বীরভূমি] মাসিক পত্রিকা [৭—১

১৩৩১

দানকেলিকৌমুদী ও শ্রীরাধা

২ শ্রীশ্রীরাসলীলা-প্রসঙ্গ

৩ বঙ্গদেশে সংস্কৃত শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা

৪ শিরোমণি মহাশয়ের গান

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

বীরভূমি] মাসিক পত্রিকা [৭—১

১৩৩১

দানকেলিকৌমুদী ও শ্রীরাধা

২ শ্রীশ্রীরাসলীলা-প্রসঙ্গ

৩ বঙ্গদেশে সংস্কৃত শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা

৪ শিরোমণি মহাশয়ের গান

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

দানকেলিকৌমুদী ও শ্রীরাধা

১। উপাখ্যান

বসুদেব মধুপুরীতে থাকেন। তিনি যজ্ঞ করিবেন। কংসের অত্যাচার, কাজেই গোপনে যজ্ঞ করিতে হইবে। গর্গের জামাতা ভাগুরিকে বসুদেব প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা যজ্ঞ হইবে, নিজে আসিতে পারিবেন না। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে গোবিন্দকুণ্ডের তীরে যজ্ঞের স্থান।

শ্রীমতী রাধিকা গুরুগণের আদেশে সখীগণের সহিত সদ্যঃ-ঘৃত লইয়া সেই যজ্ঞ-স্থলে বিক্রয় করিতে যাইবেন। রাজকন্যা ঘৃত বেচিতে যাইবেন—এ বড় আশ্চর্য্য কথা! মুনিরা বলিয়াছেন, যজ্ঞস্থলে যে নারী ঘৃত লইয়া যাইবে, তাহার অভীষ্ট লাভ হইবে, এইজন্যই শ্রীরাধা প্রেরিতা হইয়াছেন।

বসুদেব সাধুপুরুষ, তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠান অভিচার নহে,—কাহারও অনিষ্টসাধনের জন্য নহে। তাঁহার মিত্রপুত্র শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁহার নিজপুত্র বলরামের শান্তিবিধানের জন্যই এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান।

সখীগণসঙ্গে শ্রীরাধা ঘৃত লইয়া যাইবেন, পৌর্ণমাসীর উপদেশে নান্দীমুখী শ্রীকৃষ্ণকে এ সংবাদ জানাইয়াছেন। সখা সুবল ইহা বৃন্দার নিকট শুনিলেন। সুবল ভাবিলেন, ভালই হইল; আজ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকা ও তাঁহার সখীগণের নিকট দান লইবেন, সে বেশ সুন্দর খেলা হইবে। বৃন্দাও তাহাই ভাবিলেন। সুবল ও বৃন্দা, মানসগঙ্গার তীরে অবতরণ করিলেন।

মানসগঙ্গার দক্ষিণপার্শ্বে বনের ভিতর বেশ একটি মধুর শব্দ হইতেছে। সুবল তাহা শুনিয়া মনে করিতেছে হংসের কণ্ঠস্বর। বৃন্দা তাহাকে বলিলেন, উহা ব্রজবালা-দের নূপুরের শব্দ। এইবার দেখা যাইতেছে, মাথায় ঘৃতপূর্ণ স্বর্ণঘট লইয়া সখীগণের সহিত শ্রীমতী রাধিকা আসিতেছেন। বৃন্দা ও সুবল দূর হইতে সেই রূপমাধুরী দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন। বৃন্দা বলিলেন,—সুবল, তুমি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপর যে শ্যামল-মণ্ডপ আছে, সেইখানে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যাও। আমাকে ধীরে ধীরে যাইতে হইবে। ব্রজবালাদের বিলাস-কৌশল দেখাই আমার জীবনের আনন্দ। আমি তাহাদিগকে দূর হইতে দেখিতে দেখিতে যাইব।

চারিজন সখার সহিত শ্রীরাধিকা আসিতেছেন। বনশ্রেণীর শোভা দেখিয়া শ্রীরাধার আনন্দের সীমা নাই, তিনি ললিতাকে সেই শোভা দেখাইতেছেন। সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন—ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্ম—চিহ্নগুলি কেমন উজ্জ্বল, কেমন সুন্দর। ললিতা বিশাখাকে বলিতেছেন—

সদা সুধাবন্ধুরবেণুমাধুরী—
বিস্মারিতাশেষশরীরকর্ম্মণাং।
চিরং তিরশ্চামপি যত্র কাননে
মনঃ সমাধের্নকদাপুদাস্যতে॥

বাঁশির ধ্বনির মধুরতা অমৃতময়। সে ধ্বনি শুনিলে বনের পশুপাখী দেহধর্ম্ম ভুলিয়া যায়, তাহাদের মন বাঁশির স্বরে এমন সমাধিতে ডুবিয়া যায়, যে সে সমাধি আর ভঙ্গ হয় না, মন সকল সময়েই একাগ্র অবস্থায় থাকে।

শ্রীরাধিকার মনে হইতেছে, আজ একটা কিছু হইবে। শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন, আর আমাদের পথ রোধ করিবেন। ললিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সখি, তুমি হাসিতে হাসিতে বিশাখাকে কি বলিলে? ললিতা উত্তর করিলেন,—আমি বলিতেছি, আজ তোমাদের একটা কিছু বড়-রকমের লাভ হইবে।

শ্রীরাধা—সখি, কথায় কথায় আজ একবার দেবী পৌর্ণমাসীকে জিজ্ঞাসা করিও, নান্দীমুখী প্রভৃতি পূর্ব্বজন্মে কি তপস্যা করিয়াছিল?

বলিলেন—মুগ্ধে, বুঝিতে পারিলে না! যে মুখের একটু গন্ধ পাওয়াও স্বপ্নযোগে তোমাদের দুর্ল্লভ, নান্দীমুখী প্রভৃতি সেই মুখপদ্মের মাধুরী-মকরন্দ নেত্ররূপ ভ্রমরসমূহ-দ্বারা সর্ব্বদাই পান করিতেছে।

ললিতা শ্রীরাধাকে বলিলেন,—কোথায় নান্দীমুখী, আর কোথায় বা অন্য গোপনারী। ভাগ্যবতী তো তুমি।

শ্রীরাধা যেন ললিতার কথা বুঝিলেন না। তিনি যেন শুনিলেন, ললিতা মুরলীর ভাগ্যের কথা বলিতেছে। তাই বলিলেন,—সখি, ঠিক্ বলিয়াছ। মুরলীকেই প্রশংসা করিতে হয়; কারণ—

শ্রাব্যতে কলিলকেলিকাকলী—
ব্যাকুলীকৃতসমস্তগোকুলা।
শ্রীহরেরধরসীধুমাধুরী-
মাদিতা মুরলিরেব নেতরা॥

সে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতমাধুরী পানে বিহ্বল হইয়া মধুর ধ্বনিতে সমগ্র গোকুল ব্যাকুল করিয়া থাকে।

তাহার পর শ্রীরাধা নিজের অদৃষ্টের নিন্দা করিয়া আক্ষেপ করিতেছেন, আর বলিতেছেন—আমি বহুভাগ্যে তোমাদের কৃপায় তাঁহার মুখমণ্ডল দুই তিনবার মাত্র দেখিয়াছি। কিন্তু সে মুখমাধুরীর কি মাদকতা! দেখিয়াছি, আর পাগল হইয়াছি। কাজেই সে মুখ যে দেখিয়াছি, তাহা ভুলিয়াই গিয়াছি। ধ্যানযোগেও দর্শন দুর্ল্লভ।

এই প্রকারে কথা কহিতে কহিতে চারিটি সখীর সহিত শ্রীরাধা চলিয়াছেন। এমন সময় বৃন্দা আসিয়া বলিলেন—তোমরা কথা কহিতে কহিতে পথ ভুলিয়া কোথায় চলিয়াছ? বৃন্দার কথায় তাঁহাদের জ্ঞান হইল, তাঁহারা বুঝিলেন তাঁহারা গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে আসিয়াছেন, এখন দক্ষিণদিকে যাইতে হইবে।

বৃন্দা, শ্রীরাধার রূপ মুগ্ধনয়নে ও বিহ্বল-হৃদয়ে দর্শন করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের কথা ভাবিতেছেন, আর চম্পকলতার নিকট শ্রীরাধার রূপের প্রশংসা করিতেছেন। আর এদিকে শ্রীরাধা দূরে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেছেন,—আহা, মানসগঙ্গায় কেমন সুন্দর পদ্ম ফুটিয়াছে! অলিকুল কেমন শব্দ করিতে করিতে পদ্মের উপর পড়িতেছে!

শ্রীরাধার কথা শুনিয়া বৃন্দা বলিলেন—

সরোজানাং পুঞ্জে মদকলমমুং পশ্যত পুরঃ
পরাগৈরাপিঙ্গৈঃ স্ফুরদধরকায়ং মধুকরং।
মুহুর্ভ্রামিং ভ্রামং ভ্রমররমণীর্যঃ সরভসং
নিরুন্ধানো ধ্বানোদ্ধতিবিধুতমূর্দ্ধা বিহরতি॥

ওগো, সুন্দরীগণ! সম্মুখে পদ্মগুলির ভিতর মত্ত মধুকরের খেলা দেখ। কি চমৎকার শোভা, পদ্মরেণুতে মধুকরের দেহের উত্তরভাগ পীতবর্ণ হইয়াছে। বারবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন কমলিনীর পথ রোধ করিতেছে, আর দেখ কেমন ধৃষ্টতা করিয়া মাথা কাঁপাইয়া খেলা করিতেছে।

[নাট্যের সাতটি অঙ্গ। প্রথমটির নাম উপন্যাস। নাট্যের যাহা কার্য্য বা ঘটনা, প্রসঙ্গক্রমে তাহার যে বর্ণনা, তাহাকে উপন্যাস বলে। এই শ্লোকে মধুকরকে লক্ষ্য করিয়া পীতবসন শ্রীকৃষ্ণ রমণীগণের পথ রোধ করিবেন, বাক্যকলহে ধৃষ্টতা প্রকাশ করিবেন, ইহাই ইঙ্গিতে বলিয়া দেওয়া হইল।]

শ্রীরাধিকা ভাবিলেন, বৃন্দা, নিশ্চয় কিছু মনে করিয়া এই কথাগুলি বলিয়াছে। তাহার পর বৃন্দাকে প্রকাশ্যভাবে বলিলেন,—সখি, ভ্রমরী ভাগ্যবতী, সে তাহার প্রিয় কান্তের সহিত বেশ অবাধে খেলা করে। আমরা সূর্য্যের উপাসনা করি, কিন্তু আমরা হতভাগিনী। আমরা দূর হইতে কান্তকে ভাল করিয়া দেখিতেও পাইলাম না। আমার কাণদুটির বধির হওয়াই ভাল, মাধবের গুণগাথা শোনে নাই। আমার চোখদুটি অন্ধ হওয়াই ভাল, মাধবের রূপরাশি দেখে নাই।

শেষের কথাগুলি সংস্কৃত শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

ভবতু মাধবজল্পমশৃণ্বতোঃ
শ্রবণয়োরলমশ্রবণির্মম।
তমবিলোকয়তোরবিলোকনিঃ
সখি বিলোচ-নয়োশ্চ কিলানয়োঃ॥

[এইটি নাট্যের দ্বিতীয় অঙ্গ—বিন্যাস। যাহাতে নিজের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ

বৃন্দা বলিলেন—রাধে, তুমি সকল সময়েই তোমার প্রাণকান্তের সহিত দিব্যলীলা করিতেছ, তবে কেন নির্ব্বেদ প্রকাশ করিয়া খেদ করিতেছ ?

শ্রীরাধা ভাল চলিতে পারিতেছেন না। মাথায় ভার, বোধ হয় সেই জন্য। ললিতা বলিলেন,—কলস আমাকে দাও। শ্রীরাধা বলিলেন,—কলসের জন্য নহে, অলঙ্কারের ভারে কাতর হইয়াছি। শ্রীরাধা কিছুক্ষণের জন্য ভার নামাইলেন, বিশাখা শ্রীরাধার অঙ্গের অলঙ্কারগুলি খুলিয়া লইলেন।

আবার চলিতেছেন। সম্মুখে পর্ব্বতের শিখরদেশে শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যাইতেছে। গোপীগণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকট নান্দীমুখী ছিলেন, তিনি লুকাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সখাগণকে বলিলেন, তোমরা শিঙ্গা বাজাইয়া ঘোষণা কর, এখানে ঘাটোয়াল আছে। আমি ততক্ষণ বাঁশি বাজাই। বাঁশি বাজিল। বাঁশির প্রভাব বৃন্দা দেখিতেছেন। গোপীদের মাথা ঘুরিতেছে, তাহারা গাছ চাপিয়া ধরিতেছে। আশ্চর্য্য বংশীধ্বনি। তরুলতার হর্ষোদয়, কোকিলকণ্ঠে কুহুরবের জাগরণ, গোপীগণের প্রেমানল উদ্দীপন, আর শ্রীরাধার ধৈর্য্য-গিরি বিদারণ! ধন্য বংশীরব।

এইবার শ্রীকৃষ্ণ নাচিতে নাচিতে পর্ব্বতের চূড়া হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন। ললিতা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন,—দেখ একজন লোক তাড়াতাড়ি পাহাড় হইতে নামিতেছে, উহার কিছু আদায় করার মতলব আছে। চল, আমরা তাড়াতাড়ি এমনভাবে চলিয়া যাই, যেন আমরা উহাকে দেখিতেই পাই নাই। শ্রীরাধা একবার বলিলেন,—এখানে সব ভাঙ্গা পাথর, তাড়াতাড়ি চলা বড় কঠিন। যাহা হউক তাঁহারা ললিতার কথামত চলিলেন।

গোপিকাগণের ব্যবহার দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ গম্ভীরস্বরে সুবলকে বলিলেন,—সখে, সুবল, একি আশ্চর্য্য ব্যাপার। এই রমণীগুলি পায়ের নুপুর বাজাইয়া সবিলাসে হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতে কহিতে চলিয়া যাইতেছে, আমাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও নাই; আমাদিগকে যেন অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া যাইতেছে। যাও, অর্জ্জুনকে লইয়া শীঘ্র যাও, ইঁহাদের পথ রোধ করিয়া ফিরাইয়া লইয়া আইস।

সুবল অর্জ্জুনকে লইয়া অন্য পথে ঘুরিয়া গিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন ও

বলিতে লাগিলেন,—কি আশ্চর্য্য তোমরা ঘি বেচিতে যাইতেছ, জাননা। ঘটচত্বরের কর্ত্তাকে অনাদর করিয়া চলিয়া যাইতেছ! ব্যাপার কি?

গোপীরা যেন সুবলের কথা শুনিতে পায় নাই, এই ভাবে আপন মনে হাসিতে হাসিতে রহস্যালাপ করিতে করিতে আপন পথে চলিল।

সুবল দৌড়াইয়া তাহাদের নিকটে গেলেন ও বলিলেন,—আর নিজেদের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে হইবে না, ফিরিয়া আইস।

গোপীরা নিতান্ত অবজ্ঞার সহিত মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—ক্রূরভাষি, তুমি কে? আমাদের ফিরিতে বলিতেছ কেন?

সুবল—এই ঘাটের যিনি দানীন্দ্র, মাটিতে মাথা রাখিয়া আগে তাঁহাকে প্রণাম কর।

বিশাখা হাসিয়া বলিলেন,—তোমাদের দানীন্দ্র কে? গোপেন্দ্র-নন্দন। তাঁহাকে প্রণাম করা যায়, তিনি অবশ্য প্রণম্য। কিন্তু ভগবতী পৌর্ণমাসী নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়া দিয়াছেন, তোমরা যে যজ্ঞের জন্য ঘৃত লইয়া যাইতেছ, সেই যজ্ঞ অলৌকিক। পথে ব্রাহ্মণ-ছাড়া আর কাহাকেও প্রণাম করিও না।

[এইটি নাট্যের চতুর্থ অঙ্গ। ইহার নাম সাধ্বস। মিথ্যা-কথনের নাম সাধ্বস।]

অর্জ্জুন বলিলেন,—দেখ বিশাখে, আমরা যে মহাদানীন্দ্রকে প্রণাম করিতে বলিতেছি, তিনি বৃন্দাবনের ভূদেব। তিনিও এখন ব্রতধারী। আর তোমরা ব্রত-ধারিণী, কাজেই তোমরা তাঁহাকে প্রণাম করিলে কোন দোষ হইবে না।

ললিতা—তিনি আবার কি ব্রত করিতেছেন?

অর্জ্জুন—সে বড় কঠিন ব্রত! এক অর্ব্বুদ দরিদ্র ও বস্ত্রহীন ব্রাহ্মণকে তিনি বস্ত্র দান করিবেন।

অর্জ্জুন সংস্কৃত ভাষায় যাহা বলিলেন, তাহার দুই প্রকার অর্থ হয়। শ্রীরাধা অন্যরূপ অর্থ বুঝিলেন এবং তাঁহার দেহেন্দ্রিয়ে বিকার উপস্থিত হইল। ললিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেখ, আমাদের যজ্ঞমণ্ডপে যাইতে হইবে, আর দেরী করিব না, কোন্ পথে গেলে শীঘ্র যাওয়া যাইবে বলিয়া দাও।

মধুমঙ্গল বলিলেন,—ললিতে তোমরা প্রাতঃকালের পর তিন মুহূর্ত্তের মধ্যে আসিয়াছ। তোমাদের কাছে শুল্ক লওয়া উচিত নয়। তবে কি জান, তোমরা ভার

লইয়া আর চলিতে পারিতেছ না, তোমাদের কোমর বাঁকিয়া গিয়াছে। কাজেই বলি-তেছি, খট্টে আসিয়া একটু বিশ্রাম কর; আর যাইবার সময় দানীন্দ্রকে অবজ্ঞা করিয়া অপরাধ করিয়াছ, সে জন্য কিছু দিয়া যাও।

বিশাখা—গোবর্দ্ধনে দান ঘাট আছে, এ কথা তো কখন শুনি নাই।

শ্রীকৃষ্ণ—শুনিবে কি? এখন যে দেখিয়াও দেখিতেছ না!

সখীরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, ইহাদের সঙ্গে ঝগড়া করা ঠিক্ নয়। প্রথমে মিষ্ট ব্যবহার করা যাউক। তদনুসারে ললিতা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়া প্রণয়ের সহিত মিষ্টভাষায় বলিলেন,—গোকুলানন্দ, আমরা তোমার গ্রামের লোক। আমরা ভাল লোক, তুমিও সাধুশিরোমণি, আমাদের ছাড়িয়া দাও।

শ্রীকৃষ্ণ করুণার সহিত উত্তর দিলেন,—কি করি, আমার তো কোন হাত নাই, আমি স্বাধীন নই, রাজার কাজ, রাজার হুকুম!

ললিতা—রাজা কে? কংস?

কৃষ্ণ—না, না।

ললিতা—তবে কে?

কৃষ্ণ—মহামন্মথ,জান তিনি কে? তাঁহার চোখেরদৃষ্টিতে হাজার কংস পরাজিত হয়।

ললিতা—মন্মথ চক্রবর্তীর নাম তো কোন কালে শুনি নাই। ললিতার কথা শুনিয়া মধুমঙ্গল এক বিকট হাসি হাসিয়া উঠিলেন, আর বলিলেন,—মহামন্মথের নাম শোন নাই? আশ্চর্য্য, অতি আশ্চর্য্য! তাঁহার রাজধানী কোথায় জান না? মহাকটকে প্রমদমঞ্জরী-নামক তাঁহার রাজধানী। মধুমঙ্গল, সুবল, বিজয়, ইঁহারা তাঁহার বড় বড় অমাত্য। উত্তম রমণীগণ তাঁহার বিহার স্থান।

শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলের কথায় আর একটু যোজনা করিয়া বলিলেন,—কুরঙ্গ, ভৃঙ্গ, কোকিল, প্রভৃতি তাঁহার হুকুমে সর্ব্বদা দূতের কাজ করে।

চম্পকলতা বলিলেন,—ব্রজেন্দ্রনন্দন চোরের রাজা, তাহার দলের লোক সকলেই চোর! ঘৃত চুরি করিলেই বা কি করা যায়? বিরোধ করিয়া ফল নাই।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যস্ত হইয়াছেন, ললিতাকে বলিতেছেন,—তোমার কিছু নীতিজ্ঞান আছে,

চিত্রা বলিলেন,—আমরা যজ্ঞের ঘৃত লইয়া যাইতেছি। শুল্ক দিলেই ঘৃত অশুদ্ধ হইবে। তাহা না হইলে সামান্য কিছু শুল্ক আমরা অনায়াসেই দিতে পারিতাম।

ললিতা দেখিলেন, ব্যাপার কঠিন। শ্রীরাধাকে বলিলেন,—সখি, মাথায় ভার লইয়া আর কত দাঁড়াইয়া থাকিবে? ভার নামাইয়া বিশ্রাম কর।

ললিতার কথায় সকলেই ভার নামাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ খুব খুসি হইয়া সুবলকে বলিলেন,—সুবল, এই ললিতা বড় ভাললোক, আমাদের বন্ধু। ইনি আমাদের অতিথি। দাও, রত্নপাত্র হইতে উহাকে খুব ভাল পাঁচটি পাণ দাও।

বিশাখা সুবলকে বলিলেন,—ইঁহারা সকলে ব্রতধারিণী, পাণের প্রয়োজন নাই।

তাহার পর কৌতুক ও বাক্‌যুদ্ধ। রসতত্ত্বের আলোচনায় আমরা অন্য কোন সময়ে ইহার আস্বাদন করিব।

বিশাখা চম্পকলতাকে বলিতেছেন,—ইহারা পেটুক, মিছামিছি ঘাট পাতিয়া ভিক্ষা করিতেছে, ইহাদের কুড়ি কড়া কড়ি দাও, ছোলা কিনিয়া খাইবে।

বহুক্ষণ বাক্‌যুদ্ধের পর নান্দীমুখী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—আমার অনুরোধ, ইহারা সূর্য্যোপাসিকা, যজ্ঞস্থলে যাইতেছে। ইহাদের কিছু কম করিয়া শুল্ক গ্রহণ কর। শ্রীকৃষ্ণ সম্মত হইলেন, মধুমঙ্গলকে বলিলেন,—কিছু কম করিয়া হিসাব কর। মধুমঙ্গলের হিসাবে ধার্য্য হইল, চতুরশীতি লক্ষ স্বর্ণ-টঙ্ক লাগিবে।

শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে তুষ্ট হইলেন না। তিনি মধুমঙ্গলকে বলিলেন,—সখে, তুমি রসলুব্ধ, তুমি ঘুঁস খাইয়া হিসাব কম করিয়াছ। যাহা হউক মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের কাণে কাণে কি বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উহাতেই রাজি হইলেন। তাহার পর স্থির হইল শুল্কের জন্য যে কোন একটি রমণীকে লইতে হইবে। কারণ উহারা প্রত্যেকেই চতুরশীতিলক্ষ জীবজাতি অপেক্ষা বরিষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—তবে ললিতাকেই লওয়া হউক। তাহার পর বলিলেন,—না শ্রীরাধাকেই লইতে হইবে।

শ্রীরাধা ভয় পাইয়া বিশাখাকে বলিলেন,—সখি, রক্ষা কর, রক্ষা কর। এই বলিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন।

গর্ব্ব করিতে হইবে না, আমি চলিলাম। শ্রীকৃষ্ণ—কি করিয়া যাইবে? তোমার চুলগুলি কি পাখা, যে উড়িয়া পলাইবে?

এইবার শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে ধরিতে চেষ্টা করিলেন! শ্রীরাধা একটু ফিরিয়া বলিলেন,—দূর হও, দূর হও, আমাকে ধরিও না।

ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সখাগণ স্থির করিলেন, এই রমণীগণ বুকের মধ্যে আরও কলস লুকাইয়া ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিতেছে। এই কথা লইয়া আবার তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

বিশাখা স্থির করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—শুল্কের জন্য এই বৃন্দাকে গ্রহণ কর। সুবল বলিলেন,—পঞ্চবৃন্দ পাওনা, এক বৃন্দায় কি হইবে? ললিতা ক্রোধ করিয়া বিশাখাকে বলিলেন,—কতই বা শুল্ক যে বৃন্দাকে দিবে? বৃন্দার দাম কত জান?

মধুমঙ্গল ললিতাকে বলিলেন,—যাও যাও আর মিথ্যা কথা বলিতে হইবে না।

ললিতা বলিলেন,—দেখ তেত্রিশ কোটি দেবতা অপেক্ষা ইন্দ্র প্রধান। ইন্দ্র শতকোটি। তাঁহা অপেক্ষা হিরণ্যগর্ভ প্রধান, তিনি দ্বিপরার্দ্ধবৈভব। তাঁহা অপেক্ষা লক্ষ্মী প্রধান, তিনি সর্ব্বসম্পত্তির অধীশ্বরী। লক্ষ্মী অপেক্ষা বৃন্দা প্রধান। ভগবান্ বিষ্ণু বৃন্দার রূপে মুগ্ধ হইয়া লক্ষ্মীকে তুচ্ছজ্ঞান করেন। এ কথা আমরা ভগবতী পৌর্ণমাসীর নিকট শুনিয়াছি।

এখন সমস্যা,—বৃন্দা কাহার? শ্রীকৃষ্ণের, না গোপীগণের। নান্দীমুখী বলেন, বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের। শ্রীরাধা বৃন্দাকে বলিলেন,—বৃন্দে, বল তুমি কাহার? শ্রীকৃষ্ণ চক্ষু টিপিয়া বৃন্দাকে নিজের দলে টানিতেছেন। কিন্তু বৃন্দা, তাহা মানিলেন না। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—নাগরেন্দ্র, চোখ টিপিয়া যাহাই বলুন, বৃন্দা বৃন্দাবনেশ্বরীর।

সখীরা আহ্লাদে খুব হাসিয়া উঠিলেন। তখন বৃন্দা শ্রীরাধাকে বলিলেন,—দেখ আমাকে যদি বিক্রয় কর, এখানে করিও না। কারণ, জুয়ার আড্ডা অপেক্ষাও ঘাটোয়ালের আড্ডা খারাপ। এখানে দাম হইবে না।

মীমাংসা হয় না। মধুমঙ্গল মধ্যস্থতা করার জন্য গোপীদের বলিলেন,—আমাকে কিছু দাও, সব মিটিয়া যাইবে। বিশাখা বলিলেন,—শর্করা দিব। শর্করা মানে চিনি,

আর শর্করা মানে খোলা। মধুমঙ্গল হাত পাতিলেন, বিশাখা দিলেন খোলা। কাজেই মীমাংসা হইল না।

এইবার শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—তোমরা যখন শুল্ক দিবে না, তখন আর উপায় কি, 'যুদ্ধ কর।'

বৃন্দা বলিলেন,—তুমি মহাযোদ্ধা, আর আমরা স্ত্রীলোক, আমরা তোমার সহিত কি করিয়া যুদ্ধ করিব ?

শ্রীরাধা বলিলেন,—নাগর, তোমার চাতুরী বুঝিয়াছি। আমরা যজ্ঞবেদিকায় চলিলাম।

শ্রীকৃষ্ণ,—কি করিয়া যাইবে ? তোমরা যে শুল্কের জন্য অবরুদ্ধা। যদি জোর করিয়া যাও, টানিয়া ধরিয়া রাখিব।

ললিতা বলিলেন,—আমরা চলিলাম, কি করিবে কর।

শ্রীরাধা বলিলেন,—ললিতা যদি দাঁড়ায়, হরি কি করিতে পারেন ?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—পঙ্কজাক্ষি, শেষ কথা শোন।

বিদ্যোতসে কল্পলতেব কামদা
ভ্রূকার্মুকং ভূরি ধুনোসি চাগ্রহং।
ইত্যর্থপুঞ্জং মম দেহি পুষ্কলং
কিম্বা সখীভিঃ সহ সুষ্ঠু বিগ্রহং ॥

তুমি কামদা, কামদায়িনী, তুমি কল্পলতার ন্যায় উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইতেছ। সুন্দরি, তুমি বারবার ভ্রূধনু কম্পিত করিতেছ কেন ? আমার প্রাপ্য শুল্ক দাও, নতুবা আমার সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ কর।

ললিতা বলিলেন,—শঙ্খচূড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তোমার যুদ্ধ করিবার ইচ্ছাটা খুব বাড়িয়া গিয়াছে, দেখিতেছি। শ্রীরাধা বলিলেন,—আর বিশ্রামের প্রয়োজন নাই, কলস তোল, চল আমরা সকলে চলিয়া যাই।

শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে আদেশ করিলেন, উহাদের ঘৃতপূর্ণ কলসগুলি আটক কর।

সুবল ললিতাকে ভয় করেন, কাজেই বলিলেন,—আমি একা কি করিয়া পাঁচটি

সুবল বলিলেন,—সখে, তুমি কেবল মুখের কথায় দর্প করিতেছ! কিন্তু, তোমার তো মনে আছে, সেদিন শ্রীরাধার সহিত পাশা খেলিতেছিলে, আর ললিতা মিছামিছি শ্রীরাধার জয় ঘোষণা করিয়া তোমার মুরলী কাড়িয়া লইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া দন্ত প্রকাশ করিলেন, ললিতা উপহাস করিয়া বলিলেন,—শ্রীদামকে ডাক, একা পারিবে না।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে ঈষৎ আবরণ করিয়া বলিলেন,—গৌরি! যদি কাঞ্চন না দাও, গিরিগহ্বরে প্রবেশ কর।

ললিতা শ্রীকৃষ্ণকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন,—জান, উহার স্বামী উহাকে কত সম্ভ্রম করে? চরণ-পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে সাহস করে না।

ললিতার কথা শুনিয়া মধুমঙ্গল খুব জোরে হাস্য করিয়া বলিলেন,—ললিতে, তোমার প্রিয়সখী শ্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা কর, দুর্ব্বাসার নিকট তিনি শুনিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ আশৈশব ব্রহ্মচারী।

এইবার রীতিমত পাল্টা আরম্ভ হইল। বিশাখা বলিলেন,—এই সব গোপগণ বৃন্দাবনের বনে লক্ষকোটি গোচারণ করে। গরুগুলি বনের গাছপালা ভাঙ্গে, আর গোপগণ ফল পাড়িয়া খায়, পুষ্প ও পল্লবের দ্বারা বেশ রচনা করে। এই প্রকারে ইহারা বৃন্দাবন ধ্বংস করিয়া ফেলিল। গোকুলযুবতীকুলচক্রবর্ত্তিনী আমাদের প্রিয়সখী, যিনি বৃন্দাবনের একমাত্র কর্ত্রী, তাঁহার আদেশ, এই দুষ্ট গোপগণ, তাহাদের গরুর পাল লইয়া হয় এই বন ছাড়িয়া চলিয়া যাউক, না হয় উপযুক্ত কর প্রদান করুক।

মধুমঙ্গল ঝগড়া আরম্ভ করিলেন। ললিতা বলিলেন,—এ ব্যক্তি অজ্ঞান, ইহার সহিত তর্ক করিয়া কি হইবে? বিশাখার অনুরোধে নান্দীমুখী সকলকে শুনাইয়া শ্রীরাধার মহাভিষেকের মহামহোৎসব বর্ণনা করিতে লাগিলেন। পাঁচজন দেবী আসিয়াছিলেন। দেবকীর কন্যা, যিনি কংসকে ভর্ৎসনা করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, সূর্য্যের স্ত্রী সংজ্ঞা; সূর্য্যের স্ত্রী ছায়া; সূর্য্যের কন্যা যমুনা; আর গঙ্গা বা মানস-গঙ্গা। ব্রহ্মপত্নী সাবিত্রী পদ্মমালা, ইন্দ্রপত্নী শচী স্বর্ণ-সিংহাসন, বরুণপত্নী গৌরীছত্র, পবনপত্নী শিবা চামরদ্বয়, অগ্নিপত্নী স্বাহা বস্ত্রদ্বয়, যমের পত্নী ধূমোর্ণা মণিদর্পণ, এই অভিষেকের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। স্বর্গে বাদ্য বাজিয়াছিল, তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বেরা মেঘের অন্তরাল হইতে গান করিয়াছিল, অপ্সরস্ত্রীগণ আসিয়া শ্রীরাধার অভিষেক করিয়াছিলেন।

শ্রীরাধাকে স্বর্ণ-সিংহাসনে বসাইয়া গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, মণিকুম্ভে মহাভিষেক করিয়া বৃন্দাবন-রাজ্যের আধিপত্য শ্রীরাধাকে অর্পণ করিয়াছেন।

নান্দীমুখী দেখাইলেন, এই সৌগন্ধিক মালা সাবিত্রী পাঠাইয়াছিলেন। দেবকীপুত্রী বিন্ধ্যবাসিনী এই মালা শ্রীকৃষ্ণের গলায় দিয়াছিলেন। যমুনা আপত্তি করিয়াছিলেন। তাহাতে বিন্ধ্যবাসিনী শ্রীকৃষ্ণের গলা হইতে ঐ মালা ও হার লইয়া শ্রীরাধার গলায় দিয়াছিলেন। এ হার লওয়া হইবে না বলিয়া যমুনা আবার শ্রীরাধার হার খুলিয়া শ্রীকৃষ্ণের গলায় দিয়াছিলেন। বিন্ধ্যবাসিনী দেবী, শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল হইতে মৃগমদ তুলিয়া শ্রীরাধার তিলক করিয়া দিলেন। এই প্রকারে শ্রীরাধার অভিষেক হইয়াছিল। অভিষেক হওয়ার পর পৌর্ণমাসী দেবী বৃক্ষগণকে বলিয়াছিলেন, তোমরা ফুলে ফলে সুশোভিত হইয়া লতাবধূর সহিত বিহার কর; পাখীগণকে বলিয়াছিলেন, তোমরা ভৃঙ্গের সহিত রঙ্গে ক্রীড়া কর; পশুদের বলিয়াছিলেন, তোমরা নির্ভয়ে নিজ নিজ পরাক্রম প্রকাশ কর। শ্রীরাধা বৃন্দাবনেশ্বরী হইয়াছেন, তাঁহার সখীরা সেনাপতির কাজ করিবেন, আর বৃন্দা অমাত্য হইয়াছেন। পৌর্ণমাসীর কথা শুনিয়া যাবতীয় তরুলতা ফলে ফুলে সুশোভিত হইল। এই প্রকারে শ্রীরাধার অভিষেক হইয়াছিল।

এই অভিষেকে বিন্ধ্যবাসিনী দেবী তিলক দিয়াছিলেন, শনির জননী ছায়া মস্তকে চূড়া বন্ধন করিয়াছিলেন, বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞা মাথার চুল বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, সখীরা অঙ্গে অলঙ্কার পরাইয়াছিলেন, সূর্য্যকন্যা যমুনা চামর দিয়া বীজন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মনন্দিনী সরস্বতী মাথায় মণিচ্ছত্র ধরিয়াছিলেন।

মধুমঙ্গল যেন এই অভিষেকের কথায় বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে। যাহা হউক এই অভিষেক কথার আলোচনার পর শ্রীরাধা বলিলেন,—সখি বৃন্দে, আট বৎসর হইল অভিষেক হইয়াছে, এইবার হিসাব কর, আট বৎসরে কত কর হয়?

বৃন্দা বলিলেন,—সেই করের দ্বারা কৃষ্ণ প্রভৃতি গোপকে কিনিয়া রাখা যায়।

ললিতা বিশাখাকে বলিলেন,—বিশাখে, বৃন্দাবনেশ্বরীর আদেশ,—আগে ঐ পেটুক ব্রাহ্মণ বালকটার মণিভূষণ কাড়িয়া লও। এই বলিয়া মধুমঙ্গলকে দেখাইয়া দিলেন। মধুমঙ্গল পলাইবার পথ দেখিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অভয় দিলেন। আবার নূতন

শ্রীরাধা বলিতেছেন,—গোপদের কিনিয়াছি। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—তোমার আদি, অন্ত, মধ্য তিন স্থান বক্র, তুমি বক্রেশ্বর। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—তোমার বাক্য, কেশ, ভ্রূ, দৃষ্টি, হাস্য, গমন, অবগুণ্ঠন ও হৃদয়, এই আট স্থান বক্র, তুমি অষ্টাবক্র মুনি, তোমাকে প্রণাম।

কিছুক্ষণ পরে চিত্রা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—পুরুষোত্তম, আমরা ধর্ম্মপরায়ণ আমাদের মোচন কর। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—এ রাজ্যের রীতি অন্যরূপ, এখানে ধর্ম্মের দ্বারা মোক্ষ হয় না, কামের দ্বারা মোক্ষ হয়। নান্দীমুখী বলিলেন,—সত্য কথা। এই জন্যই কামের পর মোক্ষ।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিলেন,—তুমি এখন আমার নিকট শুল্ক-ক্রীতা, অতএব সেবার দ্বারা দানীন্দ্রকে তুষ্ট কর। নান্দীমুখী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—তুমিই সেবা করিবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—তবে আমিই সেবা করি, এই বলিয়া শ্রীরাধার নিকটে গেলেন। আবার ললিতার সহিত কলহ আরম্ভ হইল। ললিতা বলিলেন,—আমি থাকিতে তুমি কিছুই করিতে পারিবে না। তখন শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া ললিতাকে বলিলেন,—নমস্তুভ্যং মহাচণ্ডি চামুণ্ডে নমস্তুভ্যং নূনং মুণ্ডমালাখ্যমাত্মনো মণ্ডনং বিমুচ্য দুর্ব্বার মার-সংহারায় গোপিকারূপেণোপস্থিতাসি।—হে মহাচণ্ডি, হে চামুণ্ডে, তোমাকে নমস্কার, তোমার অলঙ্কার মুণ্ডমালা, ইহা সকলেই জানে। এখন মুণ্ডমালা ছাড়িয়া গোপিকারূপে অবতীর্ণ হইয়াছ। দুর্ব্বার মদনকে বধ করাই বুঝি তোমার অভিপ্রায়।

ললিতা বিশাখাকে বলিলেন,—তুমি ভগবতী পৌর্ণমাসীর নিকট গিয়া আমাদের সমুদয় কথা তাঁহাকে বল। নান্দীমুখী জানেন ভগবতী পৌর্ণমাসী নিকটেই আছেন, মাধবীমণ্ডপের অন্তরালে লুকাইয়া আছেন, কিন্তু সে কথা এখন বলা হইবে না। কাজেই ললিতাকে বলিলেন,—ভগবতী পৌর্ণমাসী এখন গোকুলেশ্বরীর নিকট থাকিতে পারেন।

এইবার শ্রীরাধা পরিহাস করিয়া হাসিতে হাসিতে ললিতাকে বলিলেন,—সখি, তুমি নিজের অপেক্ষাও আমাদের বেশী ভালবাস। তুমি নিজে আত্মসমর্পণ করিয়া আমাদের রক্ষা করিবে, এইরূপ অনুমান হইতেছে।

পথের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মুখদর্শনই তাহাদের পাপ হইয়াছে। কাজেই সকলে পাপক্ষালনের জন্য বিষ্ণুস্মরণ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ললিতাকে বলিলেন,—সত্যই দূষিতা হইয়াছ। আমার কাছে এস আমি দোষশূন্য করি। এই বলিয়া ললিতাকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইলেন। ললিতা বলিলেন,—ছুঁইও না, আমি দূষিতা হইব। শ্রীরাধা বলিলেন,—তোমাকে ছুঁইয়াছে, তুমি দূষিতা হইয়াছ। ললিতা বলিলেন,—বেশ, পাঁচজনের সহিত একত্রে কিছু হইলে দুঃখ বা দোষ হয় না। অতএব কৃষ্ণ, তুমি উহাদেরও সকলকে স্পর্শ কর। ললিতার কথায় শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই ধরিতে গেলেন। শ্রীরাধা ললিতাকে তিরস্কার করিলেন। মধ্যাহ্ন-কাল উপস্থিত। ললিতা চিত্রার আঙ্গুল হইতে মণিময় অঙ্গুরী লইয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন,—তোমার পাওনা পঞ্চাশ গণ্ডা কড়ি। যাহা হউক, খুব বেশী দিলাম।

কৃষ্ণের আদেশে সুবল অঙ্গুরী লইয়া এইরূপ দেখাইলেন, যেন ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। ললিতা ক্রোধ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু কি করিবেন, দান দিতেই হইবে। শ্রীরাধার কণ্ঠ হইতে হার খুলিয়া লইলেন। শ্রীকৃষ্ণকে হার দিয়া ললিতা বলিলেন,—ঘট্টনাথ, এই হারগাছটি গচ্ছিত রাখিলাম। সন্ধ্যাকালে সুবর্ণ দিয়া হার ফিরাইয়া লইব। শ্রীকৃষ্ণ হারগাছটি নিজের গলায় দিলেন।

এইবার মধুমঙ্গল ললিতাকে বলিলেন,—আমাকে খাইবার জন্য কিছু ঘি দাও। ললিতা বলিলেন,—ইহা যজ্ঞের ঘৃত। মধুমঙ্গল বলিলেন,—আঙ্গিরস যজ্ঞের যজ্ঞপত্নীরা নিজেদের বাড়ীর যজ্ঞ ছাড়িয়া আমাদের সকলকে মিষ্টান্ন খাওয়াইল, আর তুমি একজন ব্রাহ্মণকে খাওয়াইতে পার না!

শ্রীকৃষ্ণ হার পাইয়াছেন, গলায় পড়িয়াছেন, কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি এবার দাবী করিলেন, উদ্যানরাজের অভিমত শুল্ক দিয়া তাঁহার পূজার ব্যবস্থা কর। ললিতা ইহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিলে নান্দীমুখী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—তোমার অভিমত কি, আমাকে বল, আমি মধ্যস্থতা করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—শ্রীরাধাকে গচ্ছিত রাখ। নান্দীমুখী বলিলেন,—তাহা হইবে না, চিত্রাকে গচ্ছিত রাখিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ

এইবার ভগবতী পৌর্ণমাসী আসিয়া প্রবেশ করিলেন ও শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,— তাহা হইবে না, শ্রীরাধাকে পাইবে না, কারণ শ্রীরাধা অমূল্য ধন।

ভগবতী পৌর্ণমাসীকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন ও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিয়া বলিলেন,—ভগবতি, কেবল শুল্ক আদায়ের জন্যই এই আগ্রহ। গোপীর দাম পাঁচ কড়া কড়িও নহে। শ্রীরাধা পৌর্ণমাসীকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন ও বলিলেন,—আপনি যখন আসিয়াছেন, তখন আর আমাদের চিন্তা নাই। পৌর্ণমাসী প্রথমে বলিলেন,—দান না দিয়া কলহ করিয়া ভাল কর নাই। ললিতা বলিলেন,—আমরা হার দিয়াছি। পৌর্ণমাসী বলিলেন,—কলহের জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রতিকূল হইয়াছেন। প্রিয়ার উপহার চাই। শ্রীরাধাই তাহাতে সমর্থ। শ্রীরাধা কাঁদিতে লাগিলেন। পৌর্ণমাসী আশ্বস্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কান্তামণি লাভ করিলেন।

পৌর্ণমাসী প্রার্থনা করিলেন, তোমরা সর্ব্বদা এই লীলা কর, আর যাহারা তোমাদের সেবায় উৎকণ্ঠিত হইবে তাহাদের মনোরথ পূর্ণ করিও।

২। রসকথা

দানকেলি-কৌমুদী একখানি ভাণিকা, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ, গীতি-নাট্য। ইহার উপাখ্যানাংশ বৃহৎ নহে, সামান্য বলিলেও হয়। কিন্তু রসতত্ত্বের আলোচনায় ইহা অতুলনীয়। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহোদয় এই গ্রন্থে যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, বিদগ্ধমাধব বা ললিতমাধবে সেরূপ সন্তুষ্ট হন নাই। এই গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোক বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিলে রসের উদ্ঘাটন হইতে পারে। আমরা সংক্ষেপে কেবল কয়েকটি কথার আলোচনা করিব। এই আলোচনা আমাদের নিজের খেয়াল-অনুসারে নহে, প্রাচীন টিকাকার যে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া তদনুসারেই আলোচনা করিব।

রসতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয়ের শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থের আলোচনা দরকার। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী, এই গ্রন্থের প্রথমাংশে এই চারিটি বিষয় বিচারিত হইয়াছে। এই চারিটির সাহায্যে মধুর ভক্তিরসের আস্বাদন হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত-পরিকর প্রভৃতি আলম্বন। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়-

গুণ, রূপ, নাম, চরিত্র, ভূষণ, ক্রীড়া, বেণুবাদন, গোদোহন, ভৃঙ্গ, কুঞ্জ, লতা প্রভৃতি এক শ্রেণীর উদ্দীপন। আবার চন্দ্রিকা, মেঘ, বিদ্যুৎ, বসন্ত, শরৎ, পূর্ণচন্দ্র, বায়ু, পাখী, ইহারা আর এক শ্রেণীর উদ্দীপন। এগুলি বিশেষভাবে বিচারিত হইয়াছে। এই গেল বিভাব।

এইবার অনুভাব। অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিক, এই তিন প্রকার অনুভাব। অলঙ্কার কুড়ি প্রকার। অঙ্গজ, অযত্নজ ও স্বভাবজভেদে ইহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ভাব, হাব, হেলা—অঙ্গজ। শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য—অযত্নজ। লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত, বিকৃত—স্বভাবজ। আমরা শেষের এই স্বভাবজ অলঙ্কার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব বলিয়া ভূমিকা স্বরূপে এই টুকু বলিলাম।

ক। কিলকিঞ্চিত

গর্ব্বাভিলাষরুদিত-স্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতং॥

গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ, এই সাতটি বিভিন্নধর্ম্মী ভাবের সঙ্করীকরণ (মিশ্রণ, যুগবৎ প্রাকট্য) অর্থাৎ একই সঙ্গে উদয় হইয়া থাকে। হর্ষ-নিবন্ধন ইহা হইয়া থাকে, ইহার নাম কিলকিঞ্চিত। ইহা কেমন ভূষণ, ধ্যানযুক্ত হইয়া আস্বাদন করিতে হইবে। ইহাই সাধন।

দানকেলিকৌমুদী-গ্রন্থের যেটি প্রথম শ্লোক বা বন্দনা-শ্লোক, তাহাতে এই কিল-কিঞ্চিত ভাব উদাহৃত হইয়াছে।

অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎ পাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী।
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ॥

শ্রীরাধার কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টি তোমাদের কল্যাণ বিধান করুন। সেই দৃষ্টি

জলকণ-ব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা,—চক্ষুর পক্ষ্মগুলি জলকণাব্যাপ্ত। কিঞ্চিৎ পাটলিতাঞ্চলা,—চক্ষুর অন্তভাগ সামান্য পাটল-বর্ণ। রসিকোৎসিক্তা,—রসিকতার দ্বারা চক্ষু উৎসিক্ত। পুরঃ কুঞ্চন্তী,—অগ্রভাগ সঙ্কুচিত। মধুর-ব্যাভুগ্ন-তারোত্তরা,—মধুরতাদ্বারা তারা কিঞ্চিৎ বক্র। কোন সময়ে ইহা হইয়াছিল? শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক যে-সময়ে শ্রীরাধা পথিমধ্যে অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন।

শ্রীরাধা যে সময়ে ঘৃতকলস লইয়া যজ্ঞস্থলে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে ইহা হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণদর্শন-জাত হর্ষ। আমি কুলবধূ, পাছে কেহ দেখে, এই জন্য নয়নে অশ্রুকণা ও রোদন। শ্রীকৃষ্ণ পথ রোধ করিলেন, এজন্য ক্রোধ এবং চক্ষু আরক্ত। রসিকতা-দ্বারা চক্ষুঃ প্রসারিত,—ইহাতে অভিলাষ। কি জানি কি হয়, এই ভয়,—ইহাতে চক্ষুঃ সঙ্কুচিত। মধুরতা-দ্বারা দৃষ্টি ঈষৎ বক্র,—ইহাতে গর্ব্ব ও অসূয়া।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের মধ্যলীলার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে কিলকিঞ্চিতভাবের বর্ণনা আছে। কেবল বর্ণনা নহে, ইহার মূল কথাটিও আছে। বৈষ্ণব-ভক্তগণ শ্রীভগবান্‌কে কি ভাবে দেখিতেন, তাহা জানা দরকার। তাহা না জানিলে, এই রসতত্ত্বের আলোচনায় বা ধ্যান-ধারণা ও আস্বাদন কেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। স্বরূপ দামোদর বক্তা, আর আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রোতা,—জিজ্ঞাসু শ্রোতা।

দামোদর কহে কৃষ্ণ রসিকশেখর। রস-আস্বাদক রসময়-কলেবর॥
প্রেমময়-বপু কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমাধীন। শুদ্ধপ্রেমরসগুণে গোপিকা প্রবীণ॥
গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস দোষ। অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ॥
'বামা' এক গোপীগণ দক্ষিণা একগণ। নানাভাবে করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন॥
গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরাণী। নির্ম্মল-উজ্জ্বলরস-প্রেমরত্ন-খনি॥
বয়সে 'মধ্যমা' তেঁহো, স্বভাবেতে 'সমা'। গাঢ় প্রেমভাবে তেঁহো নিরন্তর 'বামা॥'
বাম্যস্বভাবে 'মান' উঠে নিরন্তর। তাঁর 'বাম্যে' উঠে কৃষ্ণের আনন্দ সাগর॥
'অধিরূঢ়মহাভাব' সদা রাধার প্রেম। বিশুদ্ধ নির্ম্মল যেন দশবাণ হেম॥
কৃষ্ণের দর্শন যদি পায় আচম্বিতে। নানাভাববিভূষণে হয় বিভূষিতে॥
অষ্ট সাত্ত্বিক, হর্ষাদি ব্যভিচারী আর। সহজ প্রেম বিংশতি ভাব-অলঙ্কার॥
কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত, বিলাস, ললিত। বিব্বোক, মোট্টায়িত আর মৌগ্ধ্য চকিত॥

কিলকিঞ্চিত ভাব-ভূষায় শুন বিবরণ। যে ভূষায় ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণমন ॥
রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ছুইতে করে মন। দানঘাটি পথে যবে বর্জ্জেন গমন ॥
যবে আসি মানা করে পুষ্প উঠাইতে। সখী-আগে চাহে যদি অঙ্গে হস্ত দিতে ॥
এই সব স্থানে কিলকিঞ্চিত উদ্গম। প্রথমেই হর্ষ সঞ্চারী মূল কারণ ॥
আর সাত ভাব আসি সহজে মিলয়। অষ্ট-ভাব সম্মিলনে মহাভাব হয় ॥
গর্ব্ব, অভিলাষ, ভয়, শুষ্ক-রুদিত। ক্রোধ, অসূয়া সহ আর মন্দস্মিত ॥
নানা স্বাদু অষ্টভাবে একত্র মিলন। যাহার আস্বাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণ মন ॥
দধি-খণ্ড-ঘৃত-মধু-মরিচ-কর্পূর। এলাচি-মিলনে যৈছে রসালা মধুর ॥
এই ভাবযুক্ত দেখি রাধাস্য নয়ন। সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটিগুণ ॥

ইহার পর দুইটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথমটি দানকেলিকৌমুদীর প্রথম শ্লোক, যাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি; আর দ্বিতীয়টি শ্রীগোবিন্দলীলামৃত-গ্রন্থের। দ্বিতীয় শ্লোকটি প্রবন্ধান্তরে আলোচ্য।

শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর মহোদয়ের একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি। এই পদটিতে কিলকিঞ্চিত ভাব বিবরিত হইয়াছে।

গরবহি সুন্দরী, চললহ আনত, নাগর পহু আগোর।
কহতহিঁ বাত, দান দেহ মঝু হাত, আন ছলে কাঁচলি তোড় ॥
অপরূপ প্রেমতরঙ্গ।
দান-কেলি-রসকলিত মহোৎসব, বর কিলকিঞ্চিত রঙ্গ ॥
অলপ পাটল ভেল, অথির দৃগঞ্চল, তহিঁ জল-কণ পরকাশ।
ধুনাইত ভুরু-ধনু, পুলকে পূরল তনু, অলখিত আনন্দ হাস ॥
ঐছন হেরি, চকিত পুন তৈখনে, বাহুড়ল পদ দুই চারি।
রাধামাধব, দুহুঁ কর পদতলে, রাধামোহন বলিহারি ॥

এই পদের সংস্কৃত ভাষায় টিকা আছে। তাহা শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর কৃত। ঐ টিকায় রসবিবৃত্তি আছে। যথা—

আনত, অন্যত্র। অত্র প্রথমচরণে গর্ব্বঃ স্পষ্টঃ। 'অল্পপাটল' ইত্যনেন ক্রোধঃ। 'তহিঁ জলকণ' ইত্যনেন রোদনং। 'ধুনাইত ভুরুধনু' ইত্যনেনাসূয়া। 'পুলকে পূরল'

ইত্যনেনাভিলাষঃ। 'অলখিত আনন্দ হাস' ইত্যনেন স্মিতঃ। 'তৈখনে বাহুড়ল পদ দুই চারি' ইত্যনেন ভয়ং ইতি সপ্ত।

খ। কুট্টমিত

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে ধরিতে যাইতেছেন, বলিতেছেন,—তোমায় যে কিনিয়াছি। শ্রীরাধা সভয়ে পলাইতেছেন, আর ললিতাকে বলিতেছেন,—তুমি কি কৌতুক দেখিতেছ ? নান্দীমুখী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন,—সখি রাধে, কুট্টমিত ভাব প্রকাশের প্রয়োজন নাই, পলাইতেছ কেন ?

স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ॥

হৃদয়ের প্রীতি হইলেও সম্ভ্রমবশতঃ ব্যথিতের ন্যায় বাহিরে যে ক্রোধ-প্রকাশ, তাহাকে পণ্ডিতেরা কুট্টমিত বলেন।

লোভে আসি কৃষ্ণ করে কঞ্চুকাকর্ষণ। অন্তরে উল্লাস রাধা করে নিবারণ॥
বাহিরে বামতা ক্রোধ, ভিতরে সুখ মন। কুট্টমিত নাম এই ভাব-বিভূষণ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ হয় করে পাণি রোধ। অন্তরে আনন্দ রাধা বাহিরে বাম্য ক্রোধ॥
ব্যথা পাঞা করে যেন শুষ্ক রোদন। ঈষৎ হাসিয়া করে কৃষ্ণকে ভর্ৎসন॥
এই মত আর সব ভাব বিভূষণ। যাহাতে ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণ মন॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

'দানকেলি-কৌমুদি' গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি একটি শ্লোকে কুট্টমিত ভাব বিবরিত হইয়াছে।

পটোন্নমনলীলয়া পুলকবৃন্দমারুন্ধতী
স্মিতস্বধরচাতুরী পরিচয়েন গান্ধর্বিকা।
মৃষা ভ্রূকুটীবল্লরী কৃতমুখী মদুক্তিশ্রবা-
ন্নিরস্যতি দৃগঞ্চলভ্রমিভিরত্র রুষ্টেব মাং॥

গান্ধর্বিকা (শ্রীরাধা) লীলায় বস্ত্র তুলিয়া অঙ্গের পুলক গোপন করিতেছেন ; অধরের

বন্ধুর হইতেছে ; যেন রুষ্টা হইয়াছেন, এই প্রকারে দৃগঞ্চল ঘুরাইয়া আমাকে প্রত্যাখান করিতেছেন।

গ। বিব্বোক

ইষ্টেঽপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাদরঃ।

'ইষ্ট' কান্ত-কর্ত্তৃক প্রদত্ত বস্তু। গর্ব্ব ও মান-নিবন্ধন অনেক সময়েই সেই ইষ্টের প্রতি অনাদর হইয়া থাকে। ইহার নাম বিব্বোক। গর্ব্বের জন্যও বিব্বোক হয়, মানের জন্যও বিব্বোক হয়।

ললিতা বলিলেন,—শ্রীরাধিকা সতী-শিরোমণি, ব্রহ্মচারিণী। সুবল বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ইহা শ্রীরাধা জানেন, দুর্ব্বাসার নিকট শুনিয়াছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া বলিলেন,—যাহারা সমানধর্ম্মী তাহাদের মিলনই স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় শ্রীরাধিকা কুটিল নয়নাঞ্চল নিক্ষেপ করিয়া অবহেলার সহিত অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—নাগর, তোমার এই চপলতা ও চাতুরী নিতান্ত অসার। আর পিষ্টপেষণ করিও না,—অর্থাৎ একই কথা আর বারবার বলিও না।

শ্রীরাধার এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাকে বলিলেন,—বৃন্দে, দেখ, দেখ,

নর্ম্মোক্তৌ মম নির্ম্মিতোদ্ধু-পরমানন্দোৎসবারামপি
শ্রোত্রস্যান্তটীম[illegible]কুটমনাধায় স্থিতোচ্চন্মুখী।
রাধা লাঘবমপ্যসাদর গিরাং ভঙ্গীভিরাতন্বতী
মৈত্রী গৌরবতোপ্যসৌ শতগুণং মৎপ্রীতিমেবাদধে॥

আমি পরিহাস করিয়া যাহা বলিলাম, তাহা পরমানন্দময়। কিন্তু শ্রীরাধা তাহাতে কাণই দিলেন না। গর্ব্বে গম্ভীর হইয়া থাকিলেন, কিন্তু ভিতরের হাসি লুকাইবে কিরূপে? মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। শ্রীরাধা অনাদর করিয়া কথা বলিলেন, আমাকে উপেক্ষা করিলেন। কিন্তু মৈত্রীগৌরব অপেক্ষা, অর্থাৎ মৈত্রী করিয়া গৌরবের কথা বলিলে তাহাতে যে আনন্দ হয়, ইহাতে তাহা অপেক্ষা আমার শতগুণে অধিক আনন্দ হইতেছে।

কুট্টমিত ও বিব্বোক, এই দুইটি ভাবের যাহা ভিতরের কথা, গোবিন্দদাসের দান-

১

এই মনে বনে, দানী হইয়াছ, ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।
রাখাল হইয়া, রাজ-কুমারী সনে, কিসের রভস রঙ্গ॥
এমন আচর, নাহি কর ডর, ঘনাঞা আসিছ কাছে।
গুরুবর আগে, করিব গোচর, তখন জানিবা পাছে॥
ছুইয় না ছুইয় না, নিলাজ কানাই, আমরা পরের নারী।
পর-পুরুষের, পবন পরশে, সচেলে সিনান করি॥
গিরি গিয়া যদি, গৌরী আরাধহ, পান কনক-ধূমে।
কাম-সাগরে, কামনা করহ, বেণী-বদরিকাশ্রমে॥
সূর্য্য-উপরাগে, সহস্র সুন্দরী, ব্রাহ্মণে করহ সাত।
তভু হয়ে নহে, তোমার শকতি, রাই-অঙ্গে দিতে হাত॥
গোবিন্দ দাসের, বচন মানহ, না কর এমন ঢঙ্গ।
যোই নাগরি, ওরসে আগরি, করহ তাকর সঙ্গ॥

২

পরবর্ত্তী পদটি ইহার প্রত্যুত্তর। পদটি সুবিখ্যাত ও সুন্দর বলিয়া উদ্ধৃত করিলাম।

তোহারি হৃদয়, বেণী-বদরিকাশ্রম, উন্নত কুচ-গিরি কোর।
সুন্দর বদন-ছবি, কনক-ধূম পিবি, ততহিঁ তপত জিউ মোর॥
সুন্দরি, তোহারি চরণযুগ ছোড়ি।
গোরি আরাধনে, কাহাঁ চলি যাওব, তুহুঁ সে তিরিখময়ি গোরি॥
সিন্দুর সুন্দর, মৃগমদ পরশল, এহি সুরজ-গ্রহ জানি।
তুয়া পদ-নখ-দ্বিজ-রাজহি সোঁপলুঁ, সুন্দরি সহস্র পরাণি॥
কাম-সাগরে হাম, সহজই নিমগন, কাম পুরবি তুহুঁ রাই।
শ্যামর বুলি অব, চরণে না ঠেলবি, গোবিন্দদাস মুখ চাই॥

['কনক-ধূমপান' এক প্রকারের অতি কঠোর তপস্যা। নীচের দিকে মাথা করিয়া

৩। নাট্যের সপ্তাঙ্গ

এই নাট্যখানি ভাণিকা, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহাতে ঘটনার বৈচিত্র্য বা ঘাত-প্রতিঘাত নাই। নাটকীয় ঘটনার বৈচিত্র্য-সাধনের জন্য নাটকে পাঁচটি সন্ধি থাকে, ইহাদের নাম—মুখ, প্রতিমুখ, গর্ব্ব, বিমর্ষ ও নির্ব্বহণ। এই নাট্যে সন্ধি-বাহুল্য নাই, কিন্তু সপ্ত অঙ্গ আছে। এই সপ্তাঙ্গ—উপন্যাস, বিন্যাস, বিরোধ, সাধ্বস, সমর্পণ, নিবৃত্তি ও সংহার। ১৪১৬ সম্বতে নন্দীশ্বরে বাস করিবার সময় শ্রীল রূপগোস্বামী মহোদয় এই গ্রন্থ সমাপ্ত করেন।

৪। পদাবলী-সাহিত্যে দানলীলা

কীর্ত্তনের গানে দানলীলা আমাদের দেশে খুবই সুপরিচিত হইয়াছে, যাঁহারা ভক্ত, এই লীলাগানের অমৃতরস পান করিয়া তাঁহারা কৃত-কৃতার্থ। দানকেলিকৌমুদী-নাটকের আলোচনার পর এই লীলা-বিষয়ক পদাবলীর কিঞ্চিৎ আলোচনা লাভজনক হইবে।

কীর্ত্তনের গানে প্রত্যেক লীলারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণ বা পদ্ধতি আছে। প্রত্যেক গায়কই যে একই পদ গান করেন, তাহা নহে। দানলীলার যে প্রকরণগুলি প্রচলিত আছে, তাহাতে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। শ্রীরাধা রাজনন্দিনী, তিনি কলস মাথায় করিয়া সখীসঙ্গে যাইতে যাইতে পথের মধ্যে ঘাটিয়ালের হাতে পড়িবেন কেন? ইহাই অতিশয় স্বাভাবিক প্রথম প্রশ্ন। শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় তাঁহার নাটকে ইহার যে হেতু দিয়াছেন, তাহা বেশ সঙ্গত হেতু। যজ্ঞ হইতেছে, যজ্ঞস্থলে যিনি ঘৃত লইয়া যাইবেন, তাঁহার অভীষ্ট লাভ হইবে, ইহাতে আর রাজনন্দিনীই বা কি, আর গরিবের মেয়েই বা কি? ধর্ম্মের কাছে সকলেই সামান। (জগন্নাথের রথের সম্মুখে যেমন পুরীর রাজাকে ঝাঁটা হাতে করিয়া রাস্তা ঝাট দিতে হয়।) এই হেতু বেশ।

দানলীলা-গানের যে প্রকরণগুলি প্রচলিত আছে, তাহার একটিমাত্র প্রকরণে এই কথার উল্লেখ আছে। সুতরাং এই প্রকরণটি শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয়ের মত-সম্মত।

সুন্দরি, শুনহ আজুক কথা।
তাপ দূরে গেল, সব ভাল হৈল, ইহা উপজিল যথা ॥
অরুণ-উদয়ে, ব্রাহ্মণ-নিচয়ে, আইল গোকুল-মাঝ।
জরতীর স্থানে, করি নিবেদনে, আপন মনের কাজ ॥
গোবৰ্দ্ধন পাশে, মনের হরিষে, করিব যজ্ঞের কাম।
যে গোপ যুবতি, ঘৃত দিবে তথি, ইষ্টবর পাবে দান ॥
জটিলা শুনিয়া, আমারে ডাকিয়া, যতন করিয়া কৈল।
বধূরে সাজাঞা, গাবীঘৃত লৈয়া, তুরিতে তাহাঁই চৈল ॥
এ সব বচনে, সব সখীগণে, কাইয়ের আনন্দ হোয়।
সে হেন নাগর, গুণের সাগর, দরশ হইবে মোয় ॥
এত মনে করি, অতি রসে ভরি, অঙ্গহি সুবেশ কেল।
ঘৃতের পসার, সাজাঞা সত্বর, সভে মেলি চলি গেল ॥
এ কথা জানিয়া, সে যে বিনোদিয়া, বান্ধিয়া ও চূড়াচান্দে।
সুবলাদি লইয়া, আধ পথে যাইয়া, রহল দানীর ছান্দে ॥
বেণুর নিসান, করয়ে সঘন, বাজায় ও জয়তুরী।
এ যদুনন্দন, করে দরশন, নিবিড় আনন্দে ভরি ॥

এই পদটি বৃন্দার উক্তি। বৃন্দা শ্রীরাধাকে এই আনন্দ-সংবাদ দিবেন। খোলা হাওয়ায়, মুক্ত আকাশের তলে, হয়ত পাহাড়ের উপর ঝরণার ধারে, যেখানে কোন বাধা নাই, সেখানে ফোটাফুল ও পাখীর গানের ভিতর শ্যামের দরশন মিলিবে ইহার অপেক্ষা আনন্দের সংবাদ আর কি হইতে পারে। কারণ আমরা জানি, শ্রীরাধা,

বয়সে কিশোরী, রাজার ঝিয়ারী, তাহে কুলবতী বালা।

পূর্ব্বে যে পদটি উদ্ধৃত হইল, সেই পদটিকে অভিসারানুবন্ধ বলে। শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের জন্য যাইবেন বা অভিসার করিবেন, পূর্ব্বের পদটিতে তাহার হেতু বিবৃত হইয়াছে।

দানলীলা-গানের এই এক প্রকরণ। ইহা ছাড়া অন্য প্রকরণও আছে। এক প্রকরণ আছে, তাহার অনুবন্ধ সঙ্কেত-মুরলী। শ্রীদামের সহিত খেলা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাকে মনে পড়িয়া গেল। তিনি আপনার গরুগুলির ভার সঙ্গীগণকে

দিয়া রাধা বলিয়া বাঁশি বাজাইলেন। শ্রীরাধা সঙ্কেত-মুরলী শুনিয়া অস্থির হইলেন। তখন তাঁহারা—

চল চল বড়ি যাই,মথুরার বিকে যাই, দানছলে ভেটিব কানাই ॥

মথুরায় বিক্রয় করিতে যাই। পথে দানছলে কৃষ্ণের সহিত দেখা হইবে।

আর একটি প্রকরণ আছে, তাহাও দ্বিতীয় প্রকরণের অনুরূপ।

কে যাবে কে যাবে বড়াই ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল মথুরায় বেচিবারে ॥
সাজাইয়া পসরা রাই দিল দাসীর মাথে।
চলিলা মথুরার বিকে রঙ্গিয়া বড়াই সাথে ॥
পথে যাইতে কহে কথা কানু-পরসঙ্গ।
প্রেমে গরগর চিত পুলকিত অঙ্গ ॥
নবীন প্রেমের ভরে চলিতে না পারে।
চঞ্চলা হরিণী যেন দীগ নেহারে ॥
হোর কি দেখিয়ে বড়াই কদম্বের তলে।
তড়িতে জড়িত যেন নবজলধরে ॥
তাহার উপরে শোভে নব ইন্দ্রধনু।
বড়াই বলে চিন না নন্দের বেটা কানু ॥
মথুরার বিকে যাইতে আর পথ নাই।
পাতিয়া মঙ্গল ঘট বসেছে কানাই ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে দধির পসারিণি।
পাতিয়া মঙ্গল ঘট বসিয়াছে দানী ॥

আর এক প্রকরণ আছে, তাহাতেও ঐ কথা। শ্রীরাধা উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন, কি প্রকারে শ্যামের সহিত মিলন হইবে। তখন মুখরা আসিয়া বলিলেন, চল, দধি, ঘৃত, দুগ্ধ লইয়া আমরা গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকটে যাইব এবং সেখানে বিক্রয় করিব। তখন

দধি ঘৃত গোরসে সাজায়া পসার ॥
চীরহি ঝাপন দেওল তার ॥

কিঙ্করিগণ সব শির পর নেল। মুখরা সঙ্গে ধনি, তহিঁ চলি গেল॥

এই সব প্রকরণের মধ্যে যে বিভিন্নতা রহিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এমন পদও সংগৃহীত হইয়াছে, যাহাতে বলা হইয়াছে, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের জন্য আকুল হইয়া পসরা লইয়া বাহির হইলেন। যেখানে শ্যাম আছেন, সেইখানে চলিলেন। এই প্রকারের অতি সাধারণ পদের রচয়িতার নাম—গোবিন্দদাস। অবশ্য, এই গোবিন্দদাস যে বিখ্যাত গোবিন্দদাস নহেন, তাহা রচনা হইতেই বুঝা যাইবে

দান-লীলা ভক্তগণের অতিশয় প্রিয়। ইহাতে অভিসার আছে, কোন কোন প্রকরণে সঙ্কেত মুরলী আছে। তাহা ছাড়া রূপোল্লাস আছে। আর অনুভাব-অলঙ্কার যাহা আছে,—কিলকিঞ্চিত প্রভৃতি,—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বিখ্যাত পদকর্ত্তা গোবিন্দদাসের একটি পদ, দানলীলার প্রসিদ্ধ প্রকরণে গীত হইয়া থাকে—

মুদির মরকত, মধুর মূরতি, মুগধ মোহন ছান্দ।
মল্লি-মালতি, মালে মধুকর, মত্ত মনমথ-ফান্দ॥
শ্যাম সুন্দর, সুঘর শেখর, শরদ শশধর-হাস।
সঙ্গে সবয়স, সুবেশ সমরস, সতত সুখময় ভাষ॥
চিক্কণ চাঁচর, চিকুর চুম্বিত, চারু চন্দ্রক পাঁতি।
চপল চমকিত, চকিত চাহনি, চীত-চোরক ভাতি॥
গিরিক গৈরিক, গোরজ গোরচন, গন্ধ গরভিত বাস।
গোপ গোপন, গরিম গুণগণ, গাওত গোবিন্দ দাস॥

শ্রীশ্রীরাসলীলা-প্রসঙ্গ

প্রথমে তত্ত্ব, তাহার পর লীলা। ভিতরের সাহায্যে বাহিরকে বুঝিতে হইবে, আয়ত্ত করিতে হইবে ও আস্বাদন করিতে হইবে। ইহাই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ। তত্ত্ব না জানিয়া যদি লীলার আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে কেবল সংশয় জাগিয়া উঠিবে—আস্বাদন হইবে না। লীলা নিত্য; প্রকট-লীলা আস্বাদন করিতে করিতে নিত্য-লীলা স্ফুরণ হইবে। কিন্তু রাস-লীলার ন্যায় প্রকট-লীলা, তত্ত্বের আলোক ব্যতীত বুঝিতে পারা যাইবে না, সুতরাং আস্বাদনও হইবে না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"আমার জন্ম ও কর্ম্ম দিব্য, (অলৌকিক ও অপ্রাকৃত); এই জন্ম ও কর্ম্ম যিনি 'তত্ত্বতঃ' জানেন, তিনি দেহত্যাগের পর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত না হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হন।" এই তত্ত্বতঃ জানাই, লীলা আস্বাদনের পথ; সুতরাং আমরা শ্রীরাসলীলার তত্ত্ব সম্বন্ধে দু-একটি কথা আলোচনা করিয়া লইতেছি।

তত্ত্বের সাহায্য ব্যতীত লীলা যে বুঝিতে পারা যাইবে না, তাহার কয়েকটি প্রমাণ দেখাইতেছি। ইহাকে লীলার বাহ্য-রহস্য বলে।

প্রথম প্রমাণ :—'রাস' কাহাকে বলে এবং শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারেই বা এই রাসলীলা করিয়াছিলেন, সর্ব্বপ্রথমে তাহাই জ্ঞাতব্য। 'রাস' এক প্রকার নৃত্য। অনেকগুলি নর্ত্তকী, হাত ধরাধরি করিয়া একটি মণ্ডলী করিয়াছে, আর একজন নট, সেই মণ্ডলীর মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের সহিত নাচিতেছে, এই যে নৃত্য, ইহার নাম হল্লীশ। তালের বৈচিত্র্য ও গতিভেদের বৈচিত্র্যের দ্বারা এই হল্লীশ-নৃত্য যখন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় বা তাহার আদর্শ পরিপূর্ণতায় উপস্থিত হয়, সেই সময় এই নৃত্যকে 'রাস-নৃত্য' বলে। প্রাচীন নাট্য-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ, এই রাস-নৃত্যের কথা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু স্বর্গ-লোকেও এই নৃত্য কখনও হয় নাই, সুতরাং মর্ত্ত্যলোকে যে হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। নাট্যশাস্ত্র-বিদ্গণ এই আদর্শ ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নৃত্য, ধ্যানযোগে বা কল্পনায় দেখিয়াছিলেন, কিন্তু বাস্তব জগতে তাহার কখনও অভিনয় হয় নাই। ইহাই রাসের লক্ষণ। শ্রীমজ্জীব গোস্বামী তাঁহার 'বৃহৎ ক্রম-সন্দর্ভ' নামক টীকায় ইহার প্রমাণ-বচন উদ্ধার করিয়াছেন :—

"নর্ত্তকীভিরনেকাভির্ম্মণ্ডলে বিচরিষ্ণুভিঃ। যত্রৈকো নৃত্যতি নটস্তদ্বৈ হল্লীশকং বিদুঃ॥
তদেবেদং তাল বন্ধ গতিভেদেন ভূয়সা। রাসঃ স্যান্ন স নাকেঽপি বর্ত্ততে কিং পুনর্ভুবি॥"

ত্রিশতকোটি ব্রজগোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ এই রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে এই সংখ্যা পাওয়া যায়। যেমন আদিপুরাণে আছে—

"তিস্রঃ কোট্যো বল্লভীনাং সমাজ স্তন্মধ্যে বল্লভস্ত্বেক রূপঃ।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় রাস নৃত্য বর্ণনাকালে, এই ত্রিশত কোটি সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন ও বলিয়াছেন—"গোপীমণ্ডল মধ্যকর্ণিকাভূত এব কৃষ্ণো মধ্যে স্থিতঃ সন্নেব তথা গতিলাঘবং প্রকটয়ামাস যথা মণ্ডলস্থানাং গোপীনামপি দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টো নৃত্যতিস্ম ইত্যেকপরমাণুমাত্রকালেনৈব মধ্যপ্রদেশাদাগত্য মণ্ডলস্থাস্ত্রিশতকোটি গোপীঃ স-নৃত্যং পরিরভ্য পুনর্মধ্যপ্রদেশগত এব বভুবেত লাতচক্রাদপি তস্ত গতিলাঘব মধিকমভূদিতি জ্ঞেয়ম্। যতোমণ্ডলকর্ণিকাগতত্বং মণ্ডলস্থা প্রত্যেকগোপী মধ্যগতত্বং তস্ত তদানীং সর্ব্বৈ দৃষ্টম্।" (৩৩শ অধ্যায়ের ৩৪ শ্লোকের টীকা)। অর্থাৎ, ব্রজগোপীগণের মণ্ডলীর ঠিক কেন্দ্রস্থানে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ এমন গতিলাঘব প্রকটিত করিলেন যে, মণ্ডলস্থ দুই দুই গোপীর মধ্যে তিনি প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত নৃত্য করিতেছেন, এইরূপ মনে হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ এক পরমাণু মাত্র সময়ে মণ্ডলের মধ্য হইতে আসিয়া, মণ্ডলস্থ ত্রিশত কোটি গোপীকে নৃত্য সহকারে আলিঙ্গন করিয়া, পুনরায় মধ্য প্রদেশে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ইহা দ্বারা অলাতচক্র হইতেও শ্রীকৃষ্ণের গতির দ্রুততা যে অধিক, ইহাই সূচিত হইল। প্রত্যেক গোপীই শ্রীকৃষ্ণকে মণ্ডলের মধ্যে এবং মণ্ডলের প্রত্যেকের পার্শ্বে যুগপৎ দর্শন করিয়াছিলেন। কেবল সেই সময়ে ব্রজগোপীগণ যে কেবল এইরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। শ্রীবিল্বমঙ্গলের লীলা স্ফুরণ হইয়াছিল এবং তিনিও এইরূপ দেখিয়া বর্ণনা করিয়াছেন :—

"অঙ্গনামঙ্গনামন্তরে মাধবঃ মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা।
ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ সংজগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ॥"

'রমণীগণের মধ্যে মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মধ্যে রমণী; এইরূপে রাসমণ্ডল প্রবর্ত্তিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বেণুদ্বারা গান করিতে লাগিলেন।'

শ্রীমদ্ভাগবত যেস্থানে এই প্রকারের নৃত্য বর্ণনা করিয়াছেন, সে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বে 'যোগেশ্বর' এই বিশেষণ যোজনা করিয়াছেন। যাহা হউক, এ কথার বিস্তৃত আলোচনা পরে করা যাইবে, এখন কেবল ইহাই বক্তব্য যে, ত্রিশত কোটি ব্রজগোপীর সঙ্গে, হয় ত্রিশত কোটি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অথবা গতির অত্যন্ত দ্রুততা বিধানের দ্বারা, যুগপৎ ত্রিশত কোটি স্থানে প্রকটিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ এই নৃত্য করিয়াছিলেন। ইহা প্রাচীন শাস্ত্রীয় মত এবং ভক্ত সাধুগণ চিরদিন এই মত পোষণ করিতেছেন। প্রকৃত কথা এই যে, 'দেশ' সম্বন্ধে এখন আমাদের যে-ধারণা রহিয়াছে, সেই ধারণাকে একান্ত সত্য

এই সংখ্যা শ্রবণ করিয়াই 'অসম্ভব' বলিয়া নিরস্ত হইবেন। এই কারণে এই সংখ্যা-রহস্য, প্রথম রহস্য।

দ্বিতীয় প্রমাণ—শরৎকালের পূর্ণিমা রাত্রিতে রাস হইয়াছিল। সেই চারি প্রহর পরিমিত সময়ের মধ্যে ব্রহ্মার একরাত্রি, অর্থাৎ এক সহস্র মহাযুগ পরিমিত সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কি প্রকারে ইহা হইয়াছিল, তাহা পরে আলোচ্য। প্রকৃত কথা এই যে, 'কাল' সম্বন্ধে এখন আমাদের যে ধারণা রহিয়াছে সেই ধারণাকে একান্ত সত্য বলিয়া আশ্রয় করিয়া যাঁহারা তাহার সাহায্যে সমুদয় ব্যাপার, এমন কি আধ্যাত্মিক জগতের যাবতীয় গূঢ় ব্যাপারও বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা এই লীলায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন :—

"প্রেমবশ্যত্বাদেকস্যামেব রজন্যামব্যবধানেন যদা তদা সত্যসঙ্কল্পতাশক্ত্যা প্রেরিতয়া যোগমায়য়া দুর্ঘটঘটনপটীয়স্যা শক্ত্যা প্রহর চতুষ্টয়বত্যাস্তস্যা এব রাত্রের্মধ্যে তাবদ্বিলাসসমাপ্তয়ে পরঃশতকোটি-রাত্র্য আনীয় দর্শিতাঃ অতএব তা রাত্রীর্বীক্ষ্যেতি বহুবচনং, "ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে" ইত্যগ্রেঽপি বক্ষ্যতে।"

শ্রীভগবান্ ব্রজগোপীগণের প্রেমের দ্বারা বশীভূত হইয়া তাঁহার সত্য-সঙ্কল্পতা শক্তির দ্বারা যোগমায়াকে প্রেরণ করিলেন। এই যোগমায়া দুর্ঘটঘটনপটীয়সী। তাঁহার শক্তিতে চারি প্রহর রাত্রির মধ্যে পরঃশতকোটি রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল, কারণ এই প্রকারের দীর্ঘকাল ব্যতীত বিলাস সমাপ্ত হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাসলীলার প্রথমশ্লোকে 'রাত্রি' এই কথাটি, এই কারণেই বহুবচনান্ত করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। আবার শ্রীরাসলীলার শেষাংশে "ব্রহ্মরাত্র" এই পদটিরও প্রয়োগ আছে।

তৃতীয় প্রমাণ—শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে রাসলীলা করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম কত? এই প্রশ্ন অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। হরিবংশ ও বিষ্ণু পুরাণে কৈশোর বয়সের উল্লেখ আছে।

"যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালবিৎ।
কৈশোরকং মানয়ানঃ সহ তাভির্ম্মুমোদ হ॥" হরিবংশ।

কালবিৎ শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর বয়সের সমাদর করিয়া রাত্রিতে যুবতী গোপকন্যাগণকে একত্র করিয়া তাঁহাদিগের সহিত বিহার করিয়াছিলেন।

"সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্ মধুসূদনঃ।
রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ॥"

বিষ্ণুপুরাণ।

ক্ষপিতাহিত অর্থাৎ যাবতীয় অহিত-বিনাশকারী অমেয়াত্মা ভগবান্ মধুসূদন কৈশোর বয়সের

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বয়স তিন প্রকার—কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর। শ্রীমদ্ভাগবতে কৌমার ও পৌগণ্ডলীলা বর্ণনার প্রারম্ভে বলা হইয়াছে যে, ইহা কৌমার-লীলা বা ইহা পৌগণ্ড-লীলা। কিন্তু কৈশোর-লীলার প্রারম্ভে, শ্রীশুকদেব এ প্রকারের কোন কথা বলেন নাই। এই কারণে, শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে রাসলীলার সময়ে শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃক্রম কত, সে সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। অবশ্য, বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশের মত সর্ব্বথা গ্রহণীয় এবং তদনুসারে স্বীকার করিতে হইবে যে, কৈশোর বয়সেই রাসলীলা করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ, দশম হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত কৈশোর বয়স ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর ঠিক্ কোন বয়সে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে ?

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় মীমাংসা করিয়াছেন, অষ্টমবর্ষে রাসলীলা হয়। টীকাকার ধনপতি সূরি মীমাংসা করিয়াছেন, নবম বর্ষে রাসলীলা হয়। আবার কেহ বলেন দশম, কেহ বলেন একাদশ। রাসবিহারী কৃষ্ণ গোপীজনবল্লভ ও শ্রীরাধারমণ ; সাধক ভক্তগণের মতে তিনি নায়ক-শিরোমণি। এখন, অষ্টম হইতে একাদশ বর্ষের মধ্যে এই নায়কশিরোমণিত্ব সম্ভব কিনা, এ সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ জ্ঞান লইয়া যদ্যপি কেহ বিচার আরম্ভ করেন, তাহা হইলে গোলযোগ উপস্থিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যে নায়ক-শিরোমণি, তাহা যশোদা জানিতেন না। সুতরাং, শ্রীবৃন্দাবনে ভাবভেদে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ ভেদ হইত। লীলার এই রহস্য না জানিয়া, বয়স লইয়া বিচার আরম্ভ করিলে, লীলার মধ্যে প্রবেশ করা যাইবেনা।

বাহির হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিলে আরও দুএকটি অসম্ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইবে। রাত্রি-কাল অথচ পদ্মফুল বিকশিত হইয়াছে, ইহাও আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলাবর্ণনার মধ্যে দেখিতে পাই। বেদান্তের গোবিন্দভাষ্যের রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ, তাঁহার বৈষ্ণবানন্দিনী টীকায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীরাসলীলার প্রথমেই আছে—শরৎকাল অথচ মল্লিকা পুষ্প বিকশিত হইয়াছে—ইহারই উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন :—

"শারদা হেতুনা শরদি অপ্রোৎফুল্লা মল্লিকা যাসু তাঃ 'কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহবাতি গন্ধ' ইতি তস্যাং কুন্দানি চ ; 'রেমে তত্তরলানন্দি কমলামোদবায়ুনে'তি রাত্রাবপি পদ্মবিকাশ ইতি বৃন্দারণ্যস্যোৎকর্ষঃ, রাত্রীরিতি বহুবচনেনৈকস্যামেব রাত্রৌ ব্রহ্মরাত্রেঃ সমাবেশো ব্যজ্যতে ; অন্যথা ত্রিযাময়া তয়া তাসাং স্বপ্রেয়সীনাং অসঙ্খ্যেয়ানাং সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-লাবণ্য সৌরভ্য-তৌর্য্যত্রিকাণি স্বস্য চ নায়কমৌলেঃ গুণমাণিক্য খনেস্তানি মিথোঽনুভাব্যানি ন স্যুঃ, বক্ষ্যতে চৈবং "ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে" ইতি ইহ রাসমহোৎসবস্য সাঙ্গতায়ৈ ত্রিযামায়ামেকস্যাং তস্যাঃ সমাবেশো রহো বিহারায় যবনিকাবিতানাদি বিধানং চ অন্যচ্চ কথং স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ—যোগেতি, দুর্ঘটঘটনপটীয়সীং পরাখ্যাং শক্তিং উপাশ্রিত ইতি

... শরৎকালেও মল্লিকাপুষ্প ফুটিয়াছে, শুধু তাহাই নহে

কৃষ্ণের গলদেশে যখন কুন্দফুলের মালা, তখন কুন্দফুলও ফুটিয়াছে ; শুধু তাহাই নহে, বিকশিত পদ্মফুলের গন্ধে বায়ু পরিপূর্ণ, সুতরাং রাত্রিকালেও পদ্মফুল ফুটিয়াছে। ইহার দ্বারা বৃন্দাবনের উৎকর্ষ প্রমাণিত হইল। "রাত্রি" এই কথাটি বহুবচনে ব্যবহৃত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, একরাত্রিতে ব্রহ্মরাত্রির সমাবেশ হইয়াছে। নতুবা, ত্রিযামা রাত্রিতে অসংখ্য স্বপ্রেয়সীর সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, লাবণ্য, সৌরভ্য, বিদগ্ধতা, এবং নায়কশ্রেষ্ঠ সর্ব্বগুণময় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য পূর্ণরূপে প্রকটিত ও আস্বাদিত হওয়া সম্ভবপর নহে। এই কারণে, এক রহস্যের যবনিকা যেন বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সমুদয় ব্যাপার যোগমায়ার দ্বারা সাধিত হইয়াছে।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের টীকা এ বিষয়ে আমাদের পথ প্রদর্শন করিবে। তাঁহার টীকার প্রথম শ্লোক এই:—

"রসং যমাহুঃ শ্রুতয়ঃ পরেশং গুণার্ণবং চিদ্ঘনমম্বুদাভং।
পীতাম্বরং বেণুধরং কিশোরং স নন্দসূনুস্তনুতাং মুদং নঃ॥"

বেদসমূহ যে পরমেশ্বরকে 'রস' বলিয়াছেন, তিনি গুণার্ণব অর্থাৎ নিখিল কল্যাণগুণের একমাত্র আধার, চিদ্ঘন, অম্বুদাভ, পীতাম্বর, বেণুধর ও কিশোর! তিনিই নন্দের নন্দন। সেই নন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিস্তার করুন।

এই যে প্রার্থনা-শ্লোক, ইহা অত্যন্ত গভীরার্থ-পূর্ণ। ইহার প্রত্যেক কথার সার্থকতা আলোচনা করিয়া, রাসলীলা বুঝিবার চেষ্টা করিলে ভাল হয়। "নন্দের নন্দন আমাদের আনন্দ বিস্তার করুন"— নতুবা রাসলীলা বুঝিতে পারা যাইবে না। আনন্দে জাগরিত হৃদয় যাহা বুঝিতে পারে ও ধরিতে পারে, নিরানন্দময় বিষণ্ণ হৃদয় তাহা বুঝিতে ও আস্বাদন করিতে পারেনা। পৃথিবীতে আমরা দুই প্রকারের মানুষ দেখিতে পাই। একদল লোকের চরিত্রে আনন্দের জাগরণ বা মত্ততা বলিয়া একটা জিনিসই নাই; তাহারা কেবল গম্ভীরভাবে হিসাব নিকাশ করিতেছে, তাহাদিগের নিকট রাসলীলার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা নিতান্ত অন্যায়। তাহারা রাসলীলার ব্যাপার শুনিলে ভয়ানক রুষ্ট হইবে। তাহাদের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক কথাতেই আপত্তি হইবে। প্রথমেই বলিয়া বসিবে—ভগবান্ পাগল নহেন, ভগবান্ বালক নহেন যে তিনি নাচিবেন। আপনি যদি বলেন—'ভগবান্, তাহা হইলে কি করিবেন?' উত্তরে তিনি বলিবেন—"যখন তিনি ভগবান্ হইয়াছেন, তখন মন্দিরে গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিবেন, নিতান্তই যদি না পারেন, তাহা হইলে অতি প্রাচীন ঋষিদের নিকট বসিয়া দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিবেন।"

শুধু নাচা নয়, স্ত্রীলোক লইয়া নাচা, ইহার ন্যায় একটা বিসদৃশ ব্যাপার কি আর হইতে

"ভুবন-বিমোহন, মঞ্জুল-নর্ত্তন, গতিবল্গিত-মণিহার।
নিজ-বল্লভজন-সুহৃৎ-সনাতন চিত্তবিহরদবতার।"

নাচ জিনিষটা কি, এবং ভগবান্ যে কেন নাচেন, সে কথা পরে আলোচনা হইবে। এখন বক্তব্য এই যে রাসলীলা যদি শুনিতে চাহেন, তাহা হইলে হৃদয়কে একটু আনন্দে সম্ভাগ করুন। নন্দের নন্দন আসিয়াছেন, যমুনাপুলিনে বাঁশি বাজিতেছে—

"যার বেণুধ্বনিশুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী,
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার।"

সকলেই যখন আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে, তখন আমাদের বিষাদময়ী দুশ্চিন্তার গুরুভার মস্তক হইতে নামাইয়া আসুন, একবার এই মহামহোৎসবে যোগদান করি। সর্ব্বত্রই আনন্দময়ের লীলা হইতেছে। আকাশে মধু ধরে না, বাতাসে মধু বহিয়া যাইতেছে। এই প্রকারের আনন্দের জাগরণের অবস্থাকে, শ্রীরূপগোস্বামী "প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্ততা" বলিয়াছেন। ভূমিকাস্বরূপ এইটুকু বলিয়া, আমরা তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতেছি।

"রসো বৈ সঃ" তিনি রসস্বরূপ। এই যে শ্রুতিমন্ত্র, ইহাই রাসলীলার বীজ। আর "আনন্দং ব্রহ্মেতি" এই যে মন্ত্র, ইহাও একটি বীজ, ইহার বিকশিত অবস্থা—"বৃন্দাবনে শ্রীনন্দ নন্দন।" আনন্দ ও রস, এই দুইটি কথার প্রভেদ কি, তাহাই প্রথমে বিবেচ্য। "রস্যতে আস্বাদ্যতে" আনন্দ যখন আস্বাদিত হয়, তখন তাহার নাম রস। ভগবান্ আনন্দ, কেবল তাহাই নহে "আস্বাদিত আনন্দ"। তিনি সর্ব্বদা আস্বাদিত হইতেছেন।

এখন প্রশ্ন উঠিবে, তাঁহাকে আস্বাদন করে কে? "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তবে তাঁহার মধ্যে সজাতীয়, বিজাতীয় ভেদ না থাকিলেও, স্বগত ভেদ আছে বা থাকিতে পারে, এইটুকু স্বীকার করিয়া যদি জিজ্ঞাসা করেন,—"তাঁহাকে আস্বাদন করে কে?" তাহা হইলে উত্তরে বলিব,—তিনি নিজেকেই নিজে আস্বাদন করিতেছেন।

শ্রীরাসলীলার নৃত্য বর্ণনায় সময় শ্রীমদ্ভাগবত একটি শ্লোকের অর্দ্ধাংশে এই গূঢ় সত্যের আভাস দিয়াছেন :—

"রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ॥

একটি শিশু দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার চারিদিকে যেন অনেকগুলি দর্পণ রহিয়াছে। ঐ শিশু দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নিজের প্রতিবিম্বটিকে ধরিতে যাইতেছে। আবার নিজের সেই উৎফুল্ল মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব দেখিয়া আরও উৎফুল্ল হইতেছে, সেই 'আরও' উৎফুল্ল মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব দেখিয়া 'আরও' 'আরও' উৎফুল্ল হইতেছে। এই প্রকারে আপনার প্রতিবিম্ব যতই

দেখিতেছে, তাহার আনন্দও ততই বাড়িয়া যাইতেছে। এই যে আনন্দের বৃদ্ধি, ইহার সীমা নাই ও শেষ নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন :—

"রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আলিঙ্গিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দর্য্যাদিগুণধাম, এইরূপ তার নিত্যধাম।"

রাসলীলার ইহাই মূল তত্ত্ব। অনন্ত আনন্দময় পরম পুরুষ যিনি, তিনি আপনার রূপ দেখিয়া আপনিই আপনাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য সর্ব্বদা ধাবমান ; এই যে প্রয়াস এবং পদ্ধতি, ইহারই নাম রাসলীলা। এই রাসলীলা নিত্য। শ্রীবৃন্দাবনে এই নিত্যরাস প্রকট হইয়াছে এবং প্রকট-লীলার নাম মহারাস। কেমন করিয়া নিত্যলীলা প্রকট হইয়াছে, তাহা ক্রমে ক্রমে আলোচনা করা যাইবে। আপাততঃ একটি কথা জানিয়া রাখা দরকার, তিনি নিজেকে নিজে আলিঙ্গন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন সত্য, কিন্তু এই চেষ্টা এখনও সফল হয় নাই এবং কখনও সফল হইবে না। এই কারণে শ্রীরাসলীলার শেষে আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীকৃষ্ণ ঋণবদ্ধ হইলেন। এই যে শ্রীরাসলীলা, ইহা শ্রীভগবানেরও "চমৎকৃতিকর", ইহা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রকাশ করিয়াছেন।

"পরিস্ফুরতু সুন্দরং চরিতমত্র লক্ষ্মীপতে স্তথা ভুবননন্দিনি স্তদবতার বৃন্দস্য চ।
হরেরপি চমৎকৃতিপ্রকরবর্দ্ধনঃ কিন্তু মে বিভর্ত্তি হৃদি বিস্ময়ং কমপি রাসলীলারসঃ॥"

লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় বরাহ নৃসিংহাদি অবতারবৃন্দের অত্যাশ্চর্য্য লীলাসকল এই জগতে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু যাহা স্বয়ং ভগবানের চিত্তবিস্ময়কর, সেই রাসলীলারস আমার হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় বিস্ময় জন্মাইতেছে।

শ্রীরূপ গোস্বামী অন্যত্র শ্রীরাসলীলার যে বন্দনাগীতি গাহিয়াছেন, তাহাই আস্বাদন করিয়া আমরা অদ্যকার আলোচনা শেষ করিতেছি :—

"কোমলশশিকর রমাবনান্তর নির্ম্মিতগীতবিলাস।
তূর্ণসমাগত বল্লবযৌবত বীক্ষণকৃতপরিহাস॥
জয় জয় ভানুসুতাতট রঙ্গমহানট সুন্দর নন্দকুমার।
শরদঙ্গীকৃত দিব্যরসাবৃত মঙ্গলরাসবিহার॥
গোপীচুম্বিত রাগকরম্বিত মানবিলোকনলীন।
গুণবর্গোন্নত রাধাসঙ্গত সৌহৃদসম্পদধীন॥
তদ্বচনামৃত পানমদাঙ্কিত বলয়ীকৃতপরিবার।
সুরতরুণীগণ মতিবিক্ষোভণ খেলনবল্গিতহার॥

অম্বুবিগাহনবল্গিতনিজজনখণ্ডিতযমুনাতীর।
সুখসম্বিদ্‌ঘন পূর্ণসনাতন নির্ম্মলনীলশরীর॥"

হে নন্দ-কুমার! তুমি জয়যুক্ত হও। কোমল চন্দ্রকরে বনভূমি রমণীয়, আর তুমি সেই বনভূমিতে গীতবিলাস নির্ম্মাণ করিতেছ। অতিবেগে সমাগত প্রোপযুবতীগণের হৃদয়ভাব দর্শনের জন্য তুমি পরিহাস করিতেছ।

হে নন্দকুমার! তুমি জয়যুক্ত হও। ভানুসুতা যমুনার তটে রঙ্গক্ষেত্রে তুমি মহানৃত্য আরম্ভ করিয়াছ এবং শরৎকালে দিব্যরসাবৃত মঙ্গলময় রাসবিহার করিতেছ। হে গোপীচুম্বনাস্পদ! হে রাগবর্দ্ধন! তুমি কটাক্ষে গোপীগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছ। সদ্‌গুণসমূহের দ্বারা উন্নতা যে শ্রীরাধিকা, তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তুমি তাঁহার অধীন হইয়াছে।

তুমি গোপীগণের বচনামৃত পান করিয়া মত্ত হইয়া তাহাদিগের মণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া রহিয়াছ। রাগসম্পন্ন গীতরসে দেবাঙ্গনাগণেরও মতি বিক্ষোভিত করিতেছ। নৃত্য-ক্রীড়ায় তোমার মণিময় হারও চঞ্চল হইতেছে।

তুমি জলে অবগাহন করিয়া তোমার নিজ জনগণকে আনন্দিত করতঃ যমুনার তীরশোভা বর্দ্ধন করিতেছ, তুমি সুখ ও জ্ঞানের ঘন মূর্ত্তি, তুমি পূর্ণ ও সনাতন, তোমার শরীর নির্ম্মল ও নীল, তুমি জয়যুক্ত হও।

বঙ্গদেশে সংস্কৃত শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা

(শ্রীবনবিহারী দাস এম্‌, এ, বি, টি লিখিত)

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলাদেশে দুইটী বিভিন্ন প্রণালীতে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রথম—টোলের দেশীয় প্রণালী, দ্বিতীয়—স্কুলও কলেজের শিক্ষা-পদ্ধতি। প্রথমতঃ টোলের প্রণালী আলোচনা করা যাউক। চতুষ্পাঠীতে শিক্ষার উদ্দেশ্য,—গভীরতা, কোন বিশেষ বিষয়ে গভীর জ্ঞানলাভ। সাধারণতঃ ছাত্রগণ ব্যাকরণ; সাহিত্য, স্মৃতি, অথবা দর্শন, এক এক বিষয় অধ্যয়ন করিয়া থাকে। প্রত্যেকেই স্ব স্ব বিষয়ে কৃতী হইবার চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে তাহারা সকল রকমের টীকা, টিপ্পনি এবং সমালোচনা পুস্তক পাঠ করিয়া থাকে। এই প্রকারে পাঠ্য পুস্তকের সকল প্রশ্নই তাহারা আয়ত্ত করে।

ধারণা ছাত্রগণের বদ্ধমূল হইয়া যায়। টীকা-পাঠেও তাহারা কম মনোযোগ প্রদান করে না। সুতরাং পাঠ্য-পুস্তক এবং সমালোচনা-পুস্তক তাহাদের নিকট একই আসন প্রাপ্ত হয়। অবশ্য, এই প্রণালীর কতকগুলি ভাল গুণ আছে। ইহাতে পাঠ্যবিষয়ে সম্পূর্ণ অভিনিবেশ আনয়ন করে এবং সুচারু জ্ঞান লাভ হয়। এই প্রণালীর শিক্ষায় শিক্ষিত বহু পণ্ডিত এমন কি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সমাজকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ শিক্ষায় প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি হওয়া যায় না। তাহারই নাম প্রকৃত শিক্ষা যাহা অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎ এবং ঈশ্বরের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ বিষয়ে জ্ঞান দেয়, যাহা মানবকে সত্যসত্যই জ্ঞানপিপাসু করে, যাহা মানবের জ্ঞানের সসীমতা উপলব্ধি করাইয়া দেয়। তিনিই প্রকৃত শিক্ষিত যিনি নিরপেক্ষভাবে গভীর গবেষণা দ্বারা সত্যের অনুসন্ধান করেন; সহানুভূতি, দয়া প্রভৃতি উচ্চবৃত্তির উন্মেষ সাধন করেন, এবং মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন হইয়া থাকেন। অনেকেই পণ্ডিত হইতে পারেন এবং বহু পুস্তক চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতে পারেন। কিন্তু ইহা প্রকৃত শিক্ষা নয়। অবশ্য ইহা দ্বারা এমন বুঝা উচিত নয় যে প্রাচীন সংস্কৃতবহুল বঙ্গে প্রকৃত পণ্ডিতের অভাব ছিল। অনেকেই প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু এই চতুষ্পাঠীর প্রণালীতে শিক্ষিত হইয় তাঁহারা জড় হন নাই। তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব তাঁহাদিগকে প্রণালীর অনেক ঊর্দ্ধে লইয়া গিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে চতুষ্পাঠীর শিক্ষা বাস্তবিকই জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত অবলম্বিত হইত। চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণ শিক্ষা সমাপনান্তে গুরুগিরি, পৌরহিত্য, এবং কবিরাজী ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন। সংস্কৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য সার্ব্বজনীন এবং প্রকৃত জ্ঞানলাভ ছিল না। ইহার ব্যবহারিক উপকারিতার দিকেই সকলের লক্ষ্য ছিল। সংস্কৃত-শিক্ষার্থী মাত্রেই স্ব স্ব ধর্ম্মমত, বিধি-ব্যবস্থা, এবং ক্রিয়াকলাপাদি অবগত হইত। এই প্রকারের শিক্ষা দ্বারা জীবনযাত্রা সুখে নির্ব্বাহ হইত। শিক্ষার্থীমাত্রেই কোন্‌দিন কোন্ ফল নিষিদ্ধ, পূর্ব্বপুরুষগণকে জলদানে কোন্ অঙ্গুলি কিরূপভাবে সঞ্চালন করিতে হয়, আধুনিক বঙ্গীয় হিন্দুগণের কার্য্যকলাপ কি প্রকারে নিয়ন্ত্রিত [illegible] এ সব জানিতে উৎসুক হইলে স্মৃতি এবং রঘুনন্দনের সার-সংগ্রহ পাঠ করিলেই জানিতে পারিত। গুরুগিরি করিবার ইচ্ছা হইলে তন্ত্র পাঠ করিতে হইত। চিকিৎসক হইতে হইলে কবিরাজী পুস্তক পাঠ করিত। পুরাণসমূহ যথারীতি পঠিত হইত না। পুরাণপাঠক এবং সমালোচকগণ শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতেন এবং তাহা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন।

সকলেই ব্যাকরণ পাঠ করিত। কাব্য এবং কল্পনামূলক সাহিত্যের তত আদর ছিল না। অবশ্য কেহ কেহ গভীর শাস্ত্রচর্চ্চার পূর্ব্বে ঐ বিষয়গুলি অধ্যয়ন করিতেন। "কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রং" অর্থাৎ শাস্ত্রচর্চ্চার পক্ষে কাব্যপাঠ অনুকূল নয়—পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার পণ্ডিত মণ্ডলীর মত এই

নৈষধচরিতের কৃত্রিমতা পছন্দ করিতেন। "রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যং" অর্থাৎ তাহাদের মতে রঘু আবার কাব্য এবং পাঠোপযোগী! অভিধান প্রণয়ন বিদ্যায় তাঁহারা বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের নিকট ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার সমব্যবসায়ী আগ্রহ সহকারে সমগ্র অমরকোষ এবং ধাতুপাঠ কণ্ঠস্থ করিতে যত্নবান হইত। দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অবলম্বিত হইত না। কিন্তু বঙ্গদেশে ইহাও নব্য ন্যায়ে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কালধর্ম্মে রঘুনাথ এবং গদাধরের মত অবিসম্বাদিত সত্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এই দুই নৈয়ায়িকের যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ পঠিত হইত। উদ্দেশ্য, সত্যে উপনীত হওয়া নয়, প্রতিদ্বন্দ্বীকে তর্কে পরাজিত করা। বড় বড় নৈয়ায়িক হইয়া নাম ধাম প্রচার করা এবং জীবিকানির্ব্বাহ করাই মূল উদ্দেশ্য ছিল। কারণ ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিতগণকে মূল্যবান উপহার প্রদান করা সাধারণে কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন। সুতরাং নৈয়ায়িকগণের এ বিষয়ে লক্ষ্য ছিল। জ্ঞান বা সত্যের আদর তাঁহারা বড় করিতেন না। জীবিকার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রও পঠিত হইত। অতএব দেখা যাইতেছে চতুষ্পাঠীর শিক্ষা উদারভাবে অনুপ্রাণিত ছিল না। সরকারী সাহায্য এবং পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও এ বিষয়ে কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই। এখন চতুষ্পাঠীর শিক্ষাপ্রণালীর যথাযথ সংশোধন কিম্বা শেষ হওয়ার সময় আসিয়াছে।

চতুষ্পাঠীতে একজন শিক্ষার্থী সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ব্যাকরণপাঠের সহিত সংস্কৃত-শিক্ষা আরম্ভ করে। তাহার পুস্তকের ভাষা এবং ভাবের সহিত কোন পরিচয়ই থাকে না। বাস্তবিকই অধিকাংশ সংস্কৃত ব্যাকরণ কোন ভাষাতেই লিখিত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বীজগণিতের নিয়মানুসারে সাঙ্কেতিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। আর কোন কোন ব্যাকরণের উদাহরণসমূহ সুশিক্ষকগণই অবধারণ করিতে পারেন। সাধারণ শিক্ষকের নিকট উহা অবিদিত থাকে। এইরূপে শিক্ষার্থীগণ কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না এবং কেবল মুখস্থ করিতে থাকে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বার তাহাদের নিকট কোন কালেই উন্মুক্ত হয় না; প্রকৃত তথ্য তাহাদের নিকট চিরকালই জটিল থাকিয়া যায়। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে প্রকৃত জ্ঞানের পিপাসা তাহাদের হৃদয়ে জাগরূক হয় না।

অবশ্য ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই প্রণালীর শিক্ষার একটী বিশেষ সুবিধা আছে। অনেক অনুপযুক্ত ছাত্রই এই প্রাথমিক জটিলতা দেখিয়াই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। ব্যাকরণপাঠের এক বৎসরের মধ্যেই ছাত্রগণ বিশেষ করিয়া তাহাদের শিক্ষকগণ বুঝিতে পারেন কোন্ ছাত্রের এ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। যে ছাত্র সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত ব্যাকরণ অধ্যয়নে অপারগ্ তাহাকে জোর করিয়া এ কার্য্যে প্রয়াসী করা শিক্ষকের এবং সমাজের দুর্ভাগ্য একথা বলা বাহুল্য!

অনেক অবনতি ঘটিয়াছে। এই তথাকথিত পণ্ডিতমণ্ডলী যতই সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইতেছেন ততই প্রকৃত পাণ্ডিত্যের অভাব হইতেছে। ইহার মূল কারণ, এই প্রথম অনুপযুক্ততা নির্দ্ধারণের ত্রুটি। আজকালকার ধুয়াই হইতেছে পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দেওয়া এবং উপাধি সংগ্রহ করা। এ বিষয়ের যুক্তিও অতি দূরে নয়। এখনও অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জীবিকানির্ব্বাহের জন্য যজমানের দানের এবং বৃত্তির প্রত্যাশা হইয়া থাকেন। এই অন্নকষ্ট এবং ঐহিক সুখস্পৃহার দিনে তাঁহাদের অন্ন-চিন্তা চমৎকার। এই সব কারণে স্বভাবতঃই তাঁহারা জীবন সমস্যার যে কোন উপায়ে সমাধান করিতে চেষ্টা করেন। ন্যায়রত্ন, স্মৃতিভূষণ কিম্বা যে কোন একটা উপাধি তাঁহাদের বড় কম উপকার করে না। সেইজন্য তাঁহারা উপাধি চান প্রকৃত শিক্ষা চান না। প্রাচীনকালে জীবনসমস্যা এত জটিল ছিল না এবং ব্রাহ্মণগণ অনায়াসেই জীবিকা সংস্থান করিতে পারিতেন। তাঁহারা উপাধির জন্য পাগল হইতেন না। আজকালকার উপাধিধারী পণ্ডিত অপেক্ষা অনেক উপাধিহীন ব্যক্তির সংস্কৃত জ্ঞান বড় কম নয়। সকল গ্রামেই যেখানে ব্রাহ্মণ আছেন সেখানেই সংস্কৃত শিক্ষার অবনতি ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন যদিও তাঁহারা উপাধিধারী ছিলেন না। আজকাল সকলেই উপাধির জন্য লালায়িত। সুতরাং রুচি বা ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও অনেক ছাত্র সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেছে এবং দেশের মধ্যে শিক্ষার আদর্শ অনেকটা খর্ব্ব হইয়াছে। সেই কারণে ব্যাকরণ শিক্ষার প্রাচীন দেশীয় প্রণালীর একটা বিশেষ সুবিধা অন্তর্হিত হইয়াছে। যাহারা অনুপযুক্ত তাহাদিগকে আর বাদ দেওয়া হইতেছে না।

দেশীয় প্রণালীর ত্রুটি কাহারও অবিদিত নহে। ইহা মুখস্থ বিদ্যা মাত্র। এই প্রণালীর শিক্ষায় বুদ্ধিশক্তির অবসাদ ঘটিয়া থাকে। স্বাধীন চিন্তার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। সংস্কৃত প্রাথমিক শিক্ষাতেই অনেক সময় অযথা অতিবাহিত হয় এবং আজকালকার উচ্চ বিষয়সমূহের চর্চ্চা করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। এক শতাব্দী পূর্ব্বে একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার জীবনের ৩০।৪০ বৎসর শিক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতে পারিতেন। তাঁহাদের পরমায়ুও বহুদিনব্যাপী ছিল। কিন্তু আজকাল ২৫ বৎসরও বহুদিন বলিয়া বোধ হয়, কারণ লোকের পরমায়ু ৬০ ষাট বৎসরে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

আবার ব্যাকরণ পুস্তকসমূহের বিষয়, নীতির হিসাবে ধরিতে গেলে দেখা যায় যে উহাদের অনেক উদাহরণ (কাতন্ত্র, কাশিকা প্রভৃতি) নৈতিকতাবর্জ্জিত। (অবশ্য নীতিবিগর্হিত নয়)। অতীতকালে ইহা বড় দোষাবহ ছিল না। জনসাধারণের আদর্শ শাস্ত্রীয় আদর্শে স্থাপিত ছিল। তাহারা তাহাদের গুরু, পুরোহিত, স্মার্ত্ত অথবা নৈয়ায়িকগণের জীবনে এই আদর্শ অনুসৃত হইতে দেখিতেন। নৈতিক বিধির অপেক্ষা দৃষ্টান্ত বেশী কার্য্যকরী। হিন্দুসমাজ দৃষ্টান্ত দ্বারাই ইহার আদর্শ শিক্ষা দিত। ভাষা-পুস্তিকার নৈতিক বিধি দ্বারা এ উদ্দেশ্য সাধিত হইত না। এখন সমস্তই

পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সমাজ, বিরুদ্ধ আদর্শের দ্বারা বিক্ষুব্ধ। অধুনা মানবের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যগুলি প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষাপুস্তকে স্থান পাওয়া একান্ত আবশ্যক। "সদা সত্যকথা কহিবে, লোক-হিতৈষণা ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ" প্রভৃতি বিধিসমূহ প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে উদ্ধার করিয়া ব্যাকরণসমূহে লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় আসিয়াছে। ব্যাকরণের দৃষ্টান্তসমূহ এইরূপ হওয়া উচিত :—যথা "সদা সত্যং ব্রূয়াৎ", 'নোপকারাৎ পরং পুণ্যং', 'প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতং'।

এখন দেখা যায় এক ব্যক্তির পাঁচ বৎসর ধরিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া এবং ব্যাকরণ আয়ত্ত করিয়াও মানবের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যগুলির সহিত পরিচয় হয় না। এরূপ প্রণালীতে প্রকৃত মানবতার শিক্ষা কতদূর হয়, ভাবিবার বিষয়। আমাদের সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের নীতিপাঠও করিতে হইবে। ১২ বৎসর হইল আমার একজন কাব্যপাঠে নিযুক্ত বন্ধুর সহিত এ বিষয়ে কথোপকথন হয়। তিনি কলিকাতার একজন সুপরিচিত পণ্ডিতের নিকট কাব্য পাঠ করিতেছিলেন। তিনি সাহিত্য-দর্পণ এবং কাব্যতীর্থ পরীক্ষার যাবতীয় পুস্তকই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি অবশ্য একজন সংস্কৃত ভাষায় এবং ব্যাকরণে সুপণ্ডিত ছিলেন। আজকালকার পণ্ডিতদের মধ্যে তিনি একজন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা দশকুমার চরিত, সাহিত্য-দর্পণ প্রভৃতি পুস্তক হইতে সংগৃহীত। তাঁর মতে স্ত্রীজাতি পুরুষের ভোগ্যবস্তু। অবশ্য মনুসংহিতা এবং অন্যান্য স্মৃতির বচন উদ্ধৃত করায় তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইল না। আজকালকার চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতের ইংরাজী এবং বাঙ্গলা প্রণালী অনুযায়ী শিক্ষা না হইলে সার্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা বলা যাইতে পারে না। কাশীর পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্করত্নের ন্যায় পণ্ডিত আজকাল বিরল। তাঁহাদের শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা এবং সংস্কৃত শিক্ষার অনুযায়ী। তাঁহাদের বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা সম্ভব ছিল, এখন তাহা আশা করা বাতুলতা। আমাদের চতুষ্পাঠীতে শিক্ষার্থীগণকে নীতিশিক্ষা এবং ধর্ম্মমূলক শিক্ষা প্রথম জীবনেই দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। হিন্দুসমাজের চতুষ্পাঠীতে আধুনিক আদর্শ অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

চতুষ্পাঠীর শিক্ষার বিশেষ গুণ এই যে, এই প্রণালীর শিক্ষায় বহু পণ্ডিত গভীর জ্ঞানলাভ করিয়াছে। ব্যাকরণে অনেক টোল-পণ্ডিতের জ্ঞান সংস্কৃত এম-এ, উপাধিধারীদের অনেক উচ্চে। স্মৃতি এবং দর্শনেও একথা খাটে। কিন্তু এরূপ পণ্ডিত আজকাল কোথায়? নব্যন্যায়ে প্রকৃত ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত বিরল। ধ্বংসোন্মুখ জাতির মাত্র দুই একজন অবশিষ্ট রহিয়াছে। নব্যন্যায় দুরূহ এবং সুকঠিন। ইহা দ্বারা যুক্তিতর্কের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়, এবং মানব-মনকে সংযত এবং যথাযথভাবে চালিত করে। গণিতে অভিজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ইহা না পড়িলেও পারে, কিন্তু চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণের ইহা শিক্ষা করা একান্ত এবং অবশ্য কর্ত্তব্য। গণিত (জ্যোতিষ) উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ

আলোচনায় বিরত ছিলেন। নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণই ইহা লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন। সূর্য্য, চন্দ্র, এবং গ্রহ-নক্ষত্রাদির আলোচনায় উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ কোন মনোযোগই দিতেন না, তাঁহাদের ধারণা ছিল যে ইহা দারিদ্র্য আনয়ন করে; সেইজন্যই প্রতিভাশালী ব্রাহ্মণ-যুবকগণ জ্যোতিষ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। দরিদ্র গণকগণ কোন প্রকারে এই বিজ্ঞানকে জীবিত রাখিয়াছিলেন। হিন্দু-সমাজ এখনও জ্যোতিষ ও ফলিত জ্যোতিষকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয়।*

শিরোমণি মহাশয়ের গান

পূর্ব্ববঙ্গে এক সম্প্রদায় লোকের মধ্যে এই গান খুব প্রিয় ও সুপ্রচলিত। শিরোমণি মহাশয়ের নাম কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি বা কৃষ্ণকান্ত পাঠক। তিনি পুরাণপাঠক ছিলেন ও গুরুগিরি করিতেন। ফরিদপুর জেলা, মাদারিপুর মহকুমার অন্তর্গত কাঁসাভোগ গ্রামে ইঁহার বাড়ী ছিল। নবদ্বীপে 'পাঠক-বাড়ী' নামে পরিচিত বাড়ীও ইঁহারই। 'বঙ্গবাসী' প্রচারিত 'বাঙ্গালীর গান' পুস্তকে ইঁহার অতি সামান্য পরিচয় আছে, আর পাঁচটি গান আছে। গত বৎসর কাঁসাভোগ নিবাসী পাঠক শ্রীরাধাবল্লভ গোস্বামী মহাশয়ের খাতা হইতে কতকগুলি গান লিখিয়া লইয়াছি, সেগুলি নিম্নে মুদ্রিত হইল। শুনিয়াছি শিরোমণি মহাশয়ের বাড়ী হইতে তাঁহার পুত্রকর্তৃক শিরোমণি মহাশয়ের যাবতীয় গান একত্র করিয়া ছাপা হইবে। বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা দরকারী অধ্যায়, সেই অধ্যায়ের কিছু উপকরণ, আর সেই অধ্যায়ে প্রযোজ্য কয়েকটি সিদ্ধান্তের প্রমাণ শিরোমণি মহাশয়ের গানে পাওয়া যাইবে। এই কারণে গানগুলি সংগৃহীত হইলে ভাল হয়।

১

রাগিণী—খট্।

সুরধুনি মুনি কন্যে। (মা)
পতিত পাবনী, ত্রিলোক তারিণী, ধরাগমন জীব উদ্ধারণ জন্যে।
তব ধারা ধরে' ধন্য এ ধরণী, ভগীরথ রথ পথানুগামিনী,
মুকুন্দচরণ রজঃ-বিহারিণী, কলুষনাশিনী জননীগো ধন্যে॥

---

* পরম শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালি চক্রবর্ত্তী বেদান্ততীর্থ এম, এ, মহাশয়ের ইংরাজী গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

তব তীর তরুকোটরান্তর্গত, পতঙ্গ বিহঙ্গ আছে কত শত,
অন্তত্র অখণ্ড ভূমিপতি যত, না হয় তাদের মত শতক্রতু পুণ্যে ॥
অভয়ে ভয়ে সদা কাঁপে প্রাণ, দিবে কি না দিবে চরণ দুখান।
ওম', অনন্তরূপিণী কর পরিত্রাণ, কৃষ্ণকান্তকে ঘিরেছে কৃতান্তেরি সৈন্তে ॥

২

রাগিণী—খট্।

অপার সংসার, ঘোর পারাবার, কি গভীর নীর, বহে শতধার।
অতি ভয়ঙ্কর এ মায়া সমীর, দুস্তর তরঙ্গ, উঠে অনিবার ॥
তাহে অবিরত কি তরঙ্গমালা, উপায় কি করি জীর্ণদেহ ভেলা,
মিছে আশায় বসে' কাটাইলাম বেলা, এ সময় পলাইল কর্ণধার ॥
অনুমান এই পাপাঙ্গ বাতাসে, কাণ্ডারি লুকায়ে র'ল অন্ত দেশে।
পলাইয়ে যে যায় সে কি আসে শেষে, আপন কর্ম্মদোষে ডুবিলাম এবার ॥
কে করিবে দয়া এমন পামরে, যদি কেউ আসে আমায় দেখে যায় ফিরে,
স্পর্শ থাক দূরে দেখে না পাপীরে, তবে বা কিরূপে পাইব নিস্তার ॥
কুবিষয় পথে হয় অনাসক্তি, তোমার শ্রীচরণে যে করে আসক্তি,
সেই তোমায় পায় করে' শুদ্ধাভক্তি, কান্ত বলে পেতে কি শক্তি আমার ॥

৩

রাগিণী—খট্ ভৈরবী।

যা ইচ্ছা তাই দিবে, কেবা নিষেধিবে, এই ভবে তুমি করুণানিধান।
দুঃখ-পাষাণের সারাংশ উঠায়ে করেছ আমার এ হৃদয় নির্ম্মাণ ॥
শিলাসম যদি এ হৃদয় না হত, তবে দিলে যত এতই কি নাথ স'ত,
তবে কি শতধা বিদীর্ণ না হত, তবে কি যেতনা যাতনায় এ প্রাণ ॥
শুনেছি তোমার নাই শত্রু মিত্র, তুমি সবার মিত্র, সবাই তোমার মিত্র,

এখন দশ দিক্ হেরি অন্ধকার, আমার বলি কার, কে আছে আমার,
তুমি ফেলে গেলে দেখে ছুরাচার, তবে ভবকূপে কে করিবে ত্রাণ ॥
কান্ত বলে নিবেদি হে কমলআঁখি, এ বাকি জনমে আর হবে নাকি,
যখন যে ভাবে রেখে হও সুখি, ভুলি যেন না নাথ চরণ দুখানি ॥

৪

রাগিণী—মল্লার ।

ভব-ভয়হারী হরিকে না ভেবে কি ভাবে কি ভেবে দিন গেল হে এবার ।
তারে যে ভাবে যে ভাবে সে ভাবে সে পাবে, সে বিনে কে পাবে চরণ তাহার ॥
বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি তারে যে জন ভাবে, স্বজন বলে সে জনারে সেই ভাবে.
সে ভাবনায় এ ভাবনা দূরে যাবে, নিত্যধামে যাবে সঙ্গী হয়ে তার ॥
ভক্তিভাবে তারে সতত যে ভাবে, সে বিনে কে তার প্রিয় ভক্ত হবে ।
ও মন রলি না সে ভাবে, রলি কার ভাবে, এ ভাবে কি যাবে মায়ার বিকার ॥
ও মন কি কথা বলিয়ে আলিরে এ ভবে, ভুলে গেলি সে সব রলি গৌরবে,
ভব জলনিধি জলে রলি ডুবে, সে বিনে কে কর্ব্বে তোমারে নিস্তার ॥
মানব জনম যদি গেলরে এ ভাবে, নীল চিন্তামণির চরণ কিসে পাবে,
কান্ত বলে মন দেখ নাকি ভেবে, সে বিনে কে হবে ভব-কর্ণধার ॥

৫

রাগিণী—মল্লার ।

আমার কথায় আমায় করিবে করুণা, এমন কথা কিবা আছেহে আমার ।
তোমার কথায় যদি করহে করুণা, করুণা-নিদান মহিমা তোমার ॥
যে কথা বলিলে হইবে সদয়, এমন কথা আমার না হয় উদয় ।
বৃথা কথা গাথা সাধু কথা নয়, সে কথা উদয় হয়েছে আমার ॥
তোমার নামগুণে কখন না হয় রুচি, আপামর আর কোথায় আছেহে অশুচি,

তোমার স্তব মহিমা স্বরূপ বর্ণিতে, যে পারে বর্ণিতে, সে পারে বর্ণিতে।
আমি কি বর্ণিব পারি কি বর্ণিতে, কলুষ বহ্নিতে দহে অনিবার॥
পতিতপাবন দীন-দৈন্যহারী, সুযশঃ প্রকাশ ত্রিভুবন ভরি,
কৃষ্ণকান্ত নহে তোমার কৃপার অধিকারী, ডোবে ভবে তরি বিনে কর্ণধার॥

৬

রাগিণী—মল্লার।

হরি, আমার মানস-সন্তাপ নাশিতে, যদি তোমার অতি দুঃখ হয়।
যা হয় আমার হবে, তুমি কেন দুখ পাবে, সুখে থাক তুমি সুখময়॥
অন্তরে অনন্ত সন্তাপ-সন্ততি, অনন্ত-সমাজে হইল বসতি।
আমার আর নাইক গতি, ব্রজ-জনপতি, তুমি কি দিবে শ্রীপদাশ্রয়॥
ফেলে আমার একা বন্ধু-বিহীন দেশে, দীনবন্ধু তুমি কোথায় আছ বসে,
আমি তোমারি উদ্দেশে, যাব কোন্ দেশে, কে বলিবে পথের পরিচয়॥
পড়েছি বিপাকে, আপন কর্ম্মপাকে, তুমি বিনে অন্যে কে খণ্ডিবে তাকে।
আমার মরণ বেদনা নিবেদি তোমাকে, তুষানলে জ্বলে এ হৃদয়॥
হরি তুমি হে অপার, করুণা-পারাবার, আমি ভক্তি-বিহীন অবশ দুরাচার,
কৃষ্ণকান্ত বলে গতি, কি হবে আমার, আমি ভবে অতি নিরাশ্রয়॥

৭

রাগিণী—মল্লার।

হায়রে আমার মন, দেখনারে কেন, আর কি মানব-জনম হবেরে।
কভু নহে স্থির অনিত্য শরীর, দেখিতে দেখিতে যাবেরে॥
আশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ অন্তে, মানব জনম পালিরে ভ্রান্তে।
দারাসুতসঙ্গ, পেয়ে কর রঙ্গ, সুখসঙ্গ কোথায় রবেরে॥
আলি কোথা হতে যাবি বা কোথায়, সাধের দিন তোর গেল মিছে কথায় কথায়।

৮

রাগিণী—মল্লার।

হরি, আমি দীনহীন, করি নিবেদন, স্মরণ হয় যেন, মরণে।
আমার মনে এই ভয়, কখন কি হয়, কৃতান্ত যাতনা যখনে॥
সদা প্রকোপিত, তিমিরাবিভূত, চাহে আঘূর্ণিত নয়নে।
অবিরত দূত, করে যাতায়াত, নিয়ত বন্ধন কারণে॥
সদা দারা ধন, করিতে পালন, ধন উপার্জ্জন কারণে।
বল না এমন, করেছি ভ্রমণ, তোমারি যুগল চরণে॥
নাহি কিছু বল, চরম সবল, বিষয় প্রবল এখানে।
ধরণী-শয়ন, হইবে যখন, হের সকরুণ নয়নে॥
কৃপা পারাবার, তুমি বিনে আর, কে আমার এই ভুবনে।
দীন কৃষ্ণকান্তের ভার, কে নিবেছে আর, যা কয় তোমার স্বগুণে॥

৯

রাগিণী—খাম্বাজ পিলু।

কৃষ্ণ প্রেমের প্রেমিক যদি হ'ত তুমমন।
ঐরূপ হৃদয়-মন্দিরে রেখে কর্‌তেম দরশন॥
কৃষ্ণ প্রেম সাগর মাঝে, রসিক হংস তাই বিরাজে।
নিবারি ক্ষীর তাইতে বেছে, কর্‌তেম আস্বাদন॥
হেন কৃষ্ণ নামামৃতে, না হইল মোর নির্ম্মল চিতে।
কাণা কড়ি ছিদ্র মাত্রে স্ফুরে শ্রবণ॥
দীন কৃষ্ণকান্ত বলে, কাজ কি অহো ছাড় কূলে।
মৃতদেহের অলঙ্কারে-কাজ কি প্রয়োজন॥

১০

রাগিণী—ভীমপলশ্রী।

হরে কৃষ্ণ হরে রাম নাম কেন বল না রসনা কর কি।
হরি নামামৃত পান, করে' জুড়াও প্রাণ, মানব দেহে আর হবে কি॥

চারিদণ্ড পথ গমন করিতে, পাথেয় পৃথক্ নিয়ে যাও খেতে।
বড়শী সহস্র যোজন যাইতে, পথে খেতে সম্বল আছে কি ॥
ষষ্টি দণ্ড দিবারাত্রি পরিমাণ, ক্ষণকাল কেন নেওয়া হরিনাম ;
ভব-দাবানলে জ্বলে এই প্রাণ, নাম বিনে শীতল হবে কি ॥
সাধু সঙ্গে সদা কর হরিনাম, জেন ভাল হবে তবে পরিণাম,
করুণাধাম নাম এখন না নিলে, অন্তে তারি স্মরণ হবে কি ॥
চঞ্চল কমলদল-জল যথা, পরমায়ু পরিমিতি যেন তথা।
কৃষ্ণকান্ত বলে কেন বল বৃথা কথা, কালের অবকাশ আর আছে কি ॥

১১

রাগিণী—মল্লার।

যদি বল মা ডাকিলে হয় করুণা, এমন করুণা কে করেছে কোথায়।
যে করে স্মরণ, মরণ-বারণ, তারি আকিঞ্চনে, সে পাবে তোমায় ॥
যে তোমাকে বলে, সে তোমাকে বলে, নিজ-ভক্তিবলে সে তোমাকে বলে।
সে বল্বার মত বলে, সদা আপন বলে, অবহেলে অন্তে চরণতরী পায় ॥
করুণা নিধান, ভক্তে যে করুণা, কিন্তু সে নয় প্রভুর কৃত করুণা।
তবে যে করুণা, তার গুণেরই করুণা, তারি প্রেমঋণে বিকায়েছ কায় ॥
যদিহে না কর সদসদ্ বিচার, এই ভবে মাত্র আমি দুরাচার।
তোমার মহিমা তবে হয় প্রচার, পার কর ভবে তরী ডুবে যায় ॥
চিন্তামণি তোমার কৃপাসিন্ধু জলে, নিখিল ভুবন সব ভাসাইলে।
কত দুঃখী তাপী নিলে কত খেলে, কান্ত বলে তার কান্তে জীবন যায় ॥

১২

রাগিণী—মল্লার।

আমি যদি ডুবে মরি হরি ভবে—ইথেই কিবা ক্ষতি আছে হে তোমার।
যে তোমাকে ভাবে, সেই যদি ডোবে, ইথে হবে তোমার কুযশঃ প্রচার ॥
হয়েছি হে আমি কলুষভাজন, আমা পরে দণ্ড স্বরূপ প্রয়োজন।

তোমার নামাভাসে পাপরাশি খণ্ডে, গ্রহণ করি নাই এই ছার তুণ্ডে।
ওহে দণ্ডধর দণ্ড দাও এই মুণ্ডে. ইথে খণ্ডে যদি কলুষ আমার ॥
করি ওহে কত কদর্য্য আকার, রাখি নাই নামের মর্য্যাদা তোমার।
ভুবন-পাবন, নাম গুণগান, করি নাই কখন, না গণিয়ে সার ॥
নাম চিন্তামণি অসীম মহিমা, অনন্ত অন্তরে দিতে নারে সীমা।
কৃষ্ণকান্ত বলে, তার দেহের এই সীমা, বিফলে জনম গেলহে এবার ॥

১৩

রাগিণী—ভৈরবী খট্।

আপনে ডুবিলি, আমাকে ডুবালি, (এ ঘোর ভবসিন্ধু-নীরে)
বহু জন্ম পরে, মানব দেহ ধরে, পেয়েও আরবার তারে হারালি ॥
ভাব্‌ছ বসে বসে বাঁচবে কত কাল, কাল পেতে আছে বিষম মায়াজাল,
হরিনাম মন্ত্রে না কেটে সে জাল, তবে কি জঞ্জাল ঘটালি ঘটালি ॥
যে দেহেরি কর মার্জ্জন ভূষণ, দিনেক দুদিন পরে নিবে হুতাশন।
দুরন্ত কৃতান্তে করিবে শাসন, সে পীতবসন কেনে না ভাবিলি ॥
দেহ-তরী তাতে গুরু কর্ণধার, তবু না চিন্তিলি উপায় তরিবার।
কিসে হবে পার, ভব পারাবার, দিনান্তে একবার হরি না বলিলি ॥
আমি কিরে তোর ঘাতক ছিলাম এত, যাই ছিল মনে করিলি মনের মত।
কৃষ্ণকান্ত বলে আর বল্‌ব তোকে কত, অবিরত বিষয় পথে রত হলি ॥

১৪

রাগিণী—সিন্ধু ভৈরবী।

হরি এই কর চরমে আমায়।
দুরন্ত কৃতান্ত ভয়ে ডাকিহে তোমায় ॥
করুণা-নিকরাকর, যদি, কৃপা অঙ্গীকার কর,
যা ইচ্ছা তা' কর্‌তে পার, নব জলধর কায় ॥

দীন কৃষ্ণকান্ত ভণে, ঐ দুঃখ আমার মনে।
ভাবি জীবনান্ত দিনে, আমার কি হবে উপায়॥

১৫

রাগিণী—ভীমপলশ্রী।

আমি যদি তার হতাম, তবে সে কি আমার হত না।
তবে কি সে মনে আমার এ মন মিশে যেত না॥
যদি দণ্ড নিশি দিনে, (তারে) কখনও করি না মনে।
তবে সে আমার হবে কেনে, আমি জেনেও তাই জানি না॥
যে হবে তার সে হবে তার, আছে ত এ প্রতিজ্ঞা তার।
তার হলাম না গেলাম এবার, এমন দিন আর হবে না॥
সে যদি আমার হ'ত, তবে কি লুকায়ে র'ত।
আমার হৃদয়মাঝে উদয় হত, এ যাতনা কি যেত না॥
কান্ত কয় এ দিন গেল, প্রাণান্ত সময় হ'ল।
এ বড় খেদ মনে র'ল এবার কিছুই হল না॥

১৬

রাগিণী—ভীমপলশ্রী।

হরি, কোন গুণে আমি তোমারি হলাম না, তবে কৃপা হবে কি গুণে।
ভ্রান্ত হয়ে বলি, শোন বনমালি, ইথেই অপরাধী চরণে॥
যে করেছে তোমায় আত্ম-সমর্পণ, হরি তারি তুমি তোমারি সেজন।
(তার) ভজন-পূজন তোমার শ্রীচরণ, তোমাকে কে পাবে, সে বিনে॥
দীনহীনের কথা বাতুলের প্রায়, (কেবল) কথা বলে যদি তোমায় পাওয়া যায়।
বিনে মনাসক্তি ঐ রাঙ্গা পায়, কে পেয়েছে তোমায় ভুবনে॥
বামন যেমন করে চাঁদ ধরিতে আশা, বাতুলেরি প্রায় তেমনি তোমায় পেতে আশা।
একি আশার মত আশা, কেবলি দুরাশা পেতেছি ভরসা মরণে॥
যারা পায় তোমার চরণারবিন্দ, মকরন্দ-গন্ধে সতত আনন্দ।

অনন্ত করুণাকর চিন্তামণি, শুক নারদাদি বলে এই শুনি।
কৃষ্ণকান্ত বলে সরে না আর বাণী, জানাইলাম মাত্র সন্ধানে ॥

১৭

রাগিণী—আলাইয়া।

প্রেমভক্তি দেবী, সুবিশুদ্ধ ভক্ত বিমল হৃদয়-কমল-বাসিনী।
নিত্যসুখদাত্রী, সুপবিত্রকর্ত্রী, তুমি ভক্তজনের জীবন-রূপিণী ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ, পঞ্চবর্ণ ফুলে, মানস অঞ্জলি করিয়ে সকলে।
দিয়ে তোমার ঐ চরণকমলে, নত-শির কত শত ভক্তশ্রেণী ॥
চিদানন্দময়ী তুমি পরাৎপরা, যুগল কিশোর রসে তনু ভোরা।
কৃপাবতী সতী, জন্মমৃত্যুহরা, নিত্যরসামৃতধারা সুবর্ষিণী ॥
কামগন্ধশূন্যা, মাধুর্য্যরসিকা, ত্রিজগতে কেবা আছে তবাধিকা।
রাধিকা গোবিন্দ চরণারবিন্দ, নিত্য চিন্ময় মকরন্দ প্রদর্শিনী ॥
ব্রজজন ভাবে, যে তোমারে ভাবে, তার প্রতি তোমার পূর্ণ কৃপা হবে।
নতুবা এ ভবে, কেবা তোমায় পাবে, কান্ত বলে চিন্তামণি স্বরূপিণী ॥

১৮

রাগিণী—খট্ ভৈরবী।

যখন যে ভাবে রাখ প্রভু যারে, তখন সে ভাবে কালাতিপাত করে।
সুখ-দুঃখদাতা, তুমি জগৎ পিতা, মাতা ধাতা তোমায় কে জানিতে পারে ॥
কখন কেউকে করাও প্রাসাদ আরোহণ, দিয়ে অসংখ্যাত রজত কাঞ্চন।
অকিঞ্চন-নাথ তার আকিঞ্চন, সুখের অবকাশ আর না রাখ অন্তরে ॥
আবার কেউকে কর দীনের অধীন, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি চিরদিন।
মনে মনে গণে সেই সুখের দিন, ঝর ঝর নয়ন বারিধারা পড়ে ॥
ভিক্ষায় যদি না হয় উদর পোষণ, চিন্তাগুণে করে শরীর-শোষণ।
কখন আসন মিলে, কখন ধরাসন, তুমি উপেক্ষিলে, কে রাখিবে তারে ॥
নীল চিন্তামণি অনন্তস্বরূপে, বিহর কে তোমায় জানিবে কিরূপে।

১৯

নদীয়ায় ভাব কল্পতরু 'পরে ফুটেছে একটি ফুল।
কিবা ভুবনদুর্লভ, সুজনবল্লভ, ব্রজধামে আছে সে তরুর মূল॥
ফুলের মধ্যদলে নব নীলঘন, বাহিরে গলিত কাঞ্চন-কিরণ।
কিবা সুদর্শন, যে করে দর্শন, মন প্রাণ কার না করে আকুল॥
সে হ'তে নদীয়ার ঘোচে নিরানন্দ, সতত বিরত পরম আনন্দ।
ফুল হতে পড়ে প্রেম মকরন্দ, গন্ধে উড়ে পড়ে ভক্ত অলিকুল॥
ফুলের সৌরভে করুণা-পবনে, এই দশদিক্ ব্যাপিল ভুবনে।
আকর্ষিল জগজ্জন-মনগণে, বিষয় স্নেহলতা করিল নির্ম্মূল॥
কান্ত বলে এ ফুলে রায় রামানন্দ, স্বরূপ দর্শনে বাড়িল আনন্দ।
তার বিনে আর কার ছিল এ নির্ব্বন্ধ, প্রেমময় হল গোদাবরী কূল॥

২০

রাগিণী—খট্।

আমার মত যদি কোন জনকে, কখন করুণা করেছ, শুনিতাম শ্রবণে।
যা' হউক্, তা হ'লে কিঞ্চিৎ কৃপালেশ পাওয়ার ভরসা হইত সেই নিদর্শনে॥
কোন যুগে আমার মত কোন জন, ভবপাশ হ'তে কর নাই মোচন।
কি বলিব হে পদ্মপলাশলোচন, আমার বন্ধন ছেদন করিবে কেমনে॥
এ বিষয় একেকালে তিলাঞ্জলি, দিয়ে আছি তবু লজ্জা খেয়ে বলি।
তোমাকে না বলে আর কাকে বলি চিরদোষী তোমার যুগল চরণে॥
হয় নাই হবে না আর তোমাতে সম্বন্ধ, কখনও যাবে না এ ভব নির্ব্বন্ধ।
যেরূপ কারাগারে রেখেছ গোবিন্দ, এমন ভাগ্যবান্ আর কে আছে ভুবনে॥
নিরুপম তুমি ভুবন-বিদিত, আমিও একাংশ তুলনা-রহিত।
তাই বুঝে যা' হয় কর হিতাহিত, কৃষ্ণকান্ত কয় স্মরণ কি হইবে মরণে॥

২১

রাগিণী—ভৈরবী।

কাঁদ্‌ছে যারা, যাও সে পাড়া, গেলে জান্‌তে পাবে।
এ পাড়ায় থাকিলে কি ভুল করে॥

এ পাড়ায় যাদের বাস, তারা হয়েছে মায়ার দাস,
জাতি কুলমান বিদ্যামদে করে অহঙ্কার-প্রকাশ ;
বলে আমার মত গুণি মানি ধনী আর কে হবে ভবে ॥
ভক্তের স্বতন্ত্র লক্ষণ, করে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন,
স্তম্ভ কম্প রোমাঞ্চাদি সাত্বিক-ভূষণ।
পড়ে হরি বলে নয়নবারি, কৃষ্ণপ্রেম-অনুভবে ॥
সুখদুঃখে সমভাব, অতি নির্ম্মল স্বভাব,
সেই পাড়াতে গেলে হবে প্রেমরত্ন-লাভ।
সেই পাড়ায় যেয়ে রসিকজনার অনুগত হতে হবে ॥

[এই গানটিতে কবির ভণিতা নাই। অনুসন্ধান করিয়া যতদূর বুঝিয়াছি, গানটি শিরোমণি-মহাশয়েরই রচনা]

রাজকুমার পাঠক মহাশয়েরও কাঁসাভোগে বাড়ী। ইনি শিরোমণি-মহাশয়ের শিষ্য ইঁহার একটি গান পাইয়াছি।

নিরন্তর অন্তরে চিন্ত তারে।
যারে ভাবিলে ভাবনা যাবে দূরে ॥
এ যে তব চিত্ত-ক্ষেত্র, করিয়ে অতি পবিত্র, গুরুদত্ত তত্ববীজ বপন কররে।
দেখ প্রাণপণ করে, ভক্তিবারি সিঞ্চন করে, স্নেহ-সেচনী লয়ে' করে ॥
অঙ্কুর হইলে পরে, ছয় রিপুতে নষ্ট করে, বিবেক বৈরাগ্য দুই প্রহরী রাখরে।
হরিনামের দিয়ে বেড়া, হয়ে থাক জিতে মরা, তবে রিপু প্রবেশিতে নারে ॥
হবে বৃক্ষ মোক্ষময়, নিত্যজ্ঞান ফলোদয়,
ভাগ্যক্রমে সে ফল যদি পরিপক্ক হয়,
সে ফলে অনন্ত রস, কৃষ্ণসদা যাতে বশ,
পান করে রেখ যশে বাড়ে,
দ্বিজ রাজকুমার ভণে, এই দিন অবসানে,
জীবন কুসুম তাই বৃথাই গেলরে।
প্রেমময়ীর কৃপা হলে, সে কুসুম সদাই তুলে,
মনে প্রাণে দিতেক একই বারে ॥

বীরভূমি] মাসিক পত্রিকা [৭—৩
১৩৭২

শ্রীবৃন্দাবন ও তাহার অন্তরায়

২ সতীশচন্দ্র ও তাঁহার গান

৩ অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক
সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

বীরভূমি, '৭—৩ৗ

শ্রীবৃন্দাবন ও তাহার অন্তরায়

১। লীলা

'ভারতবর্ষীয়-লীলাবাদ' বলিয়া একটি মতবাদ বা দার্শনিক চিন্তাপদ্ধতি, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে ও বিদেশে কিছু কিছু আলোচিত ও প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু এখন যাহা প্রচারিত হইতেছে, তাহা ঠিক ভারতবর্ষেরই অকৃত্রিম জিনিষ কিনা, তাহা ধীরভাবে ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণলীলায় "ভারতবর্ষীয়-লীলাবাদ" তাহার পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে, ইহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ। এই উপদেশের দ্বারা আমাদের এই বাঙ্গালাদেশের এবং উৎকলের অধিকাংশ লীলাবাদী সাধকের আধ্যাত্মিক জীবন গত চারিশত বর্ষকাল পরিচালিত হইতেছে। কাজেই শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর অনুবর্ত্তী সাধক ও ভক্তগণের উপলব্ধি ও আস্বাদনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলে "ভারতবর্ষীয়-লীলাবাদ" এর মর্ম্ম আমরা সর্ব্বাপেক্ষা সুগম উপায়ে বুঝিতে পারিব।

লীলাবাদের সূত্র স্থাপন করিবার জন্য আমরা বলিয়াছি যে বৃন্দাবন বলিতে একই সঙ্গে দুইটি জিনিষ বুঝিতে হইবে; একটি স্থান ও চৈতন্যের একটি অবস্থা*—এবং এই চৈতন্যের অবস্থাটি প্রথম বুঝিয়া তাহার সাহায্যে স্থানটিকে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ বুঝিতে হইবে যে বাহিরে যে স্থানটি রহিয়াছে তাহা অনুভূতির ঘনীভূত মূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই প্রকারের দর্শনের নাম অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া দর্শন বা চৈতন্যের ভূমি হইতে দর্শন। আর এই প্রকারের যে আস্বাদন তাহার নাম ভাবুক হইয়া আস্বাদন। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান আলোচনার ইহাই পদ্ধতি। বৈষ্ণব কবি বলিলেন, আগে মন, তাহার পর বন এবং মন ও বনকে এক করিয়া জানিলেই সম্যক্ দর্শন বা লীলাদর্শন হইবে।

---

* A place and a state of consciousness combined in one.

২। বৃন্দাবন

'বৃন্দাবন" এই কথাটির অর্থ নানা স্থানে নানা প্রকারে কথিত হইয়াছে। "বৃন্দাবন" মানবীয় সাধনার একটি সাধ্য বিষয়। অনেকে বলেন ইহাই "সাধ্যের সীমা।" প্রত্যেক সাধকের অধিকার ও রুচি এক নহে, সুতরাং অধিষ্ঠান-ভূমির প্রভেদ-নিবন্ধন "বৃন্দাবন" এর অর্থ যে নানারূপে কথিত হইবে, তাহাতে বিস্মিত বা বিচলিত হইবার কোনই কারণ নাই। পরিশেষে দেখা যাইবে যে এই সমুদয় অর্থ বা ধারণা বিরোধী নহে,—একই অসীম তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন বিভাব বা প্রতীতি মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-কার যাহা বলিয়াছেন, তাহা বৃন্দাবন-সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

"কেহ কোনমতে কহে যেমন যাহার মতি" যাঁহার অধিকার ও রুচি যেমন, তিনি তেমনই বলেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের উক্তি বা মত পরস্পর বিরোধী নহে,—

"মিথ্যা নহে সত্য হয় বচন সবার।"

গৌতমীয় তন্ত্রে কথিত হইয়াছে, বৃন্দাবন একটি পঞ্চ-যোজন বন, এবং তাহা শ্রীকৃষ্ণের দেহরূপ। পরমামৃত বাহিনী কালিন্দী সুষুম্নাখ্যা নাড়ী। তন্ত্রের এই উক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ নানাস্থানে আদরপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়াছেন, সুতরাং এই মত একটি সমাদৃত মত।

শ্রীজীবগোস্বামী গোপালচম্পূ-নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন বৃন্দার যেখানে অবন হয় তাহার নাম বৃন্দাবন। 'অবন' কথাটির অর্থ রক্ষণ, আর 'বৃন্দা' কথার অর্থ হ্লাদিনী শক্তি। শ্রীসনাতন গোস্বামী 'হ্লাদিনী'র অর্থ বলিয়াছেন, "হ্লাদকরূপোঽপি ভগবান্ যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনী'। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার এই কথাই বাঙ্গালা পয়ারে বলিলেন—

"সুখরূপী কৃষ্ণ করে সুখ-আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥"

হ্লাদিনী শক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ এই দুই চরণে কথিত হইয়াছে। প্রথম চরণ স্বরূপ লক্ষণ, আর দ্বিতীয় চরণ তটস্থ লক্ষণ।

"সুখ-রূপ কৃষ্ণের সুখ-আস্বাদন" যে স্থানে ও যে অবস্থায় নিত্য ও বাধাহীন, সেই

স্থান বা সেই অবস্থার নাম বৃন্দাবন। অথবা আনন্দরূপে শ্রীভগবানের নিত্য প্রকাশ যে চিণ্ময় ভূমিতে হইয়া থাকে, তাহারই নাম বৃন্দাবন। "হ্লাদিনীর সার প্রেম" সুতরাং প্রেমের বিজয় যেখানে বাধাহীন, আনন্দ যেখানে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ং-প্রকাশ, সেইখানে বৃন্দাবন। ব্রহ্মসংহিতা নামক গ্রন্থ, যাহা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু দক্ষিণাপথে সংগ্রহ করিয়া আমাদের দেশে আনিয়াছিলেন, এবং যে শ্রীগ্রন্থ তিনি স্বয়ং আদরপূর্ব্বক আস্বাদন করিতেন, সেই গ্রন্থে নিত্য বৃন্দাবনের কথা আছে, আর শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে তাহার প্রাকট্যের কথা আছে। লীলার ন্যায় শ্রীবৃন্দাবনও প্রকটাপ্রকট।

সহজ কথায় বৃন্দাবন বলিতে প্রেমের বিজয় বা হ্লাদিনী শক্তির স্থায়িত্ব-লাভ বুঝায়। আমাদের চৈতন্যের অবস্থা আলোচনা করিলেও আমরা বুঝিতে পারি যে এখানেও শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তির বিলাস হয়। আমাদের চৈতন্যেও প্রেমের বা আনন্দের স্পর্শ আছে। চিন্তা করুন সে স্পর্শ কেমন? তাহা স্থায়ী নহে, তাহা ক্ষণিক। কেবল তাহাই নহে, তাহা বিদ্যুৎ-বিকাশের মত—তাহা "ক্ষণ-প্রভা' প্রভা-সম বাড়ায় মাত্র আঁধার পাঁথিকে ধাঁধিতে।"

আনন্দ আর প্রেম একই জিনিষ। "আনন্দচিণ্ময় রস প্রেমের আখ্যান।" আমাদের চেতনায় আনন্দের ক্রিয়া আছে, তাহা বেদান্তশাস্ত্রে স্পষ্টভাবেই বিচারিত হইয়াছে। পঞ্চদশী গ্রন্থের শেষ অর্থাৎ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের নাম "ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দ।" সেখানে বলা হইয়াছে, অখণ্ড-রস-স্বরূপ যে পরমাত্মা, তিনিই এই বিষয়ানন্দের পরম আনন্দ রূপী এবং বিষয়ানন্দ এই পরমানন্দের কলামাত্র; ইহাই জীবসকল উপভোগ করিয়া থাকে।

এই হ্লাদিনী শক্তিকে প্রাচীন গ্রন্থে বিদ্যুতের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এইবার ভাবুকের ভাষা ব্যবহার করা যাইতেছে। আমাদের ভাগ্যাকাশে বিদ্যুল্লতা যে আসেন না, তাহা নহে। তিনি আসেন কিন্তু চলিয়া যান; 'আঁধারে ও মরু-মাঝারে' ফেলিয়া যান। আমরা পাই কেবল বজ্রের গর্জ্জন, বা বজ্রাঘাত, দারুণ দাহ এবং পর-মুহূর্ত্তে ঘনীভূত বর্দ্ধিত অন্ধকার। সংস্পর্শজ ভোগ দুঃখ-যোনি, ইহাই গীতার মত।

কিন্তু নৈরাশ্যের কারণ নাই। বৃন্দাবনের লোকেরা বলিতেছেন, এক নবজলধর আছেন, সেই নবজলধরের গায়ে এই চঞ্চলা বিদ্যুল্লতা স্থিরা, আর এই নবজলধরের কার্য্য "লীলামৃত-ধারা-বর্ষণ।" অমৃতের পুত্ররূপী মানব। কিন্তু এখন আমরা গ্রীষ্মকালের

শুষ্ক ও দাহময় ধূলি ও বালুকার মধ্যে নিপতিত বীজের ন্যায় যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছি, সে অমৃতের স্মৃতি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। গীতায় ভগবান্‌ যাহাকে অষ্টধা অপরা প্রকৃতি বলিয়াছেন, তাহারই মধ্যে নিপতিত অমৃতের বীজ, তাহাদের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এখন বীজের উপায় কি? এখন মেঘের উদয় প্রয়োজন, আর প্রয়োজন বৃষ্টির। কৃষ্ণই সেই নবীন মেঘ, আর লীলা সেই অমৃতবর্ষণ। তাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলিয়াছেন—

> "মুক্তাহার বকপাঁতি, ইন্দ্রধনুপিঞ্ছ তথি, পীতাম্বর বিজুরী-সঞ্চার।
> কৃষ্ণ নব জলধর, জগৎ শস্য-উপর বরিষয়ে লীলামৃত ধার।"

৩। তিনটি অন্তরায়

প্রাচীন ভক্তগণের চিন্তা-প্রণালীর আভাস দেওয়া হইল। আমরা মোটামুটি বুঝিলাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা প্রেমের বিজয়। এই লীলার তিনটি অন্তরায় আছে। এই অন্তরায় তিনটির কথা খুব ভাল করিয়া ভাবিতে হইবে। অন্তরায় তিনটিও নিত্য, অন্ততঃপক্ষে প্রকট-লীলায় তাহারা অবশ্যম্ভাবী। এ অন্তরায় তিনটির নাম—১। কংস ২। বেদবাদ বা বেদবাদী ব্রাহ্মণ ৩। দেবতা। এই তিনটি তত্ত্ব আলোচ্য।

৪। কংস

প্রথমেই শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে কংসের কথা বলিতেছি। প্রারম্ভে যে সূত্র স্থাপন করা হইয়াছে তাহা স্মরণ করিবেন। নিত্যকংস একটি তত্ত্ব বা চৈতন্যের একটি অবস্থা, আমাদের প্রত্যেককেই একদিন না একদিন এই অবস্থা অতিক্রম করিতে হইবে। সকলের বয়ঃক্রম সমান নহে, কেহ হয়ত অতিক্রম করিয়াছেন—তাঁহার চরণে প্রণাম! কেহ হয়ত এখন কংস-রাজ্যে অবস্থান করিতেছেন, আবার অনেকে এখনও এতদূর আসেন নাই, এখনও জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া চলিতে হইবে, তাহার পর এই কংসের নিকট আসিবেন। এই নিত্যকংস। যিনি প্রকট বা ঐতিহাসিক কংস, তিনি এই নিত্যকংসের ঘনীভূত মূর্ত্তি বা স্থূল প্রকাশ। শ্রীমদ্ভাগবত বা ভারতবর্ষীয় লীলাবাদ আলোচনা করিতে

হইলে এই সূত্রটি সর্ব্বদাই ধরিয়া থাকিতে হইবে, নতুবা পদস্খলন বা ভ্রমপ্রমাদ অবশ্য-স্তাবী। এইজন্য পুনর্ব্বার ইহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল। এইবার শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে কংসের কথা বলিতেছি।

কংস রাজপুত্র। প্রথম যখন তাহার সহিত দেখা হইল, তখন সে নিতান্ত মন্দ লোক নহে। বরং সাধারণ সাংসারিক হিসাবে সে ভাল লোক। দেবকী তাহার ভগিনী, সহোদরা নহে, তবে সম্পর্ক নিকট। বসুদেবের সহিত দেবকীর বিবাহ হইয়াছে, সমা-রোহের বিবাহ। আজ বিবাহের পর দিন, খুব ঘটা করিয়া বসুদেব নববধূকে লইয়া বাড়ী যাইতেছেন। সঙ্গে বহু লোকজন। স্বর্ণমালায় অলঙ্কৃত চারিশত হস্তী, পঞ্চদশ সহস্র অশ্ব, অষ্টাদশ শত রথ, বিবিধ ভূষণে ভূষিত দুই শত দাসী, তদ্ব্যতীত বিবিধ বাদ্যভাণ্ড, শঙ্খ, তূর্য্য, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদিত হইতেছে। বিশাল সমারোহ-পূর্ণ শোভাযাত্রা। সকলেই আনন্দিত। অন্যান্য সকলের ন্যায় কংসেরও হৃদয় আনন্দ-পূর্ণ। দেবকী ও বসুদেব, যে সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিয়াছেন, কংস সেই রথের সারথী হইয়া অশ্বের লাগাম-হস্তে রথ-চালনা করিতেছে। পরমানন্দে চলিতে চলিতে অকস্মাৎ এক দৈববাণী হইল। দৈববাণী কংসকে সম্বোধন করিয়া বলিল "অরে, মূর্খ, আজ তুই তোর যে ভগ্নিকে আদর করিয়া রথে তুলিয়া নিজে রথ চালাইয়া লইয়া যাইতেছিস্, তোর এই ভগ্নির অষ্টমগর্ভে যে জন্মগ্রহণ করিবে সে তোর "হত্যাকারী"। ক্রম-সন্দর্ভটীকায় বলা হইয়াছে—"শত্রুজনয়িত্রী-বহনাৎ স্বমরণাজ্ঞানাচ্চ মূর্খঃ" নিজের শত্রুর জনয়িত্রীকে বহন করিতেছিস্ এবং নিজের মরণ সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, অতএব তুই মূর্খ।

কংস এই দৈববাণী শুনিল। কংস যাহা করিল তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু সেকথা এখন থাকুক। প্রথমে আমাদের চিন্তা করা যাউক, কংস যখন একজন মানব, তখন তাহার কি করা উচিত? কংস এই দৈববাণীর ব্যাপারটিকে যত ভয়ানক বলিয়া মনে করিল, বাস্তবিক তাহা তত ভয়ানক নহে। এ কথা বসুদেব কিছুক্ষণ পরে কংসকে বুঝাইয়া দিবেন। এই দৈববাণী শুনিয়া কংস যদি ভাবিতে পারিত যে "দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান আমাকে হত্যা করিবে! সে অনেক দিনের কথা। আমি যখন দেহধারী, আমার যখন জন্ম হইয়াছে, তখন আমাকে মরিতে হইবে, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যে প্রকারেই হউক মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। দেবকীর অষ্টম গর্ভের পুত্র

আমাকে হত্যা করিবে, সেজন্য দেবকী কি করিবে ? তাহার অপরাধ কি ? সে বালিকা, বিবাহের পর পতিগৃহে যাইতেছে, আজ এই আনন্দের উৎসব। দৈববাণী যাহা বলিলেন তাহা যদি সত্যও হয় তাহা হইলেও এখন সে সম্বন্ধে কিছুই করিবার নাই। তাহার পর দৈববাণী ! ভবিষ্যতের কথা ! সত্য কি মিথ্যা কে বলিতে পারে ?" এইরূপ চিন্তা করিয়া কংস ধীরচিত্তে এই দৈববাণীকে আপাততঃ অনায়াসেই উপেক্ষা করিতে পারিত। কংস যদি তাহা করিতে পারিত, তাহা হইলে কংসের জয় হইত। কিন্তু তাহা হইল না।

কংস অন্য প্রকারে চিন্তা করিল। আর কংসের যে চিন্তা, তাহাকে চিন্তা না বলাই সঙ্গত। দৈববাণী শুনিয়া কংস উত্তেজিত, আত্মহারা ও অধীর হইয়া উঠিল। তাহার মনে এই প্রকারের একটা চিন্তা উঠিল—"আমি !" "আমি মরিব !" "হায় হায় সে কি নিরানন্দ ! সে কি দুঃখ ! আমি মরিতে চাই না !" "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। * * আমি বাঁচিবারে চাই।" "দেবকী !" "দেবকীর পুত্র আমায় মারিবে ? "আমার হত্যাকারীর জন্ম হইবে দেবকীর গর্ভে" "দাঁড়াও দেবকীকে মারিয়া ফেলিতেছি, দেখি আমার মরণ কি প্রকারে কোথায় জন্মগ্রহণ করে !" ইহাই কংসের চিন্তা। শেষ সময়ে কংস চিন্তা করিল দেবকী যেন বৃক্ষ, আর আমার মৃত্যু,—সে যেন এই বৃক্ষের একটি ফল। আজ যদি আমি এই বৃক্ষকে নষ্ট করিয়া ফেলি, তাহা হইলে হে আমার মরণ ! জন্মাইবে কি করিয়া ? তুমি জন্মাইবার গাছ না পাইয়া নিরুপায় হইয়া ফিরিয়া যাইবে—আর তাহার ফলে আমি অমর হইব ! এইরূপ চিন্তা করিয়া কংস এক সুশাণিত খড়্গ হস্তে লইয়া দেবকীর চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাকে হত্যা করিতে অগ্রসর হইল। নিকটে ও চতুর্দ্দিকে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। কাহারও মুখে কথা নাই। আর অসহায়া দেবকী থর থর কাঁপিতেছে। বসুদেবও বীর, কিন্তু তিনি দৈহিক শক্তির বীরত্ব প্রকাশ করিলেন না, তিনি নিমেষমধ্যে কংসের হাত ধরিয়া তাহাকে নিবারণ করিলেন ও অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা বলিয়া তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন।

বসুদেব যাহা বলিলেন তাহা অত্যন্ত গভীরার্থপূর্ণ। তাহার তাৎপর্য্য আলোচনা করিলে কংস কি তাহা অতি সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি প্রথমে কংসের

বংশের যশস্কর।" বসুদেব মিথ্যা কথা বলেন নাই, বসুদেব চাটুবাক্য বলেন নাই। বসুদেবের দেখিবার প্রণালী সাধারণ মানুষের দেখিবার প্রণালী হইতে পৃথক্। আসুন আমরা বসুদেবের চক্ষু ও হৃদয় লইয়া বসুদেবের কথাগুলি আলোচনা করি। কংস বেচারা বাঁচিতে চায়, মৃত্যুর যাহা নিদান সে তাহার মূলচ্ছেদ করিতে চাহে। ইহাতে তাহার অপরাধ নাই। তবে বেচারা অজ্ঞান, সে কিছুই জানে না। কি করিলে সত্য সত্য অমরতা লাভ করা যায়, তাহা সে জানে না—তাহার অমৃত-পিপাসা প্রশংসনীয়, তবে অজ্ঞান বলিয়া অমৃত লাভের প্রকৃত উপায় কি, তাহা সে জানে না। ইহাই তাহার অপরাধ, অজ্ঞানতাই এই অপরাধের হেতু, সুতরাং তাহার উপর রাগ করিয়া কি হইবে? বরং তাহাকে ভালবাসিয়া বা তাহার অন্তরের অন্তরে যে ভাল জিনিষটুকু আছে সেটুকু দেখিয়া তাহাকে তাহার অধিকারানুযায়ী সুপথ প্রদর্শন করাই উচিত। বসুদেব তাহাই করিলেন।

তাহার পর বসুদেব কংসকে বুঝাইলেন যে এই সংসারে মৃত্যুই সর্ব্বাপেক্ষা ধ্রুব। দেহের জন্মের সহিত মৃত্যুরও জন্ম হয়—সুতরাং ভাই কংস, আজ যদি তুমি দেবকীকে মারিয়াই ফেলিতে পার, তাহা হইলে মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে ত্রিংশৎ শ্লোকে বসুদেবের উপদেশের যাহা প্রধান কথা তাহা বলা হইয়াছে, সেই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই,—দেখ ভাই কংস, আমাদের সকলেরই চিরদিন বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছা। তোমারও সেই ইচ্ছা আছে, ইহা দোষের নয়, ইহা প্রশংসার। কিন্তু একটা কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কে চিরদিন বাঁচিতে চায়? সে কি এই দেহ? না তাহা নহে। একটা দৃষ্টান্ত দেখ। আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে। নিম্নে একটি সরোবর, তাহার জল বাতাসে কাঁপিতেছে। চাঁদের প্রতিবিম্ব সেই সরোবরে পড়িয়াছে, কিন্তু জল কাঁপিতেছে বলিয়া প্রতিবিম্বটি বড়ই অস্থির, কেবল ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। একজন লোক সরোবরের জলে চাঁদের যে ছবি পড়িয়াছে, তাহাই দেখিতেছে। সে লোকটি ঐ প্রতিবিম্ব দেখিয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছে, তাহার মনের ইচ্ছা স্থির পূর্ণচন্দ্র দেখি। কিন্তু সরোবরের বুকে প্রতিবিম্বিত ছবিটি কিছুতেই স্থির হইতেছে না, কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ হইতেছে না, কেবল ভাঙ্গিয়া

একবার সেই তরঙ্গগুলিকে কাতর স্বরে অনুনয় করিয়া বলিতেছে, 'ও সরোবর, ও তরঙ্গ, ও চাঁদ, স্থির হও, তোমাদের পায়ে ধরি স্থির হও। আমি পূর্ণ অচঞ্চল চাঁদ চাই।" অনেক অনুনয় করিয়া কিছুই হইল না, তখন করুণ রসের অভিনয় ছাড়িয়া ঐ লোকটি বীররসের অভিনয় আরম্ভ করিল, অর্থাৎ একগাছি লাঠি লইয়া, বা তরবারি লইয়া ঐ তরঙ্গকে বা সরোবরকে আঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে ফল বিপরীত হইল অর্থাৎ প্রতিবিম্বের চাঞ্চল্য না কমিয়া আরও বাড়িয়া গেল। এখন উপায় কি? এই লোকটির মনে চাঁদকে পূর্ণাঙ্গ ও অচঞ্চল অবস্থায় দেখিবার বা পাইবার ইচ্ছা, জাগ্রত হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই চাঁদ আকাশে পূর্ণাঙ্গ ও অচঞ্চল অবস্থায় বসিয়া রহিয়াছে। এমন কথাও বলা যাইতে পারে যে চাঁদ আকাশে পূর্ণাঙ্গ ও অচঞ্চল হইয়া বসিয়া আছে বলিয়াই ঐ লোকটির মনে অচঞ্চল ও পূর্ণাঙ্গ চন্দ্র দেখিবার ইচ্ছা জাগিয়াছে, নতুবা তাহার মনে ঐ প্রকারের ইচ্ছারই উদগম হইত না। এখন লোকটি কি করিবে? সে নীচের দিকে চায় কেন? সে সরোবরের দিকে চায় কেন? সে ছায়াকে কায়া মনে করে কেন? এ যে ছায়া, এ যে সংসার! ইহা তো স্থির হইতে পারে না। আগুনকে যদি কেহ বলে, "ভাই আগুন, তুমি শীতল হও।" তাহা হইলে আগুন বলিবে "ভাই, আমি যদি শীতল হই, তাহা হইলে আমি যে আগুনই থাকিব না।" তেমনই সংসারকে যদি কেহ স্থির হইতে বলে তাহা হইলে সংসার বলিবে "স্থির হইলে আমি যে সংসারই থাকিব না।" তেমনি "ভাই কংস, তুমি বাঁচিতে চাও খুব ভাল কিন্তু শরীর লইয়া তো বাঁচিবে না। শরীরের স্বভাবই শীর্ণ হওয়া, ধ্বংস হওয়া।"

বসুদেব কংসকে নানা প্রকারে বুঝাইলেন। কংস অবশ্য বসুদেবের সমুদয় কথা বুঝিল না। বসুদেবের উপদেশ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলে কংস আর কংসই থাকিবে না। সাধারণ অভিধানে 'কম' ধাতু হইতে 'কংস' পদটি নিষ্পন্ন করা হইয়াছে; কিন্তু বৈষ্ণবতোষণী টীকায় বলা হইয়াছে, 'কসি' ধাতু হইতে 'কংস' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "কসি ধাতোঃ 'শাতনার্থত্বাৎ" 'শাতন' শব্দের অর্থ বিনাশন। নিজে বাঁচিবার জন্য যে জগৎকে বিনাশ করিতে চায়, সেই কংস। সুতরাং বসুদেবের উপদেশ সম্প্যূর্ণরূপে গ্রহণ করা কংসের পক্ষে অসম্ভব।

বসুদেব সর্ব্বশেষে বলিলেন "দেখ ভাই কংস, তুমি উদ্বিগ্ন হইও না। দেবকীর

পুত্র জন্মাইলে আমি সেই পুত্র তোমার হস্তে সমর্পণ করিব। তাহাকে লইয়া তোমার যাহা ইচ্ছা হয় করিও।"

বসুদেবের কথায় কংস দেবকীকে হত্যা করিল না। এইবার কংসের অবশিষ্ট কথা সংক্ষেপে বলিতেছি। মাতা দশমাস দশদিন সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়া, অকথ্য প্রসবযন্ত্রণা সহ্য করার পর সেই সন্তানটিকে প্রসব করিয়াছেন। সুন্দর সুকুমার শিশু, যেন নন্দনের বিকশিত পারিজাত ফুল, দেবতার আশীর্ব্বাদ,—অতীত শতজন্মের তপস্যার ফল, যেন মূর্ত্তিমান হইয়া কোল আলো করিয়া আসিয়া উপস্থিত। ভাবস্তিমিত নেত্রে নবীনা জননী শিশুর মুখের পানে চাহিয়া আছেন—শিশুর নয়নে বৈকুণ্ঠের অম্লান জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া জননী পুলকে শিহরিয়া উঠিতেছেন! এমন সময়ে নিষ্ঠুর কংস আসিয়া মায়ের কোল হইতে সেই শিশুটিকে বজ্রমুষ্টিতে কাড়িয়া লইয়া শাণিত তরবারির আঘাতে তাহার শিরচ্ছেদ করিতেছে! নির্ম্মল সুন্দর শিশুর শোণিতে পৃথিবীর বুক ভাসিয়া গেল। আর জননী—"হা পুত্র! হা বিধাতঃ" এই বলিয়া সংজ্ঞাহীনা হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। "হায় কংস! কি করিতেছ? ঐ শিশু তোমার কি করিয়াছে?" কংস বলে "ঐ শিশু যে নির্দ্দোষ তাহা তো আমি জানি,—কিন্তু আমাকে তো বাঁচিতে হইবে।" আচ্ছা, পার যদি বাঁচো। দেবকী ও বসুদেবের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ আর কেহ নাই। তাঁহারা স্বপ্নেও কখন শত্রুরও অনিষ্ট চিন্তা করেন না। তাঁহারা সর্ব্বদাই ভগবচ্চিন্তায় বিহ্বল, বিশ্ব-কল্যাণ ব্যতীত তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষার দ্বিতীয় বস্তু নাই। তাঁহাদের হস্তপদ শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া, কংস তাঁহাদের দুই জনকে অন্ধকারময় কারাগারের কক্ষে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। "হায় কংস! কি করিতেছ, উঁহারা পরম সাধু, ইহা কি তুমি জান না?" কংস বলে—"উহারা সাধু এবং নিরপরাধ, তাহা তো বেশ ভাল করিয়াই জানি, কিন্তু আমাকে তো বাঁচিতে হইবে!" আচ্ছা বাপু, পার যদি বাঁচো।

এই কংস। সে এই দেহ লইয়া বাঁচিতে চায়। কেবল দেবকী বসুদেবের সন্তান নয়। রাজ্যের যত ছেলে, কাহারও নিস্তার নাই! পিতা কাঁদিতেছে, মাতা কাঁদিতেছে, গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে হাহাকার উঠিয়াছে! নিরপরাধ শিশুগণকে ছলে বলে কৌশলে বিনাশ করিতেছে। কত পিতামাতার নয়নের তারা, কত বংশের একমাত্র প্রদীপ

রাজ্যের নিরপরাধ শিশুগণকেই হত্যা করিয়া কংস প্রতিনিবৃত্ত হইল না। যাহারা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ, গো, তপস্যা, যজ্ঞ সকলেরই উপর সন্দেহ। দয়ালু, পরোপকারী, সত্যবাদী, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ মনুষ্যের নিস্তার নাই। এই কংসের স্বভাব।

কংস বাঁচিতে চায়। তাহাতে আপত্তি নাই, সকলেরই বাঁচিতে চাওয়া উচিত। কিন্তু দেহাত্মবাদী, ইন্দ্রিয়-সর্ব্বস্ব কংস, এই দেহ লইয়া ইন্দ্রিয়ের ভোগের জন্য বাঁচিতে চায়। এই ইচ্ছা পূরণের জন্য সে একদিকে, আর সমগ্র জগৎ একদিকে। কিন্তু তাহাতে তাহার দৃক্পাত নাই। ইহাই কংসের তত্ত্ব।

মরণকে স্বীকার করিয়া বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করিবে যে, সেই অমৃতত্ব লাভ করিবে; সেই লীলা দর্শন করিবে; কিন্তু কংস বৈরাগ্য বোঝে না। আজ যদি কংসের কোন অনুচর আমাদের এই ভারতবর্ষে লোক-শিক্ষকের আসনে বসিতে পারিত, তাহা হইলে সে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিত যে বৈরাগ্যের সাধনা করিয়াই ভারতের এই দুর্দ্দশা। অতএব বৈরাগ্য-সাধন দেশ হইতে উঠাইয়া দাও। দেশের লোককে ভোগপরায়ণতায় দীক্ষিত কর। আজ যদি কংসের কোন অনুচর আমাদের দেশে দার্শনিক পণ্ডিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিত, তাহা হইলে যজ্ঞ, তপস্যা আদি অনুষ্ঠানগুলি লইয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতে নিষেধ করিত। আজ যদি কোন কংসের অনুচর আমাদের দেশে মাসিক কাগজের কর্ত্তা হইয়া আসিত, তাহা হইলে অবতারবাদ যে মিথ্যা—অসাধারণ মানুষ বলিয়া যে কোন জিনিষ নাই, আমাদের মত সাধারণ মানুষেই সমস্ত ব্যাপার চালাইতেছে, ইহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিত। প্রকৃত কথা এই—কংস তিনটি জিনিষ বুঝিত না। প্রথমতঃ সে বুঝিত না যে আমার যাহা ভাল লাগে, তাহারই অনুবর্ত্তন করিলে চলিবে না। বিবেক ও বৈরাগ্যের দ্বারা ইন্দ্রিয় ও মন জয় করা আবশ্যক, নতুবা সত্যের সহিত পরিচয় হইবে না। কংসকে কেহ মূর্খ বিবেচনা করিবেন না। কংস, দেবকী ও বসুদেবের সন্তানগুলি একে একে বিনাশ করিয়া শেষে তাঁহাদের বেশ দার্শনিক পণ্ডিতের মত একটা বক্তৃতা শুনাইয়াছেন। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ও দেহের ভোগের জন্য উন্মত্ত কংস—কিন্তু সে কথা বলে দার্শনিক পণ্ডিতের মত। দ্বিতীয়তঃ কংস বোঝে না যে এই জগৎ কেবল

সত্য। তাহাদের একটা শাসন আছে। যাগ, যজ্ঞ, ক্রিয়া, কর্ম্ম, ব্রত, তপস্যা প্রভৃতি ব্যবস্থাগুলি এই দেবশাসনের আনুকূল্য করিবার জন্যই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই দেব-শাসনের বিরুদ্ধে যাইবার কাহারও শক্তি নাই, কারণ এই দেবশাসন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানবের আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ এই শাসনের অনুবর্ত্তনের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। ইহাই সনাতন ব্যবস্থা। প্রত্যক্ষবাদী বা জড়বাদী মানুষ অহঙ্কারের দ্বারা চালিত হইয়া ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চাহে কিন্তু দাঁড়াইতে পারে না। তৃতীয় কথা, ভগবৎ-শক্তির বিশেষ আবির্ভাব, ইহাও কংস বোঝে না। কংসের চরিত্রে এই তিনটির অভাব—১। বৈরাগ্য, ২। অবতারে বা ভগবদাবির্ভাবে বিশ্বাস, ৩। দেবশাসন বা যাগযজ্ঞ ক্রিয়া কর্ম্ম প্রভৃতির উপযোগীতা। কংস বাঁচিতে চায়, দেহ ও ইন্দ্রিয় লইয়া—কংস জয়ী হইতে চায় বিশ্বব্যবস্থার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বেদবাদী ব্রাহ্মণগণ বৃন্দাবনের অন্তরায়। তাঁহাদের মধ্যে তৃতীয় লক্ষণটি আছে, কিন্তু প্রথম দুইটি নাই। আর দেবতাদের মধ্যে কেবল বৈরাগ্য নাই, অপর দুইটি আছে। একথা আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

কংসের একটা পরীক্ষা হইয়াছিল। দৈববাণীই সেই পরীক্ষা। আমরা বলিয়াছি, কংস সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। সেই পরীক্ষাটি কি, একটু ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা যাউক। আমি আর আনন্দ, এই দুইটি জিনিষ আছে। প্রত্যেক মানুষের বা প্রত্যেক সাধকের নিকট পুনঃ পুনঃ একটি প্রশ্ন আসিয়া উদিত হয়। প্রশ্নটি এই,—আনন্দে আমি না আমাতে আনন্দ? কাহার জন্য কে? আমার জন্য আনন্দ, না আনন্দের জন্য আমি? যে বলিবে—আমাতে আনন্দ বা আমার জন্যই আনন্দ, সে যাইবে অহঙ্কারে বা কংসপুরে; আর যে বলিবে আনন্দের জন্য আমি বা আনন্দে আমি, সে যাইবে প্রেমে বা বৃন্দাবনে। কংসকে যখন দৈববাণী বলিল যে "কংস তুই মরিবি।" কংস তখন বিবাহের শোভাযাত্রায় অন্য সকলের সঙ্গে মিশিয়া অর্থাৎ আপনাকে ভুলিয়া আনন্দ ভোগ করিতেছিল। কিন্তু দৈববাণী শুনিবামাত্র কংস ভাবিল—'আমি মরিব! তবে আনন্দ থাকিবে কোথায়?' এই চিন্তাতেই কংস পরাস্ত হইল। যদি সেদিন বলিতে পারিত—"আমি তো মরিতেই আসিয়াছি! একথা বলিয়া ভয় দেখাইতেছ কেন? আমি

এইবার কংস বেচারার অদৃষ্টের কথা ভাবুন। আনন্দ আসিলেন—তিনি বৃন্দাবনে নন্দের নন্দন। চেতন, অচেতন, পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গম কেহই বাদ যায় নাই, সকলেই অমৃত লাভ করিল, কিন্তু কংসের অদৃষ্টে লাভ হইল কি? মৃত্যু। আমরা যেন কংসের হস্তে পরিত্রাণ পাই, আমরা যে আনন্দের জন্য—ইহা যেন বুঝিতে পারি। আনন্দ আমাদের নয়, আমরা আনন্দের—এইটুকু যেন বুঝিতে পারি।

৫। উগ্রসেন ও যদুবংশ ধ্বংস

বৃন্দাবনের প্রথম অন্তরায় কংস যে কেমন, তাহা আমরা মোটামুটি দেখিয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের প্রারম্ভেই এই কংসের কথা বলা হইয়াছে। যাঁহারা তত্ত্বরূপী কংস, বা নিত্য কংসকে ধরিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ অংশ ধীরভাবে আলোচনা করিলে পৌরাণিক ঋষির যাহা অভিপ্রায়, তাহা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথমে কংসের কথা, আর একাদশ স্কন্ধের প্রথমে যদুবংশের ধ্বংসের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। কংসের ভিতরে যাহা ছিল, তাহা যে কেবল কংসের মধ্যেই ছিল তাহা নহে। অল্পবিস্তর পরিমাণে অনেকের মধ্যেই ছিল। কেবল 'ছিল' বলিতেছি কেন, আছে ও থাকিবে। কংসবধ হইয়া গেল, কিন্তু কংসের বিষ গেল না। ক্রমে ক্রমে জরাসন্ধ গেলেন, শিশুপাল, দন্তবক্র গেলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন গেলেন, কিন্তু বিষ গেল না। শেষে যদুবংশ ধ্বংস হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণও লীলা সংবরণ করিলেন, পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থান করিলেন, স্বর্গারোহণ হইয়া গেল, দ্বাপর গেল, কলি আসিল, কলিরও পাঁচ হাজার বৎসর হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কে বলিবে, কংস নাই? কে বলিবে কংস ধ্বংস হইয়াছে? পুরাণের মর্ম্ম বুঝিতে হইলে, শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে, নিত্যলীলার এই রহস্য উপলব্ধি করিতে হইবে।

যদুবংশ কি প্রকারে ধ্বংস হইল, তাহার আলোচনা করিলে আমরা ঐ কংসকেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রারম্ভে কংসের কথা শুনিয়াও যদি কেহ ঠিকমত কংসকে না বুঝিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে একাদশ স্কন্ধের এই যদুবংশ ধ্বংসের কথা শুনিবেন, কংসকে বুঝিতে অনেকটা সুবিধা হইবে।

ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই একই কথা, কিন্তু বর্ণনার একটু প্রভেদ আছে। মহাভারত ইতিহাস, আর শ্রীমদ্ভাগবত কেবল পুরাণ নহে, মহাপুরাণ, এ কথাটিও মনে রাখা দরকার। মহাভারতের মৌসল-পর্ব্বে উগ্রসেনের কথা নাই, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনায় উগ্রসেনের কথা আছে। উগ্রসেন কংসের পিতা। কংসের যাহা ধর্ম্ম, তাহা উগ্রসেনের মধ্যেও ছিল; তবে পিতার মধ্যে তাহা বেশ ভাল করিয়া ফুটিতে পারে নাই, পুত্রের মধ্যে তাহা সুপরিস্ফুট। কাজেই কংসকে বেশ ভাল করিয়া চিনিতে হইলে, এই যদুবংশ ধ্বংসের বেদনাময়ী কথা একবার স্মরণ করায় লাভ আছে।

ব্যাপার এই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভারতবর্ষের বড় বড় রাজবংশ অনেক লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; যাঁহারা আছেন তাঁহাদেরও অবস্থা মলিন, সে শৌর্য্য বীর্য্য আর নাই। এখন যদুবংশের সম্মান খুব অধিক। রাজসূয় যজ্ঞের দিন ভীষ্ম চেষ্টা করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করিতে, কারণ দেবব্রতই সর্ব্বপ্রথম বুঝিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণই ভারত-বর্ষের আত্মা। শ্রীকৃষ্ণের মধ্য দিয়াই ভারতবর্ষ তাঁহার সে দিনের যুগবাণী ঘোষণা করিতেছিলেন। দেবব্রত ভীষ্ম তাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপী কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যার ফলে বুঝিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণই কালাত্মা। কিন্তু তখনও শিশুপাল প্রবল, ভীষ্মের চেষ্টা সফল হয় নাই। বাঁচিয়া থাকিতে ভীষ্ম যাহা করিতে পারেন নাই, স্বেচ্ছায় শরশয্যা আশ্রয় করিয়া, মৃত্যুকে বরণ করিয়া, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে করিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ এখন ভারতবর্ষে, অবশ্য মৃতপ্রায় দুর্ব্বল ভারতবর্ষে, স্বীকৃত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধের দ্বারা যদুবংশ এখন ভারতবর্ষে একরূপ সর্ব্বোচ্চ সম্মানের স্থান লাভ করিয়াছে। বংশের সম্মান খুব বাড়িয়াছে, কিন্তু বংশের ছেলেগুলি সেই সম্মানের উপযুক্ত হয় নাই; কেবল তাহাই নহে, যাঁহার জন্য এই সম্মান, তাঁহাকেও ভাল করিয়া চিনিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে পারে নাই।

ভিতরের এই অব্যবস্থা শীঘ্রই বাহির হইয়া পড়িল। বিশ্বামিত্র, নারদ প্রভৃতি প্রাচীন মহর্ষিগণ একদিন দ্বারকানগরের পথে যাইতেছেন। যদুবংশীয় বালকগণ পথে খেলা করিতেছে। মহর্ষিদের দেখিয়া তাহাদের মনে হইল, এই সব প্রাচীন মহর্ষি, ইঁহাদের সহিত যদি কৌতুক করা না যায়, তাহা হইলে জীবনই বিফল? কি প্রকারের কৌতুক করা যাইবে, তাহা নির্ণয় করিতে বিলম্ব হইল না।

বতীর পুত্রের নাম সাম্ব। সাম্ব বালক, দেখিতে স্ত্রীলোকের মত। একজন সাম্বকে গর্ভবতী স্ত্রীলোক সাজাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া মহর্ষিগণের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। যথারীতি প্রণাম ও অভিবাদন করিয়া মহর্ষিগণকে জিজ্ঞাসা করা হইল—"দেখুন, আপনারা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকলই জানেন। এই বালিকাটি গর্ভবতী, ইহার কি সন্তান হইবে তাহা জানিবার জন্য বড়ই ইচ্ছা, লজ্জায় কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারে না ; আপনারা দয়া করিয়া যদি বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমরা বড়ই অনুগৃহীত হই।"

প্রাচীন মহর্ষিগণ বালকদের ব্যবহার বুঝিলেন, তাঁহারা যে রুষ্ট হইলেন, তাহা নহে। তাঁহারা যেন ধ্যানযোগে যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা অনুভব করিয়া বলিলেন— "ইহার গর্ভে, একটি কুলনাশন মুসলের জন্ম হইবে।" এই বলিয়া মহর্ষিগণ চলিয়া গেলেন।

সাম্বের উদর কিসের দ্বারা স্ফীত করা হইয়াছিল, তাহা সকলে জানিত না। মহর্ষিদের কথা শুনিয়া তাহারা উপরের আবরণ-বস্ত্র সরাইয়া দেখিল, সত্যই একটি মুসল রহিয়াছে। একটু চিন্তা হইল। মহর্ষিগণ বলিয়াছেন—"একটি মুসলের জন্ম হইবে। সেই মুসল তোমাদের কুলনাশন হইবে।" ঋষিরা যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্দ্ধেক অংশ ফলিয়াছে। সাম্বের উদরে কাপড়ের নীচে যে মুসল আছে, ইহা মহর্ষিগণ কেমন করিয়া বুঝিলেন ? প্রথম অর্দ্ধাংশ যখন মিলিয়াছে, তখন শেষ অর্দ্ধাংশও ফলিতে পারে। বালকগণের মনে এই প্রকারের একটা ভয়ের সঞ্চার হইল। তাহারা ঐ মুসলটি লইয়া উগ্রসেনের নিকটে গেল। শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যায় নাই, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের কথা। মহাভারতের বর্ণনার সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের এই স্থানে একটু প্রভেদ আছে। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণ করিতেছি। উগ্রসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া বালকেরা যখন সকল কথা বলিল, তখন উগ্রসেন বালকদের তিরস্কার করিলেন না, বা তাহাদিগকে বলিলেন না যে, মহর্ষিগণের চরণে ধরিয়া অপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষা কর।

উগ্রসেন চিন্তা করিতেছেন। কংস দৈববাণীতে শুনিয়াছিল,—"দেবকীর অষ্টম গর্ভের পুত্র তোর হন্তা হইবে।" এই কথা শুনিয়া কংস যে পদ্ধতিতে চিন্তা করিয়াছিল, মহর্ষিগণের অভিশাপ বা ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া উগ্রসেনও ঠিক সেই পদ্ধতিতে চিন্তা

করিয়া আসিবে, সুতরাং আজ যদি এই আধার নষ্ট করিয়া ফেলি, তাহা হইলে আর মরণ কি প্রকারে আসিবে?" উগ্রসেন চিন্তা করিল,—"এই মুসলটি করণ, এই মুসলের সাহায্যে যদুবংশের যে বিনাশ, তাহা আসিয়া উপস্থিত হইবে। সুতরাং বিনাশের যন্ত্ররূপী এই মুসলটি যদি এখনই নষ্ট করিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে কুলনাশ আর কি প্রকারে আসিবে?"

বসুদেবের জন্য কংস দেবকীকে বিনাশ করিতে পারে নাই। বিনাশ করিলে, কি প্রকারে কংসের মৃত্যু আসিত, তাহা আমরা জানি না, তবে মৃত্যু যে আসিত, যাহা অবশ্যাম্ভাবী, তাহা যে অবশ্যই ঘটিত, ইহাতে আমাদের কোনরূপ সন্দেহ নাই। উগ্র-সেন ব্যবস্থা করিলেন—"এই মুসলের দ্বারা কুলনাশন হইবে, আচ্ছা এই মুসলটিকে চূর্ণ করিয়া সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দাও, কেমন করিয়া মরণ আসে দেখা যাউক।"

উগ্রসেনের ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যে পরিণত হইল। মুসলটিকে চূর্ণ করা হইল। সমগ্র মুসল চূর্ণ হইল না, তাহার ভিতরের সামান্য একটু অংশ যেমন তেমনই থাকিয়া গেল। সমস্তটা সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দেওয়া হইল। এই লোহার গুঁড়ার সহিত সমুদ্রের জলের যোগ হইলে কি যে রাসায়ণিক ক্রিয়া হইল, তাহা ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিবেন। লৌহচূর্ণগুলি সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে আসিয়া প্রভাসের সমুদ্রতীরে সংলগ্ন হইল। তাহা হইতে এরকা নামক এক প্রকার তৃণের জন্ম হইল। সে তৃণ কেমন তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু একদিন এই তৃণ মুসলের কাজ করিল এবং ইহারই আঘাতে যদুবংশীয়গণ পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিল।

এদিকে যে লৌহখণ্ড চূর্ণ হয় নাই, তাহা ফেলিয়া দিবামাত্র একটি সমুদ্রের মৎস্য আসিয়া গ্রাস করিল। এক ধীবর জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতে ধরিতে দৈবক্রমে সেই মাছটিকে ধরিয়া ফেলিল। মাছটিকে ছেদন করিতে গিয়া ধীবর লৌহখণ্ড প্রাপ্ত হইল। ঐ ধীবরের সহিত এক ব্যাধের বড় বন্ধুতা ছিল। ব্যাধের নাম জরা। তাহার তীরের একটি লৌহফলক হারাইয়া গিয়াছিল। সে যখন খবর পাইল তাহার ধীবর বন্ধু এক সামুদ্রিক মাছের পেট হইতে একখণ্ড ইস্পাত পাইয়াছে, তখন সে অনায়াসেই ঐ ইস্পাত খণ্ড বন্ধুর নিকট সংগ্রহ করিয়া তীরের ফলক করিয়া লইল। উগ্রসেন ও তাঁহার বন্ধু-

জন সম্পূর্ণ করিয়া রাখিল—জরা ব্যাধের তীরস্পর্শে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করিয়া যদুবংশের ধ্বংসাভিনয় সম্পূর্ণ করিলেন। এই গেল উগ্রসেনের ব্যাপার! এখন বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে—কংস কি এবং উগ্রসেনই বা কি? ইহারা বাঁচিতে চায়, কিন্তু অমরতার উপায় অন্বেষণ করে বাহিরে।

কেবল কংস আর উগ্রসেনের কথা বলিলেই ইহাদের ইতিহাস শেষ হইবে না। হিরণ্যকশিপুও ঠিক্ এই পথে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু দৈব সহস্রবৎসর কাল মন্দর পর্ব্বতে কঠোর তপস্যা করিয়াছিল। তপস্যার জোরে ব্রহ্মা আসিয়া উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলেন। কেবল উপস্থিত হওয়া নহে, সৃষ্টিরক্ষা করার জন্য ব্রহ্মা তাহাকে বর দিয়া তপস্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে বাধ্য হইলেন।

হিরণ্যকশিপুও অমরতা চাহে। ব্রহ্মাকে বলিল—"আমায় অমর বর দিন।" ব্রহ্মা বলিলেন—"আমি নিজেই অমর নহি, আমি তোমায় অমর বর কেমন করিয়া দিব?" হিরণ্যকশিপু বলিল,—"তবে আমার বর লওয়ার প্রয়োজন নাই।" সে আবার সুতীব্র তপস্যা আরম্ভ করিল। ব্রহ্মা আসিয়া বর লইবার জন্য সাধাসাধি আরম্ভ করিলেন। হিরণ্যকশিপু চাতুরী করিয়া এমন বর লইল, যাহাতে দুই দিক্ আগলাইয়া রাখিতে পারে। "দিবসে মরিব না, রাত্রিতে মরিব না। আকাশে মরিব না, পৃথিবীতে মরিব না। মানুষে মারিবে না, পশুতে মারিবে না।" ইহাই ছিল হিরণ্যকশিপুর প্রার্থনা, আর সৃষ্টিরক্ষার জন্য ব্রহ্মা তাহার প্রার্থনা পূরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু ভাবিয়াছিল, প্রকারান্তরে অমর হইলাম। কিন্তু দিন নয়,—রাত্রি নয়, এমন সময় আছে; আকাশ নয়, পৃথিবী নয়—এমন স্থান আছে; মানুষ নয় পশু নয়,—এমন প্রাণী আছে; হিরণ্যকশিপু তাহা বুঝিতে পারে নাই। হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু তাহারই প্রমোদভবনের স্ফটিক স্তম্ভের ভিতর লুকাইয়া ছিল, আর তাহারই আত্মজ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সেই মৃত্যুকে প্রকট করিয়া দিল!

এই প্রকারে আমরা নিজের কাজেই প্রতিনিয়ত পরাজিত হই। ব্রহ্মা বহির্ম্মুখ করিয়া আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, এই জন্য আমরা অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাই না। কিন্তু তাঁহাকে যে না দেখিতে পাইবে, সে মরণ হইতে মরণের দিকেই ছুটিয়া চলিবে।

প্রেমরূপে, রসরূপে, আপনাকে বিলাইয়া দিতে আসিলেন যিনি, তিনি আমাদের নিকট মৃত্যুরূপে উপস্থিত হইতেছেন। বাঁচিবার ভুল রাস্তা ধরিয়া আমরা মরিয়া যাইতেছি, এখন মরিবার ঠিক্ রাস্তা পাইলে চিরজীবনে বাঁচিয়া উঠিতে পারি। মরিবার ঠিক্ রাস্তাই বৃন্দাবনের পথ। এই গেল কংসের কথা।

কংসের বিপরীত ছবি, শ্রীমদ্ভাগবতে অনেক আছে। ধ্রুব, প্রহ্লাদ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রজগোপীগণ পর্য্যন্ত, এই চিত্রের ক্রমবিকাশ। আমরা এই বিপরীত চিত্র একখানি দেখিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ে এই উপাখ্যানটি বর্ণিত হইয়াছে।

অবন্তীনগরে এক ধনবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কদর্য্যবৃত্তি আশ্রয় করিয়া বিপুল ধন-সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার আদৌ কোনরূপ সদ্ব্যয় ছিল না। তিনি সকলের সহিত কলহ করিতেন, সকলের অপ্রিয় আচরণ করিতেন। তাঁহার ব্যবহার এতই খারাপ ছিল যে, পঞ্চযজ্ঞভাগী দেবগণ পর্য্যন্ত তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন।

অকস্মাৎ ব্রাহ্মণের ধননাশ আরম্ভ হইল। গৃহদাহ, দস্যুতস্করের উপদ্রব, রাজ-পীড়ন প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ একেবারে দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। এই আকস্মিক দারিদ্র্যে ব্রাহ্মণের উপকার হইল, কারণ দারিদ্র্যের সহিত বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ অতীত জীবনের দুষ্কর্ম্মের জন্য সরলভাবে অনুতাপ করিতে করিতে ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন করিলেন। দুষ্ট লোকে ব্রাহ্মণের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে লাগিল। সে অত্যাচার অনির্ব্বচনীয়। ব্রাহ্মণ ক্ষুব্ধ হইলেন না, এই সমুদয় অত্যাচারই তাঁহার পরীক্ষা। তিনি ভাবিতেন, এই দুঃখ সমুদয় আমার ভোক্তব্য।

"নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতুর্নদেবতাত্মাগ্রহকর্ম্মকালাঃ।
মনঃ পরং কারণমামনন্তি সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্ যঃ॥"

এই সকল দুষ্টলোক বা দেবতাগণ, গ্রহ, কর্ম্ম ও কাল, ইহারা কেহই আমার সুখ দুঃখের হেতু নহে। যে মন সর্ব্বদা সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিতেছে, সেই মনই ইহার হেতু। অতএব মনকেই নিগ্রহ করা প্রয়োজন। নতুবা সমস্তই ব্যর্থ।

"দানং স্বধর্ম্মো নিয়মোদমশ্চ শ্রুতঞ্চ কর্ম্মাণি চ সদ্ব্রতানি।
সর্ব্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ পরোহি যোগো মনসঃ সমাধিঃ॥"

দান, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম, যম, নিয়ম, শ্রৌতকর্ম্ম ও ব্রতাচরণ, এ সমুদয় মনের নিগ্রহের উপায়মাত্র, কিন্তু মনের যে সমাধি, তাহাই পরমযোগ।

"সমাহিতং যস্য মনঃ প্রশান্তং দানাদিভিঃ কিং বদ তস্য কৃত্যম্।
অসংযতং যস্য মনো বিনশ্যদ্দানাদিভিশ্চেদপরং কিমেভিঃ॥

যাঁহার মন প্রশান্তভাবে সমাহিত হইয়াছে, দানাদিদ্বারা তাহার আর কি কার্য্য হইবে, আর যাহার আলস্যাদি দ্বারা মন অসংযত হয়, তাহার দানাদি দ্বারাই বা অপর কি কার্য্য হইবে? এই প্রকারে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের মন যখন সমাহিত হইল, যখন সংসারের তরঙ্গাঘাত হইতে তিনি আপনাকে নির্মুক্ত করিলেন, তখন তিনি পরাত্মনিষ্ঠার যে সনাতন পথ তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন এবং পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এইরূপ পরমাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় করিলেন যে, মুকুন্দ-চরণ-পদ্ম সেবা দ্বারা আমি এই ঘোর অন্ধকার উত্তীর্ণ হইব।

ব্রাহ্মণের এই অবস্থায় কথিত শ্লোকটি এই—

"এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর যখন রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন এই শ্লোকটি পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেছিলেন।

"চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘমাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন।
রাঢ়দেশে তিনদিন করিলা ভ্রমণ॥
এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে।
ভ্রমিতে পবিত্র কৈলা সব রাঢ় দেশে॥
প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুক বচন।
মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠা এই সাংবেশ ধারণ।
মুকুন্দ সেবায় [illegible] সংসার তারণ॥

সেই বেশ কৈল, এবে বৃন্দাবনে গিয়া।
কৃষ্ণ নিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া॥"

এই পথ বৃন্দাবনের পথ—কংসের পথ ইহার বিপরীত।

৬। বেদবাদ

বৃন্দাবনের প্রথম অন্তরায় কংস, আর দ্বিতীয় অন্তরায় বেদবাদী ব্রাহ্মণ। উপনিষদে কথিত হইয়াছে যে, অনেকে ব্রাহ্মণ হইয়া পবিত্র বংশে জন্মিয়াছেন, কিন্তু পরব্রহ্মের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বর্গলাভের কামনায় সমারোহ করিয়া যজ্ঞ করেন। তাঁহাদের ধারণা স্বর্গই চরম বস্তু। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, যাহারা অতত্ত্বজ্ঞ ও মূঢ় তাহারা বেদের কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে আপাতসুখকর যে সমুদয় স্বর্গভোগের কথা আছে, তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া যায় এবং মনে করে স্বর্গসুখই মানবের প্রাপ্তব্যের শেষ সীমা।

যাহারা স্বর্গকে শেষ বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের উপাসক। তাহারা ধর্ম্ম বলিতে সেই সমুদয় অনুষ্ঠান বা আচরণ বুঝে, যাহার দ্বারা অর্থ-লাভ হয় এবং ইহলোকে ও পরলোকে প্রচুর পরিমাণে কামভোগ হয়। এই সমুদয় লোক মোক্ষধর্ম্মই বুঝিতে পারে না, সুতরাং বৃন্দাবন বা প্রেমসেবা অনেক দূরের কথা। এই বেদবাদ বৃন্দাবনের একটি অন্তরায়। কেহ হয়ত বলিবেন, একথা সকলেই জানে। গীতায় ভগবান পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, যাহারা স্বর্গের জন্য কর্ম্ম করে, তাহারা স্বর্গে যায় সত্য, কিন্তু স্বর্গ চিরস্থায়ী নহে, পুণ্য ক্ষয় হইলে সেই সুরেন্দ্রলোক বা স্বর্গলোকের বিশাল ভোগসুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া আবার পৃথিবীতে আসিতে হয়। যাহারা কামকাম অর্থাৎ কাম্যবস্তুতেই যাহাদের একান্ত আসক্তি, তাহারা এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মা-কর্তৃক বিনির্ম্মিত মনোময় চক্রে আরোহণ করিয়া গতাগতি লাভ করিতেছে। গীতায় একথা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, গীতার পূর্ব্বে উপনিষদেও একথার বহুস্থানে উল্লেখ আছে। কিন্তু মানুষের পক্ষে স্বর্গকামনা পরিত্যাগ করা নিতান্ত সহজ কথা নহে। কত জন্ম চলিয়া গিয়াছে, কতবার নরকে ডুবিয়াছি, কতবার স্বর্গলোকে সুখভোগ করিয়াছি, স্বর্গের স্মৃতি লইয়া আবার সংসারে আসিয়াছি, কিন্তু স্বর্গের সেই পবিত্র স্মৃতি সংসারের ধূলার

মুখে হয়ত নিষ্কাম কর্ম্মের কথা, মোক্ষের কথা, ভগবৎ-প্রেমের কথা দিন রাত্রি বলিতেছি; কিন্তু কামনার বন্ধন ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। সুতরাং এই বেদবাদ বা স্বর্গ-কামনা, ইহাও একটি নিত্য অন্তরায়, বৃন্দাবনের গোষ্ঠভূমির নিকটে আসিয়াও বাধা পাইতে হইবে, আপনা হইতে প্রেম আসিয়া দুয়ারে উপস্থিত হইলেও তাহাকে চিনিতে পারিব না। প্রেমময়ের বাঁশির আহ্বান শুনিয়া যমুনা নদীর জল উজানে প্রবাহিত হইবে, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের শিলাগুলি গলিয়া যাইবে, তরুলতা রোমাঞ্চিত হইয়া মধুবর্ষণ করিবে, ময়ুর ময়ূরী পেখম তুলিয়া নৃত্য করিবে, শুক সারী নয়নের জলে ভাসিয়া নাচিতে থাকিবে, পৃথিবীর বুকে পুলক জাগিয়া উঠিবে, গোপ, গোপী ও গবী প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খাইবে, আর আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের জাতির অহঙ্কার, কুলের অহঙ্কার, শৌচ-সদাচার ও ক্রিয়াদক্ষতার অহঙ্কার লইয়া আমরা বসিয়া থাকিব। প্রেমের দেবতা আসিতেছেন, ভিখারীর বেশে আসিতেছেন, উপেক্ষিত হইয়াও তাঁহার অভিমান নাই। তিনি কোন্ পথে কখন আসেন, চতুর তাহা বুঝিতে পারে এবং ধরিতেও পারে। কিন্তু তিনি যে আসেন, আপনার গুণে আসেন, না ডাকিলেও আসেন, দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিলেও আসেন, এ কথা অনেকেরই জানা নাই। বিশেষতঃ, যাহারা দক্ষপ্রজাপতির বংশধর অর্থাৎ যাহারা মনে করে আমরা মন্ত্র জানি, কাল জানি, দ্রব্য জানি, প্রয়োগ জানি, সুতরাং আমরা নিজের জোরে, নিজের কল্যাণ অর্জ্জন করিয়া লইব, তাহাদের জানা নাই যে তিনি আসেন। যিনি যজ্ঞ, যাজ্ঞিক ও যজ্ঞসাধন ঘৃতাদির অধিষ্ঠাতা ও ফলদাতা এবং যাঁহার প্রীতির জন্যই যাবতীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান, জোয়ারে উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের মত তরঙ্গ তুলিয়া আপন আনন্দে নাচিতে নাচিতে তিনি যে আসেন, এ কথা তাহারা বুঝিতে পারে না। সুতরাং এই অন্তরায় কংসের মত নিত্য, চিরদিন আছে ও চিরদিন থাকিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় শ্রীধরস্বামী "বেদ-বাদিনঃ" এই কথার অর্থ করিয়াছেন "বেদঘোষণশীলাঃ, নতু বেদমর্ম্মজ্ঞাঃ" অর্থাৎ যাঁহারা শুকপাখীর মত চিরদিন বেদের ঘোষণাই করিতেছেন কিন্তু তাহার মর্ম্ম বুঝেন না, তাঁহারাই বেদবাদী। গীতায় "বেদ-বাদরতাঃ" এই কথার টীকায় বলিয়াছেন, বেদে যে অর্থবাদ আছে, সেই অর্থবাদকেই বেদের সর্ব্বস্ব বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারাই বেদবাদরত। মোটের মাথায়, উভয় কথারই তাৎপর্য্য এক।

৭। শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা

'শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা' নামক যে লীলা আছে, সেই লীলায় 'বেদবাদ' নামক এই অন্তরায়ের কথা বলা হইয়াছে। তাহার বিবরণ এই ঃ—

গ্রীষ্মকাল, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম রাখালবালকগণকে সঙ্গে লইয়া গোচারণ করিতেছেন। রাখালেরা মধ্যাহ্ন ভোজনের খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে। আজ তাহারা যে কারণেই হউক, খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসে নাই। দারুণ রৌদ্র, ক্ষুধায় ও পিপাসায় কাতর হইয়া বালকেরা কৃষ্ণ বলরামের শরণাগত হইয়া বলিল,—"হে কৃষ্ণ, তুমি মহাবাহু, হে রাম তুমি দুষ্ট-নিবর্হণ, অসুর বিনাশে তোমাদের দক্ষতা সুপ্রসিদ্ধ, এখন ক্ষুধা নামক অত্যন্ত দুষ্ট অসুর আসিয়া আমাদের আক্রমণ করিয়াছে, ইহার একটা সুব্যবস্থা কর।" কৃষ্ণ বলিলেন—"দেখ, অদূরে আঙ্গিরস গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ করিতেছে, তোমরা কিছুদুর অগ্রসর হইলেই যজ্ঞস্থানের কোলাহল শুনিতে পাইবে; সুতরাং সেইস্থাননির্ণয় করা বিশেষ কঠিন হইবে না। যজ্ঞের অন্ন প্রস্তুত এবং তাহা নিবেদন করাও হইয়া গিয়াছে, তোমরা সেখানে গিয়া আমাদের নাম করিয়া অন্নভিক্ষা কর। বৃহৎ আয়োজন, তোমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।" শ্রীকৃষ্ণের কথামত রাখালবালকেরা যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইল এবং বলিল —"হে ভূদেবগণ! শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গোচারণ করিতে আসিয়া অত্যন্ত ক্ষুধাতুর হইয়াছেন, তাঁহারা কিছু অন্নভিক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন, দয়া করিয়া কিছু অন্ন দান করুন।" ব্রাহ্মণেরা বিরক্ত হইলেন, কোথা হইতে একদল রাখাল বালক যজ্ঞশালায় আসিয়া অন্নভিক্ষা করিতেছে! কি অন্যায়! তাঁহারা বালকদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না, আবার কেহ কেহ বোধ হয় ক্রোধও প্রকাশ করিলেন। ব্রজবালকেরা হতাশ হইয়া কৃষ্ণ বলরামের নিকট ফিরিয়া গেল। এইবার ব্রাহ্মণগণের চরিত্র শ্রবণ করুন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, তাঁহারা "ক্ষুদ্রাশা" "ভূরিকর্ম্মাণোঃ" "বালিশাঃ" "বৃদ্ধমানিনঃ।" তাঁহাদের আশা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তাঁহারা ত্রিবর্গের উপাসক, স্বর্গসুখ তাঁহাদের জীবনের চরম লক্ষ্য। বলরাম ও কৃষ্ণের ইঁহারা কোনই খবর রাখেন না। বলরাম ও কৃষ্ণের সংবাদ আমাদের ভিতরেই আছে, ভিতরে যাঁহারা সে সংবাদ পাইয়াছেন, বাহিরের লীলা তাঁহারাই বুঝিয়াছেন।

ধরিতে পারে না। বলরাম অনন্ত, দেবকীর সপ্তম গর্ভে তাঁহার আবির্ভাব। প্রাচীন টীকাকার সপ্তম গর্ভের তত্ত্বকথা ব্যক্ত করিয়াছেন। দেবকীর প্রথম ছয় পুত্রের নাম দিয়াছেন "ষড়্ বিষয়াঃ"। পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা যে ছয় প্রকার বিষয়ের উপভোগ হয় তাহারাই এখানে প্রতিপাদিত হইয়াছে। পৌরাণিক উপাখ্যানের দ্বারাও এই তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়।

সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার মন হইতে মরীচি ঋষির জন্ম হয়। মরীচির ছয় পুত্র, ব্রহ্মার অভিশাপে দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়। মনেই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও অহঙ্কারের বসতি; মানুষ যতক্ষণ এই ছয়ের দ্বারা বদ্ধ, ততক্ষণ অনন্তের আভাস পায় না। এই ছয় বিনষ্ট হইলে অনন্তের বা বলরামের জন্ম হয়, তখন মানব যাহা কিছু ক্ষয়শীল, তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া ভূমা ও নিত্য যে বস্তু, তাহার জন্য আকুল হইয়া উঠে। এই আকুলতার পরে আনন্দব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার আবির্ভাব ও নিত্য-লীলার প্রাকট্য। সুতরাং, বেদবাদী ব্রাহ্মণগণের পক্ষে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা বুঝিতে পারা সম্ভব নহে। ব্রাহ্মণেরা ক্ষুদ্রাশা—"নাল্পে সুখমস্তি" যাহা অল্প তাহাতে সুখ নাই, "ভূমৈব সুখম্" ভূমাই সুখ—এই তত্ত্ব তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহাদের আশা ক্ষুদ্র, কিন্তু কর্ম্মের আড়ম্বর দেখিলে মনে হয়, না জানি কত বড় ব্যাপার লইয়াই তাঁহারা রহিয়াছেন। বাহিরে বিরাট সমারোহ—তাই ভাগবত বলিলেন—"ভূরিকর্ম্মা", সুতরাং তাঁহারা মূর্খ। কিন্তু মূর্খ হওয়ায় দোষ নাই, মূর্খ যদি নিজকে মূর্খ জানিয়া বিনয়ী ও শ্রদ্ধাবান্ হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ভাগ্যবান্। কিন্তু এই ব্রাহ্মণেরা "বালিশ" বা মূর্খ হইলেও, নিজেদের অত্যন্ত বিজ্ঞ বলিয়া বিবেচনা করেন। তাই ভাগবত বলিলেন—"বৃদ্ধমানিনঃ" অর্থাৎ মূর্খ, কিন্তু বিবেচনা করে তাহারা পণ্ডিত। এই প্রকারের কর্ম্মের আড়ম্বর-যুক্ত অভিমানী লোক নিকটবর্ত্তী সত্যকে উপেক্ষা করিয়া সুদূরবর্ত্তী কল্পনার উপাসনা করিয়া থাকে। স্বর্গ বহুদূরে, অপ্রত্যক্ষের মধ্যে তাহার পারমার্থিক সত্যতা নাই, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা সেই সুদূরবর্ত্তী অপ্রত্যক্ষের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছেন, আর এদিকে প্রত্যক্ষের মধ্যে তাঁহাদের চারিদিকে নিত্য বৃন্দাবন প্রকট হইয়াছে—প্রেমের হাটে "নীলকান্তমণি" বিকাইয়া যাইতেছে, সেখানে জড়-চেতনের দ্বন্দ্ব মিটিয়া গিয়াছে; ভূমি সেখানে চিন্তামণি, জল অমৃত,

সেখানে প্রিয়সখী,—কিন্তু ব্রাহ্মণেরা এত কাছের জিনিষকে চিনিতে ও আদর করিতে পারিলেন না!

ব্রাহ্মণগণের নিকট উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইয়া বালকেরা কৃষ্ণ বলরামের নিকট ফিরিয়া গেলেন ও সকল কথা জানাইলেন। কৃষ্ণ ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি বালকগণকে বলিলেন,—"তোমরা এক কাজ কর, এইবার যজ্ঞশালায় না গিয়া রন্ধনশালায় যাও, ব্রাহ্মণগণের নিকট না গিয়া ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের নিকটে যাও, সদর দ্বার যখন রুদ্ধ, তখন নিরাশ হইও না, একবার খিড়কির দিকে যাও।" বালকেরা প্রথমে এই প্রস্তাবে বড় সম্মত ছিল না। কারণ ব্রাহ্মণদিগের ব্যবহার দেখিয়া তাহারা দুঃখিত হইয়াছে, কাজেই মনে হইল ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের ব্যবহার আরও তীব্র হইতে পারে। যাহা হউক, কৃষ্ণের কথা না মানিয়া উপায় নাই। কাজেই বালকেরা দ্বিজপত্নীগণের নিকট চলিল। ব্রাহ্মণগণের কথা বলা হইয়াছে, এইবার ব্রাহ্মণীগণের কথা বলিতেছি। যজ্ঞশালা ও রন্ধনশালা এই দুয়ের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। যজ্ঞশালায় যাঁহারা আছেন, তাঁহাদেরও রন্ধনশালা প্রয়োজন, কিন্তু সে কথা তাঁহাদের সকল সময়ে মনে থাকে না। যজ্ঞশালায় যাঁহাদের সেবা হয়, তাঁহারা দূরের জিনিষ ও অপ্রত্যক্ষ; মন্ত্র, শৌচ, সদাচার, দ্বিজাতি সংস্কার প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাদের সেবা হয়। এ অতি উত্তম কথা; কিন্তু রন্ধনশালার কথা স্বতন্ত্র। যজ্ঞশালার লোকেরা রন্ধনশালার লোকেদের খবর রাখে না সত্য, কিন্তু রন্ধনশালার লোকেরা যজ্ঞশালার খবর রাখে। রন্ধনশালার কারবার প্রত্যক্ষ বা নিকটের সহিতই বেশী, তবে অপ্রত্যক্ষকে উপেক্ষা করে না। এখানে মন্ত্র, সদাচার, শৌচ, সংস্কার প্রভৃতির বাড়াবাড়ি না থাকিলেও, এখানে প্রেমের খেলা, ত্যাগের খেলা ও সেবার খেলা সর্ব্বদাই চলিতেছে। সুদূরের স্বর্গের আশায় ইহারা নিকটের ও চারিদিকের যে বর্ণ, গন্ধ, গান ও স্নেহ, প্রেম ভালবাসা, তাহার কখনই অমর্য্যাদা করে না। কাজেই আজ যে লীলা হইতেছে, তাহারও সংবাদ তাহারা কিছু কিছু রাখে! কোন্ সুদূর অতীতের লীলার স্মৃতিমাত্র নহে, কোন্ সুদূর ভবিষ্যের লীলার আশামাত্র নহে, আজ এই বর্ত্তমানের, এই চারিদিকের লীলা কি, ব্রাহ্মণেরা তাহা জানেন না, কারণ তাঁহারা কেবল গ্রন্থ-বেদ লইয়া মোহিতবুদ্ধি হইয়াছেন, গ্রন্থ-বেদকে জীবনবেদে প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণীরা রন্ধনশালায় আছেন; আজিকার উষার হাসি, আজিকার মলয় বাতাস, আজিকার সন্ধ্যা-

গগন, আজিকার বনের পাখী কি কথা বলিতেছে, আজিকার নরনারী, বিশেষ করিয়া কিশোর কিশোরী কি কথা বলিতেছে, কি স্বপ্ন দেখিতেছে, কি খেলা খেলিতেছে, তাঁহারা তাহার কিছু কিছু খবর রাখেন। কেবল রাজ-সভার বড় বড় কথা নহে, কেবল ব্রাহ্মণের যজ্ঞশালার পাণ্ডিত্যের কথা নহে, গোপপল্লীর ও নদীতীরের গোপগোপীর সরল প্রাণের বিমল কথা, ব্রাহ্মণীরা কিছু কিছু শুনিতে পান। কেবল সমাধি ধ্যানের উচ্চ কথা নহে, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যের সহজ রসকথা তীব্রকর্ম্মী ব্রাহ্মণদের যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিতে না পারিলেও, ব্রাহ্মণীদের রন্ধনশালায় তাহার প্রবেশপথ রুদ্ধ হয় নাই। আজ ব্রহ্মণ্যদেব গোচারণের মাঠে, রাখালবালকের সঙ্গে গোচারণ করিতেছেন, তোমরা কি কুলাভিমান, শৌচ ও সদাচারের দোহাই দিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিবে? ব্রাহ্মণেরা উপেক্ষা করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণীরা স্বীকার করিলেন। অবস্থাটা দাঁড়াইল এইরূপ। ব্রাহ্মণীরা কৃষ্ণকথা শুনিয়াছেন। বৃন্দাবনে কৃষ্ণকথা সকলের প্রাণের কথা হইয়া পড়িয়াছে, যাহারা কাণ খুলিয়া থাকে, এবং সকল কথা শুনিতে যাহাদের আপত্তি নাই, তাহারা শুনিবে না কেন? ব্রাহ্মণীরা শুনিয়াছেন। কৃষ্ণকথার আজ বাহিরে অভিনয়মাত্র হইতেছে, কিন্তু ভিতরে, প্রত্যেক জীবের অন্তরের অন্তরে ইহার নিত্য-লীলা—সুতরাং ব্রাহ্মণীরা, শুনিয়াছেন, দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই বটে, কিন্তু শুনিয়াই আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। সকল সময়েই আলোচনা, সকল সময়েই ধ্যান। আজ সকাল হইতে কি যেন এক আনন্দের অমৃতরস হৃদয়ে রহিয়া যাইতেছে। কে যেন হৃদয়ের ভিতর হইতে বলিতেছে,—

"ওগো সাবধান, আজ সে আসিবে,
সেই চির-প্রত্যাশিত, প্রাণের দেবতা তোর,
আসিবে গো আজ আসিবে—"

মনে হইতেছে, অতি যত্ন করিয়া অদ্য যে চতুর্ব্বিধ অন্ন প্রস্তুত করিতেছি, এই অন্ন আজ তাঁহারই ভোগে লাগিবে। রন্ধনশালায় কাজ করিতেছেন, আর শতবার পথের পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছেন, ঐ বুঝি সে আসিতেছে! এমন সময়ে একদল রাখাল বালক সসম্ভ্রমে আসিয়া উপস্থিত। বেশী কিছু বলিতে হইল না, ব্রাহ্মণীগণ অন্ন লইয়া যমুনা-পুলিনে চলিয়া গেলেন; ব্রাহ্মণেরা বাধা দিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না।

আসিলেন। ব্রাহ্মণগণেরও পরিবর্ত্তন হইল। গার্হস্থ্য জীবনের একটী সুবিধা, পতি, পত্নীর পুণ্যের কিছু অংশ পাইয়া থাকেন। স্ত্রীলোকেরা যখন চলিয়া গেলেন, তখন ব্রাহ্মণদের মধ্যে এক নূতন প্রকারের চিন্তার উদয় হইল। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন— 'এই সকল স্ত্রীলোকের দ্বিজাতি-সংস্কার নাই, ইহারা দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার জন্য গুরুগৃহে বসতিও করেন নাই, ইহাদের শৌচ নাই, আচার নাই, আত্মমীমাংসা নাই। অথচ ইহারা যাহা পাইল, আমরা তাহা পাইলাম না। আমাদের কুলে ধিক্ আমাদের ক্রিয়াদক্ষতায় ধিক্, আমাদের ত্রিবিধ দীক্ষায় ধিক্! কারণ আমরা অধোক্ষজে বিমুখ হইলাম।"

ইহার পর ব্রাহ্মণেরা শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব কিছু কিছু বুঝিলেন, আজ যে গোচারণের মাঠে, প্রেমের হাট বসিয়াছে, গোলকের নিত্যবস্তু যে আজি এই নদীতীরে কুসুমিত কুঞ্জে কিন্তু প্রকট হইয়াছেন, ইহা তাঁহারা বুঝিলেন, বুঝিয়াও কিছু হইল না। কেন হইল না, তাহার কারণ শ্রীমদ্ভাগবত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার কারণ 'ভয়'—কংসের ভয়। গীতায় দৈব-সম্পদ্ বর্ণনা করিবার সময় প্রথমেই বলিয়াছেন—'অভয়'। বেদ বলিয়াছেন —"অভীঃ"। যে ভীরু তাহার আবার সাধন কি? তাহার আবার পরমার্থ কি? ভিতরে বুঝিলাম, কিন্তু বাহিরে স্বীকার করিতে পারিলাম না। ভিতর বাহিরের দ্বন্দ্ব মিটিল না। সুতরাং উপায় নাই। ব্রাহ্মণেরা বিষয়ী লোক, অনেক দিনের বদ্ধ সংস্কার, তাই পত্নীগণের পুণ্য ফলে বুঝিয়াও বুঝিলেন না। সুতরাং, এই বেদবাদও এক নিত্য অন্তরায়। হে প্রেমময়! তুমি আমাদের জাতি, কুল, বিদ্যা, ধন, নিপুণতা প্রভৃতির অহঙ্কার হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর। হে কৃষ্ণ, প্রত্যক্ষের মধ্যে কোন্ পথে তুমি আসিতেছ, তাহা বুঝাইয়া দাও, আজ কাহাদের মধ্যে তুমি লীলা করিতেছ তাহা বুঝাইয়া সেই লীলাস্থলীতে আমাদিগকে লইয়া চল। আজ আবার ভারতবর্ষে এক প্রেমের যুগ আসিয়াছে। সুদীর্ঘকাল যাহারা পল্লীভবনে অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়াছিল, আজ তাহারা নিত্য-সখার বংশী শুনিয়া নবজীবনে মাতিয়া উঠিয়াছে। আজ তাহারা প্রেমমন্ত্রে পাগল হইয়াছে। আজ রাজার সিংহাসন কাঁপিতেছে, ব্রাহ্মণের যজ্ঞশালা কাঁপিতেছে—আজ কংসের পথে মৃত্যু, বেদবাদের পথে দারুণ ক্ষতি—আজ ব্রাহ্মণীদের পথ ধরিয়া, লীলাময়ের আহ্বান শুনিয়া চলুন, আমরা পুলিন-ভোজনের সামগ্রী লইয়া অগ্রসর হই। নির্ভয়ে চলিতে হইবে—ইহাই নিত্য লীলার বার্ত্তা।

৮। দেবতা

দেবতারা সত্য, দেবপূজায় লাভ আছে। দেব-শক্তির আনুকূল্য লাভ করিতে পারিলে মানুষের ইহলোকে ও পরলোকে সুবিধা হয়। যাঁহারা ইহলোকে ও পরলোকে সুবিধা চাহেন, যাঁহাদের লাভের প্রত্যাশা আছে, তাঁহারা অবশ্যই দেবপূজা করিবেন। কোন্ দেবতার পূজা করিলে কি পাওয়া যায়, শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে তাহার তালিকা আছে। যিনি ব্রহ্মতেজ চাহেন, তিনি বেদপতি ব্রহ্মার পূজা করিবেন। ইন্দ্রিয় সমূহের শক্তি বৃদ্ধির জন্য ইন্দ্রের পূজা করা আবশ্যক। যিনি পুত্র-পৌত্র কামনা করেন, তিনি প্রজাপতিগণের পূজা করিবেন। লক্ষ্মীকাম মায়াদেবীর, তেজস্কাম সূর্য্যের, সম্পত্তিকামী বসুগণের, বীর্য্যকাম রুদ্রগণের, অন্নকাম অদিতির, স্বর্গকাম আদিত্যগণের, রাজ্যকাম বিশ্বদেবগণের, প্রজাগণের হিতকামী সাধ্যদেবগণের, আয়ুস্কাম অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের, পুষ্টিকাম ইলাদেবীর, প্রতিষ্ঠাকাম ব্যক্তি লোকমাতা রোদসীদেবীর, রূপকাম গন্ধর্ব্বগণের, স্ত্রীকাম উর্ব্বশীর, আধিপত্য-কাম পরমেষ্ঠীর, যশস্কাম যজ্ঞদেবের, কোষকাম প্রচেতার, বিদ্যাকাম গিরিশের, দাম্পত্যকাম উমাদেবীর, ধর্ম্মকাম উত্তমশ্লোকের, বংশবৃদ্ধিকাম পিতৃগণের, রক্ষাকাম পুণ্যজনগণের ওজস্কাম মরুদ্গণের, রাজ্যকাম মনুদেবগণের, অভিচারকাম নির্ঋতিদেবের এবং কামকাম ব্যক্তি সোমদেবের পূজা করিয়া থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজার ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র আছে, ক্রিয়া আছে ও কাল আছে। দেবতত্ত্ববিৎ ঋষিগণ অন্তর্জ্জগতের এই রহস্য জানিতেন। তাঁহাদের উপদেশানুসারে অনেকেই দেবশক্তির উদ্বোধন করিয়াছেন এবং অভীষ্টলাভও করিয়াছেন।

দেবতা সত্য, দেবপূজায় লাভ আছে। দেবশক্তির আনুকূল্য লাভ করিতে পারিলে, ইহলোকে ও পরলোকে অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু মানবজীবনে দেবপূজা করিয়া লাভবান্ হওয়াই শেষ কথা নহে। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত দেবপূজার তালিকা প্রস্তুত করিয়া উপসংহারে বলিলেন,—"যিনি অকাম, তিনি পরমপুরুষের পূজা করেন।" কেবল অকাম নহে—

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।

অর্থাৎ যাঁহার বুদ্ধি উদার, যিনি অকাম, সর্ব্বকাম বা মোক্ষকাম, তিনি তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা পরম পুরুষের যজন করেন। অকাম, সর্ব্বকাম ও মোক্ষকাম, একই কথা।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই অংশটি এখনকার দিনে বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া দরকার। এক ঈশ্বরের উপাসনা বা পরমপুরুষের যজন, মানবমাত্রেরই আদর্শ বা চরম লক্ষ্য। কিন্তু সেই এক ঈশ্বরের উপাসনা করিবার অধিকারী কে? ভাগবত বলিলেন, —অকাম, সর্ব্বকাম ও মোক্ষকাম ব্যক্তিই এই উপাসনার অধিকারী।

বর্ত্তমান পৃথিবীতে একেশ্বরবাদ নামক যে মত, দেববাদ ও দেবপূজা ধ্বংস করিবার জন্য গর্জ্জন করিতেছে, তাহা একটি ব্যর্থ চেষ্টামাত্র। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা যতদিন থাকিবে, ধর্ম্মের মুখোস্ পরিয়া পাঁচটা জাতি আর একটা জাতিকে ধ্বংস করিয়া তাহার রাজ্য ভাগ করিয়া খাইবার জন্য যতদিন শকুনি-গৃধিনীর মত কলরব করিবে, ততদিন বুঝিতে হইবে যে এই কামকাম জগতে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা হইতে এখনও বিলম্ব আছে। দেবপূজাই সকাম মানুষের স্বাভাবিক অধিকার। ক্রমে ক্রমে ভগবানের কৃপায় মানুষ এই সীমা অতিক্রম করে। তখন সে বুঝিতে পারে, যে চায় সে পায় না, যে চায় না সেই পায়। যে লাভ করে সে হারায়, যে হারায় সেই লাভ করে। মানুষ যখন এই অবস্থা লাভ করে, তখন সে কামের আঁধার রাজ্য ছাড়িয়া প্রেমের সূর্য্যালোকের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। বৃন্দাবনে এই প্রেম প্রকট হইয়াছিল, সুতরাং এখানে দেবশক্তির সহিত সংগ্রাম অনিবার্য্য এবং এই সংগ্রামে দেবশক্তির পরাজয়ও অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল।

দেবতাদের তত্ত্ব একটু ভাল করিয়াই বলি। তাঁহারা মহৎ ও বলবান, সুতরাং তাঁহাদের চরণে প্রণাম। কিন্তু আমাদের বৃন্দাবন প্রতিষ্ঠায় তাঁহারা যে কিরূপ বিঘ্ন উৎপাদন করেন, তাহা আমাদের প্রত্যেকেরই খুব ভাল করিয়া আলোচনা করা দরকার। দেবতারা প্রজাবৎসল জমিদারের মত। প্রজা যতদিন প্রজা হইয়া থাকে, ততদিন তিনি প্রজার হিতসাধন করেন। কিন্তু প্রজা যদি জমিদারের জমিদারী বা রাজ্য ছাড়িয়া স্বাধীনভাবে সহরে বাস করিতে চায়, তাহা হইলে জমিদার তাহা সহ্য করিতে পারেন না। কারণ সমুদয় প্রজাই যদি এই প্রকারে চলিয়া যায়, তাহা হইলে জমিদারের জমিদারীই

লোক জমিদার হইয়াছে, এখন যদি তাঁহার প্রজাগুলি একে একে সকলেই গ্রাম ছাড়িয়া জমিতে ইস্তফা দিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে জমিদারের কি দশা হয়? তাঁহার জমিদারীই যে থাকে না! কাজেই এরূপ অবস্থায় তিনি ছলে বলে কৌশলে বাধা না দিয়াই পারেন না। ইহাতে জমিদারের দোষ নাই, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক। দেবতারা মানুষের জমিদার। ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক এই ত্রিলোকে তাঁহাদের শাসন। তাঁহারা মানুষকে বলেন ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের উপাসনা কর। তাঁহাদের নিকট ধর্ম্মের অর্থ—যজ্ঞদ্বারা দেবপূজা। সকল লোকের যিনি কর্ত্তা, তিনিই পরমপুরুষ। মানুষ যদি তাঁহার কাছে যাইতে চাহে, তাহা হইলে দেবতাদের সাহায্য লইয়া যাউক। দেবতারা বলেন—কোটির মধ্যে এক-আধ জন মানুষ পরমপুরুষের কাছে যাইবে। কে যাইবে, আমরা দেবতা, আমরাই তাহার বিচার করিব। যদি কেহ আপত্তি করেন, তাহা হইলে দেবতারা বলিবেন—আমরা যে ব্যবস্থা করিয়াছি, তাহা কেবলমাত্র তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য। দেবতারা নিজেদের নির্দ্দোষ, নির্ম্মল ও পরার্থপর বলিয়া ঘোষণা করেন; যাঁহারা দেবতাদের অনুগৃহীত তাঁহারাও তাহাই বলেন। কিন্তু সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, বৃন্দাবনে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

ত্রিলোকের সীমার মধ্যে, ত্রিবর্গের উপাসনা লইয়া দেবতার পূজা করিলে মানুষ বেশ সুখে থাকিতে পারে। কিন্তু অনেককে সুখে থাকিতে ভূতে কিল মারে। সে অবস্থায় এক নবজাগরণে জাগ্রত হইয়া মানুষ পরমপুরুষের অন্বেষণ করে। সেই সময় মানুষ মোক্ষ বা পরাভক্তি বা প্রেম অন্বেষণ করে। দেবতারা আসিয়া সে সময়ে প্রলোভন দেখান, তাহাতে ফল না হইলে ভয় দেখান, তাহাতেও যদি কিছু না হয়, তাহা হইলে দারুণ অত্যাচার আরম্ভ করেন। দেবতার ভয়ে, প্রলোভনে ও ছলনায় অনেক মোক্ষার্থী পদস্খলিত হইয়াছেন, পুরাণে তাহার বর্ণনা আছে। দেবতারা বলেন না যে পরমপুরুষের কাছে যাইও না। সে কথা বলিবার তাঁহাদের সাহস ও শক্তি নাই। তাঁহারা বলেন—পরমপুরুষের কাছে যাও, কিন্তু আমাদের সাহায্যে ধীরে ধীরে চল। অসহিষ্ণু বলে, আমার প্রাণ কাঁদিয়াছে, আমি ধীরে ধীরে চলিতে পারিব না। দেবতাদের সহিত বিরোধের ইহাই হেতু।

হয় না। কথাটা সত্য। কারণ বাধা না থাকিলে শক্তির বিকাশ হয় না। অতএব বাধাকে ভয় করিবার প্রয়োজন নাই। চলুন আমরা বৃন্দাবনে যাই, দেখি সেখানে দেবতারা কি প্রকারের বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন।

৯। ব্রহ্মা

বৃন্দাবনে দেবতাদের মধ্যে প্রথম বাধা—ব্রহ্মা। তাহার পর ইন্দ্র, তাহার পর অগ্নি ও বরুণ। সর্ব্বশেষ বাধা—মদন। পর পর এই বাধাগুলির প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইবে।

ভগবানের আবির্ভাব হইবে, ব্রহ্মা ইহা জানিতেন। অসুরভার-পীড়িতা পৃথিবীকে সঙ্গে লইয়া তিনি যখন ক্ষীরোদ সাগরে গিয়াছিলেন তখন সে কথা আকাশবাণীতে শুনিয়াছিলেন। ভগবান আসিয়া কোথায় আবির্ভূত হইয়াছেন এবং কি করিতেছেন, ইহা ব্রহ্মা জানিতেন না। শ্রীকৃষ্ণ যেদিন অঘাসুরকে বধ করেন, সেই দিন ব্রহ্মা হঠাৎ এই ব্রহ্মগোপালের লীলা দেখিলেন। তাহার পর পুলিন ভোজন দেখিলেন। রাখালগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ একত্র বসিয়া খাইতেছেন, ইহা ব্রহ্মাকে তেমন ভাল লাগিল না। ব্রহ্মা বিধি—তিনি কতকগুলি নিয়ম লইয়া চিরদিন বসিয়া আছেন, তিনি যাহা কিছু দেখেন, এই নিয়মের সহিত মিল করিয়া দেখেন। রাখালের সহিত একত্র ভোজন দেখিয়া ব্রহ্মার সন্দেহ হইল। তাঁহার নিয়মের সহিত এই কার্য্যটি মিলিল না। তিনি পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ রাখালগণের মণ্ডলীতে বসিয়া ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে একটি বাছুর নিকটে দাঁড়াইয়া ঘাস খাইতে খাইতে হঠাৎ দূরে চলিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ সহচরগণকে ব্যস্ত হইতে নিষেধ করিয়া নিজেই বাছুরটিকে অন্বেষণ করিতে যেমন দূরে গিয়াছেন, আর অমনি ব্রহ্মা সেই বালক ও বৎসগণকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া নিকটবর্ত্তী এক পর্ব্বতগুহায় তাহাদের লুকাইয়া রাখিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করিলে পর্ব্বতের গুহা হইতে রাখালগণকে ও বৎসগণকে বাহির করিয়া আনিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিলে ব্রহ্মার চৈতন্য হইত না। এই জন্য তিনি নিজের অঙ্গ হইতে ঠিক পূর্ব্বের মত একদল রাখাল ও বৎস বাহির করিলেন এবং তাহাদের লইয়া যথারীতি বৎসচারণ করিয়া সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিলেন। [illegible]

করিয়া ফিরিয়া আসিলেন ; আসিয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ রাখাল-বালক লইয়া পূর্ব্ববৎ বৎসচারণ করিতেছেন। প্রথমে ব্রহ্মা মনে করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ একটি বুজরুক, কোনরূপে সেই পর্ব্বতগুহার সন্ধান পাইয়া ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অপহৃত সেই বৎস ও রাখাল-বালকগণকে বাহির করিয়াছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা একবার পর্ব্বতের গুহার মধ্যে চাহিয়া দেখিলেন, দেখিলেন সেখানে বৎস ও বালকগণকে তিনি যেমন ভাবে রাখিয়াছিলেন, তাহারা ঠিক তেমনি অবস্থায় রহিয়াছে। আবার বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ ঠিক সেই প্রকারের বৎস ও বালকগণকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। এইবার ব্রহ্মা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন সহচরগণকে লইয়া বৎসচারণ করিতেছেন, এই অবস্থায় ব্রহ্মা পুনর্ব্বার যেমন শ্রীকৃষ্ণের সহচর ও বৎসগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, অমনি দেখিলেন—সকলেই ঘনশ্যাম, পীতকৌষেয়বসন, চতুর্ভুজ ও শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-শোভিত। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

"ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌষেয়বাসসঃ।
চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্রগদারাজীবপাণয়ঃ।
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো হারিণো বনমালিনঃ॥
শ্রীবৎসাঙ্গদদোরত্ন কম্বু-কঙ্কণ-পাণয়ঃ।
নূপুরৈঃ কটকৈর্ভাতাঃ কটি সূত্রাঙ্গুলীয়কৈঃ॥"

কেবলমাত্র যে এই নারায়ণ মূর্ত্তি দেখিলেন, তাহাই নহে—সমুদয় তত্ত্বও দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মার জ্ঞান হইল। তখন বৃন্দাবনের প্রতি চাহিলেন, বৃন্দাবন কি, প্রেম কি, তাহা বুঝিলেন। তাহার পর গোপবেশ বেণুকর মূর্ত্তিধারী শ্রীকৃষ্ণের যে নর-লীলা তাহা ব্রহ্মা বুঝিতে পারিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন। ব্রহ্মার স্তব শ্রীমদ্ভাগবতের এক অদ্ভুত সামগ্রী, কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মার ভ্রান্তিই বা কি, এবং কি প্রকারে এই ভ্রান্তি নিরস্ত হইল, তাহাই বলিতেছি।

ব্রহ্মা নিজেই বলিয়াছেন, তিনি "রজোভুব" অর্থাৎ রজঃগুণ হইতে তাঁহার উৎপত্তি এবং এই কারণে তিনি নিজেকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন—"পৃথগীশ-

ব্যবহারিক। এই কথা সকলেই ভুলিয়া যায়। সমাজে উচ্চ নীচ রহিয়াছে, যে উচ্চ সে যদি বিবেচনা করে যে আমি আপনা হইতেই উচ্চ অর্থাৎ আমার এই উচ্চতা "স্বতন্ত্র," যাহারা নীচ তাহাদিগকে নীচে ফেলিয়া রাখাই আমার ধর্ম্ম, তাহা হইলে চৈতন্যময়ের যে খেলা বা নিত্যলীলা তাহা রুদ্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু এই লীলাস্রোত রুদ্ধ হইবার নহে, সুতরাং যে উচ্চ বলিয়া অভিমান করে, তাহাকে অধঃপতিত ও চূর্ণ হইতে হইবে। তবে তাহার যদি জ্ঞান হয়, তাহা হইলে সে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে। একজন উচ্চ হইয়াছে, অধিকার ও সুবিধা পাইয়াছে; কিন্তু উচ্চ হওয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকার জন্য নহে, অধিকার ও সুবিধাভোগ করিয়া স্ফীত হইবার জন্য নহে। তবে কি জন্য? সেবা করিয়া আনন্দময়ের নিত্যলীলার সহায়তা করিবার জন্য। কিন্তু আমরা যে অন্ধ হইয়া যাই, প্রকৃতির রজোগুণ আর তমোগুণ আসিয়া আমাদের দৃষ্টিশক্তি অপহরণ করিয়া লয়। তখন মনে হয় আমি একটি পৃথক্ সত্তা। শাস্ত্র যাহাকে ধর্ম্মের গ্লানি বলিয়াছেন, এইরূপ অবস্থাতেই জগতে সেই ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হয়। ধর্ম্মগ্লানির জন্য যে কেবল কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ বা দুর্য্যোধনই দায়ী তাহা নহে; তবে কি জানেন, ইহারা ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু অনেক কংস, শিশুপাল ডুব দিয়া জল খায়, তাহারা চতুর, ধরা পড়ে না। সৃষ্টিতে ধর্ম্মগ্লানি যখন হয়, তখন সেই দোষ প্রায় সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। সৃষ্ট পদার্থের যাহা সমষ্টিগত দোষ, তাহা ব্রহ্মারই দোষ। পৃথিবীর পক্ষ হইয়া ব্রহ্মা পরম-পুরুষকে ডাকিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট জানাইয়াছিলেন কংস প্রভৃতি অসুরেরা ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া দারুণ দ্রোহ উৎপাদন করিয়াছে। পরমপুরুষ আসিলেন, কংস, শিশুপাল প্রভৃতিকে তিনি পরে বধ করিবেন, প্রথমে বিচার করিলেন স্বয়ং ব্রহ্মার। কেবল বাহিরের কুকুর তাড়াইয়া শুচিতা রক্ষার জন্য চেষ্টার সীমা নাই, কিন্তু ঘরের ভিতরে যে অশুচির আবর্জ্জনাস্তূপ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি নাই। কংস অন্যায় ও অত্যাচার করে, আমরা নিরীহ সাধুলোক তাহাকে গালাগালি করি, আর যখন নিরুপায় হইয়া পড়ি, তখন গলায় কাপড় দিয়া ভগবান্‌কে ডাকি আর বলি—"ঠাকুর রক্ষা কর, রক্ষা কর, এই পাপ বিনাশ কর।" মানুষ চিরদিন এমনি করিয়া ভগবান্‌কে ডাকিতেছে, আর দেবাসুরের যুদ্ধের সময় ভগবান্‌কে দিয়া অসুর শক্তি বিনাশ করাইয়া লইতেছে।

জন্মাইত না, যদি তোমার নিজের ভিতরে কংস জন্মের সম্ভাবনা না থাকিত। অত্যাচারী অত্যাচার করে কেন, জানেন? যাহারা অত্যাচারিত তাহারা ক্রীতদাস বলিয়া। ক্রীত-দাসের স্বভাব কি জানেন? প্রবলের নিকট সে গোলাম, আর দুর্ব্বলের নিকট সেও একজন অত্যাচারী। অমৃতের পুত্র মানব অন্তর্মুখীন হইয়া চিন্তা করিলে ইহা বুঝিতে পারে।

"কারো দোষ নয় গো মা।
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা॥"

ব্রহ্মার অধীনে একটা ব্যবস্থা জন্মাইয়াছে, ব্রহ্মা সেই ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হইয়াছেন, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব, সেই ব্যবস্থায় বেশ নিরাপদ ও নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিয়াছে। ব্রহ্মা চাহেন পরমপুরুষ আসিবেন, ব্রহ্মার যাহারা শত্রু তিনি তাহাদের বিনাশ করিবেন; কিন্তু ব্রহ্মার এই ব্যবস্থা যেমন আছে, ঠিক তাহাই থাকিবে। ইহার পূর্ব্বে পরমপুরুষ আসিয়া অংশে অবতীর্ণ হইয়া অনেকটা এই ভাবেই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তপস্বী শূদ্রের মস্তক ছেদন পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এতদিন যাহা হইয়াছে বা চলিয়াছে, চিরদিনই যে তাহা হইবে ও চলিবে, নিত্য-লীলাবাদী প্রেমিকগণ এমন কথা বলেন না। ব্রহ্মার সে নির্ম্মল দৃষ্টি আজ আর নাই, কেবল 'বেদবাদী' বলিয়া ব্রাহ্মণদের দোষ দিই কেন, স্বয়ং বেদপতি ব্রহ্মাই গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন।

বৃন্দাবন-লীলায় ব্রহ্মার সন্দেহ হইল কেন? ব্রহ্মা ভগবানের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটা ধারণা লইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা কি, তাহা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে ও অন্যান্য লীলাগ্রন্থ হইতে বেশ বুঝিতে পারি। ব্রহ্মা ভাবিলেন,—ভগবান যদি আসেন রাজর্ষিদের স্বর্ণ সিংহাসনে কিম্বা বৈদিক ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞবেদীর উপর তিনি গম্ভীরভাবে বসিবেন। যাহারা অত্যন্ত প্রাচীন, শাস্ত্রবিৎ, যোগসিদ্ধ ও ক্রিয়াদক্ষ, তাহাদের সহিত তিনি গম্ভীরভাবে বড় বড় কথা বলিবেন। বালক, স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র, গ্রামের লোক, রাখাল বালক, ইহারা তাহার ত্রিসীমানায় আসিতে পারিবে না। ভগবান্ দিনরাত্রি বড় বড় অলৌকিক কার্য্যের অভিনয় করিবেন, ব্রহ্মার মনে ভগবদাবির্ভাব সম্বন্ধে এই প্রকারের

ছাড়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ যখন অঘাসুর বধ করিলেন, তখন একটি বড় রকমের অলৌকিক ব্যাপার হইয়া গেল—ইহা দেখিয়া ব্রহ্মার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, ভগবান্ যাহা করিবেন সকলই অলৌকিক হইবে। কিন্তু দেখিলেন, আজ বৃন্দাবনে অলৌকিক ব্যাপার ঘটিলেও, তাহার অলৌকিকতায় কেহ বিস্মিত বা স্তম্ভিত নহে। রাখালবালকগণের হৃদয়ের গঠনই এমনি যে, তাহারা অত্যন্ত অলৌকিক ব্যাপারকে নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপারের মত দেখে এবং তাহার অভিনয় হইলে স্তম্ভিত বা বিচলিত হয় না। তাহারা অর্থাৎ এই রাখালবালকেরা লৌকিক ব্যাপারেই মত্ত। তাহারা শিশু, সুতরাং তাহাদের ঘৃণা করা ব্রহ্মার পক্ষে স্বাভাবিক। তাহার পর, তাহারা বেদপাঠী ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণবালকও নহে। নিম্নশ্রেণীর বৈশ্যবালক, এখনকার দিনে দরিদ্র ও নিরক্ষর শূদ্র বালক বলিলেও হয়। সুতরাং ব্রহ্মার নিকট তাহারা অবজ্ঞার পাত্র। ব্রহ্মা তাহাদের ছোঁয়া জলই গ্রহণ করিতে পারেন না। আর কোন কোন লোক যাহাকে ভগবান্ বলিতেছে, তিনি তাহাদের সঙ্গে বসিয়া একপাতে খাইতেছেন! অসম্ভব! অসম্ভব! ব্রহ্মা ভাবিলেন,—নারদ যেমন মূর্খ, তাই ব্রহ্মলোকে গিয়া গল্প করে, গোচারণের মাঠে ভগবান্ আসিয়াছেন। তবে যে অঘাসুর বধ হইল! ব্রহ্মা ভাবিলেন—ইহা একটি মায়াবীর বুজরুকি।

আজ জগতে শিশুদের দিন প্রবর্ত্তিত হইল, আজ প্রেমের দুন্দুভি বাজিল, আজ বেদ-গোপ্য চরম সত্য প্রকটিত হইল, আজ রাখালবালকের সঙ্গে গোচারণের মাঠে শ্রীভগবান্ বন্ধুভাবে মিলিত হইলেন। অন্ধ জগৎ, যদি এই লীলার মর্ম্ম বুঝিতে পারে, তাহা হইলে চিরদিনের মত কংসের দৌরাত্ম্য শেষ হইবে। কিন্তু জগৎ কি এ লীলা বুঝিবে? জগতের কর্ত্তা ব্রহ্মা; সেই ব্রহ্মাকেই প্রথমেই বুঝাইয়া দেওয়া দরকার।

ব্রহ্মাকে শ্রীকৃষ্ণ কি বুঝাইলেন? ব্রহ্মা ঐশ্বর্য্যের উপাসক। তাই প্রথমে দেখাইলেন ঐশ্বর্য্য। নারায়ণ-মূর্ত্তি ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তি। ব্রহ্মা দেখিলেন, সকলেই নারায়ণ! প্রত্যেক রাখালবালক নারায়ণ, প্রত্যেক গোবৎস নারায়ণ। ব্রহ্মা কি এ কথা কখনও শোনেন নাই? "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ"! শুনিয়াছেন অনেকবার, টীকা-টিপ্পনী সহ প্রচারও করিয়াছেন অনেকবার! কিন্তু বুঝিতে পারেন নাই। তাই ভগবান্ বুঝাইলেন, এ ঐশ্বর্য্যের মূল্য নাই।

তাহার পর ব্রহ্মাকে একটি তত্ত্ব দেখাইলেন। ভাগবতের ভাষায় সে তত্ত্বটি এই।

"সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ।"

অর্থাৎ এই যে মূর্ত্তি ইহা রসের মূর্ত্তি—ইহা আনন্দ ও সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত স্বরূপ। এই তত্ত্ব ব্রহ্মা বুঝিলেন, তাহার পর বৃন্দাবনের ভিতরের কথা বুঝিলেন—

"যত্র নিসর্গদুর্বৈরাঃ সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ।"

নিসর্গ বা প্রকৃতি যাহাদের শত্রুভাবাপন্ন করিয়াছে, এমন যে সব জীব অর্থাৎ মৃগ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি, এখানে তাহাদের মধ্যেও প্রেম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এখানে তাহারাও বন্ধুর মত একত্রে মিলিত হইয়া সুখে বাস করিতেছে। এ যে বড় ভয়ঙ্কর কথা! অনেকে এখনও মনে করেন, ইহা অসম্ভব। আমাদের এক বন্ধু বলেন যে, মানুষ যদি ছাগমাংস ভোজন না করে তাহা হইলে ছাগলের সংখ্যা এত বাড়িয়া যাইবে যে পৃথিবীতে ছাগল ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না। ইহার একটা প্রতিধ্বনি পশ্চিমদেশ হইতে শুনিতে পাই। পূর্ব্বদেশের রঙ্গীন মানুষগুলি যদি সত্য সত্য মানুষ হইয়া উঠে, অর্থাৎ এখন যেমন সাদা মানুষের খোরাক হইয়া আছে, যদি তাহা না থাকে তাহা হইলে সাদা মানুষ বাঁচিবে কি করিয়া? তাহা হইলে রঙ্গীন মানুষে জগৎ যে ছাইয়া যাইবে! অতএব ধর্ম্মের নামে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নামে, আর বিশ্বহিতের নামে তাহাদের মানুষ হইতে দিও না, তাহাদের খাদ্য করিয়া রাখ।

কাজেই বৃন্দাবনের কথা; বড়ই নূতন ধরণের কথা কিন্তু জগৎ জানিয়া রাখুক, ইহাই সত্য কথা। যাহা হউক ব্রহ্মা বৃন্দাবন বুঝিলেন, তাহার পর বুঝিলেন নরলীলা।

"তত্রোদ্বহৎ পশুপবংশ শিশুত্ব নাট্যং।
ব্রহ্মাদ্বয়ং পরমনন্তমগাধবোধম্॥"

এই অবস্থায় ব্রহ্মা সজল নয়নে কৃষ্ণের চরণমূলে লুণ্ঠিত হইয়া স্তবস্তুতি পাঠ করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ব্রহ্মার স্তব বর্ণিত হইয়াছে। তাহার প্রধান কথা এই, ব্রহ্মা এতদিন ঐশ্বর্য্যের ও অলৌকিকের উপাসক ছিলেন, আজ কৃষ্ণের কৃপায় তিনি মাধুর্য্যের তত্ত্ব বুঝিলেন। তাই প্রথমেই প্রণাম করিয়া বলিলেন—"তোমার শরীর সজল-জলদবৎ-স্নিগ্ধশ্যামল। তোমার বসন বিদ্যুতের ন্যায় পীতবর্ণ। গুঞ্জরি

মালাধারী। কবল, বেত্র, বেণু, শৃঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা তোমার সৌন্দর্য্য উদ্রিক্ত হইতেছে। তোমার পাদপদ্মযুগল অত্যন্ত মৃদু, তুমি গোপরাজ নন্দের আত্মজ।" এই প্রথম শ্লোক টীকাকারগণ বিষদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিরীট, কুণ্ডল, কেয়ূর, বলয়, গদা, চক্র, প্রভৃতি নহে। গুঞ্জা, শিখিপাখা, বেত্র, বেণু এই সকলের মহিমা বুঝিয়া ব্রহ্মা প্রকৃতিস্থ হইলেন। বৃন্দাবনে শ্রীভগবানের এই যে প্রকাশ, ব্রহ্মা ইহাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। ভগবানের সহিত পরিচয় বা তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন বড়ই দুরূহ ব্যাপার ; কিন্তু এই দুরূহ ব্যাপার আজ সুলভ হইয়াছে। সুলভ হইয়াছে সত্য, কিন্তু এতদিন ব্রহ্মা তাহা বুঝিতে পারেন নাই, এখন শ্রীভগবানের কৃপায় তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। এই কারণে ব্রহ্মা বলিলেন—"তোমার মহিমা অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় হইলেও সংসার নিস্তার অসম্ভব নহে। যে সকল ব্যক্তি জ্ঞান বিষয়ে অত্যল্পও প্রয়াস না করিয়া স্বস্থানেই অবস্থিতি করতঃ সাধুজন কর্ত্তৃক নিত্য-প্রকটিত তদীয় বার্ত্তা নিরন্তর শ্রবণ করে, তুমি অন্যের দুষ্প্রাপ্য হইলেও, তাহারা তোমাকে অনায়াসে পাইতে পারে।"

১০। অগ্নি

এই গেল ব্রহ্মার পরাজয় কথা। তাহার পর দুই বার অগ্নির পরাজয়ের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়। কালিয়-দমনের পর শ্রান্ত-সুপ্ত বন্ধুগণকে শ্রীকৃষ্ণ দাবানল হইতে পরিত্রাণ করেন, দশম স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আর একবার মুঞ্জারণ্যে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ নিবারণ করেন। উনবিংশ অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। অগ্নির পরাজয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই।

১১। ইন্দ্রের পরাজয় ও গোবর্দ্ধন-ধারণ।

কেহ বলেন—দেবতার ভিতর ব্রহ্মাই প্রধান, তিনি বেদপতি। আবার কেহ বলেন—ইন্দ্রই প্রধান, তিনি স্বর্গের রাজা। বিচারে প্রয়োজন নাই, ব্রহ্মার পরাজয়ের কথা বলিয়াছি, এইবার ইন্দ্রের কথা বলিতেছি।

বৃন্দাবনের গোপগণ ইন্দ্রের পূজা করিতেন। কতকাল হইতে যে এই প্রথা

এবারেও উৎসবের আয়োজন হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহার পিতা নন্দ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিসের আয়োজন হইতেছে ?"

নন্দ বলিলেন—"ভগবান্ ইন্দ্রই পর্জন্য। মেঘসমূহ তাঁহার মূর্ত্তি। মেঘে বৃষ্টি হয়। সেই বৃষ্টিই জীবের জীবন-স্বরূপ। ইন্দ্রের কৃপায় জীবের ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সাধিত হয়। এই কারণে চিরদিনই আমাদের মধ্যে ইন্দ্রের পূজা প্রচলিত রহিয়াছে। কাম, লোভ, ভয় বা দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া এই যে অনুষ্ঠান অর্থাৎ ইন্দ্রের পূজা, ইহার অন্যথাচরণ করা উচিত নয়।"

নন্দের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে, অনেকগুলি প্রাথমিক কথার আলোচনা করা আবশ্যক। মানুষ পূজা করে, অনেকেরই পূজা করে। ভূত, প্রেত, পিশাচ, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির পূজা করে। মানুষ মানুষেরও পূজা করে। এই পূজা করার প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এবং এই পূজা করার প্রবৃত্তি হইতেই মানুষের যে ক্রমবিকাশ বা উন্নতি, তাহাও সাধিত হয়। সুতরাং মানুষকে পূজা করিতেই হইবে। যেখানে মহত্ত্ব ও বিভূতির প্রকাশ, মানুষ সেখানেই মস্তক নত করিবে। বৈষ্ণবধর্ম্মে এই পূজার ভাব বিশেষভাবে সুবিকশিত হইয়াছে, বৈষ্ণব নিজেকে নিত্য কৃষ্ণদাস বলিয়া থাকেন। অতিসুন্দর কথা।

কিন্তু আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে দাসত্ব বা দাস্য বলিতে সচরাচর যাহা দেখিতে পাই, তাহাই কি কৃষ্ণ-দাস্য ? বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে সচরাচর যেমন বড়লোকের পূজার প্রণালী দেখি, তাহাই কি দেবপূজার প্রণালী ? ইহার উত্তর—না,—একেবারেই না। গরিব ও অত্যাচারিত মানুষের নিজের উপরে আদৌ বিশ্বাস নাই। তাহার যে কোন শক্তি আছে ইহা সে জানে না, এবং ভয় ও লোভের তাড়নায় সে বাহিরের একজনের তোষামোদ করিয়া ও পদলেহন করিয়া নিজের সুবিধা করিয়া লইতে চায়। এই প্রকারের সেবা বা পূজা মনুষ্যত্বের অবমাননা। এই কথাটি সর্ব্বপ্রথমে জানিয়া রাখা দরকার। আমরা ধনবানের পূজা করি, কিছু পাইবার প্রত্যাশায়। সেই ধনী, হয়ত অত্যাচারী, পরপীড়ক ও দস্যুস্বভাবাপন্ন। হয়ত অস্বাভাবিক সামাজিক ব্যবস্থায় অন্য লোকের যাহা ন্যায্য বা ভগবদ্দত্ত অধিকার, সেই অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া

দরিদ্রের বুকের রক্ত জমাট করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে ; এসকল কথা আমরা জানি, অথচ সেই ধনবানের আমরা তোষামোদ করি ও গুণগান করি, কারণ তাঁহার অর্থ আছে।

এই প্রকারে যে ব্যক্তি প্রবল, তাহাকে দুশ্চরিত্র ও পরপীড়ক জানিয়াও তাহার আনুগত্য করি। কারণ, তাহার আনুগত্য না করিলে বিপদ ঘটিতে পারে। এই প্রকারের সেবা ও দাস্য জগতে চলিতেছে। এখন প্রশ্ন এই, এই প্রকারের পূজা কি দেবপূজা ? এই প্রকারের দাস্যই কি কৃষ্ণ-দাস্য ?

গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ দেখাইলেন যে, দেবপূজার প্রণালী ইহা নহে। যে আমার ভিতরের জিনিষ নহে, যে আমার অনাত্ম, কিছুতেই তাহার নিকট মাথা নোয়াইব না। কোন লোভে বা কোন বিপদের আশঙ্কায় মানুষ তাহার মনুষ্যত্বের অবমাননা করিবেনা, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। গীতা ও ভাগবতে, এই কথাই শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন।

অধ্যাত্মসাধনার বা ধর্ম্মজীবনের প্রথম কথা আত্ম-সংস্থা। ইংরাজীতে যাহাকে Self-determination বলে। ভগবদ্গীতার প্রারম্ভে অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগ বর্ণনায় এই আত্ম-সংস্থা বা Self-determination এর কথাই বলা হইয়াছে। মানুষ ! তুমি আত্মা, তুমি অজর, অমর ; তুমি নিত্য ও সর্ব্বগত। আজ তুমি প্রকৃতির ক্ষেত্রে পড়িয়া আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছ, কিন্তু নিরাশ হইও না, দুর্ব্বল হইও না, ভয় পাইও না। ভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রারম্ভে দৈবীসম্পদ্ বর্ণনায় প্রথম গুণটির নাম বলিলেন —"অভয়"। যে ভীরু, তাহার আবার ধর্ম্ম কি ? সুতরাং দেবতার উপর নির্ভর করিবে। কিন্তু এই যে দেবতা, ইহা বাহিরের প্রবল দেবতা নহে। এই দেবতা আমার ভিতরের জিনিষ My Own Ideal Self. কেবল দেবতা কেন, কৃষ্ণও যদি বাহিরের জিনিষ হইতেন তাহা হইলে মানুষ হইয়া, অমৃতের পুত্র হইয়া সে কৃষ্ণেরও আমরা পূজা করিতাম না ! তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন—

"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।"

সুতরাং কৃষ্ণ আমার আত্মার আত্মা।

"যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ"

প্রথমে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস কর, তাহার পর দেবতাকে আত্মবস্তু বলিয়া অনুভব করিয়া তাহার পূজা করিবে। অনাত্মের পূজা করিয়া, হে মানব! তুমি পতিত হইও না! শ্রীকৃষ্ণের ইহাই উপদেশ।

কি প্রকারে গোপগণকে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিলেন, এক্ষণে তাহাই আলোচ্য। নন্দ বলিলেন—"ইন্দ্রের কৃপায় জীবের ত্রিবর্গ সিদ্ধি।" ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ, কর্ম্মের কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন—

"কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে॥"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "বাবা, তুমি ইন্দ্রের কথা বলিতেছ, কিন্তু আমি দেখিতেছি, কর্ম্মের দ্বারাই জীবের জন্ম হয়, কর্ম্মের দ্বারাই বিলয় হয়। সুখ, দুঃখ, ভয়, মঙ্গল যাহা কিছু সমস্তই কর্ম্মের দ্বারা হইয়া থাকে।

"অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্যকর্ম্মণাম্।
কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি ন হ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ॥"

ঈশ্বর বলিয়া যদি কেহ পৃথক্‌ভাবে থাকেন, তাহা হইলে তিনি কর্ম্মের ফলদাতা। যিনি যেমন কর্ম্ম করেন, তাঁহার তদনুরূপ ফলবিধান করেন।

"স্বভাবতন্ত্রো হি জনঃ স্বভাব মনুবর্ত্ততে।"
"স্বভাবস্থমিদং সর্ব্বং সদেবাসুর মানুষম্।"

মানুষ স্বভাবতন্ত্র, স্বভাবের অনুবর্ত্তন করে। দেব, অসুর, মানুষ সকলেই স্বভাবস্থ।

"তস্মাৎ সংপূজয়েৎ কর্ম্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।"

অতএব স্বভাবস্থ হইয়া এবং স্বকর্ম্ম সাধন করিয়া কর্ম্মের পূজা করিবে।

এই যে উপদেশ অর্থাৎ স্বভাবস্থ ও স্বকর্ম্মকৃৎ হইবে, অধ্যাত্ম-সাধনার ইহাই প্রথম উপদেশ। স্বভাবস্থ হইলেই মানুষ বুঝিবে যে তাহার এই যে "স্ব", ইহার মধ্যেই সব আছে। দেবতাতো দূরের কথা, কৃষ্ণ বা ভগবান্‌, তিনিও এই "স্ব"-এর মধ্যে আছেন।

এই প্রকারের কর্ম্মের কথা বলিয়া কৃষ্ণ দেবতার কথা তুলিলেন ও বলিলেন—

"অঞ্জসা যেন বর্ত্তেত তদেবাস্য হি দৈবতম্।"

মানুষ যাহার দ্বারা সুখে অবস্থিত হয় তাহাই তাহার দেবতা। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের

সময়ে বুঝিতে পারে না, ইহা সত্য, কিন্তু প্রকৃতিকে যে ভিতর হইতে অন্বেষণ করিতেছি তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। স্বপ্রকৃতি নিরূপণ করিয়া স্বভাবস্থ হইতে হইবে। স্বভাবস্থ না হইলে কেহ স্বকর্মকৃৎ হইতে পারে না। আমার স্বপ্রকৃতিই আমার দেবতা, আমার যিনি অন্তরতম তিনিই আমার দেবতা। তাঁহারই পূজা করা আমার ধর্ম্ম। যদি তাহা না করি, অর্থাৎ যে দেবতা আমার ভিতরে নাই, যদি আমি সেই দেবতার পূজা করি, তাহা হইলে কি হইবে? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"তাহা হইলে অসতী স্ত্রীলোকের উপপতি সেবার ন্যায় তাহা গর্হিত ও পাপজনক হইবে।"

"আজীব্যৈকতরং ভাবং যস্ত্বন্যমুপজীবতি।
ন তস্মাবিন্দতে ক্ষেমং জারং নার্য্যসতী যথা॥"

শ্রীকৃষ্ণ গোপদিগকে ইন্দ্রের যজ্ঞ করিতে নিষেধ করিলেন ও বলিলেন, "আমরা বৈশ্য ও গোপ। আমরা পর্ব্বতের পাদদেশে বনভূমিতে বাস করি, গরু মহিষ লইয়া আমাদের কারবার। সুতরাং অপ্রত্যক্ষ ও সুদূরবর্ত্তী ইন্দ্রের পূজার পরিবর্ত্তে, ইন্দ্র পূজার দ্রব্যাদির দ্বারা গো, ব্রাহ্মণ ও পর্ব্বতের যজ্ঞ কর।"

এই উপদেশকে আমরা—'প্রত্যক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন'—এই আখ্যা দিতে পারি। ইংরাজীতে বলা যায় Return to the concrete. মানুষ ধর্ম্ম করিতে করিতে অনেক সময়েই বাক্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া কল্পনার রথে চড়িয়া প্রত্যক্ষকে ছাড়িয়া অপ্রত্যক্ষের মধ্যে হারাইয়া যায়। মানুষ মানুষ চেনে না, মানুষ প্রত্যক্ষের মহিমা বোঝে না, কেবল দেবতা দেবতা করিয়া অপ্রত্যক্ষের পশ্চাতে ধাবিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গোব্রাহ্মণের যজ্ঞ হইবে।" ব্রাহ্মণ প্রত্যক্ষ। ব্রাহ্মণ ভূদেব। আজ ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ আছে কিনা জানি না, কিন্তু ব্রাহ্মণ চাই, ব্রাহ্মণের পূজাও চাই।

ইন্দ্রের যজ্ঞ বন্ধ হইল, সুতরাং ইন্দ্র রুষ্ট হইলেন। দেবতার ক্রোধ পদে পদেই হইয়া থাকে। তাঁহারা মানুষকে তাঁহাদের খাদ্য করিয়া রাখিয়াছেন, মানুষ চিরকালই তাঁহাদের খাদ্য হইয়া থাকুক, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা। সুতরাং, মানুষের এই অহঙ্কার বা উপেক্ষা সহ্য করিতে পারিলেন না। ভগবান্ যে পূর্ণতমরূপে মানবের মধ্যে মানববেশে আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহাও ইন্দ্র বুঝিলেন না। কাজেই ইন্দ্র বলিলেন—"বনবাসী গোপ, তাহাদের এত অহঙ্কার! কৃষ্ণ একজন মানুষ, তাহাকে আশ্রয় করিয়া গোপগণ

ইন্দ্র তাঁহার মেঘদিগকে আহ্বান করিলেন, মেঘ-সমূহ প্রচণ্ড বিক্রমে ব্রজভূমি আক্রমণ করিলেন। বজ্রের গর্জ্জন, বিদ্যুদ্-বিকাশ আর ভয়ানক বৃষ্টি-বর্ষণ!

এইখানে একটি কথা চিন্তনীয়। বেদবাদী ব্রাহ্মণদের কথায় বলা হইয়াছে যে শেষে তাঁহারা কৃষ্ণকে চিনিলেন, কিন্তু কংসের ভয়ে কৃষ্ণকে স্বীকার করিতে পারিলেন না। কংস অবশ্য তখনও ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করেন নাই। কিন্তু পাছে কোনরূপ অত্যাচার হয় এই আশঙ্কায় তাঁহারা সাবধান হইয়া চলিলেন। এখন গোপগণের কি হইল, একবার দেখুন। গরু বাছুর লইয়া সংসার। অকস্মাৎ অসময়ে বৃষ্টি। বৃষ্টি বলিয়া বৃষ্টি নহে, ইন্দ্র, দেবরাজ ইন্দ্র, ব্রজভূমি ধ্বংস করিবার জন্য তাঁহার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। গোপগণের মধ্যে যদি অণুমাত্র দুর্ব্বলতা থাকিত, তাহা হইলে বিপৎপাত হইবামাত্র তাঁহারা ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইতেন ও ইন্দ্রকে বলিতেন—"কৃষ্ণ বালক, বালকের কথায় আমরা অন্যায় করিয়াছি। যাহা হউক আপনি দেবরাজ, দয়া করিয়া অপরাধ ক্ষমা করুন।" গোপগণ কিন্তু তাহা করিলেন না। তাঁহারা "গুঁতোর চোটে বাবা" বলিয়া নাকে কাণে খত দিলেন না। এই অতি ভীষণ বিপদের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চাহিয়া অবিচলভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমুদয় সহ্য করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ যদি তাঁহাদের বাহিরের বস্তু হইতেন, তাহা হইলে এ অবস্থায় কৃষ্ণকে ছাড়িতে পারিতেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাদের বাহিরের বস্তু নহেন, বাহিরে আজ লীলা প্রকট হইয়াছে, এইমাত্র। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাদের অন্তরের বস্তু, তাঁহাদের অন্তরতম বস্তু। জীবন ছাড়া যায়, কিন্তু কৃষ্ণকে ছাড়া যায় না।

এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ একহস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন, বালকে যেমন ছাতা ধরে ঠিক সেই প্রকারে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া ব্রজবাসীগণকে আহ্বান করিলেন ও বলিলেন—"তোমরা সকলে এই পর্ব্বতের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। বায়ু, বাতাস ও অনলে ভয় করিও না।"

এক সপ্তাহকাল তিনি এই প্রকারে পর্ব্বত ধারণ করিয়া রহিলেন। এখন ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব বুঝিলেন। কৃষ্ণকে মানুষ বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এখন সে জন্য অনুতপ্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া নিজের অপরাধ ক্ষমা করাইলেন।

সতীশচন্দ্র ও তাঁহার গান

সম্প্রতি এই অজ্ঞাত-পূর্ব্ব পল্লী-কবির কয়েকটি গান, 'বীরভূমি'-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে আর কোন মাসিক বা সপ্তাহিক পত্রিকায় ইঁহার কোন গান প্রকাশিত হয় নাই। বীরভূম-অঞ্চলে বৈষ্ণব বাবাজীদের মুখে মুখে ইঁহার অনেক গান গীত হয়। আমাদের অনুরোধ-বশতঃ সতীশচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত তারেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়, কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাঁহার রচিত কয়েকটি গান সংগৃহীত করিয়া পাঠাইয়াছেন। তজ্জন্ত আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। আশা করি, তিনি সতীশচন্দ্রের যতগুলি গান সংগৃহীত করিয়াছেন, সেগুলি সমস্তই ক্রমে ক্রমে 'বীরভূমি'-পত্রিকায় প্রকাশের জন্ম পাঠাইয়া সতীশচন্দ্রের নাম চিরস্মরণীয় করিবার পক্ষে সহায়তা করিতে বিরত হইবেন না।

কবি সতীশচন্দ্র, বীরভূম জেলার অন্তর্গত চহটা গ্রামে, ১২৭৬ সালে চৈত্র মাসে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিত্রালয় বোলপুরের সন্নিকট সুরুল গ্রাম। পিতা রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের দুই পুত্র। ইনি জ্যেষ্ঠ ছিলেন; কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত তারেশচন্দ্র এখন বর্ত্তমান আছেন। এই দুই ভ্রাতা পৈত্রিক ভবন ত্যাগ করিয়া মাতুলালয়ে বাস করেন। সতীশচন্দ্র ভালকুটি গ্রামে ৺মহানন্দ চৌধুরির জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী গোবিন্দমোহিনী দেবীকে বিবাহ করেন। সতীশচন্দ্রের দুই কন্যা ভিন্ন অপর কোন সন্তানাদি জন্মে নাই।

সতীশচন্দ্র যথাসময়ে নিজগ্রামের বাঙ্গালা স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাঁধগড়া হাই স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন; এবং ইচ্ছানুযায়ী এইখানেই পড়া শেষ করিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত অভিরামপুর গ্রামে বাঙ্গালা স্কুলে হেডপণ্ডিতের কার্য্য গ্রহণ করেন। এই স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করিবার পর তিনি ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না—কোন রকমে দিন চলিয়া যাইত; এজন্ম তাঁহাকে বড় বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতে হইত না।

জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিত্তবৃত্তি সাহিত্য-চর্চ্চার দিকে আকৃষ্ট হয়, এবং গান রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি মেলায় মেলায় প্রায়ই ঘুরিয়া বেড়াইতেন। পিঠস্থানে বসিয়া গান রচনা করিতেন এবং আপন মনে গান গাহিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেন। অনেক বৈষ্ণব বাবাজী তাঁহার গান শুনিয়া মুগ্ধ এবং তৎপ্রতি সমধিক আকৃষ্ট হয়। সতীশচন্দ্র, এতদঞ্চলে অনেকের নিকট 'সাধক কবি সতীশচন্দ্র' বলিয়া পরিচিত।

সতীশচন্দ্রের সংসারের প্রতি একরূপ আসক্তি ছিল না বলিলেই হয়। কনিষ্ঠ তারেশচন্দ্রই

সংসারপত্র দেখাশুনা করিতেন। সংসার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া অপেক্ষা সতীশচন্দ্র পূজাবন্দনাদি, সাধুসহবাস এবং নির্জ্জনতা ভালবাসিতেন। তিনি ন্যূনাধিক পাঁচশত গান রচনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার অনেকগুলি গান এই অল্পকাল মধ্যেই দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। প্রায় তিন-শতাধিক গান তাঁহার অনুজ তারেশচন্দ্র কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। সতীশচন্দ্রের গানগুলি প্রকাশিত হওয়া উচিত। তাঁহার অপ্রকাশিত গানগুলি প্রকাশিত হইলে, আমরা সতীশচন্দ্রকে আরও ভালরূপে বুঝিতে ও চিনিতে পারিব।

কবি ১৩২২ সালে ১৩ই অগ্রহায়ণ রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় শয্যায় উপবেশন করিয়া ইষ্ট নাম জপ করিতে করিতে সজ্ঞানে পরপারে চলিয়া যান।

নিম্নে সতীশচন্দ্রের চারিটি গান প্রকাশিত হইল।

(১)

গৌরী—একতালা

এই ভাবনাই ভাবি।
ভব-নদীর পরপারে কেমন করে যাবি॥

ত্যজে সাধন,	যেদিকে ধন,	সেইদিকে মন ধাবি,
ছয় জনে সব,	লুটলে পেয়ে,	চোর-কুঠারীর চাবী॥
যা কিছু ধন,	থাক্‌লো পরে,	আসল নয় তা, বাবী,
গরদা মালের,	গরব কোথা,	কিসের বা গুণ গাবি॥
ফু'লে ফু'লে,	সুদে মূলে,	হলো অনেক দাবী,
যম জমীদার,	জবর হুকুম,	কেমনে এড়াবি॥
খিড়্‌কি দিয়ে,	পলাইতে,	আর কি সময় পাবি,
তখনি কি তোর,	হবে চেতন,	যখন খাবি খাবি॥
সতীশ ভনে,	কতদিনে,	হয়ে ভাবের ভাবী,
শ্যামাপদ,	সরোবরের,	শান্তিজলে না'বি॥

(২)

ভৈরবী—কাওয়ালী

রসনা, বলরে আমার হরেকৃষ্ণ নাম।

অলস করোনা তনু,	কখন অবশ হবে
অজপা ফুরায়ে যাবে,	জপ নাম অবিরাম।

কুসঙ্গ প্রসঙ্গ, রস, কেন ভালবাসরে,
রাধাগোবিন্দ নাম, রসামৃতে ভাসরে,
জুড়াতে পরাণ পান কর নিশি বাসরে ;
ভব ক্ষুধা নাশরে, ভাবরে পরিণাম ॥
বান্ধ হরিনামের তরি, বলি তোরে বারে বারে,
দুঃখময় সংসার পারাবার তরিবারে,
আসিতে হবে না ফিরে, ভব ঘোরে ঘুরে ঘুরে,
পার পেলে পরপারে, পাবিরে পরম ধাম ॥
কাল করোনা গত, সতীশের গেল কাল,
করাল বদনে গ্রাস, করিবারে এলো কাল,
কাল ভয়ে বল হরি, না ভাবিয়ে কালাকাল,
(হবে) ইহকাল পরকাল, চিরকালে পূর্ণ কাম ॥

(৩)

ইমন—কাওয়ালী

জাগ, মূলাধারে জননী ।
জনম মরণ যন্ত্রণা-বারিণী ॥
সুষুম্না-গলিত-সুধা পানে মেতে মা আমার,
অধঃমুখে আঁখি মুদে, ঘুমাবিগো কত আর,
সাপিনী রূপিণী জেগে দাও সাধকে সুধাধার,
কর পার পারাবার দিয়ে তরণী ॥
অনাহত স্বাধিষ্ঠান বিশুদ্ধাক্ষ মণিপুর,
ভেদ করিয়ে খেদ মিটা মা, তোর কাছে সে কতদূর,
দু'লে দু'লে চল্ দ্বিদলে বাজ্‌বে নূপুর সুমধুর,
শ্রবণ পিপাসাতুর শুনিতে ধ্বনি ॥
সোহং তত্ত্ব জানায়ে মা, অহং-তত্ত্ব করি নাশ,
সতীশ কয় সে সহস্রারে, চল্ মা পরম শিব পাশ,
(গিয়ে) শম্ভু গৃহে শম্ভু-প্রিয়ে হিয়ায় করি বাস,

(৪)

চোরের মতন, ও নীলরতন, এসোনা কুঞ্জে ধীরে।
মিছে এলে শুধু, ইথে নাই মধু, যাও যাও বঁধু ফিরে॥
ছিলে যথা সুখে, যাও সেই সুখে, (মোরা) মনোদুঃখে মরে যাই,
সারা যামিনী জাগিয়ে, সরমে মরিয়ে, ঘুমায়ে গিয়েছে রাই,
তোমার সরম হলোনা আসিতে কি, মধু মিলে হরি বাসিতে কি,
(আর) বাসিতে না চাও, নূতনেতে চাও, নূতন রাগের ভরে॥
আর জ্বালা কালা দিও না, হে অবলা সরল প্রাণ,
তরল বাঁশীতে বাজাইও না আর গরল মিশানো গান,
তুয়া নাম কানে ভুলিব না, কপট বাণীতে ভুলিব না
এসনা এসনা, গেল গেল জানা, ভালবাসা ভাল ক'রে॥
কমল-আঁখি আঁখি দিবে নাহে, তোমার কালরূপে প্যারী আর,
যাও তার কাছে হৃদয়ের মাঝে, মুরতি এঁকেছ যার,
গোপী ভাবাবেশে সতীশ কয়, পিরীতি করার এ রীতি নয়,
যার যেবা হয়, প্রাণে বাধা রয়, জীবন মরণ তরে॥

শ্রীগৌরীহর মিত্র।

অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী

৩। পদকর্ত্তা—রাধামুকুন্দ দাস

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ স্তবক

ষষ্ঠ স্তবকে বসন্তলীলা সুবিস্তার। বসন্ত পঞ্চমী হোরী তৃতীয় প্রকার॥
দোল-যাত্রা চৈত্র হোরী দ্বিতীয় প্রকার। দ্বিতীয় প্রকার লীলা বসন্ত বিহার॥
তৃতীয় প্রকার লীলা শ্রীবাসন্তীরাস। পুনঃ পুষ্প দোলযাত্রা হইল প্রকাশ॥

সপ্তম স্তবক

মাধবে মাধব বিলাস মাধবী মাধব। সপ্তমে পঞ্চম পদ ভব অনুভব॥

অষ্টম স্তবক

অষ্টমে অষ্টম পদে অভিষেক লীলা। জ্যৈষ্ঠেতে পুর্ণিমা দিনে বর্ণনা হইলা॥

নবম স্তবক

নবমে হিন্দোল যাত্রা শ্রাবণ মাসেতে। দিবসে শ্রীরাধাকুণ্ড দ্বাদশ পদেতে॥
পুনশ্চ শ্রীবৃন্দাবনে রাত্রিতে হিন্দোলা। সুবিস্তার পঞ্চদশ পদেতে বর্ণিলা॥

দশম স্তবক

দশম স্তবকে হৈল প্রার্থনা বিস্তার। সুষড়্‌বিংশতি পদে সুপঞ্চ প্রকার॥
সমাপ্ত হইল এই উত্তর বিভাগ। যাথে ভক্ত ভক্তি হয় কৃষ্ণ অনুরাগ॥
চতুঃশত চতুরশীতি পদের গণন। ষট্‌শত নবপঞ্চাশৎ পদ বিভাগে মিলন॥
অতঃপর সুষোড়শ পদে যে লিখিল। শ্রীমুকুন্দানন্দে যাহা মুকুন্দ বর্ণিল॥
অতঃপর বর্ণিল যে অনুক্রমণিকা। পূর্ব্বোত্তর ভাগদ্বয়ের সংক্ষেপ কারিকা॥ ● ●॥
শ্রীমুকুন্দানন্দ গ্রন্থ তোষক মুকুন্দ। বৈষ্ণব দাসানুদাস গাইল মুকুন্দ॥
ইতি শ্রীমুকুন্দানন্দ নামক গ্রন্থঃ। শ্রীরাধামুকুন্দদাসেন বর্ণিতঃ॥ সমাপ্তঃ॥

এই পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে, সঙ্কলয়িতা ৯১, জন মহাজনের ৬৫৯টি পদ পূর্ব্ব ও উত্তর বিভাগদ্বয়ে, ১৬টি স্তবকে সুসজ্জিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৫৪টি পদে কোন ভনিতা নাই। এই গ্রন্থে এমন কয়েকটি মহাজন পদকর্ত্তার নাম ও পদাবলী সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, যাঁহাদের পরিচয় ও রচিত পদাবলী এখনও সাহিত্য-সেবিগণের নিকট একেবারে নূতন। আমরা ক্রমে, এই সকল পদাবলী প্রকাশিত করিব। এই গ্রন্থখানির হস্তলিপি অতি সুন্দর ও সমুজ্জ্বল—ছাপা হরফের ন্যায়। এই গ্রন্থখানি মূলগ্রন্থ—ইহার অনুলিপি হয় নাই। এই সুন্দর সংগ্রহ-গ্রন্থখানি প্রকাশযোগ্য। এই গ্রন্থের লিপিকাল বা সংগ্রহকালের কোন উল্লেখ নাই। মূলগ্রন্থখানি সমগ্র ও অক্ষুণ্ণ আছে। (রঃ লাঃ পুঃ—১০০২)

এই গ্রন্থ হইতে, সংগ্রহকার রাধামুকুন্দ দাসের স্বরচিত সমস্ত পদগুলি উদ্ধৃত হইল—

শ্রীসুবল বেশস্থ

অম্বিকানগরে পহুঁ শ্রীগৌরসুন্দর। গৌরীদাস মন্দিরেতে রহে নিরন্তর॥
গৌরীদাস কর ধরি সুরধনী তীরে। উপনীত রাধাকুণ্ড ভাবয়ে অন্তরে॥
কহয়ে সুবল সখা শুনহে বচন। শ্রীরাধিকা বিনা মোর না রহে জীবন॥

সায়াহ্ন কালস্ত

খেলাইয়া গৌরচন্দ্র বেলা অবসানে। উপনীত হৈলা আসি শচীর অঙ্গনে॥
দরিদ্রেতে পাইল যেন হারাধন রত্ন। ধূলা ঝাড়ি স্নান করাইলা করি যত্ন॥
ভোজনে বসিল প্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র। বামে গৌরীদাস দক্ষিণে নিত্যানন্দ॥
আচমন সারিয়া লইলা মুখবাস। ভাবে গদগদ বাণী অন্তরে উল্লাস॥
ধবলি শ্যামলি কোথা শ্রীদাম সুদাম। দোহনের ভাণ্ড মোর হাতে দেহ রাম॥
গৌরীদাস বলে আন ছান্দনের দড়ি। মুকুন্দ কহয়ে দড়ি গোপী কৈল চুরি॥ ২॥

অথ শ্রীযুগলবিলাসঃ॥ শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী মিলনং॥

হেনই সময়ে ধনী কৃষ্ণচিত্ত বিহারিণী নন্দালয়ে সর্ব্বগুণাধিকা।
ললিতা বিশাখা সঙ্গে চম্পক কলিকা রঙ্গে তারা মাঝে শোভয়ে চন্দ্রিকা॥
উপনীত শ্রীমতি রাধিকা।
যশোমতী ক্রোড়ে করি নীলমণি গর্ব্বহারী তিহ রাই চন্দ্রের কণিকা॥ ধ্রু॥
নয়নে নয়ন বান পরস্পর সন্ধান হানে দুহে দুহার উপরে।
শরাঘাতে দুহু তনু কদম্ব কুসুম যনু পুলকিত নেত্রে ধারা ধরে॥
ললিতাদি সখী সব প্রভাব হেরিয়া তব মহাভাবে ধন্য করি মানে।
যে হইল মহাসুখ কি জানে সহস্র মুখ রাধিকা মুকুন্দ নাহি জানে॥ ৩॥

শ্রীরাধা জন্মাষ্টমী মিলনং॥

বৃষভানু পুরে তথি যোগমায়া ভগবতী আসিয়া দিলেন দরশন।
পরম আনন্দ হয়া সুতিকা মন্দিরে গিয়া রাই কর্ণে কহেন বচন॥
গোলোক বিহারী হরি আসিবেন ত্বরা করি তোমায় আর ভক্তে সুখ দিতে।
না ভাবিহ মনে দুঃখ পূর্ণ হবে সর্ব্বসুখ পৃথিবী হইবে আনন্দিত॥
শুনি পুলকিত তনু কদম্ব কুসুম যনু দুনয়নে বহে প্রেম বন্যা।
কহে হেন হব বিধি মিলায়ব গুণ নিধি মনে ভাবে বৃষভানু কন্যা॥
কৃষ্ণ পদে করি ধ্যান মনে মনে অনুমান আসিবেন মোর প্রাণধন।
যশোমতী নন্দালয়ে পরম আনন্দময়ে মুকুন্দের হৈব দরশন॥ ৪॥

বাৎসল্য মিলন—ধানসী॥ সুহই॥

নাচিছে কানাই সঙ্গে বলাই। হেনকালে তথা আয়ল রাই॥

নীলগিরি কিবা রজত-গিরি। তথাই শোভয়ে সুহেম-গিরি ॥
শ্বেত নীল যহু কমল মাঝে। সোনার কমল অধিক রাজে ॥
হেম নীল শ্বেত চন্দ্র উদিত। সখীগণ তহি তারা মিলিত ॥
অদ্ভুত শোভা শ্রীনন্দালয়ে। হয় নাই কভু হবার নয়ে ॥
নয়নে নয়ন কমল অলি। চাতক পায়ল মেঘ আবলি ॥
চকোর মিলল চন্দ্র উজরে। রাধিকা রূপ মুকুন্দ নেহারে ॥ ৫ ॥

অথ গোবর্দ্ধন যাত্রা মিলন ॥

পর্ব্বত গহ্বর হৈতে সবে গেলা আলয়েতে মেঘ মুক্ত যহু তারাগণ।
রাহুমুক্ত দ্বিজরাজ তেন হৈল ব্রজরাজ আনন্দিত ব্রজবাসিজন ॥
কৃষ্ণপ্রেমে পরিপূর্ণ নাহি জানে নিশিদিন নাচে গায় পরম আনন্দে।
তথা গিরিবর রাজে ললিতাদি সখী মাঝে রাই চান্দ নিরখে গোবিন্দে ॥
চন্দ্র গরাসল রাহু রাই গলে শ্যাম বাহু চন্দ্র চকোরে হৈল মেল।
সখীগণ মহাহর্ষে রাধা মেঘে প্রেম বর্ষে শ্যামচাতক সুখী ভেল ॥
গোবর্দ্ধন নিকুঞ্জেতে প্রেমবন্যা বহে স্রোতে সুরপুরে হৈল মহানন্দ।
ললিতাদি সখীগণ প্রেম মগ্ন অনুক্ষণ নিরীক্ষয়ে রাধিকা মুকুন্দ ॥ ৬ ॥

শ্রীগোষ্টাষ্টমী যাত্রা মিলন ॥ ধানশী—সুহই ॥

নন্দালয়ে তব আয়ল রাই। হেরিয়া চকিত ভেল কানাই ॥
অঙ্গ পুলকিত নয়নে বারি। মুখচন্দ্রে দুহু চিত্তচকোরী ॥
মহাভাব অঙ্গে উদয় রহু। প্রেমের স্বভাবে বিস্মৃত দুহু ॥
হেরি সখীগণ আনন্দে ভাসে। সুবলাদি সখা প্রেম উল্লাসে ॥
পরম আনন্দে নন্দের গৃহে। রাধিকা মুকুন্দ হেরিয়া রহে ॥ ৭ ॥

বৎসচারণ মিলন ॥

বনে গেলা শ্রীগোবিন্দ রাধিকা পরমানন্দ সখী সঙ্গে ভানু আরাধনে।
চলে ধনী ত্বরা করি ভাবে গোলক বিহারী কতক্ষণে পাব দরশনে ॥
কৃষ্ণচন্দ্র যেই বনে পরম আনন্দ মনে বটু সুবল সঙ্গে বিহরে।
তথা রাই কমলিনী কৃষ্ণ চিত্ত বিহারিনী কুসুমচয়ন ছলে হেরে ॥
সুবল মধুমঙ্গলে ললিতা বিশাখা বলে চল যাই পুষ্প তুলিবারে।
ইঙ্গিতে বুঝিয়া কার্য্য মনেতে করিয়া স্থৈর্য্য চলিলা কুসুম সরোবরে ॥

এথা কৃষ্ণ রাধিকায় কমলে ভ্রমর প্রায় চিত্ত বিত্ত কৈল সমাধানে।
নিত্যলীলা সুখময় তুলনা দিবার নয় রাধিকা মুকুন্দ গুণগানে ॥ ৮ ॥

প্রাতর্মিলন শ্রীনন্দালয়ে ॥ শ্রীগান্ধারী ॥

যশোদা নিকটে শ্রীরাধিকা সুন্দরী। বিদায় হইয়া চলে ত্বরা করি ॥
ললিতা বিশাখা চিত্রারে লইয়া। উপনীতা যথা নাগর শুতিয়া ॥
নাগরী হেরিয়া নাগর কানাই। আনন্দে কহয়ে আইসহ রাই ॥
একাসনে দুহু করিলা শয়ন। মহানন্দ সুখে মগ্ন সখীগণ ॥
ভুজে ভুজে দুহু প্রেম অনুবন্ধ। পরস্পর হেরে রাধিকা মুকুন্দ ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বাহ্নে গোষ্ঠগমনে পথি মিলন ॥

শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম বলরাম সুবল মধুমঙ্গল সঙ্গে।
অংশুমান কিঙ্কিনী মধ্যে ইন্দ্র নীল মণি গোগণ চালায়ই রঙ্গে ॥
অগ্রে ধেনুবৎস সব আবা আবা হৈহৈরব পাছে শিশুশ্রেণী চলু ঢঙ্গে ॥
রামকৃষ্ণ গোষ্ঠ চলে শৃঙ্গশৃঙ্গ বেণু বোলে যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মনোভঙ্গে ॥
যাবট নিকটে যায় রাধা হেরে শ্যামরায় চন্দ্রশালা উপরে থাকিয়া।
কৃষ্ণ হেরে রাই মুখ উথলে দোঁহার সুখ পরস্পর বদন হেরিয়া ॥
নবীন বারিদ যেন চাতকী মিলন হেন চন্দ্রে চকোর পিয়ে সুধা।
কুবলয়ে শশী তনু হেমপদ্মে অলি যনু নিরীক্ষণে না পূরয়ে ক্ষুধা ॥
ধেনু সথা চলি যায় শ্রীকৃষ্ণ অস্থির প্রায় ললিতা বিশাখা পরানন্দ।
সুবল মধুমঙ্গল বলে ভাই চল চল হেরে দোঁহে রাধিকা মুকুন্দ ॥ ১০ ॥

শ্রীশিবরতন মিত্র।

বীরভূমি] মাসিক পত্রিকা [৭—৪

১৩৩২

যোগমায়া

২ হ্লাদিনী শক্তি ও তাহার বিলাস

৩ দেবলোকে দেশবন্ধু

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

যোগমায়া

যোগমায়া চিচ্ছক্তি, শুদ্ধ সত্ত্ব-পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ-রতন, ভক্তজনের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

'যোগমায়া'কে সমীপে গ্রহণপূর্ব্বক ভগবান্ রমণের জন্য ইচ্ছা করিলেন। ইহাই শ্রীরাসলীলার প্রথম কথা। কেবল শ্রীরাসলীলায় নহে, সমগ্র শ্রীকৃষ্ণলীলায়, বিশেষতঃ আবির্ভাবলীলায় ও শ্রীবৃন্দাবনলীলায় আমরা এই যোগমায়াকে পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাই। 'ক্ষীরপয়োনিধি'র তীরে বসিয়া ভারাক্রান্তা পৃথিবীর অনুরোধে দেবগণের সহিত যখন ব্রহ্মা পুরুষসূক্তের সাহায্যে পরম পুরুষের উপাসনা করিয়াছিলেন, তখন এক দৈববাণী শ্রুত হইয়াছিল। সেই দৈববাণীতে মায়ার কথাও বলা হয়।

বিষ্ণোর্ম্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুনাংশেন কার্য্যার্থে সংভবিষ্যতি ॥

যে ভগবতী বিষ্ণুমায়ায় জগৎ সংমোহিত সেই বিষ্ণুমায়াও প্রভু-কর্ত্তৃক আদিষ্টা হইয়াছেন। দেবকীর গর্ভ-সংকর্ষণ ও যশোদামোহনাদি কার্য্যের জন্য তিনি যশোদার গর্ভে (অংশে) উৎপন্ন হইবেন। (দেবকী-গর্ভ-সংকর্ষণ যশোদামোহনাদি কার্য্যার্থে যশোদায়াং সংভবিষ্যতি। ইতি শ্রীধরঃ।)

আবার শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হইতেছেন, তখন শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন—

"ভগবানপি বিশ্বাত্মা বিদিত্বা কংসজং ভয়ং।
যদূনাং নিজনাথানাং যোগমায়াং সমাদিশৎ ॥

গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপ-গোভিরলঙ্কৃতং।
রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে।
অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি।
দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকং॥
তং সংনিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সংনিবেশয়।
অথাহমংশভাগেন দেবক্যাং পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি॥
অর্চ্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্ব্বকামবরেশ্বরীং।
নানোপহারবলিভিঃ সর্ব্বকামবর প্রদাং॥
নামধেয়ানি কুর্ব্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ॥
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানা শারদেত্যম্বিকেতি চ॥
গর্ভ-সংকর্ষণাত্তং বৈ প্রাহুঃ সংকর্ষণং ভুবি।
রামেতি লোকরমণাৎ বলভদ্রং বলোচ্ছ্রয়াৎ॥
সংদিষ্টৈবং ভগবতা তথেত্যোমিতি তদ্বচঃ।
প্রতিগৃহ্য পরিক্রম্য গাং গতা তত্তথাকরোৎ॥"

বিশ্বাত্মা ভগবান্, কংস হইতে আপনার আশ্রিত যাদবগণের ভয়ের কথা অবগত হইয়া স্বয়ং যোগমায়ার প্রতি এইরূপ আদেশ করিলেন। 'হে দেবি, হে ভদ্রে, গোপ এবং গো-সমূহে অলঙ্কৃত ব্রজপুরে গমন কর। বসুদেবগৃহিণী রোহিণী নন্দগোকুলে বাস করিতেছেন, কেবল তিনিই নহেন বসুদেবের অন্যান্য ভার্য্যাও কংসভয়ে ভীত হইয়া অলক্ষ্য স্থানে এখন বাস করিতেছেন। দেবকীর জঠরে 'শেষ' নামক যে সন্তান আছে, তুমি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে রোহিণীর উদরে সন্নিবেশ কর। আমি পূর্ণরূপে (অংশ-ভাগেনেতি অংশৈঃ শক্তিভির্ভজতেঽধিতিষ্ঠতি সর্ব্বান্ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তান্ ইতি অংশ-ভাগঃ তেন পরিপূর্ণেন রূপেণেত্যর্থঃ। যদ্বা অংশৈর্জ্ঞানৈশ্বর্য্য বলাদিভির্ভাজয়তি যোজয়তি স্বীয়ানিতি তথা তেনেতি। যদ্বা অংশেন পুরুষরূপেণ মায়য়া ভাগো ভজনং ঈক্ষণং যস্য তেন। যদ্বা অংশেন গুণাবতারাদিরূপা ভাগা ভেদা যস্য তেন। যদ্বা অংশা এব মৎস্য-

কূর্ম্মাদিরূপা ভজনীয়া নতু সাক্ষাৎ স্বরূপং যস্য তেন। যদ্বা অংশৈশ্চ নিবলাদিভির্ভজনং অনুবর্ত্তনং ভক্তেষু যস্য তেন সর্ব্বথা পরিপূর্ণেন রূপেণেতি বিবক্ষিতং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যুক্তত্বাৎ—শ্রীধরঃ) দেবকীর পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব, তুমি নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিও। হে দেবি, তুমি পূজকদিগকে শ্রেষ্ঠ কাম-বর প্রদান করিবে। মানবগণ উপহার ও বলি দিয়া তোমার পূজা করিবে। পৃথিবীতে মানবগণ তোমার স্থান করিয়া দিবে। দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানা, শারদা, অম্বিকা, তোমার এই সকল নাম রাখিবে। হে দেবি, তোমাকর্ত্তৃক গর্ভ আকৃষ্ট হওয়াতে সেই গর্ভের শিশুকে লোকে সংকর্ষণ বলিবে। পরে তিনি সকলের রতি উৎপাদন করিবেন, ইহাতে লোকে তাঁহাকে 'রাম' বলিয়াও সম্বোধন করিবে। তিনি নিজ বলে অতিশয় উচ্ছ্রিত হইবেন, এজন্য লোকে তাঁহাকে বলভদ্র বলিয়াও ডাকিবে।" ভগবান্ কর্ত্তৃক এই প্রকার আদিষ্টা হইয়া, তাহাই করিতেছি, এইরূপ বলিয়া মায়া শ্রীভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ করিয়া পৃথিবীতে গমন করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত আশ্রয় করিয়া শ্রীল শ্রীধরস্বামী এই মায়ার জন্মকথা নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—"যদি কংসাদ্ভীতোঽসি তর্হি মাং গোকুলং নয় যশোদায়াশ্চ কন্যাং মন্মায়ামানয়েতি প্রথমমেব ভগবতা প্রচোদিতো বসুদেবো যদা গন্তুমৈচ্ছৎ তদৈব চ যা অজাপি সা নন্দজায়য়া নিমিত্তমাত্রভূতয়া অজনি জাতা।"

"যদি কংস হইতে তোমার ভয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাকে গোকুলে লইয়া চল, এবং যশোদা হইতে কন্যারূপে আমার মায়া জন্মাইয়াছেন, তাঁহাকে লইয়া আইস" এই কথা শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত হইলে বসুদেব যখন শিশুকে লইয়া গোকুলে যাইতে ইচ্ছা করিলেন, ঠিক্ সেই সময়েই সেই জন্মরহিতা নন্দপত্নীকে নিমিত্তমাত্র করিয়া জন্মগ্রহণ করিলেন।

সেই সময়ে মায়ার প্রভাবে সমুদয় দ্বারপালের ইন্দ্রিয়বৃত্তি অপহৃত হইল; শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন, দ্বারপালগণ জাগিয়াই থাকিল, ঠিক্ যে ঘুমাইল তাহা নহে, অথচ জাগ্রত অবস্থাতেই অচেতন হইয়া পড়িল। পুরবাসিগণ নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। বসুদেব ও দেবকী কারাগারের যে কক্ষে ছিলেন, সেই কক্ষদ্বারের সুবৃহৎ কপাটগুলি

লইয়া যেমন বাহিরে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, অমনি সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেমন আপনা হইতে অপগত হয়, সেইরূপ কপাটগুলি আপনা হইতে উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। বসুদেব নন্দব্রজে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভগবানের মায়াপ্রভাবে সেখানেও সকলে নিদ্রিত। যশোদা একটি কিছু প্রসব করিয়াছেন, কিন্তু তাহা পুত্র কি কন্যা, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। কৃষ্ণ রহিলেন নন্দব্রজে যশোদার সূতিকাগারে, আর যশোদাগর্ভসম্ভূতা যোগমায়া বসুদেবের ক্রোড়ে উঠিয়া মথুরায় কংস কারাগারে আসিলেন, তাহার পর কংস সেই সদ্যোজাতা কন্যাকে পা ধরিয়া শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। তখন—

"সা তদ্ধস্তাৎ সমুৎপত্য সদ্যো দেব্যম্বরংগতা।
অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্ট মহাভুজা।
দিব্য স্রগম্বরালেপ রত্নাভরণভূষিতা।
ধনুঃ শূলেষু চর্ম্মাসি শঙ্খ চক্র গদাধরা।
সিদ্ধচারণ গন্ধর্ব্বৈরপ্সরঃ কিন্নরোরগৈঃ।
উপাহৃতোরু বলিভিঃ স্তূয়মানেদমব্রবীৎ।
কিং ময়া হতয়া মন্দজাতঃ খলু তবান্তকৃৎ।
যত্র ক্বচিৎ পূর্ব্বশত্রুর্মা হিংসীঃ কৃপণান্ বৃথা॥"

অর্থাৎ শিলাপৃষ্ঠে প্রক্ষিপ্তা হইবামাত্র সেই কন্যা কংসের হস্ত হইতে ঊর্দ্ধে উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ এক দেবীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আকাশে গমন করিলেন। সেই সময়ে সকলে দেখিলেন বিষ্ণুর অনুজা সেই দেবী, সশস্ত্র অষ্টভূজা হইয়াছেন এবং দিব্য বসন ভূষণ ও মাল্যালঙ্কারে শোভা পাইতেছেন। তাঁহার অষ্ট হস্তে শূল, ধনুঃ, বাণ, খড়্গ, চর্ম্ম, শঙ্খ, চক্র, ও গদা দেদীপ্যমান, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা কিন্নর, এবং উরগগণ ভূরি ভূরি উপহার আহরণ করিয়া তাঁহার স্তব করিতেছেন। ঐ দেবী আকাশ হইতে উচ্চস্বরে কংসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "অরে মূঢ়! আমাকে বধ করিলে কি হইবে, তোর পূর্ব্বশত্রু তোর অন্তক হইয়া কোন স্থানে জন্মিয়াছেন, তুই আর অন্যান্য দীন বালকদিগকে বৃথা বধ করিস না।"

এই গেল যোগমায়ার আবির্ভাব ও কংসহস্তে তাঁহার নিগ্রহ। শ্রীমদ্ভাগবতে বস্ত্রহরণলীলার প্রারম্ভে আমরা কুমারী গোপকন্যাগণ কর্ত্তৃক কাত্যায়নীদেবীর পূজা

দেখিতে পাই। কুমারীগণ অগ্রহায়ণ মাসে হবিষ্যভোজিনী হইয়া বালুকাময়ী প্রতিমা স্থাপনপূর্ব্বক গন্ধমাল্য, ধূপ, দীপ, ফল, তণ্ডুল ও অন্যান্য নানারূপ উপহারের সাহায্যে পূজা করিতে লাগিলেন। গোপকুমারীগণ পূজা করিয়া নিম্নরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥"

হে কাত্যায়নি, হে মহামায়ে, হে মহাযোগিনি, হে অধীশ্বরি, কৃপা করিয়া নন্দগোপের সুতকে পতিরূপে প্রদান করুন, আপনাকে নমস্কার করি।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত যোগমায়ার ইহাই সংক্ষিপ্ত বিবরণ। যোগমায়া তত্ত্ব যে অতি দুরূহ এবং প্রয়োজনীয় তত্ত্ব, তাহা প্রাচীন টীকাকারগণের ব্যাখ্যা আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। আমরা প্রথমে বিবরণটুকু দিলাম, এইবার প্রাচীন ও সম্মানিত টীকাকারগণের ব্যাখ্যা আলোচনা করিতেছি। শ্রীরাসলীলার টীকায় শ্রীমৎ সনাতন-গোস্বামী যোগমায়ার সাতটি অর্থ দিয়াছেন। শ্রীমৎ কিশোরপ্রসাদ বিদ্বৎ-কৃত বিশুদ্ধ রসদীপিকানাম্নী টীকায় 'মৃত্যুঞ্জয় তন্ত্র' নামক গ্রন্থ হইতে যোগমায়া দেবীর ধ্যানের মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা সেই মন্ত্রে দেবীর ধ্যান করিয়া তত্ত্বালোচনা করিতেছি।

ধ্যায়েত্তত্র মহাদেবীং স্বয়মেব তথাবিধঃ।
রক্তপদ্মনিভাং বালাং বালার্ককিরণোজ্জলাম্ ॥
পীতবস্ত্র পরীধানাং বংশহস্তকরাম্বুজাম্।
কৌস্তুভোদ্দীপ্তহৃদয়াং বনমালাবিভূষিতাম্ ॥
শ্রীমৎ কৃষ্ণাঙ্কপর্য্যঙ্ক নিলয়াং পরমেশ্বরীম্।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ীং দেবীং পরমানন্দনন্দিতাম্ ॥
রাসোৎসব প্রিয়াং রাধাং কৃষ্ণানন্দস্বরূপিণীম্।
ভজেচ্চিদমৃতাকারাং পূর্ণানন্দমহোদধিম ॥

এই ধ্যানে শ্রীরাধিকাকেই যোগমায়া বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথমেই যে স্থানে যোগমায়ার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, সেখানে 'বিষ্ণুমায়া' এই কথাটির

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রথম স্থলের ব্যাখ্যাতেই বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দশম স্কন্ধ প্রথম অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। আমরা এই টীকার আলোচনা করিতেছি।

"কিঞ্চ স্বলীলা পরিকরাণাং ভক্তানাং ভক্তদ্বিষাং কংসাদীনাঞ্চ মোহনার্থং যোগমায়াং মায়াঞ্চ আদিশদিত্যাহ বিষ্ণোর্মায়া যোগমায়াং সমাদিশদিত্যগ্রিমোক্তেঃ।"

দুইদল লোককে মোহন করিতে হইবে, একদল শ্রীকৃষ্ণের স্বলীলা পরিকরভক্ত, আর একদল ভক্তদ্বেষী কংসাদি। প্রকৃত কথা যোগমায়া ও মায়া এই উভয়কেই আদেশ করা হইল। প্রথমে বিষ্ণুমায়ার নাম করা হইল, যোগমায়াকে আদেশ করিলেন, ইহা পরে কথিত হইবে। অবশ্য যোগমায়া ও মায়া পৃথক নহে। টীকাকার বলিতেছেন "প্রভুনা কৃষ্ণেন আদিষ্টা সতী অংশেন সহ স্বাংশভূতবহিরঙ্গমায়া সহিতৈব কার্য্যার্থে প্রাদুর্ভবিষ্যতি।" প্রভু কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া যোগমায়া অংশের সহিত অর্থাৎ নিজের অংশভূত বহিরঙ্গ মায়ার সহিতই কার্য্যের জন্য প্রাদুর্ভূতা হইলেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণের লীলার সাহায্য করিবার জন্য যোগমায়া তাঁহার অংশভূত বহিরঙ্গ মায়ার সহিত আসিলেন।

"যয়া জগৎ সংমোহিতং স্বাংশভূতমায়য়েতার্থঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবতে যেখানে বলা হইয়াছে যে, যে বিষ্ণুমায়া কর্ত্তৃক জগৎ সংমোহিত, সেই বিষ্ণুমায়াকে আদেশ করিলেন। টীকাকার বলিতেছেন, জগৎসম্মোহনকারিণী এই যে মায়া, ইনি ঠিক যোগমায়া নহেন, ইনি যোগমায়ার অংশভূত মায়া। অবশ্য একজন অংশী আর একজন অংশ।

যদ্বা জগৎ অপ্রাকৃতং প্রাকৃতঞ্চ স্বেন স্বাংশেন সংমোহিতং"।

যোগমায়া ও তাহার অংশভূত মায়া—এই দুইজনেরই আবির্ভাবের কারণ এই যে, জগৎ, অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত; যোগমায়া স্বয়ং অপ্রাকৃত জগৎকে আর নিজের অংশের দ্বারা প্রাকৃত জগৎকে সম্মোহিত করেন।

"মায়ায়া যোগমায়াংশত্বং দৃষ্টং নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতি-বিদ্যাসম্বাদে-
জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা।

যস্যা বিজ্ঞান মাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ।
মুহূর্ত্তাদ্দেবদেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা॥
একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী।
অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদি দেবাহ্খিলেশ্বরঃ।
অস্যা আবরিকাশক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী।
যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিন।
ইতি"

নারদ পঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা সংবাদে, মায়া যে যোগমায়ার অংশ তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।, সেখানে নিম্নরূপ বচন আছে—এক পরা পরমাশক্তি তিনি মহাবিষ্ণু-স্বরূপিণী। তিনি তদাত্মিকা ও দুর্গা। কেবলমাত্র তিনিই কান্তকে জানেন। এই পরাশক্তির বিজ্ঞান হইলে তন্মুহূর্ত্তেই পরেরও যিনি পরমাত্মা, সেই দেবদেবের প্রাপ্তি ঘটে, ইহার অন্যথা নাই। এই যে দেবী, ইনি একা; প্রেমই তাঁহার স্বভাবের সর্ব্বস্ব, ইনিই গোকুলেশ্বরী, ইঁহার দ্বারা অখিলেশ্বর আদি দেবকে অনায়াসে জানা যায়। এই পরাশক্তির এক আবরিকা শক্তি আছেন, তিনি অখিলেশ্বরী, জগৎবাসী সকলেই তৎকর্তৃক মোহিত হইয়া দেহাভিমানী হইয়াছে।" ইহার পরে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিতেছেন এখানে কার্য্য দ্বিবিধ, দেবকীর সপ্তম গর্ভাকর্ষণ ও যশোদা-স্বাপন অর্থাৎ যশোদাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখা। ইহা যোগমায়ার কার্য্য,—মায়ার নহে। কারণ বলভদ্রের আকর্ষণে মায়ার প্রভাব নাই। যশোদা-স্বাপনেও মায়ার প্রভাব নাই, "রাজসত্বাভাবাচ্চ" কারণ সেখানে রজোগুণ নাই। কারণ—

"ব্যতীত্য তুর্য্যামপি সংশ্রিতানাং তাং পঞ্চমীপ্রেমময়ীমবস্থাং।
ন সম্ভবত্যেব হরিপ্রিয়াণাং স্বপ্নোরজে বৃত্তি বিজৃম্ভিতোহঃ॥"

অর্থাৎ যাঁহারা হরির প্রিয় তাঁহারা মানবচৈতন্যের চতুর্থ অবস্থা যে তুরীয় অবস্থা তাহাও অতিক্রম করিয়া পঞ্চমী যে প্রেমময়ী অবস্থা, সেই অবস্থায় অবস্থান করেন। রজোগুণের বৃত্তির দ্বারা উৎপাদিত স্বপ্ন প্রভৃতি সে অবস্থায় নাই। দ্বিতীয় কার্য্য দেবকীর কন্যারূপে কংস-বঞ্চনাদি ইহা মায়ার কার্য্য। "তাদৃশ দুষ্টলোকেষু তস্যা অনুপযোগাদেব" কারণ

হস্ত হইতে আকাশে উত্থিত হইয়া বিন্ধ্যবাসিনী প্রভৃতি বহুনামে বহুস্থানে যে অবস্থান, তাহাও মায়ার কার্য্য, যোগমায়ার নহে।

যদুক্তং স্বয়মেব মায়য়া—

বৈবস্বতেহন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
নন্দগোপ গৃহে জাতা যশোদা-গর্ভ-সম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচল নিবাসিনী॥

মায়া স্বয়ং বলিয়াছেন—বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি যুগে, নন্দগোপগৃহে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া বিন্ধ্যাচল-নিবাসিনী হইয়া তাহাদের দুইজনকে (শুম্ভ নিশুম্ভকে) পুনর্ব্বার বিনাশ করিব। (মার্কেণ্ডয় চণ্ডী)

"তথা রাসলীলাদি-সিদ্ধ্যর্থং ভগবৎ প্রেয়সীনাং পতিশ্বশ্রাদিমোহনং যোগমায়য়া এবং কার্য্যংনতু মায়য়া। তেষাং ভগবদ্বৈমুখ্যাদর্শনাৎ মায়া মোহিতত্বে তদ্বৈমুখ্যস্যাবশ্য-ম্ভাবাৎ। যোগমায়ামুপাশ্রিত ইতি তত্রোক্তেশ্চ"।

রাসলীলাদি সিদ্ধির জন্য ভগবৎ প্রেয়সীদিগের পতি ও শ্বশ্রূ প্রভৃতিকে মোহিত করিতে হইয়াছিল, ইহা যোগমায়ার কার্য্য, মায়ার কার্য্য নহে। কারণ এই সমুদয় লোক কখনই ভগবদ্বিমুখ নহে। মায়ার দ্বারা মোহিত হইতে হইলে ভগবদ্বিমুখ হওয়া আবশ্যক। এই কারণেই রাসলীলার প্রারম্ভে বলা হইয়াছে—

"যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ।"

তাহার পর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিতেছেন—দুর্য্যোধন, শাল্ব প্রভৃতি অসুর ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণকে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ ও গরুড়বাহনত্ব প্রভৃতি দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহা দেখিয়াও উহাদের এরূপ মনে হয় নাই যে ইনি ঈশ্বর। উহাদের মনে হইয়াছিল ইহা ধূর্ত্ত যাদবের ইন্দ্রজাল। এই যে মোহন, ইহা মায়ার কার্য্য, যোগ-মায়ার নহে। কারণ এই মোহনের ফল ভগবদ্বৈমুখ্য। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে মোহন দ্বিবিধ। বিমুখ-মোহন ও উন্মুখ-মোহন। "বিমুখ-মোহনং মায়য়া উন্মুখ-মোহনং যোগমায়য়েতি ব্যবস্থিতিঃ" অর্থাৎ মায়া কর্ত্তৃক যে মোহন হয় তাহা উন্মুখ-মোহন, ইহাই প্রতিষ্ঠিত হইল। বাৎসল্যাদি মহাপ্রেমসম্পন্ন নন্দযশোদা প্রভৃতি বিশ্বরূপ দর্শন

তাঁহাদের বাৎসল্যাদিভাব আরও বাড়িয়া গিয়াছিল, এবং তাঁহারা ভাবের প্রাবল্যে ঐশ্বর্য্যের বিষয় চিন্তাও করেন নাই। এই যে মোহন, বিশ্বনাথ বলেন, ইহা মায়া কর্ত্তৃকও হয় নাই। তবে ইহা কি? "কিন্তু প্রেম্ন এব স স্বভাবঃ" কিন্তু ইহা প্রেমেরই স্বভাব। যঃ খলু ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞানমাবৃণ্বন্ চিণ্ময়মমতারসনয়া শ্রীকৃষ্ণং নিবধ্য প্রতিক্ষণং তস্মিন্ স্নেহাধিক্যমুৎপাদয়ন্ তন্মাধুর্য্যাস্বাদমহোদধৌ ভক্তজনং নিমজ্জয়তীত্যসাধারণ লক্ষণ স্তাপ্যো ভবত্যত এব তত্রোক্তং বৈষ্ণবীং ব্যতনোম্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুরিতি পুত্রস্নেহময়ত্বং বাৎসল্য প্রেম্নোঽসাধারণং লক্ষণং। মোহনত্বেন মায়া সাধর্ম্ম্যান্মায়ামিতি।

প্রেমের স্বভাব এই যে তাহার দ্বারা ভগবানের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান তাহা আবৃত হইয়া যায় এবং চিন্ময় মমতার ডোরে শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণে স্নেহাধিক্য উৎপাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যাস্বাদনের যে মহাসমুদ্র ভক্তজনকে তাহাতেই নিমজ্জিত করে। ইহাই প্রেমের অসাধারণ লক্ষণ। এই কারণে বলা হইয়াছে, 'বিভু স্নেহময়ী বৈষ্ণবী মায়া বিস্তৃত করিলেন'। পুত্রস্নেহময়ত্ব বাৎসল্য প্রেমের অসাধারণ লক্ষণ। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা মায়া নহে, মোহনকার্য্য সাধারণতঃ মায়ার কার্য্য, মায়ার কার্য্যের সহিত এই সাদৃশ্য দর্শন করিয়া 'মায়া' এই পদ ব্যবহৃত হইয়াছে।

আবির্ভূত হইবার বা জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াকে আবির্ভূত হইবার জন্য আদেশ করিলেন। সেইস্থানে টীকাকার শ্রীজীব গোস্বামী এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"যোগো ভগবচ্ছক্তি বিশেষঃ সএব ব্রহ্মাদীনামপি মোহনান্মায়া তাং জগৎকারণ শক্তিতোপি পরাবস্থামেকামংশাখ্যাং।" যোগ বলিতে শ্রীভগবানের শক্তিবিশেষকে বুঝায়। এই শক্তি ব্রহ্মা প্রভৃতিকেও মোহিত করিয়া রাখে বলিয়া ইহা মায়া। জগৎকারণ যে শক্তি, এই শক্তি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা অংশ নহে একা। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—"বিমলাদীনাং চিচ্ছক্তি বৃত্তীনাং পঞ্চমীং" বিমলা প্রভৃতি চিচ্ছক্তি বৃত্তি সমূহের ইনি অর্থাৎ এই যোগমায়া পঞ্চমী। শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী মহোদয় তাঁহার বৃহৎ বৈষ্ণবতোষিণী টীকায় শ্রীরাসলীলার প্রারম্ভে "যোগমায়া"র নিম্নরূপ সাতটী অর্থ করিয়াছেন—

১। পরাখ্য সচ্চিদানন্দ শক্তিবিশেষঃ।

২। যোগঃ ঐশ্বর্য্যং তদ্‌যুক্তা মায়া দয়া। * * রাস-ক্রীড়য়া স্বৈস্বৈশ্বর্য্যং কৃপাং

চ বিস্তারিতবান্। ঐশ্বর্য্যযুক্তা দয়া। রাসক্রীড়া দ্বারা শ্রীভগবান্ তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও দয়া, এই দুইই প্রকাশিত করিলেন।

৩। অপি শব্দাস্তাত্রৈবান্বয়ঃ, যোগ আত্মারামতা, মায়া আবরণাত্মিকা, কাপট্যং বা যোগযুক্তাং মায়াম্ উপসামীপ্যেণ নিত্যমাশ্রিতোঽপি ইতি তদানীং যোগো মায়াচ নাতিষ্ঠৎ কিন্তু নিজপদাব্জপ্রেমসম্পদ্বিস্তাররূপ সত্যস্বভাবো ব্যক্তোঽভূদিত্যর্থঃ। শ্রীরাসলীলার প্রথম শ্লোকে একটি "অপি" পদের প্রয়োগ আছে। সমগ্র বাক্যের কর্ত্তৃপদ যে, ভগবান, সাধারণতঃ সেই পদটির সহিত অন্বিত করিয়া এই "অপি" পদটির অর্থ করা হইয়া থাকে। তাহা না করিয়া "যোগমায়াকে" আশ্রয় করিয়া এই ব্যাক্যাংশের সহিত অন্বিত করিয়া তাহার অর্থ করা যায়। শ্রীভগবান আত্মারাম, কিন্তু এই আত্মা-রামতা গোপন করিয়া তিনি সচরাচর কাপট্য করেন। এই আত্মারামতা-যুক্ত কাপট্য, অন্যান্য স্থলে থাকিলেও রাসস্থলে তাহা ছিল না। রাসস্থলে শ্রীভগবানের নিজ পাদ-পদ্মের প্রেমসম্পদ বিস্তাররূপ যে সত্য স্বভাব তাহাই ব্যক্ত হইয়াছিল।

৪। যোগে সংযোগে যা মায়া যজ্ঞপত্নীষ্বিব বঞ্চনা তামুপাশ্রিতোঽপি ইতি তদানীং তস্য সঙ্গমে ময়া নিবৃত্তেত্যর্থঃ। সর্ব্বাভিরেব ব্রজসুন্দরীভিঃ সহ সাক্ষাৎ সংযোগ বিশেষ সিদ্ধেঃ সিদ্ধিং গতাভিরপি তৎপ্রাপ্তেঃ। সংযোগ বিষয়ে অর্থাৎ যখন কৃপা করিয়া মিলিত হয়েন সেই সময়ে শ্রীভগবানের একটি মায়া ও বঞ্চনা আছে। যজ্ঞপত্নীগণের সহিত যে মিলন, তাহাতে এই বঞ্চনা দেখা গিয়াছে। যদিও এই বঞ্চনার ভাব সর্ব্বত্র থাকে, কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণের সহিত মিলনে সেই বঞ্চনা ছিল না। প্রথমাবস্থায় এই বঞ্চনাভাবের কিছু কিছু প্রকাশ থাকিলেও শেষে তাহা নিবৃত্ত হইয়াছিল।

৫। যুনক্তি নিত্যং বক্ষসি সংযোগং প্রাপ্নোতীতি যোগায়া মা লক্ষ্মী স্তস্যাং নিত্যং বর্ত্তমানং তয়া সদা সেব্যমানোঽপীত্যর্থঃ। ইতি রাসক্রীড়া তয়া ন সম্পদ্যেত তৎ দুর্ল্লভা চেত্যাত্মাভিপ্রেতম্।

সর্ব্বদাই বক্ষস্থলে যিনি মিলন প্রাপ্ত হয়েন, তিনি যোগমায়া লক্ষ্মী। লক্ষ্মী কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সেব্যমান হইয়াও তিনি রাসক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন। রাসক্রীড়া

৬। যোগায় সংযোগায় মায়ঃ শব্দো যস্যাঃ সা যোগমায়া। বংশী।

৭। যোগস্য সম্ভোগস্য মায়োমানং পর্য্যাপ্তির্যস্যাং সা যোগমায়া। শ্রীরাধা অথবা যোগস্য সম্ভোগস্য মা লক্ষ্মীঃ সম্পত্তিরিতি যাবৎ তাং যাতি প্রাপ্নোতীতি যোগমায়া শ্রীরাধৈব তাং মনসা উপাশ্রিতঃ রাসক্রীড়ায়া স্তদ্ধেতুকত্বাৎ তৎপাদ্মে প্রসিদ্ধমেব। যোগের অর্থাৎ সম্ভোগের মায় অর্থাৎ পর্য্যাপ্তি যাঁহাতে তাঁহাকে যোগমায়া বা শ্রীরাধা বলে, অথবা সম্ভোগের যে মা অর্থাৎ সম্পত্তি, তাহাকে যিনি প্রাপ্ত হয়েন, তিনি অর্থাৎ শ্রীরাধা, সেই শ্রীরাধাকে মনের দ্বারা আশ্রয় করিয়া। ইহাতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে শ্রীরাধাই এই রাসক্রীড়ার হেতু। পদ্মপুরাণে ইহা কথিত হইয়াছে। 'যোগমায়া' বলিতে কোন কোন টীকাকার শ্রীবৃন্দাদেবীকে বুঝিয়াছেন। বৃন্দাদেবী ও পৌর্ণমাসী দেবীর কথা আমরা পরে আলোচনা করিব। শ্রীভগবানের তিন শক্তি শ্রী, ভূ ও লীলা। ইহার মধ্যে লীলা-শক্তিই প্রধান। এই লীলাশক্তিই শ্রীবৃন্দাবনে বৃন্দাদেবী নামে পরিচিত। আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে যে বচন উদ্ধার করিয়াছি তাহার প্রথম কথা এই যে যোগমায়া চিচ্ছক্তি। বিশ্বে ক্রিয়ান্বিত শক্তিসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি, তটস্থা জীবশক্তি, আর অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি। এই অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির অপর নাম স্বরূপ শক্তি। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীভগবানের স্বরূপে অর্থাৎ তাঁহার স্বপ্রকৃতিতে নিত্য সিদ্ধ অবস্থায় যে আনন্দ বা মাধুর্য্য আছে শ্রীভগবান তাহা আস্বাদন করিতেছেন। স্বরূপশক্তির দ্বারাই এই মাধুর্য্যের আস্বাদন হইয়া থাকে। শ্রীরাসলীলার আলোচনায় এই শক্তিত্রয়ের জ্ঞান অত্যন্ত আবশ্যক। মানুষের উদাহরণ লইয়া দেখা যাউক। আমি একজন মানুষ, জগতে নানারূপ কার্য্য করিতেছি ব্যবসায় করিতেছি, টাকা আনিতেছি, ঘর বাড়ী করিতেছি, বিষয় সম্পত্তি করিতেছি ইত্যাদি। এইটুকু বহিরঙ্গা শক্তির কার্য্য তাহার পর বসিয়া বসিয়া হিসাব করি-তেছি ও চিন্তা করিতেছি। যাহা করিলাম, তাহা কেমন হইল, ইহার পর আর কি করা যাইবে, এই সব চিন্তা যখন করিতেছি, তখন অবশ্য কর্ম্মের উন্মাদনা নাই। ইহা তটস্থা শক্তির কার্য্য। তাহার পর চিন্তাও শেষ হইয়া গেল। এখন আমি চুপ করিয়া আনন্দভোগ করিতেছি। এখন এমন অবস্থা যে আমি নিজেকেও ভুলিয়া গিয়াছি। নিজেকে না ভুলিলে আনন্দের বা মাধুর্য্যের ...

জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিনটি অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া এই তিন শক্তির বা একই শক্তির এই ত্রিবিধ প্রকাশের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। জাগ্রত অবস্থায় মানবের বহিরঙ্গা শক্তি প্রধানতঃ ক্রিয়া করে, স্বপ্নাবস্থায় তটস্থা শক্তি, আর সুষুপ্তি অবস্থায় স্বরূপ শক্তি প্রধানতঃ ক্রিয়া করে। 'প্রধানতঃ' এই কথাটি আবশ্যক, কারণ জাগ্রত বা স্বপ্নাবস্থাতেও স্বরূপ শক্তির যে ক্রিয়া হয় না তাহা নহে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় একথা স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, এই তিন ছাড়া, আরও এক অবস্থা তিনি বলিয়াছেন; এবং তাহাকে আর শক্তি না বলিয়া, তাহা প্রেমের স্বভাব, এইরূপ কথা বলিয়াছেন। তাহাকে তুরীয় বলিলেই হয়। সে অবস্থায় শক্তি অব্যক্ত। তাহার পরেই এই তিন শক্তির খেলা। লীলা হইয়াছে, শ্রীভগবানই লীলা করিয়াছেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। আমরা জাতীয় উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে কেবল যে তাহার সংবাদ পাইয়াছি তাহা নহে, তাহার স্পন্দনও পাইয়াছি। It is a sp'ritual heritage, and its memory resides in our Racial soul. এই লীলা ভক্তে আস্বাদন করে। ভক্তের কৃপায় উদ্বুদ্ধ হইয়া দার্শনিকগণ তাহার তত্ত্বালোচনা করেন। প্রধানতঃ লীলা তিনটি ভূমি হইতে আলোচিত হয়। প্রথমতঃ ইহা সংসারেরই ঘটনা, লীলা সৃষ্টি-প্রবাহেরই একটি প্রয়োজনীয় তরঙ্গ। দ্বিতীয়তঃ ইহা সংসারে ঘটিলেও ঠিক সংসারের ঘটনা নহে, জীব-চৈতন্যের বিকাশসাধনই ইহার উদ্দেশ্য। তৃতীয়তঃ ইহাকে সংসারের ঘটনা বলিয়া বুঝিলেও ঠিক বুঝা যাইবে না, জীব-চৈতন্যের বিকাশের ভূমি হইতেও ইহা ঠিক বুঝা যাইবে না, শ্রীভগবান তাঁহার স্বরূপে মাধুর্য্যানুভব করিবার জন্যই লীলার অভিনয় করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই তৃতীয় ভূমি হইতেই যোগমায়ার ও মায়ার তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। আমরা ক্রমশঃ তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

যোগমায়া, মায়া নহে। কিন্তু বাহির হইতে, অর্থাৎ সাধারণ জীবচৈতন্যের ভূমি হইতে দেখিলে, এই উভয়ের কার্য্যের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। যেমন আমরা চক্ষু দ্বারা রূপ দেখিতেছি, কর্ণের দ্বারা শব্দ শুনিতেছি, নাসিকার দ্বারা গন্ধের আঘ্রাণ পাইতেছি এবং এই দর্শন শ্রবণ আঘ্রাণ প্রভৃতি ব্যাপারের বা ক্রিয়ার হেতুস্বরূপ একটি

মোহাবেশ বা কল্পনা মাত্র। অথবা ইহা ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল-সৃষ্টির মত। জগন্মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য—এই শিক্ষা আমাদের সনাতনী শিক্ষা।

এই শিক্ষায় অভ্যস্ত মানুষ, 'অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ' যে ব্রহ্ম তাঁহার কথা অন্ততঃ পক্ষে তর্কযুক্তির দ্বারা বুঝিতে পারে। সুতরাং একদিকে মায়াবাদ আর একদিকে নির্গুণ ব্রহ্মবাদ, ইহাতে বিশেষ কোন গোলযোগ নাই। 'লীলা' লইয়াই গোলযোগ। লীলাবাদ এইরূপ—ব্যাসদেব বলিলেন—"মধুসূদন, আমি চক্ষু দ্বারা তোমাকে দেখিতে চাই। উপনিষৎসমূহ সত্য, পরব্রহ্ম, জগৎকারণ, জগৎপতি, বলিয়া যাহার নির্দ্দেশ করেন, সেই যে তোমার রূপ, সেই রূপ আমার দৃষ্টিগোচর হউক।"

"ত্বামহংদ্রষ্টুমিচ্ছামি চক্ষুর্ভ্যাং মধুসূদন !
যত্তৎ সত্যং পরং ব্রহ্ম জগদ্‌যোনিং জগৎপতিম্।
বদন্তি বেদশিরসশ্চাক্ষুষং নাথ ! মেহস্তুতৎ ॥"
(পদ্মপুরাণ)

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"তোমাকে আমার বেদ-গোপিত স্বরূপ দেখাইব, দর্শন কর।" তাহার পর ব্যাসদেব কিশোর-মূর্ত্তি, নবঘন শ্যাম, গোপীগণ-পরিবৃত, গোপ বালকদিগের সহিত হাস্যপরায়ণ, কদম্বমূলে সমাসীন, পীতবসন গোপরূপ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন—

"পশ্য ত্বং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতম্।
ততোঽপশ্যমহং ভূপ ! বালং কালাম্বুদপ্রভম্।
গোপকন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈঃ।
কদম্বমূলআসীনং পীতবাসসমদ্ভুতম্।"

এই প্রকারের রূপ-দর্শনের পরেই যদি কথা শেষ হইয়া যাইত, তাহা হইলে আমরা এই দর্শনের যাহা হউক এক প্রকার অর্থ করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা হইল না। এই প্রকারে দর্শন দেওয়ার পর ভগবান্ বলিলেন—"তুমি অলৌকিক, সনাতন, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, পূর্ণ ও পদ্মপলাশলোচন, এই যে আমার রূপ দর্শন করিলে, ইহার পর আর তত্ত্ব নাই। বেদগণ এইরূপকেই সর্ব্বকারণকারণ, সত্য,

"যদিদং মে ত্বয়া দৃষ্টং রূপঃ দিব্যং সনাতনম্।
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।
পূর্ণং পদ্মপলাশাক্ষং নাতঃ পরতরং মম॥
ইদমেব বদন্ত্যেতে বেদাঃ কারণ-কারণম্।
সত্যং ব্যাপি পরানন্দং চিদ্‌ঘনং শাশ্বতং শিবম্॥

আমরা রূপ দেখিতেছি, ব্যাসদেবও দেখিলেন। আমরা প্রতিনিয়ত যে সমুদয় রূপ দেখি তাহা অনিত্য এবং কতকগুলি হেতু বা কারণের দ্বারা সিদ্ধ হয়; অর্থাৎ তাহা স্বতঃসিদ্ধ ও স্বয়ং প্রকাশ নহে। ব্যাসদেব কর্তৃক পরিদৃষ্ট এই রূপও যদি সেই প্রকারের হইত, তাহা হইলে আমরা তাহাকেও মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু এই রূপ সকল কারণের কারণ, ইহার পরে আর তত্ত্ব নাই। অর্থাৎ—

"অনাদেয়মহেয়ঞ্চ রূপং ভগবতো হরেঃ।
আবির্ভাব তিরোভাবাবস্যোক্তে গ্রহমোচনে॥
"নিত্যাবতারো ভগবান্ নিত্যমূর্ত্তির্জগৎপতিঃ।
নিত্যরূপো নিত্যগন্ধো নিত্যৈশ্বর্য্য সুখানুভূঃ॥"

শ্রীভগবান হরির রূপ অনাদেয় ও অত্যাজ্য। উহার আবির্ভাব ও তিরোভাবই গ্রহণ ও মোচন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। জগৎপতি ভগবানের অবতার, মূর্ত্তি, রূপ, গন্ধ, ঐশ্বর্য্য, সুখ এবং অনুভব সকলই নিত্য। "নিত্য" এই কথাটির তাৎপর্য্য বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ আজকাল "ভগবদ্দর্শন" বাজারে বিক্রীত হইতেছে। একজন সাধু ছোট ছেলে মেয়েদের এবং অনেক স্ত্রীলোককে আবিষ্ট করিয়া বৃন্দাবন দেখাইতেন। তাঁহার অনেক শিষ্য হইয়াছিল। একদল লোক টিকা করিয়া ছয় মাসে ভগবদ্দর্শন করাইয়া থাকে। এই যে দর্শন, ইহা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কতকগুলি চিন্তা-চিত্র দর্শন মাত্র। এই কল্পনামূর্ত্তি আবিষ্ট অবস্থায় দর্শন হয়। তাহার পর তাহার ক্ষীণ স্মৃতি মাত্র থাকে। ইহা ভগবদ্দর্শন নহে, পক্ষান্তরে এইরূপ দর্শন মানবের ধর্ম্মজীবনের পক্ষে বড়ই ক্ষতিকারক। এইবার দর্শন কিরূপ তাহা বলিতেছি।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হইয়া লীলা করিলেন। ব্রজবাসিগণ সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন ও বিরহ। মথুরা যাওয়ার

তিনমাস পরে শ্রীকৃষ্ণ অকস্মাৎ ফিরিয়া আসিলেন। ব্রজবাসিগণের মনে হইল আমরা কৃষ্ণের সহিত যেমন বিহার করিতাম তেমনই বিহার করিতেছি। উদ্ধবের নিকট যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ শ্রবণ করেন সেই সময়েই তাঁহার ব্রজে প্রাদুর্ভাব হয়, শ্রীরূপ গোস্বামী এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে সেই সময়ে ব্রজবাসিগণের মনে হইল যে শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কখনই যান নাই, তবে যে মথুরা গিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিরহ যাতনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা কি ? তাহা আমাদের স্বপ্ন মাত্র। নিত্য বস্তুর যে দর্শন তাহাও নিত্য অর্থাৎ অনিত্য দেহেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাহার দর্শনই হয় না—যদি দর্শন হয় তাহা হইলে একান্ত-বিরহ হয় না।

"অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম, যেন জাম্বূনদ হেম,
এ প্রেম নৃলোকে নাহি হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য়॥

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে নারদের ভগবদ্দর্শনের কথা আছে ; ব্যাসদেবের ভগবদ্দর্শনের কথা পদ্মপুরাণ হইতে বলা হইল। ব্রজবাসিগণের দর্শন সম্বন্ধে শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয়ের সিদ্ধান্তও বলা হইয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের নিকট না হইয়া যুগপৎ অনেকের নিকট হইলেই তাহাকে 'লীলা' বলে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও আমরা বিশ্বরূপ দর্শনে দেখিতে পাই যে ভগবান অর্জ্জুনকে দিব্য চক্ষু দেওয়ার পর তবে তিনি বিশ্বরূপ দেখিতে পাইলেন।

তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম যে ভগবান্ তাঁহার স্বরূপের কৃপাশক্তি দ্বারা ভক্তগণের নয়নদ্বয়ের গোচরীভূত হইয়া থাকেন। যিনি দর্শন করেন তিনি সেই স্বরূপের কৃপাশক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহেন। "যমেবৈষ বৃণুতে" এই শ্রুতিমন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। এ বিষয়ে নানা গ্রন্থে প্রমাণ বচন পাওয়া যায়।

"ততঃ স্বয়ং প্রকাশত্বশক্ত্যা স্বেচ্ছা প্রকাশয়া।
সোঽভিব্যক্তো ভবেৎ নেত্রে ন নেত্রবিষয়ত্বতঃ॥

লঘু ভগবতামৃত॥

"নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবান্ ঈক্ষ্যতে নিজ শক্তিতঃ।
তামৃতে পরমাত্মান: কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্॥"

"সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ স্যাৎ কৃষ্ণোঽধোক্ষজোঽপ্যসৌ ।
নিজশক্তেঃ প্রভাবেন স্বং ভক্তান্ দর্শয়েৎ প্রভুঃ ॥

'সেই ভগবান নিজ ইচ্ছায় প্রকাশমানা স্বয়ং-প্রকাশ শক্তি দ্বারা নয়নে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। তিনি যে নেত্রের বিষয় তাহা নহে। ভগবান্ স্বভাবত অব্যক্ত হইয়াও নিজ শক্তি দ্বারা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন। সেই স্বরূপশক্তি ব্যতীত কে অপরিমেয় প্রভু পরমাত্মা হরিকে দেখিতে পায়? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সুতরাং অধোক্ষজ হইয়াও স্বীয় শক্তি প্রভাবে ভক্তজনের নয়নে আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকেন।'

এই স্বয়ং-প্রকাশ শক্তিই যোগমায়া। এই যোগমায়ার দ্বারাই লীলা হয়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টই কথিত হইয়াছে।

"যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥

ভাগবত ৩।২।১২

আচার্য্যগণ এই শ্লোকটির নানাস্থানে নানারূপে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যোগমায়ার কার্য্য বুঝিতে হইলে এই শ্লোকটিকে ভালরূপে আলোচনা করিতে হইবে। শ্লোকটীর সাধারণ অর্থ নিরূপণের জন্য ইহার পূর্ব্বের শ্লোকটিও আবশ্যক। পূর্ব্বের শ্লোকটি এই—

"প্রদর্শ্যাতপ্ততপসামবিতৃপ্তদৃশাং নৃণাং।
অদায়ান্তরধাদ্যস্তু স্వবিম্বং লোকলোচনং॥"

দুইটি শ্লোকের অর্থ এই। শ্রীকৃষ্ণ এতদিন পর্য্যন্ত লোকদিগকে আপনার মূর্ত্তি প্রকৃষ্টরূপে দর্শন করাইয়া এক্ষণে লোকলোচনস্বরূপ 'স্ববিম্ব' (স্বমূর্ত্তি বা শ্রীবিগ্রহ) তাঁহাদের নেত্র-সন্নিধান হইতে যেন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আপনি অন্তর্হিত হইয়াছেন। লোকেরা তাঁহাকে অনেকদিন দর্শন করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাদের তপস্যা না থাকাতে নয়নের পরিতৃপ্তি জন্মে নাই। সেই মূর্ত্তি অতি আশ্চর্য্য ছিল, ভগবান্ আপন যোগমায়ার বল প্রদর্শন করাইয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন; সেই মূর্ত্তি মর্ত্ত্যলীলার উপযুক্ত ও সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা ছিল এবং আপনিও তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন; অধিকন্তু সেই মূর্ত্তির অঙ্গসকল এরূপ শোভনীয় ছিল যে ভূষণসকলকেও ভূষিত করিত।

প্রথমে যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত-দার্শনিক শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এইরূপ। শ্রীকৃষ্ণ স্বযোগমায়া বা পরাখ্যা স্বশক্তির বল বুঝাইবার জন্য মর্ত্ত্যলীলার উপায়ভূত যে 'বিম্ব' প্রকটিত করিলেন, তাহা তাঁহার নিজেরই অর্থাৎ তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইলেও তাঁহার বিস্মাপন বা পরমাশ্চর্য্যকর। "বিম্ব" এই কথাটি লইয়া আলোচনা করিতে হইবে। বলদেব বলেন "তাদৃগাকৃতিমন্তরা মনুষ্যেষু তা মনোজ্ঞলীলা ন স্ফুরিত্যর্থঃ। মনুষ্যরীতিচ্ছন্নাঃ পারমৈশ্বর্য্যগর্ভা লীলাঃ খল্বধরস্থচিত্রমুকুরবৎ অতিচারুত্বভাজঃ, অতদগর্ভাঃ কেবলনরলীলাস্তু পারদালিপ্তাধরমুকুরবৎ নানন্দপ্রদর্শিকাঃ, ইতি নরাকৃতেস্তদ্বিম্বস্য তৎপরমোপযোগিত্বমিতি ভাবঃ।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণলীলায় যে বিগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই শ্রীবিগ্রহপ্রকাশ ব্যতীত সেরূপ মনোজ্ঞ লীলা কখনও হয় নাই। এই যে লীলা ইহা মনুষ্যরীতি অবলম্বনে হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহার ভিতরে পরমেশ্বরতাই প্রকটিত। অধরের প্রতিবিম্বযুক্ত মুকুর যেমন সুন্দর, নরলীলাও তদ্রূপ। কেবল নরলীলা, পারদাবরণহীন মুকুরের ন্যায় প্রতিবিম্বহীন হওয়ায় আনন্দপ্রদর্শিকা নহে। নরাকৃতিই সেই বিম্বের পরমোপযোগী।

শ্রীরূপ-গোস্বামী মহোদয় প্রথমশ্লোকটির যে কারিকা করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"যদ্‌বিম্বং মর্ত্ত্যলীলানাং ভবেদৌপয়িকং পরম্।
পূর্ব্বপদ্যস্থিতং বিম্বং যৎপদেনানুকৃষ্যতে॥
বিবিধাশ্চর্য্যমাধুর্য্যবীর্য্যৈশ্বর্য্যাদি সম্ভবাৎ।
স্বস্য দেবাদিলীলাভ্যো মর্ত্ত্যলীলা মনোহরাঃ॥
ধ্বন্যতে বিম্বশব্দেন সদ্‌গুণাবলিশালিনাম্।
সকলস্বস্বরূপাণাং মূলত্বং তস্য সর্ব্বথা॥
অতস্তদেব নিঃশেষগুণরূপাস্পদত্বতঃ।
বিচিত্র নরলীলানামতিযোগ্যমুদীর্য্যতে॥
স্বযোগমায়া চিচ্ছক্তির্বলং তস্যাঃ সমর্থতা।
এতদ্ দর্শয়তা সাক্ষাৎ কুর্ব্বতা প্রকটীকৃতম্॥
অহো মদীয় চিচ্ছক্তেঃ প্রভাবং পশ্যতাদ্ভুতম্।
দিব্যাতিদিব্যলোকেষু যদগন্ধোঽপি ন সম্ভবেৎ॥

তজ্জগন্মোহনং রূপং যয়াবিষ্কৃতমীদৃশম্।
স্বযোগমায়েত্যাস্য ভাবোঽয়মিতি গম্যতে॥
স্বস্যাত্মনোঽপি পরমব্যোমেশাদ্যাত্মদর্শিনঃ।
বিস্মাপনং নবোদ্দামচমৎকৃতিকরং পরম্॥
সৌভগর্দ্ধির্মহাশ্চর্য্যং সৌন্দর্য্যপরমাবধিঃ।
তস্যাঃ পরং পদং নিত্যোৎকর্ষসম্পদ্বরাস্পদম্॥
যৎ তু কৌস্তুভমীনেন্দ্রকুণ্ডলাদ্যং হি ভূষণম্॥
তস্যাপি ভূষণাত্মনাস্যেতি সতি বিগ্রহে।
তস্য শ্রীবিগ্রহস্যেদম্ অসমোর্দ্ধত্বমীরিতম্॥
সচ্চিদানন্দসান্দ্রত্বাৎ দ্বয়োরেবাবিশেষতঃ।
ঔপচারিক এবাত্র ভেদোঽয়ং দেহদেহিনোঃ॥

পূর্ব্বপদ্যে 'বিম্ব' বলিয়া একটি পদ আছে। এই পদ্যের 'যৎ' পদটি সেই 'বিম্ব' পদটির পরিবর্ত্তে বসিয়াছে। যে বিম্ব বিবিধ মর্ত্ত্যলীলার অতিশয় উপযোগী। মর্ত্ত্যলীলা শ্রীভগবানের দেবাদিলীলা অপেক্ষাও মনোহারিণী, কারণ এই মর্ত্ত্যলীলায় নানাবিধ আশ্চর্য্য মাধুর্য্য, বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যাদির অভিব্যক্তি হয়। 'বিম্ব' এই শব্দের দ্বারা সদ্গুণাবলিশালী এবং সকল স্বস্বরূপগণের (মহাবৈকুণ্ঠ-নাথ পর্য্যন্তানাং—ইতি বলদেবঃ) মূল যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকেই বুঝাইতেছে। সেই বিম্বই গুণ ও রূপের চরম স্থান সুতরাং বিচিত্র নরলীলার অতিশয় যোগ্য। স্বযোগমায়া বলিতে চিচ্ছক্তিকে বুঝায়; বল শব্দের অর্থ, তাহার অর্থাৎ সেই যোগমায়ার সমর্থতা।

"আমার যোগমায়ার অদ্ভুত প্রভাব দর্শন কর, দিব্যাতিদিব্যলোকেও ইহার গন্ধমাত্র নাই" এইরূপ বলিয়া সেই যোগমায়া-সামর্থ দেখাইবার জন্য জগন্মোহন রূপ প্রকটিত করিলেন। এই রূপ তাঁহার নিজের এবং পরমব্যোমনাথাদিরও চমৎকারক, সৌন্দর্য্য-রাশির পরাকাষ্ঠা এবং নিত্য উৎকর্ষ-সম্পত্তির পরমাশ্রয়। এই বিম্ব কৌস্তুভ ও মকর-কুণ্ডলাদি ভূষণেরও ভূষণ-স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ অসমোর্দ্ধ অর্থাৎ তাহার সমান বা অধিক নাই। ভগবান ও তাঁহার শ্রীবিগ্রহ উভয়ই সচ্চিদানন্দঘন, অতএব দেহ ও দেহী, ইহাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই।

শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয়ের কারিকা আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার এই কারিকা অবলম্বন করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যার দ্বারা কারিকার তাৎপর্য্য আরও বিশদ হইয়াছে বলিয়া আমরা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সেই স্থানটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিলাম।

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন,
যে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন,
বিশ্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব-পরিণতি,
তাঁর শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপরতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হইতে॥
রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
এই রূপ তার নিত্য ধাম॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তার উপর ভ্রূধনু-নর্ত্তন।
তেরছ নেত্রান্ত-বাণ, তার দৃঢ়-সন্ধান,
বিন্ধে রাধা গোপীগণ-মন॥
কোটি-ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহা যে স্বরূপগণ,
তা-সভার বলে হরে মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥"

যোগমায়া সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইল, কিন্তু কিছুই বলা হইল না। তাহার কারণ লেখকের অক্ষমতা। প্রচীন আচার্য্যগণ এ সম্বন্ধে কত কথাই বলিয়া গিয়াছেন,

আমাদের তাহা ধারণাতীত। আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম সংক্ষেপে তাহার সারমর্ম্ম নিবেদন করিতেছি। "দেহ ও দেহী" এই দুইয়ের মধ্যে যেখানে ভেদ নাই অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ, সেই বিগ্রহ প্রকটনই যোগমায়ার শেষ কার্য্য। এই শেষ কার্য্যটি মনে রাখিয়া 'যোগমায়া' কি আলোচনা করা যাউক। আমার দেহ আছে, আপনার দেহ আছে; আমাদের উভয়েরই মনে একটি ভাবের উদয় হইল। মনে করুন একটি গান করিতে ইচ্ছা হইল। আপনার গলা বেশ ভাল, আপনি প্রাণ ভরিয়া গান করিলেন। আমার গলা অত্যন্ত খারাপ, চেষ্টা করিলাম, মনের মত গাহিতে পারিলাম না, লজ্জিত হইলাম; আপনারা উপহাস করিলেন। তাহার পর একটি ছবি আঁকিতে ইচ্ছা হইল, আপনার হাত কেমন নিপুণ, আপনি সুন্দর আঁকিলেন, আমি কিছুই করিতে পারিলাম না। আমি দেহী আপনিও দেহী, আমাদের উভয়ের মনে একই প্রকারের ইচ্ছার উদ্ভব হইল। আপনার দেহ উপযুক্ত, আপনার ইচ্ছা দেহের দ্বারা পূর্ণ হইল। আমার দেহ অনুপযুক্ত, আমার ইচ্ছা দেহের দ্বারা পূর্ণ হইল না। এই গেল স্থূলদেহের বা অন্নময় কোষের কথা। আবার সকলের ইচ্ছা, কল্পনা ও চিন্তা এক প্রকার নহে। আপনার মনে অনায়াসে যে ভাব ও কল্পনার উদয় হয়, শত চেষ্টা করিয়াও আমি তাহা আমার মধ্যে জাগাইতে পারিলাম না। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে আপনার সূক্ষ্ম দেহের বা মনোময় কোষের যে উপযুক্ততা আছে, আমার তাহা নাই। এইবার জন্মান্তরের মধ্য দিয়া কর্ম্মের বিধানে মানবের আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতি কি প্রকারে সাধিত হইতেছে, তাহা চিন্তা করা যাউক। এবার যে দেহ পাইয়াছি, তাহার সাহায্যে ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বে গান গাহিতে পারিলাম না। চেষ্টা চলিতেছে, ইচ্ছাও আছে; শত বিফলতার মধ্য দিয়া চেষ্টা করিতেছি। আগামী জন্মে যে দেহ পাইব, তাহা সঙ্গীতের পক্ষে অনেকটা উপযুক্ত হইবে। ক্রমশঃ শরীরের উন্নতি হইতে হইতে বা ক্রমশঃ ইচ্ছা ও চেষ্টার ফলে উপযুক্ত হইতে উপযুক্ততর দেহ পাইতে পাইতে একদিন চরমসীমায় উপস্থিত হইব। তাহা হইলে দেহ ও দেহীর ভেদ ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। প্রথম অবস্থায় দেহ ভাব-প্রকাশের যতটা অনুপযুক্ত শেষে আর ততটা অনুপযুক্ত, থাকিতেছে না। এই প্রকারে দেহ ও দেহী ক্রমশঃ কাছাকাছি হইতে হইতে একদিন ইহাদের ভেদ নিরস্ত হইবে। যেখানে বা যাঁহাতে দেহ ও দেহীর ভেদ নাই, স্বরূপ ও বিগ্রহ যেখানে এক হইয়াছে,

সেই খানে আমরা নিত্য পুরুষের সাক্ষাৎ পাইব। সেখানে জড় চেতনেরও ভেদ নাই। তাহা হইলে জগতের এই যে ক্রমবিকাশ,—মূর্ত্তির এই যে ক্রমিক স্ফূর্ত্তি ও বৈচিত্র, ইহার পুরোদেশে সেই নিত্যপুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। পুরোদেশে দাঁড়াইয়া আছেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন কিন্তু আমরা আর দুইটি কথা বলিব। একটি কথা এই যে কেবল দূরে দাঁড়াইয়া কেন? যিনি শেষ, তিনি এইখানে এখনই রহিয়াছেন, ভালরূপে রহিয়াছেন, কেবল যে রহিয়াছেন তাহা নহে ভিতর হইতে ধাক্কা মারিতেছেন। সকল বাধা দূর করিয়া সকল আবরণ ভেদ করিয়া তিনি ফুটিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টা সকল সময়েই চলিতেছে। দ্বিতীয় কথা এই—সেই চেষ্টা আপনার মধ্যেও আছে, আমার মধ্যেও আছে; চেতন বা অচেতন, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলের মধ্যেই আছে। কিন্তু সেই চেষ্টাকারী তিনি এক। আমাতেও তিনি, আপনাতেও তিনি, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আকাশে বাতাসে তিনি। এই যে ক্রিয়া ইহাই যোগমায়ার ক্রিয়া। মায়া বহিরঙ্গ হউক, জগৎ দুঃখময় জ্বালাময় হউক, যতই আবরণ ও বিক্ষেপ থাকুক, তিনি রহিয়াছেন কেবল দূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন তাহা নহে, কাছে ও ভিতরে থাকিয়া ধাক্কা মারিয়া ভবকোলাহলের ভিতর ভাবের বাঁশির মধুর আওয়াজটি ফুটাইয়া তুলিতেছেন—এই বাঁশি যে শোনে সেই লীলা দেখে। যোগমায়া সেই নিত্যবিগ্রহের সেবা করিতেছেন, সেই সেবা যে দেখে সেই লীলা দেখে। নিত্যমনুষের সঙ্গ পাইয়া সে নিত্য হইয়া যায়। কেহ এক আনা কেহ দুই আনা দেখে। ষোল আনা যিনি দেখেন তিনিই দেখেন; আর যাঁহারা দেখেন তাঁহারা তাঁহাদের দেখার মধ্য দিয়া ঐ ষোল আনা দেখার যিনি কর্ত্রী তাঁহারই সাহায্য করেন। ঐ ষোল আনা দেখার কর্ত্রীর নাম যোগমায়া। আসুন আমরা তাঁহার শরণাগত হই।

হ্লাদিনী শক্তি ও তাহার বিলাস

(খ) হ্লাদয়তে

"ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে স্বভক্ত পোষণ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে যে দশটি তত্ত্বের বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটির নাম 'পোষণ'। ইহার অর্থ 'অনুগ্রহ'—শ্রীভগবানের অনুগ্রহ। শ্রীরাসলীলার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে, "অনুগ্রহায় ভক্তানাং" ভক্তগণকে অনুগ্রহ করাই শ্রীরাসলীলা প্রভৃতি লীলার উদ্দেশ্য। 'ভক্তানুগ্রহ' ও 'ভূতানুগ্রহ' একই কথা। ভক্তের প্রতি যে অনুগ্রহের অমৃতধারা বর্ষণ করা হয়, তাহা ভক্ত আত্মসাৎ করেন না, অথবা ভক্তের নিকট উপস্থিত হইলেই তাহা ফুরাইয়া যায় না; পরন্তু, ভক্তকে আশ্রয় করিয়া তাহার বেগ ও পরিমাণ বিশেষরূপে বাড়িয়া যায়। সুতরাং, ভক্ত ভূতানুগ্রহের প্রণালীমাত্র, ভক্তহৃদয় আশ্রয় করিয়া এই অনুগ্রহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। 'ভক্তানুগ্রহ' বা 'ভূতানুগ্রহ'ই রাসাদিলীলার উদ্দেশ্য। অসুর সংহার প্রভৃতি কার্য্য আনুষঙ্গিক, অর্থাৎ ঐ সকল কার্য্য আপনা আপনিই হইয়া যাইতেছে। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন, বিষ্ণুশক্তির দ্বারা ভূভারহরণ ও অসুর-মারণাদি কার্য্য হইয়া থাকে, ইহা স্বয়ং ভগবানের কার্য্য নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীবৃন্দাবনলীলায় পূতনা বধ বা পূতনামোক্ষণের কথা বলা হইয়াছে। যাঁহারা বিষ্ণুশক্তির ভূমি হইতে ব্যাপারটি দেখিবেন, তাঁহারা বলিবেন পূতনা বধ হইয়া গেল, কিন্তু যাঁহারা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলার ভূমি হইতে দেখিবেন, তাঁহারা বলিবেন পূতনামোক্ষন হইল অথবা রাক্ষসী পূতনা সদ্গতি লাভ করিল। কিন্তু পূতনার কথা অনেক পূর্ব্বের কথা, আমরা শ্রীরাসলীলার কথা বলিতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচ্য তত্ত্বের মধ্যে 'পোষণ' যেমন একটি তত্ত্ব, 'স্থিতি' বা 'স্থান' তেমনই আর একটি তত্ত্ব। ইহার অর্থ, নিজ নিজ মর্য্যাদাপালনের দ্বারা ক্রমোৎকর্ষ। "উতি" আর একটি তত্ত্ব, ইহার অর্থ 'কর্ম্মবাসনা'।

স্থিতির্বৈকুণ্ঠবিজয়ঃ পোষণং তদনুগ্রহঃ।
মন্বন্তরাণি সদ্ধর্ম্ম উতয়ঃ কর্ম্মবাসনাঃ ॥

স্থিতি, পোষণ ও উতি, এই তিনটি তত্ত্বের মধ্যে পোষণই মূল তত্ত্ব। এই তত্ত্বে দৃষ্টি বা চিন্তা

দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ করিলে, আশ্রয় তত্ত্ব বা দশম তত্ত্ব যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার সকল লীলার মূলীভূত শ্রীরাসলীলা বুঝিতে পারিব।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের টিকার যে প্রথম শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার শেষে বলা হইয়াছে, "স নন্দসূনুস্তনুতাং মুদং নঃ" সেই নন্দের নন্দন আমাদের সকলের আনন্দ বিস্তার করুন। তাঁহার এই আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ যদি বিফল হয়, তাহা হইলে শ্রীরাসলীলার ভিতর প্রবেশ করিতে পারা যাইবে না।

প্রত্যেক লোকের হৃদয়ের ও মনের অবস্থা ঠিক্ একরূপ নহে ; হৃদয় ও মনের একটি বিশেষরূপ অবস্থা না হইলে এই রাসলীলার তত্ত্ব হয়ত চেষ্টা করিলে কিছু কিছু বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু লীলার আস্বাদন হয় না ; একথা শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী ও শ্রীমজ্জীবগোস্বামী তাঁহাদের টীকায় বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম কথা "শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ"। শ্রীল সনাতন-গোস্বামী মহাশয়, এই কথাটি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন "শ্রীব্যাসদেব বদরিকা-শ্রমে মহতী তপস্যা আচরণ করিয়াছিলেন, শ্রীশুকদেব সেই তপস্যার ফলস্বরূপ পুত্র ; কাজেই শ্রীশুকদেব সর্ব্বজ্ঞ ও ভগবৎপ্রেমরসময়—তিনি যখন বক্তা, তখন এই আখ্যান অর্থাৎ শ্রীরাসলীলা অতি উচ্চ অনুরাগময়, অতএব আমাদেরও সেইরূপ ভক্তির সহিত ইহা শুনিতে হইবে।" শ্রীমজ্জীব-গোস্বামী এই ব্যাখ্যারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন, তিনি ইহার সঙ্গে বলিয়াছেন যে "বাদরায়ণি উবাচ" বা "বাদরায়ণি বলিলেন" একথা অন্যান্য লীলা বা আখ্যানের প্রারম্ভে আছে বটে, কিন্তু এই নামের যাহা নিরুক্তি বা ধাতুপ্রত্যয়গত অর্থ, তাহা এই শ্রীরাসলীলাবর্ণনাতেই সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছে। শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীর টীকা এই—

"বদরিকাশ্রমে মহা তপশ্চরণাদ্ভগবান্ শ্রীব্যাসো বাদরায়ণঃ তস্য তপঃফলরূপ পুত্র ইতি সর্ব্বজ্ঞত্ব শ্রীভগবৎ প্রেমরসময়ত্বাদিকং ধ্বনিতং, তেনোক্তত্বাদস্যাখ্যানস্য সর্ব্বথা যথা সাধনসাধ্যত্বং, প্রৌঢ়ানুরাগ-ময়ত্বং চাভিপ্রেতং ভক্ত্যৈতচ্ছ্রোতব্যমিতি ভাবঃ।"

শ্রীজীব গোস্বামী বলিলেন—"বদরিকাশ্রমে মহাতপশ্চরণাৎ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ বেদব্যাসঃ তচ্চ তপঃ শ্রীকৃষ্ণোপাসনলক্ষণমেব। সর্ব্বজ্ঞস্য তস্য পরমোত্তমে তস্মিন্নেব ব্যবসায়ৌচিত্যাৎ তস্য তাদৃশতপঃ ফলরূপঃ পুত্র ইতি সর্ব্বজ্ঞত্ব শ্রীভগবৎপ্রেমরসময়ত্বাদিকং তত্রাধিকং যদ্যপি স্ফুরতি তথাপি তন্নামনিরুক্তের্ম্মাহাত্ম্যপর্য্যবসানমত্রৈব জাতং ততস্তাদৃশ ভক্ত্যৈবৈতৎ শ্রোতব্যমিতি ব্যঞ্জিতম্॥"

শ্রীজীবগোস্বামীকৃত এই টীকার একটি কথা ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। বাদরায়ণ ব্যাসের উপসনা সম্বন্ধে বলা হইল যে ব্যাস সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং পরমোত্তম যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার উপাসনাই ব্যাসের পক্ষে স্বাভাবিক। এই কথা শুনিয়া কোন সাম্প্রদায়িক লোক বলিতে পারেন, "কৃষ্ণোপাসনা

সর্ব্বোত্তম আর অন্য উপাসনা নিকৃষ্ট ?" শ্রীজীবগোস্বামীর যাহা উদ্দেশ্য তাহা বুঝিতে হইলে কেবল কথায় আবদ্ধ না থাকিয়া, কথার দ্বারা সূচিত যে ভাব ও তত্ত্ব তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। "শ্রীকৃষ্ণ, উপাস্যের মধ্যে সর্ব্বোত্তম" ইহা বুঝিতে হইলে 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিতে কি বুঝায় তাহা চিন্তা করিতে হইবে। ভগবান্ সম্বন্ধে সকলের ধারণা একরূপ নহে। একই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক মানুষ মুখে একই কথা বলে, কিন্তু প্রত্যেকেরই ভিতরে—হৃদয়ে, মনে ও প্রাণে,—কি একই তত্ত্বের বা বস্তুর উপলব্ধি হয় ? তাহা হয় না, এবং হইতে পারে না। মানবের আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ হইতেছে, এই ক্রমবিকাশের পথ একটি ক্রমোন্নত পর্ব্বতপৃষ্ঠের মত, এক একজন এক একস্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, যে যতদূর উন্নত হইয়াছে, তাহার ধারণাও ঠিক ততদূর উন্নত হইয়াছে। "কৃষ্ণ" বলিতে ভগবান্ বুঝায়, আবার 'বিধাতা' 'বিভু' 'ঈশ্বর' প্রভৃতি পদের দ্বারাও সেই ভগবান্‌কেই বুঝায়। কিন্তু এক একটি নামের সহিত সেই অনন্তের এক একটি বিশেষ ভাব প্রকাশিত হয়। 'কৃষ্ণ' বলিতে তাঁহার যে ভাবটি বিশেষরূপে সূচিত হয়, তাহা বেদের 'আনন্দব্রহ্ম' বা 'রসব্রহ্ম' বা 'মধুব্রহ্ম' এই সব কথার দ্বারা প্রকাশিত হয়। তিনি আনন্দ, তিনি রস, তিনি সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহার অনন্ত অসীম মাধুর্য্য "ত্রিজগন্মানসাকর্ষী"—ত্রিজগতের সকলের মনপ্রাণ আকর্ষণ করে ; তিনি "মুরলীকলকূজিতঃ" মোহন বাঁশির অস্ফুট ও মধুর কূজনে আমাদিগকে অসীমের অভিমুখ করেন। এইভাবে শ্রীভগবান্ আসিয়া যখন আমাদের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময়ে তিনি কৃষ্ণ। সকলেই কি এইভাবে তাঁহাকে অনুভব করিয়াছে ? মানুষ তাঁহাকে কখন কর্ম্মফলদাতারূপে, কখন দানববিনাশকারী-রূপে, কখন বা 'ভীষণং ভীষণানাং'—যাবতীয় ভয়ঙ্কর বস্তুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কররূপে উপলব্ধি করিয়াছে—অবশ্য, এই সমুদয় কথা বা ভাব যে মিথ্যা, তাহা নহে, কিন্তু সর্ব্বশেষে তাঁহার সহিত পরিচয় হইল—শ্রীকৃষ্ণরূপে। এই ভাবটি নিত্য, ইহা সকল দেশেই সম্ভব, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সাধকের পক্ষে সম্ভব। বেদের আনন্দ ব্রহ্ম ও রসব্রহ্ম বিশ্বজনীন, বেদের বা বেদান্তের সিদ্ধান্তের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত বুঝিলে আমরা দেখিব যে শ্রীমদ্ভাগবতের লীলাও বিশ্বজনীন, সুতরাং "শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা"কে সর্ব্বোত্তম বলিয়া শ্রীজীবগোস্বামী যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা নহে ; তিনি এক বিশ্বজনীন মূল সত্যের পরিচয় দিয়াছেন।

"শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ" এই পাঠই সাধারণ, কোন কোন প্রদেশের গ্রন্থে "শ্রীশুক উবাচ" এ পাঠও আছে। শ্রীজীব গোস্বামী তাহাও ধরিয়াছেন, এবং তাহার নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"শ্রীশুক উবাচেতি পাঠে তু পরমোজ্জ্বলরসস্বাভাব্যেন পরমকোমলালাপতা দর্শিতা, ততস্তাদৃশ চিত্তকতৈব শ্রোতাব্যমিদমিতি ব্যঞ্জিতম্।"

শুক-পক্ষীর কণ্ঠস্বর বড়ই কোমল, বড়ই মধুর। কণ্ঠস্বরের এই কোমলতা কি কেবল একটি

বাহিরের ব্যাপার? তাহা নহে। যাহার চিত্তে উজ্জ্বল রসের ক্রিয়া অধিক, তাহার আলাপ স্বভাবতঃ কোমল ও মধুর। উজ্জ্বল রসই আদিরস, ইহার অপর নাম শৃঙ্গার রস। এই রসের জগতে ও রসের জীবনে এই রসই আদি। অন্যান্য যাবতীয় রস, এই রসের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি; (different modifications) এই রসকে স্থায়িত্ব দান করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীরাধারমণ শ্রীরাসবিহারীর উপাসনার উদ্দেশ্য,—এই রসকে স্থায়ী করা। রস স্থায়ী হয় না কেন? অহঙ্কারের ভূমিতে বা মনের ভূমিতে পতিত হইলে ইহা প্রাকৃত মদন বা মনসিজ হইয়া যায়। তখন ইহা দেহ ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বা 'শোণিতপুরে' অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। এই কারণে রস স্থায়ী হয় না। এই রসকে স্থায়ী করিবার জন্য বা প্রাকৃত মদনকে মোহন করিবার জন্য "অপ্রাকৃত নবীন মদন" শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে রাসক্রীড়া। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরাসলীলার রসাস্বাদনে তন্ময়চিত্ত হইয়াছিলেন, "শ্রীশুক উবাচ" এই কথা আশ্রয় করিয়া তিনি এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিলেন। আমাদের চিত্ত "উজ্জ্বল রসে" কিঞ্চিৎ জাগরিত হউক, তাহা হইলেই শ্রীরাসলীলা আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইব, কামরাজ্য হইতে প্রেমরাজ্যে নবজন্ম লাভ করিব। বৈষ্ণব শাস্ত্র এই অবস্থাকে "প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্ততা" বলিয়াছেন।

এইবার দেখা যাউক 'পোষণ' কি এবং এই তত্ত্বে কেমন করিয়াই বা চিত্তকে নিবদ্ধ করা যায়? সংসারে নানাপ্রকারের লোক, হৃদয়েরও গঠন নানারূপ। ইহাদের দুইটি বিভাগে ভাগ করিয়া লওয়া যাউক। আপনি বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া একজন লোকের সর্ব্বদাই উপকার করেন। এই প্রকারে সর্ব্বদা উপকার করিতে করিতে একদিন অসাবধানতাবশতঃ তাহার কিঞ্চিৎ অপকার করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার পর, অর্থাৎ এই উপকার ও অপকার করার পর অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। এখন সেই লোকটিকে আপনার কথা একবার জিজ্ঞাসা করা যাউক, দেখা যাউক সে লোকটি আপনার সম্বন্ধে সরলচিত্তে কি বলে? আপনার কথা সেই লোকটিকে যেমন জিজ্ঞাসা করিয়াছি অমনি সে বলিয়া বসিল—"মহাশয়! তাঁহার কথা আর বলিবেন না, তাঁহাকে আমি যেমন জানি তেমন আর কেহ জানে না, যাহারা জানে না তাহারাই তাঁহাকে ভাল লোক বলে, আমার কিছু অজানা নাই।" এই বলিয়া কবে আপনি যে অসাবধানতা বশতঃ তাহার কি অপকার করিয়াছিলেন সে কথাটি নানারূপে পল্লবিত করিয়া বর্ণনা করিল। আপনি যে এতদিন তাহার এত উপকার করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে একটি কথাও বলিল না। ব্যাপার কি? এই লোকটির চিত্তবৃত্তির গঠনই এইরূপ যে তাহার মস্তিষ্কে উপকারের স্মৃতিচিহ্ন থাকে না, কিন্তু অপকারের স্মৃতি উজ্জ্বল ও গভীররূপে থাকিয়া যায়। ইহার চিত্তবৃত্তির গঠনই এইরূপ, আপনি হাজার চেষ্টা করিয়াও সহজে ইহার স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না, এই গেল এক শ্রেণীর লোক।

তাহার অপকার করুন, এই প্রকারে অপকার করিতে করিতে একদিন হয়ত কোনরূপ স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার একটা উপকার করিয়া ফেলুন। তাহার পর, অর্থাৎ এই অপকার ও উপকার করার পর অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। এখন সেই লোকটিকে আপনার কথা একবার জিজ্ঞাসা করা যাউক ; দেখা যাউক সে লোকটি আপনার সম্বন্ধে সরলচিত্তে কি বলে ?

আপনার কথা সেই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করায়, সে লোকটি আনন্দের সহিত আপনার প্রশংসা করিতে লাগিয়া গেল।

একদিন যে উপকার করিয়াছিলেন, তাহাই পল্লবিত করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল। তাহার কথা শুনিতে শুনিতে অপনি যে তাহার অপকার করিয়াছেন, সেই অপকারের কথা তাহার মনে পড়াইয়া দেওয়া গেল, তাহাতে সে সেই অপকারেরও অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিল, এমন কি বুঝাইয়া দিল যে সেই অপকার করা আপনার পক্ষে কেবল যে ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে, তাহা নহে সেই অপকারের দ্বারাও তাহার উপকার হইয়াছে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকও জগতে আছে—সংখ্যা হয়ত আজকাল, অর্থাৎ এই সমালোচনার যুগে, কিছু কম, কিন্তু এ প্রকারের লোকও আছে।

এই যে দুইজন লোক, ইহাদের মধ্যে কাহাকেও মিথ্যাবাদী বলিয়া বিবেচনা করিবেন না। ইহারা উভয়েই সত্যবাদী, তবে চিত্তের গঠন সকলের একরূপ নহে, তাহার ফলে সকলের মস্তিষ্কে সকল প্রকারের দাগ সমানরূপে থাকে না। সাধারণ মানুষ সমগ্র জীবন নাটকের অভিনয় শেষ করিয়া কেবলমাত্র নিজের কৃতিত্বটুকুই মনে রাখে, ঘটনার অনুকূলতা, অন্যের দয়া বা সহায়তা, এ সকল কথা ভুলিয়া যায়। অন্যের কথা ভাবিয়াও এইরূপ মনে করে যে এই দয়া তাহার অর্থাৎ ঐ দয়ালুর কোনরূপ মহত্ত্ব বা উদারতার পরিচায়ক নহে—সে আমাকে দয়া করিয়া আমাকে ধন্য করে নাই, নিজেই ধন্য হইয়াছে।

একজন লোককে দেখিতেছি বেশ সুখে আছে, ধন মান পুত্র বন্ধু স্বাস্থ্য প্রভৃতি পার্থিব সুবিধার কোনরূপ অভাব নাই। আরাম করিয়া খাইতেছে আর ভুঁড়ি ফুলাইতেছে। তাহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয় কেমন আছেন ?" যেমন জিজ্ঞাসা করা, অমনি বেদনায় আর্ত্তনাদ তুলিয়া জীবনের বিষাদকাহিনী বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

দুঃখের পর দুঃখ, অত্যাচারের পর অত্যাচার, অবিচারের পর অবিচার, অকৃতজ্ঞতার পর অকৃতজ্ঞতা,—সমগ্র পৃথিবী যেন একতাবদ্ধ হইয়া তাহার বিরুদ্ধে একটা ভীষণ রকমের ষড়যন্ত্র করিয়াছে। তাহার এই দুঃখকাহিনী শুনিতে শুনিতে আমারও হৃদয় মলিন এবং আঁধার হইয়া আসিল। দেখিলাম লোকটি সারাজীবন কেবল শ্মশানের দেবতারই পূজা করিয়াছে ; এ আঁধারে কখনও উষার

রাখুন। আসুন আর একজন লোকের কাছে যাই। লোকটী বড়ই দরিদ্র। দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া, আধপেট, সিকিপেট খাইয়া কোনরূপে জীবন ধারণ করে; যাহাকে পার্থিব সুখ বলে, তাহার কিছুই নাই। লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয় কেমন আছেন?" জিজ্ঞাসা করিবামাত্র লোকটি বলিল "আসুন, বসুন, বেশ ভালই আছি। জীবনটা বেশ; দুঃখের মধ্যে সুখ, আঁধারের মধ্যে আলো, কান্নার শেষে হাসি। আমি বেশ ভালই আছি।" কোনরূপ কিছু কষ্ট বা অসুবিধা আছে কি না, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় লোকটি বলিল—"অসুবিধার কথা কি জিজ্ঞাসা করেন? অসুবিধা সংসারে আছেই। কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্য। ভালরূপ সুবিধাগুলিকে আনিবার জন্যই এই-সব অসুবিধা। আমার তেমন কিছু অসুবিধা নাই। তবে একটা ছেলে ছিল, সেটা নিত্যধামের নিত্যশিশুর খেলার সাথী হওয়ার জন্য মাটির খোলসখানা ছাড়িয়া কাল চলিয়া গিয়াছে। আর এই দু'দিন খাওয়া হয় নাই, তা' উপবাসটা মাঝে মাঝে ভাল. উপবাসের পর খাবার জিনিষগুলি খেতেও ভাল লাগে; আর উপবাসে শরীরও ভাল থাকে; আবার আর একটা কথা আছে—শরীর-ছাড়া যে জিনিষটা আছে, মাঝে মাঝে উপবাস ঘটিলে, সে জিনিষটার সঙ্গে দেখাশুনা হয়"। এই দেখুন আর একজন লোক। ইঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করুন।

শ্রীমদ্ভাগবতে অধিকার এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা যে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইবেন, তাহা নহে। তবে তাঁহারা সাধুসঙ্গে সৎশাস্ত্রের দ্বারা হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন করিতে করিতে কতকটা দ্বিতীয় শ্রেণীর অবস্থা লাভ করুন, তাহার পর লীলারসমাধুরী অনায়াসেই আস্বাদন হইবে। ইহজন্মেও হইতে পারে, না হয় পরজন্মে বা তাহারও পরের পরজন্মে হইবে। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ আশীর্ব্বাদ করিলেন "নন্দের নন্দন আপনাদের আনন্দ বিস্তার করুন।" নন্দ-নন্দনের আনন্দ বিস্তৃত হইলে, চিত্ত প্রসন্নোজ্জ্বল অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, হৃদয় মনের কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহা পূর্ব্বের উদাহরণগুলির সাহায্যে অনায়াসই বুঝিতে পারা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত যে এই প্রকারের সাধনার উপদেশ করিয়াছেন, তাহার কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক। কারণ আমরা ধার্ম্মিক লোক বলিতে আশাহীন উৎসাহহীন এমন একদল লোককে বুঝি, যাহারা সর্ব্বদাই মলিনমুখে চারিদিকে কেবল পাপ ও অমঙ্গল দেখিতেছে—যাহারা হাসিতে জানেনা, মিশিতে জানেনা, ভাল-বাসিতে জানেনা; যাহারা মাতিতে পারেনা, নাচিতে পারেনা। অবার এই প্রকারের লোকেরা সাজিয়া গুজিয়া বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করে! হায়রে অদৃষ্ট! আমার অদৃষ্ট নয়, আমার সমাজের, আর আমার দেশের অদৃষ্ট!

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই একভাব। দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতের অধিকারী কে, তাহা নিরূপণ

অর্থ করিলেন "পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরঃ তদ্রহিতানাং ভূতানুকম্পিনাং সতাং" পরের উৎকর্ষ বা উন্নতি সহিতে না পারার নাম মৎসর, এই মৎসর যাহার নাই অর্থাৎ যিনি পরের সুখে সুখী, তিনিই নির্ম্মৎসর, তিনি ভূতানুকম্পী এবং সাধু।

তিনিই শ্রীমদ্ভাগবতের অধিকারী। তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন "পরের সুখে সুখী হও"। "পরের দুঃখে দুঃখী হও" সাধারণতঃ এই উপদেশ মানুষকে দেওয়া হইয়া থাকে। পরের দুঃখে দুঃখী হওয়া তত কঠিন নহে, অনেকস্থলে পরের দুঃখে দুঃখী হওয়া ভদ্রলোকের পক্ষে স্বাভাবিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু পরের সুখে সুখী হওয়া বড়ই কঠিন। এখন চিন্তা করুন, "পরের সুখে সুখী" হওয়ার সাধনপথ গ্রহণ করিয়া যদি ভগবৎ কৃপায় কিছুদূর অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা হইলে "দুঃখে আর দুঃখ থাকে না" অর্থাৎ নিজের সহস্র দুঃখ থাকিলেও বেশ সুখে দিন কাটাইতে পারা যায় অথবা আরও উপরে উঠিলে, দুঃখই তখন সুখ হইয়া যায়। 'পরের সুখে সুখী হওয়া' অভ্যাস না করিলে আনন্দ-ব্রহ্মের বা রসব্রহ্মের উপাসনা করা যায় না। মানুষ কাঁদিতেছে, যৌবন চলিয়া গেল, স্বাস্থ্য চলিয়া গেল, জীবনের উৎসবের বেণুবীণা থামিয়া গেল, সোহাগের নিকুঞ্জ-কানন শুকাইয়া গেল! মানুষ কাঁদিতেছে; কিন্তু হে মানুষ, একবার চক্ষু খুলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখ দেখি; কিছুই চলিয়া যায় নাই। যৌবনের বেণুবীণা সোহাগের নিকুঞ্জকাননে এখনও বাজিতেছে। তরুণ তরুণীর প্রেমের মেলা এখনও চলিতেছে। এখনও নূতন রবি, ঊষারাণীর ললাটে গৌরবের সিন্দূর বিন্দুরূপে ফুটিয়া উঠে; এখনও নূতন শশী শরতের নীল গগনে প্রেমের লুকোচুরি খেলা মেঘের আড়াল হইতে খেলে। হাসি আছে, গান আছে, ভালবাসাবাসি আছে। তবে তুমি কেন হাসিবে না? আনন্দ আছে। চিরন্তন প্রশ্ন এইটি 'আনন্দে আমি' না 'আমাতে আনন্দ'। যে বলে 'আমাতে আনন্দ', সে হয় কংস, বাঁচিতে চেষ্টা করিয়া সে কেবল মরে! আর যে বলে 'আনন্দে আমি' সে ব্রজে এবং বৃন্দাবনে আসিয়া মরিয়া বাঁচিয়া উঠে। পরের সুখে সুখী হয় যে, সে জানে এবং বুঝে যে 'আনন্দে আমি' 'আমিতে আনন্দ' নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্তব কুন্তীদেবীর স্তব। তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিলেন "দুঃখই হউক"। দশম স্কন্ধে কালিয়নাগের পত্নীগণের যে প্রার্থনা আছে, এই তত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট আকারে সেই স্থানে পরিদৃষ্ট হইবে। সেই স্তবের একুশটি শ্লোক তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া শ্রীধরস্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথমে দণ্ডানুমোদন, তাহার পর নুতি, তাহার পর প্রার্থনা। কালিয়নাগের মাথার উপরে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন নাচিতেছিলেন, তখন কালিয়ের কষ্টের সীমা ছিল না। তাহার রক্তবমন হইতেছে, ফণা ভাজিয়া যাইতেছে। নাগপত্নীগণ প্রথমে আসিয়া বলিলেন "হে কৃষ্ণ!

বলিলেন এই যে কর্ম্মফলদান, ইহা কোন প্রতিশোধ-পরায়ণ ঈশ্বরের বৈরনির্য্যাতন নহে, ইহা জীবের মঙ্গল বিধানের জন্যই বিহিত হয়। এইটুকু উপলব্ধি করার পর শাস্তি আর শাস্তি রহিল না। নাগপত্নীগণ বলিতে লাগিলেন, অমাদের স্বামী এই কালিয়নাগ বড়ই ভাগ্যবান্—

"তপঃ সুতপ্তং কিমনেন পূর্ব্বং নিরস্তমানেন চ মানদেন।
ধর্ম্মোঽথবা সর্ব্বজনানুকম্পয়া যতো ভবাংস্তুষ্যতি সর্ব্বজীবঃ॥"

'না জানি এই কালিয় পূর্ব্বে স্বয়ং নিরভিমানী হইয়া অন্যকে মানদানপূর্ব্বক এবং সর্ব্বভূতে দয়াধর্ম্ম অনুশীলন করিয়া কতই তপস্যা করিয়াছে, তাই সর্ব্বজীবস্বরূপ যে তুমি, তুমি তাহার উপর তুষ্ট হইয়াছ'।

সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতে এই মহাসত্যের প্রচার দেখিতে পাওয়া যাইবে। সংসার দুঃখময় সত্য, মানবজীবন হাহাকারে পরিপূর্ণ সত্য; কিন্তু ইহাই শেষ কথা নহে।

দুঃখের নিশা অবসান হইতেছে, সুখের আনন্দ উষা ভাগ্যাকাশের প্রাচীমূলে মোহন হাসি হাসিতেছে, হাহাকারের নয়নবারি আদর করিয়া মুছাইয়া দিতে কাহার করুণ হস্ত প্রসারিত হইতেছে! মরুভূমি চিরমরুভূমি নহে, সেখানে শীতল জলের বিপুল বন্যা বহিয়া যাইতেছে, অনুর্ব্বর শুষ্ক ভূমি সরস, উর্ব্বর ও শ্যামল হইয়া উঠিতেছে। এ সকল কথাও সত্য। পোষণবাদী ইহাই প্রত্যক্ষ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের সমুদয় আখ্যানেই এই "পোষণ" বর্ণিত হইয়াছে। যাহার চক্ষু আছে ও হৃদয় আছে, সে দেখিতে পায় ও বুঝিতে পারে যে, কারুণ্যের অমৃত ধারায় জগৎ চিরদিন অভিস্নাত হইতেছে, দুঃখদুর্দশার নিদাঘ-সন্তাপ চিরস্থায়ী নহে। আবার বর্ষার অতি ঘন মেঘজাল বিতাড়িত করিয়া শরতের স্নিগ্ধহাস্যে নবশশি কৌমুদীকিরণ লইয়া আসিতেছে। তারুণ্যের অমৃতধারাও জগতে নিত্য প্রবাহিত। জগৎ প্রাচীন হয় না, আমরা বে-তালায় পা ফেলিয়া প্রাচীন হইয়া মরিয়া যাই। কিন্তু বিশ্বলীলা চিরতারুণ্যের অভিনয় করে। লাবণ্যের অমৃতধারা নিত্য বহিয়া যাইতেছে, আমরা অবিশ্বাস-বশে সে সুযোগ লইতে পারিতেছি না, ক্ষয়িত হইয়া কুৎসিত হইতেছি। কিন্তু এই ত্রিধারায় চিরদিন ভক্তের পোষণ হইতেছে। ভগবানের অনুগত হইয়া তাঁহার স্বগণ হওয়া অনেক দূরের কথা, আমরা যদি ভক্তের অনুগত হইতে পারি, তাহা হইলেই এই পোষণ বুঝিতে পারিব। এই পোষণই নিত্যজীবন।

নারদের উপাখ্যান যাহা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভেই বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পোষণের দৃষ্টান্ত। আবার ব্যাসদেব অবসন্নচিত্তে সরস্বতী নদীতীরে যখন বসিয়াছিলেন, তখন যে দেবর্ষি নারদ আসিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র রচনা করিতে উপদেশ দিলেন, তাহাও পোষণ। গর্ভের মধ্যে পরীক্ষিৎ অশ্বত্থামা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের অত্যুৎকট তেজে ভীত ও মৃতপ্রায়, এমন সময়ে এক ইন্দ্রনীল মণিশ্যাম স্নিগ্ধ ও সুন্দর অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ মূর্ত্তি আসিয়া চক্রধারণপূর্ব্বক গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা

দুর্ঘটনার পর মহারাজ পরীক্ষিতের চিত্তে যখন অতি তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইল, সেই বৈরাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যখন গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে বসিলেন,এবং এই অবস্থায় শ্রীশুকদেব আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলে পর যখন শ্রীমদ্ভাগবতের কথা আরম্ভ হইল, তখন বুঝিতে পারা গেল যে ইহাও পোষণ। ধ্রুব চরিত্র, প্রহ্লাদ চরিত্র, অজামিল উদ্ধার, গজেন্দ্র মোক্ষণ প্রভৃতি সমস্তই পোষণ। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন প্রভৃতি অবতারের লীলা যে ভূতানুগ্রহ তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে যখন এই সমস্ত কথা বর্ণিত হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে এগুলি কেবলমাত্র অতীত কালের ঘটনামাত্র নহে, এ সমুদায় নিত্য সত্য ;—অর্থাৎ আমরা যদি অন্তর্মুখী হইয়া চিন্তা করি এবং জীবনের যাবতীয় ঘটনা কেবল-মাত্র জড়ের ও ইন্দ্রিয়ের অথবা ইহলোকের ভূমি হইতে না দেখিয়া চৈতন্যের বা আত্মার ভূমি হইতে দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে এই সমুদয় লীলার প্রত্যেকটির অভিনয় আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই, হয় হইয়া গিয়াছে, নতুবা হইতেছে বা হইবে। সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস ক্ষুদ্রাকারে প্রতি জীবের জীবনে অভিনীত হইয়া থাকে।

এইবার শ্রীরাসলীলার ভূমি আলোচনা করুন। নীরস ও শুষ্ক, মরুভূমির মত অনুর্ব্বর, একদেশে কিছুকাল পরে আসিয়া আপনি দ্বিতীয়বার পর্য্যটন করিতেছেন। এবার এক নূতন দৃশ্য দেখিতে-ছেন। এবার দেখিতেছেন সমগ্র দেশ খালে খালে ভরিয়া গিয়াছে, আর সেই সব খালের ভিতর দিয়া স্নিগ্ধ ও শীতল জলরাশি সকল দিকে উথলিয়া উথলিয়া বহিয়া যাইতেছে। কৈ, আর মরুভূমি নাই, সব শীতল স্নিগ্ধ ও সুখময় হইয়া উঠিয়াছে, তরুলতা ফল ফুল আর ধরে না।

সকলদিকে এই জলসেচন দেখিয়া আপনি এখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আচ্ছা সে সমুদ্র কোথায় ? যে সমুদ্র অকাতরে এত জল যোগাইয়া যাইতেছে." এই প্রশ্ন মনে জাগিলে পর যদি কেহ দয়া করিয়া আপনাকে সমুদ্রতীরে লইয়া যায়, তাহা হইলে সমুদ্রের বুকে চিরদিন যে তরঙ্গের খেলা হইতেছে, তাহার সার্থকতা কি, তাহা আপনি বুঝিতে পারেন। এই জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যেমন হউক একটা ধারণা লইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণমূলক সাধনা আরম্ভ করা গেল। ক্রমে ক্রমে দেখিতেছি, সংসার কেবল অশাশ্বত দুঃখালয় নহে, করুণার অমৃত স্রোত সকল দিক হইতে নিরন্তর আসিতেছে,—এবং এই নীরস মরুভূমিকে সরস, শ্যামল ও সুখময় করিতেছে। যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই ইহা দেখিতেছি। এই প্রকারের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে প্রাণ আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে, এখন জিজ্ঞাসা করিতেছি, "সে জগৎকারণ কেমন, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডকে নিরন্তর রসসিঞ্চনে কৃতার্থ করিতেছেন "? What is that conception of the Divine which justifies this eternal nourishment of the universe ? এই প্রশ্ন অন্তরে উদিত হইলেই আমরা শ্রীরাসস্থলীতে

হইয়াছে, হ্লাদিনী শক্তির বিলাসের দ্বারা নায়কের শিরোরত্ন ও একমাত্র প্রেমিক যে শ্রীকৃষ্ণ তিনি স্বমাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন, ইহাই তাঁহার রাসলীলা। এই কথা শুনিয়া মানুষ বলিবে, তিনি তাঁহার রস আস্বাদন করিতেছেন, বেশ করিতেছেন তাহাতে তোমারই বা কি, আমারই বা কি? তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয় তিনি করিতে পারেন, তোমারই বা কালি কলম খরচ করিয়া সে কথা লেখার দরকার কি, আর আমারই বা সময় নষ্ট করিয়া পয়সা নষ্ট করিয়া সে কথা পড়ার দরকার কি? ইহার উত্তর আমরা এখন পাইলাম। ভগবানের এই স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের দ্বারাই জগতের পোষণ হইতেছে বা মানবজীবন রসপূর্ণ হইয়া ধন্য বা পূর্ণ হইতেছে। "রসোবৈসঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধা সর্ব্বানন্দী ভবতি" এই যে শ্রুতি, ইহার ইহাই তাৎপর্য্য। তাহা হইলে আমরা রাসকথা কেনই বা শুনিব, কেনই বা বর্ণনা করিব, একবার দুইবার নহে পুনঃ পুনঃ বলিব ও শুনিব, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে।

ভগবান্ স্বমাধুর্য্য আস্বাদন করিলেই আমি সরস হইব ও পূর্ণ হইব, অথবা আমার পোষণ হইবে। অধ্যাত্মবিজ্ঞান আলোচনা করার পদ্ধতি যাঁহারা জানেন না, অথবা যাঁহারা আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ জড়জগতের সত্যসমূহের সহিত একই পর্য্যায়ভুক্ত সত্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া, একই পদ্ধতি অবলম্বনে বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা বলিবেন, ভগবান্ ত নিত্যই স্বমাধুর্য্য আস্বাদনে বিহ্বল ও আত্মহারা হইয়া রহিয়াছেন, ইহাই ত নিত্যলীলা। আর নিত্যলীলা যদি খুব দূরের জিনিষও হয়, তাহা হইলেও শ্রীবৃন্দাবনে প্রকট হইয়া এই মহারাসের লীলাভিনয় করিয়া তিনি স্বমাধুর্য্য আস্বাদন করিলেন, তবুও আমাদের এ নীরসতা, দুঃখ, অভাব ও অপূর্ণতা কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দরকার। দেখুন, আলো জ্বলিলেই আলো জ্বলেনা, ইহাই আধ্যাত্মিক সত্য। আমার কাছে বা আমার জ্ঞানে আলো জ্বলা চাই। আমার যদি চক্ষু না থাকে, আমি যদি অন্ধ হই, আর যদি এককালে দ্বাদশ সূর্য্য উদিত হয়, তাহা হইলে আমার কি হইবে? বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ রাসে নৃত্য করিলেন, তাহাতে আমার কি? আমারও যে বৃন্দাবন আছে, আমার সেই বৃন্দাবনে, সেই লীলা হওয়া চাই। এই কারণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়াছেন "মনে বনে এক করি জানি।" সুতরাং এই লীলা সর্ব্বদা শুনিতে শুনিতে, কীর্ত্তন বা আলোচনা করিতে করিতে এবং স্মরণ করিতে করিতে আমার নিকট এই লীলা সত্য হইবে।

আমার নিকট এই লীলা যে পরিমাণে সত্য হইবে, আমি সেই পরিমাণে সরস, পূর্ণ ও ধন্য হইব। জীবনের সফলতায় ইহাই একমাত্র পথ। এই কারণে শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথবর্ণয়েদ্‌যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিণোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

তিনি ভগবানে পরাভক্তি লাভ করেন এবং তাঁহার হৃদ্রোগ বা কাম অচিরে দূরীভূত হওয়ায় তিনি ধৈর্য্য-লাভ করেন।' শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব। এখন সমুদয় তত্ত্ব একবার আলোচনা করা যাউক। আমরা রসের কাঙ্গাল, প্রেমের কাঙ্গাল। আমাদের অভাব যে কত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাহিরে একটা জীবন রহিয়াছে, তাহা দেহ ও ইন্দ্রিয়ের জীবন। এই জীবনের অভাবসমূহ দূর করিবার জন্য নিত্যই পরিশ্রম করিতেছি। ক্রমে দেখিলাম, ইহা ছাড়া একটা মানসজীবন বা ভিতরের জীবন আছে। এই দুইটী জীবন যে পরস্পর বিরোধী, তাহা নহে; কিন্তু এই মানসজীবনের সাহায্যব্যতীত বাহিরের জীবনকেও পূর্ণ করা যায় না। ক্রমশঃ আত্মার জীবন বুঝিলাম। তাহার অভাব ভয়ানক। এখন দেখিতেছি, তাহার অভাবই অভাব; যে অভাব দেহের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত হইতেছে, যে অভাব ইন্দ্রিয়সমূহের ও মনের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত হইতেছে, তাহাদেরও মূল উদ্ভব দেহে, ইন্দ্রিয়ে বা মনে নহে।

সুতরাং রোগের নিদান নির্ণয় করিতে গিয়া দেখিলাম, আত্মার জীবনই জীবন। অন্যান্য জীবন সেই মূল জীবনের আশ্রিত ও অনুগত। এখন তাহার চিকিৎসা প্রয়োজন। এই যে 'আমি', ইহার আবার জীবন সেই শ্রীকৃষ্ণের জীবনে বা সেই এক পরম পুরুষের জীবনে। সুতরাং আমার আনন্দ আমাতে নহে—শ্রীকৃষ্ণে! এই শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে—সখারূপে, পুত্ররূপে, নাগরশেখর-রূপে বিহার করিতেছেন, এই যে নাগরশেখররূপে বিহার, ইহাই আবার তাঁহার যাবতীয় বিহারের আশ্রয়স্বরূপ। অতএব নাগরেন্দ্র শিরোমণি রাসমণ্ডলে জয়যুক্ত হউন। তাহাতেই জগতের পোষণ, তাহাতেই আমাদের একমাত্র কৃতার্থতা। প্রথম মনু স্বায়ম্ভুব, তিনি শতরূপার পতি, শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার একটি স্তব আছে—তাহাতে আছে যে মনু সুনন্দানদীর তীরে এক পদে ভূমি স্পর্শ করিয়া অবিশ্রান্ত শত বৎসর দুশ্চর তপস্যা করিতে করিতে বিস্মিতের ন্যায় বলিয়াছিলেন—

"যেন চেতয়তে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যম্।
যো জাগর্ত্তি শয়ানেঽস্মিন্নায়ং তং বেদ বেদ সঃ॥

এক চিদাত্মা কর্ত্তৃক বিশ্ব চেতন হয়। বিশ্ব তাঁহাকে চেতন করে না; কারণ তিনি স্বতঃ-চেতন। জীব যখন নিদ্রিত, তখন তিনি জাগ্রত থাকেন, কি আশ্চর্য্য এই জীব তাঁহাকে জানেন', কিন্তু তিনি ইহাকে জানেন। এখন আমরা বুঝিলাম এক চিদাত্মাই একমাত্র ভোক্তা। তিনি একমাত্র আস্বাদন-কারী। আমি আমার মধ্যে যখন তাঁহাকে সকল রূপের ও সকল রসের ভোক্তা বলিয়া বুঝিতে পারি, তখনই আমার প্রকৃত সুখভোগ হয়, আর তাঁহাকে ভুলিয়া নিজেকে পৃথক ভোক্তা বলিয়া যখন ভোগের দ্রব্য অন্বেষণ করি, তখন কামভোগের পথ ধরিয়া কামনার আগুন নিভাইতে গিয়া তাহার বেগ

দেবলোকে দেশবন্ধু

১

বিদেশে, অকালে ও অকস্মাৎ, বঙ্গের এক সুসন্তান—ভারতাকাশের এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র, মরণের সাগরবুকে খসিয়া পড়িয়াছিলেন,—ঠিক্ একটি বৎসর পূর্ব্বে;—গ্রীষ্মের শেষে, বর্ষার প্রারম্ভে। সে মহাপ্রয়াণ, বাঙ্গলার কর্ম্মজীবনে যে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাশ্যের আঁধার আনিয়াছিল, তাহা এখনও অপগত হয় নাই; এমন সময়ে আর একটি উজ্জ্বল তারা—যাহার কিরণ বঙ্গ ছাড়াইয়া ভারত, ভারত ছাড়াইয়া সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, সেই তারাটি বিদেশে, অকালে ও অকস্মাৎ, গ্রীষ্মের শেষে নববর্ষার প্রারম্ভে, অনন্তে লুকাইল। আশুতোষ গিয়াছেন, চিত্তরঞ্জন গেলেন। ঠিক্ এক বৎসরের ব্যবধান। বাঙ্গালার গৌরব, ভারতের গৌরব, পৃথিবীর গৌরব—ধন্য মানব, মহামানব! প্রায় এক বৎসরের মধ্যে আরও দুই জন গিয়াছেন—আশুতোষ চৌধুরী, আর ভূপেন্দ্রনাথ বসু। বাঙ্গালার কর্ম্মজীবনে আজ যে আঁধার ও বিশৃঙ্খলা আসিল—বঙ্গের ও ভারতের কর্ম্মজীবনে যে অপ্রত্যাশিত নৈরাশ্য ও অবসাদ আসিল, তাহার তুলনা নাই। পঞ্চান্ন বৎসর বয়ঃক্রমে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস—২রা আষাঢ় ১৩৩২, অপরাহ্ণ ৫ টার সময় দার্জ্জিলিঙ্ পাহাড়ে এক অনির্দ্ধারিত ব্যাধির আক্রমণে দেহত্যাগ করিলেন।

২

গত বৎসর প্রায় এই সময়ে মুখোপাধ্যায় আশুতোষের প্রয়াণে হৃদয় যখন কাতর, তখন আমরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতি চাহিয়াছিলাম। আমরা সেদিন লিখিয়াছিলাম—

"দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ত্যাগের তরঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেদিন যখন ভাঙ্গন লাগিয়াছিল, তখন সেই ভাঙ্গনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সাম্‌লাইতে পারেন, আশুতোষ ছাড়া এমন লোক দেশে কেহই ছিলেন না।"

সেদিন আমরা আরও লিখিয়াছিলাম—

"আমাদের শক্তি নাই, আশুতোষ সম্বন্ধে ঠিক্ মত ভাবিতে—তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ, অনেক দূরের কথা। মহতের ভাবনা, আজ ভাবুন তাঁহারা, যাঁহারা সত্য সত্য মহৎ। দেশবন্ধু দাস আজ কি করিবেন? তাঁহার অনেক কাজ, সময় নাই। কিন্তু আশুতোষের

দিন তিনি আশুতোষের মুখোমুখি হইয়াছিলেন, সেদিনও তিনি ভক্তি করিতেন আশুতোষকে,—অন্তরের সহিত। কিন্তু, সেদিন, তিনি শুনিয়াছিলেন এক আজবদেশের ডাক। আজ তিনি অন্ত পথের পথিক। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি দখল করিয়াছেন, তিনি কি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিবেন, তিনি কি বিশ্ববিদ্যালয় দখল করিতে চেষ্টান্বিত হইবেন?"

৩

এক বৎসর পূর্ব্বের আশা ভরসা আজ ধূলায় অবসান! ইহাই সংসারের রীতি। ভগবানের ইচ্ছা!—বাঙ্গালী জাতির আর বুঝি শোক-প্রকাশেরও সামর্থ্য নাই। ভগবানের ইচ্ছা,—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!—পাথরে বুক বাঁধিয়া, স্তম্ভিত বঙ্গ চিত্রার্পিতবৎ শুনিল, চিত্তরঞ্জন নাই! একি স্বপ্ন, না সত্য? চক্ষু শুকাইয়া গিয়াছে,—চোখে জল নাই, মুখে ভাষা নাই!—স্বপ্নাবস্থায় নহে, জাগরণে—পূর্ণজ্ঞানে, নিষ্ঠুরবাণী বারবার বলিল—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন চলিয়া গিয়াছেন!! হিমালয়ের চূড়া হইতে আর সে নয়নরঞ্জন সৌম্যমূর্ত্তি নামিয়া আসিয়া আমাদের মধ্যে দাঁড়াইবে না, সৌম্য মুখের মধুর গম্ভীর বাণী আর আমাদের হৃদয়-মাঝে আশার আলো জ্বালাইয়া ত্যাগের পথে সেবার পথে চালাইয়া লইয়া যাইবে না। সে নয়নের শান্ত দীপ্তি আর আমাদের প্রাণের মধ্যে অভয় ও নববল জাগাইবে না। আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন!

এতদিন যাহারা বোঝে নাই, এতদিন যাহারা বুঝিয়াও না বোঝার ভাণ করিয়াছে, যাহারা অন্য কারণে বুঝিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিল, তাহাদের বুকে ও মাথায় সত্যগ্রহণের উপযুক্ত নরম জায়গা একতিল পরিমাণও যদি থাকে, তাহারা বুঝুক ও ভাবুক,—চিত্তরঞ্জন কি ছিলেন!

৪

বর্ত্তমান ভারতে রাজনীতিক সমস্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা—একথা আজ বালকেও বোঝে। বাঁচিব, না মরিব? জীবন-সংগ্রামে লুপ্ত হইব, না টিঁকিয়া যাইব? গোটা দেশের সমক্ষে ইহাই আজ একমাত্র প্রশ্ন। ধর্ম্ম, সমাজ, শিল্পকলা, সাহিত্য, সবই চাই—কিন্তু আগে বাঁচা চাই—অন্ন চাই, জল চাই,—আয়ু ও আরোগ্য চাই। আর চাই—আমরা যে মানুষ, এই বোধ ও বিশ্বাস চাই। আমরা অমৃতের পুত্র, অস্ফুট সচ্চিদানন্দ—

বিধান। এ বিধান সফল হউক! এই ভাবে বিকশিত হইবার পথে কোনরূপ কৃত্রিম বাধা থাকিবে না, সকল প্রকারের অধিকার ও সুযোগ থাকিবে। ইহাই প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সাধন করিবার যে চেষ্টা তাহাই নব্যভারতের রাজনীতিক চেষ্টা। আত্মরক্ষা, আত্মবিকাশ ও আত্মসম্প্রসারণ। এই আত্মা, জড় আত্মা নহে, পশু আত্মা নহে,—দিব্যাত্মা—মানবাত্মা। বহু বহু যুগ ও মন্বন্তরের তপস্যার ফলে ভারতবর্ষ এই আত্মার পরিচয় পাইয়াছে। এই আত্মনির্দ্ধারণ, আত্মপুষ্টি ও আত্মসম্প্রসারণ, কাহারও প্রতি হিংসাযুক্ত হইয়া নহে, কাহাকেও দলন, দমন বা শোষণ করিবার জন্য নহে,—"জগদ্ধিতায়"—নিখিলের প্রতি মানবের অন্তরতম স্থলে 'নারায়ণ' নিদ্রাগত আছেন, সেই অনন্তশয্যায় সুপ্ত নারায়ণকে জাগাইবার জন্য। ইহাই নব্যভারতের ও নব্যবঙ্গের রাজনীতির মর্ম্ম কথা।

ভারতবর্ষ তাহার একালের রাজনীতি প্রথমাবস্থায় শিখিয়াছে, প্রতীচ্যের নিকট। প্রথম যুগে রাজনীতি-চর্চ্চায় পাণ্ডিত্য ছিল, কৌশল ছিল, সুবিধাবাদীর দক্ষতা ছিল, অনেক স্থলে নিষ্ঠাও ছিল—কিন্তু অভাব ছিল ভাবুকতার। প্রথম যুগের ইংরাজী-পড়া বাঙ্গালী কবির কবিতায় যে স্বদেশপ্রেম ছিল, তাহাতে সরল অন্তরের গভীরতম প্রদেশের অনির্ব্বচনীয় রসাস্বাদের বিহ্বলতা ও মত্ততা অপেক্ষা কৃত্রিমতা ও পোষাকি উত্তেজনাই বেশী ছিল। কিন্তু বিদেশী Patriotism যখন এদেশে আসিয়া নাম লইলেন—"স্বদেশপ্রেম," তখন তিনি নিজের ইচ্ছামত সফল হইতে পারিবেন না। 'প্রেম' কেমন করিয়া সফল হয়, বাঙ্গলা তাহা জানে, ভারত তাহা জানে। ভারতের অতীতের সাধনায় ও অভিজ্ঞতায় তাহার স্মৃতি উজ্জ্বলভাবে গাথা আছে। প্রেম কেমন করিয়া সফল হয়, মাত্র চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে, বাঙ্গলাদেশ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। সেদিন যাহা আসিয়াছিল, তাহারই নাম প্রেম, এমন করিয়া আর কোথায়ও প্রেম আসে নাই। সেই প্রেমই প্রেম—'জাম্বুনদ হেম'। স্বদেশ-প্রেম, স্বজাতিপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, যে প্রেমই বলিনা কেন, ঐ প্রেমমন্দাকিনীরই শাখানদী, না হয় উপনদী। সর্ব্ববিধ প্রেমের প্রতিষ্ঠা ও সফলতা যে প্রেমে, সেই প্রেম, মূর্ত্তি লইয়া আসিয়াছিল, এই বঙ্গে,—এই গঙ্গাতীরে; প্রবাহ তাহার ছুটিয়াছিল, সমগ্র ভারতবর্ষে। সেই প্রেম নীলাচলে মহাসাগরের কূলে আপনার বিরাটত্ব ও অনন্তত্বের অসীম কল্লোলে আপনাকে সফল করিয়াছিল। ঐ মহাসিন্ধুই সে প্রেমের দ্যোতক, আর

প্রথম জীবনে সে প্রেমের স্পর্শ পাইয়াছিলেন, সে প্রেমের তরঙ্গাঘাতে জীবনের প্রথম হইতেই কাঁপিয়া উঠিতেন, মাতিয়া উঠিতেন। তাঁহার রচিত একটি কবিতা "সিন্ধু-সঙ্গীত"।

১

আমার জীবন লয়ে কি খেলা খেলিলে ?
আমার মনের আঁখি কেমনে খুলিলে ?
আমার পরাণ ছিল কুঁড়ির মতন,
তোমার সঙ্গতে তারে ফুটালে কেমন ?
সকল জীবন যেন প্রস্ফুটিত ফুল
বিচিত্র আলোকে গন্ধে করেছে আকুল !
সমস্ত জনম যেন অনন্ত রাগিণী
তব গীতে ওগো সিন্ধু ! দিবস যামিনী !

২

তোমার আমার যোগ ওগো পারাবার।
কোন দেশে কোন কালে কোন পরপার
উদারা মুদারা তারা বল কোন গ্রামে ?
কোন মহাশবদের কোন নিত্যধামে ?
কোন সঙ্গীতের কোন রাগিণীর প্রাণে ?
কোন সুরে কোন তালে কোন মহাগানে ?
অনাদি অনন্ত নিত্য মহাপ্রাণ হ'তে
দুজনে এসেছি যেন দুটি প্রাণ-স্রোতে !
তারপর কতবার জনমে জনমে
আমরা মিলেছি দোঁহে মরমে মরমে,
কতবার ছাড়াছাড়ি, মিলেছি আবার
তুমি আর আমি আজ ওগো পারাবার !
তুমি ভেসে যাও সখা ! অনন্তের পানে,
আমি যে ভেসেছি শুধু তোমারি এ গানে !

সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০।

৫

ভারতের বা বাঙ্গলার রাজনীতিক্ষেত্রে প্রথম যেদিন সত্যকার ভাবুকতা জাগিয়া উঠিল—সেই স্বদেশী-আন্দোলনের প্রথম যুগ ; যেদিন স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ, আর শ্রীযুক্ত বিপিন পাল, বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে সেই নবভাবুকতার ভেরি বাজাইলেন, সেই দিনই চিত্তরঞ্জন বিশেষভাবে দেশের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই ভাবুকতার আহ্বান না পাইলে চিত্তরঞ্জন সাড়া দিতেন না, সাড়া দিতে পারিতেন না।

তাঁহাকে দুঃখ, অভাব, এমন কি অপমানের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইতে হইয়াছিল। ভগবান্ তাঁহাকে ভাল করিয়া পিটাইয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। বিধাতার 'পিটুনি,' তিনি যাহা সহিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকেই ভাঙ্গিয়া যায়, কেহ কেহ একেবারে না ভাঙ্গিয়া 'স্বরূপ' হারাইয়া বিকৃতভাবে নিতান্ত একপেশে ও এলোমেলোভাবে গড়িয়া উঠে। তেমন-ধারা গড়িয়া উঠা সুখের নয়—দুঃখের, সৌভাগ্যের নয়,—দুর্ভাগ্যের।

গড়িয়া উঠিয়াছিলেন,—দেশের পরম সৌভাগ্য ! ভগবানের 'পিটুনি' খাইয়া এই প্রকারে যিনি গড়িয়া উঠেন, তিনিই ভাগ্যবান্। দেশবন্ধু জানিতেন ও স্বীকার করিতেন—তিনি এই রকমের ভাগ্যবান্।

আশুতোষ ও চিত্তরঞ্জন দুজনেই থাকিতেন,—শক্তিক্ষেত্র কালীঘাটে—ভবানীপুরে। কালের প্রভাবে শক্তিক্ষেত্রের প্রধান রাস্তাটির নাম হইল 'রসা'। উভয়ের মধ্যেই শক্তি ছিল, রস ছিল, দুইয়ের সম্মিলন ছিল। আশুতোষে 'রস' ছিল, সংযত ও 'হিসাবে বাঁধা', আর চিত্তরঞ্জনে 'রস' ছিল উচ্ছ্বাসময়—উপ্‌চে-ওঠা, বিপুল ও প্রবল, তবে ইচ্ছা করিলে তাহাকে সংযমে বাঁধিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরতম সাধ ছিল, রসে ভাসিতে, গলিতে, মজিতে, নিজেকে একেবারে ষোল-আনা ভাসাইয়া দিতে। এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে কে তাহা পারে ?

তিনি আসিয়াছিলেন "মালঞ্চ" গড়িতে, প্রথমাবধি চাহিয়াছিলেনও তাহাই, একথা আজ কে স্বীকার করিবে ? কিন্তু তিনি নিজে ইহা বার বার বলিয়া গিয়াছেন। সংগ্রাম করা, সংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পর্য্যুদস্ত করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, ইহার নাম কুরুক্ষেত্র। বাঙ্গলায় আজ কয়জন বিশ্বাস করিতে পারিবে যে ইহা তাঁহার প্রকৃতসিদ্ধ ছিল না। ইহা তাঁহার 'স্বরূপ' ছিল না। কিন্তু বাঙ্গলা যদি বাঙ্গলারূপে সগৌরবে বাঁচিতে চায়, চিত্তরঞ্জনের তপস্যা ও ত্যাগ, যদি সফল করিতে চায়, তাহা হইলে এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আসিয়া তাহাকে দাঁড়াইতেই হইবে। চিত্তরঞ্জনের অন্তরতম প্রকৃতি তাঁহাকে 'মালঞ্চ' রচনা করিতে, "সিন্ধুসঙ্গীত" গাহিতে ও নিত্য 'কিশোর কিশোরী'র চিরনবীন হৃদয়-স্পন্দন অনুভব করিতে, 'মালা' গাঁথিয়া মধুর ও সুন্দরের আরাধনায় মাতিয়া দেশকে ও জগৎকে মাতাইতে নিয়োজিত করিতে চাহিয়াছিল ; তাঁহার 'স্বরূপশক্তি' যদি অবাধে বিলসিত হইতে পারিত, তাহা হইলে তিনি তাহাই করিতেন।

অর্থের উপর তাঁহার আদৌ মমতা ছিল না, অথচ বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু হাতের উপর বা বুকের উপর স্বর্ণমুদ্রার কণামাত্রও আঁচড় লাগে নাই। এ-যুগে ইহার তুলনা কোথায় ? সে যে সন্ন্যাসী—বীরাচারী—বীর অবধূত—সে যে গৃহী বাউল—পূর্ণ ভোগের মধ্যে ভোগের দাগ লাগে নাই তাহার মনে এবং প্রাণে। সংগ্রামে আদৌ তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না, কিন্তু তিনি করিয়াছিলেন অতিভীষণ সংগ্রাম ! তাঁহার মত

সংগ্রাম আর কে করিয়াছে ? অকৃতজ্ঞতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের এমনধারা শরশয্যা বাঙ্গলাদেশ আর কাহারও জন্য প্রস্তুত করে নাই। এমনধারা সপ্তরথী আর কাহাকেও ঘেরে নাই। ভীষ্ম ও অভিমন্যু, উভয়েরই ভাগ্য একত্র হইয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছে।

কিন্তু, তাঁহার অন্তরতম স্থলে ছিল 'মালঞ্চ' আর 'সিন্ধুসঙ্গীত'। 'মালঞ্চ' যে গড়া যায় না। এ মাটিতে রস ছিল,—বিপুল ও গভীর। আজ আর তাহা নাই। সে রস শুকাইয়া গিয়াছে! এ মাটিতে আজ রস নাই, তরুলতা গজায় না, ফুল ফোটে না, বসন্ত আসে না, মলয় আসে না,—শুষ্কতা ও নীরসতা—চারিদিকে প্রাণশূন্য নিরুৎসব!

"ইহ রাজবেশ হাতি ঘোড়া মনুষ্য গহন"

এ মাটি খুঁড়িতে হইবে! বাঁশি রাখিয়া গদা লইতে হইবে! সংগ্রাম—সংগ্রাম, নিত্য নব নব সংগ্রাম—শোণিত-সাগরে সাঁতার কাটিয়া চল, পাহাড়ের চারিদিকে আগুন, লাফাইয়া পড় সাগর-জলে, উত্তাল তরঙ্গের মাথায় মাথায় নির্ভয়ে অজানা দেশের অভিমুখে সন্তরণ-অভিযান! সংগ্রাম, সংগ্রাম, শেষ নাই—শেষে সংগ্রাম করিতে করিতেই গুপ্তব্যাধের শরাঘাতে—মহাপ্রয়াণ—এ এক বিয়োগান্ত নাটক। বর্ত্তমানে, এই প্রকটলীলায় ইহার অধিক হইবার নহে! কিন্তু আরও আছে—তাহা এখন 'অপ্রকট' হইলেও, ঠিক জানিও 'আছেই আছে'।

মনীষা ও কর্ম্মঠতা—এই দুইয়ের সম্মিলন এদেশে দুর্ল্লভ হইয়া পড়িয়াছে। আশুতোষেও ইহা ছিল, চিত্তরঞ্জনেও ইহা ছিল। তাই তাঁহারা দেশের গৌরব ছিলেন, বিপন্ন ও মুহ্যমান জাতির ভরসাস্থল ছিলেন। চিত্তরঞ্জনের মনীষায় ভাবুকতা ছিল বেশী, খুবই বেশী—তিনি মাতিতে পারিতেন, মাতিয়া সব ভুলিতে পারিতেন, কাজেই অপরকে মাতাইতে পারিতেন। তিনি ছিলেন ভাবুক (Mystic), কিন্তু কেবল কল্পনার দুলাল ছিলেন না, তিনি ছিলেন 'কর্ম্মযোগী ভাবুক'—a practical mystic—একালে একজন বিচক্ষণ ও বহুদর্শী পণ্ডিত (Lord Rosebery) বলিয়াছেন The practical mystic is the strongest type of man.

৬

চিত্তরঞ্জনের এই ভাবুকতার প্রতিষ্ঠা কোথায়—তাহা তাঁহার বাঙ্গলা রচনা হইতে

যায়, বুঝিয়া বা না বুঝিয়া অনেকেই আবৃত্তি করে—"এই বাঙ্গলা দেশের, এই বাঙ্গালী জাতির, এই বাঙ্গলার ভাষা, ধর্ম্ম, সমাজ প্রভৃতির একটি বিশিষ্টতা আছে। আমরা অনেকেই তাহা ভুলিয়া গিয়াছি, একালের শিক্ষা ও জীবনযাত্রা-পদ্ধতি আমাদিগকে তাহা ভুলাইয়া দিতেছে। কিন্তু, তাহা ভুলিলে আমাদের ইষ্ট হইবে না, অনিষ্ট হইবে।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই মন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা সক্ষম প্রচারক ছিলেন, আর এই মন্ত্র উদ্‌যাপনের জন্য সুকঠোর তপস্যায় ব্রতী ছিলেন। এই তপস্যায় যাহারা আত্মনিয়োগ করিবে, তাহারাই যেন চিত্তরঞ্জনের নামের দোহাই দেয়; কারণ, চিত্তরঞ্জনের নাম আজ খুব বড় নাম—বড় নামের দোহাই দিয়া ভিক্ষা করিয়াও খাওয়া যায়—'ভূতও ছাড়ানো যায়'।

চিত্তরঞ্জন যে-মন্ত্রের উপাসক ছিলেন, যে-মন্ত্র উদ্‌যাপনের জন্য, যে-মন্ত্রে চৈতন্য সঞ্চারের জন্য তিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন, সেই মন্ত্র কি, আজ সর্ব্বাগ্রে তাহাই নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। এই মন্ত্রের ইতিহাস আছে। স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনেকস্থলে এই মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ও কিছু কিছু করিয়াছেন, সুবিধা হইলে এখনও হয়ত করেন, কিন্তু প্রচার ও আচার পৃথক্। চিত্তরঞ্জন, আপনি আচরণ করিয়া নিজের সর্ব্বস্ব—"ধনৈরপি দারৈরপি"—শেষে প্রাণ-পর্য্যন্ত দিয়া এই মন্ত্র 'আপনি আচরি' শিখাইয়া গেলেন। এই মন্ত্র এযুগে আচরণ করিয়া প্রচার করার শক্তি ও অধিকার, কেবলমাত্র তাঁহারই ছিল, তাই সিদ্ধি যেটুকু, তিনিই লাভ করিয়াছেন।

মনীষি ভূদেবচন্দ্রের এই মন্ত্র ছিল। বঙ্কিমযুগের শক্তিশালী সাহিত্যসেবকগণের মধ্যে স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের চিন্তায় ও জীবনে এই মন্ত্র দীপ্যমান ছিল। বঙ্কিম-যুগে অক্ষয়চন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা জোরে এই মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও খাঁটি বাঙ্গালী খুঁজিতেন ও চাহিতেন; খাঁটি বাঙ্গালী লুপ্ত হইয়া যাইতেছে বলিয়া দুঃখও করিতেন। কিন্তু, তিনি খুঁজিয়াছিলেন সাহিত্যে—চিত্তরঞ্জন খুঁজিয়াছিলেন, সাহিত্যে ও জীবনে—ব্যষ্টির জীবনে ও সমষ্টির জীবনে। বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্তের জীবনীতে লিখিয়াছিলেন—

"আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বাঙ্গলা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়—হউক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের—আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গলা কথায় খাঁটি বাঙ্গালির মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর

নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালির কবি—ঈশ্বরগুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালি কবি জন্মে না। * * কিন্তু খাঁটি জিনিস একেবারে আমাদের ছাড়িলে চলিবে না; দেশশুদ্ধ জোন্‌স্ গমিসের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইলে চলিবে না। বাঙ্গালি নাম রাখিতে হইবে।"

বাঙ্গালা দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ও জলবায়ুর গুণেই হউক, আর অন্য কারণেই হউক, বাঙ্গালির চরিত্রে কতকগুলি বিশেষগুণ বিকাশলাভ করিয়াছিল। এই গুণগুলি আমাদের গ্রামে, সমাজে, গৃহস্থালীতে ও জীবনের লক্ষ্যে সুপরিস্ফুট ছিল। এখন আর তাহা নাই, স্মৃতি-পর্য্যন্ত লোপ হইতে বসিয়াছে। অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার 'উলা বা বীরনগর' প্রবন্ধে বাঙ্গলার গ্রাম বর্ণনা করিয়াছেন, 'গৃহস্থালী' প্রবন্ধে তিনি বাঙ্গালীকে কি আদর্শে সংসার চালাইতে হয় তাহা শিখাইয়াছেন, 'দ্রবময়ী চণ্ডালিনী' প্রবন্ধে বাঙ্গালীর, বিশেষ করিয়া বঙ্গনারীর শক্তি দেখাইয়াছেন। জীবন, সংগ্রাম নহে, স্বস্তি। 'মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি' প্রবন্ধে বাঙ্গালীর মহৎ জীবন দেখাইয়াছেন। 'খাঁটি বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব' যাহাতে হয়, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রেরও সাধনার বিষয় ছিল।

এই যে নব-ভাবুকতা, চিত্তরঞ্জনে আসিয়া ইহার পূর্ণবিকাশ হইয়াছে, তাঁহার 'বাঙ্গালার কথা'ই তাঁহার মর্ম্মকথা। চিত্তরঞ্জনের পূর্ব্বে নব্যবঙ্গের অপর কোন নেতাই বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিতে পারেন নাই। রাজনীতিক্ষেত্র ছিল ইংরাজীনবীশ বচনবাগীশগণের অধিকারে। চিত্তরঞ্জন এ দলের প্রধান ছিলেন, শক্তিতে ও জ্ঞানে, কিন্তু ইহা তাঁহার গৌণ পরিচয়। তাঁহার মুখ্য পরিচয়, বাঙ্গলার এই নবভাবুকতায় তিনি সিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার এই নবভাবুকতাই ছিল তাঁহার হৃদয়ের সারবস্তু। চিত্তরঞ্জন এই খাঁটি বাঙ্গালির বা খাঁটি ভারতের অন্বেষণ করিয়াছিলেন, ইহাই আমাদের "হারামণির অন্বেষণ"। ইহাই এ জাতির এ যুগের তপস্যা, চিত্তরঞ্জন ছিলেন, বাঙ্গালিদের সেই তপস্যার অগ্রদূত।

৭

চিত্তরঞ্জনের এই তপস্যা, ভাবুকতা ও ত্যাগ একটি প্রতিক্রিয়ার ফল। এই জন্যই ইহার মূল্য খুব বেশী। মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কাগজে দেখিলাম,

বিষয় স্বর্গীয় ভুবনমোহন দাস ও দুর্গামোহন দাস, এই দুই ভ্রাতার নাম বাদ পড়িয়াছে। সত্য কথা, এই দুই দাস ভ্রাতার গুপ্ত ও প্রকাশ্য বদান্যতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠনে খুব বেশী সাহায্য করিয়াছিল। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আর সাধারণ সমাজের উত্থান। একদিন চিত্তরঞ্জন প্রকাশ্যভাবে ও নির্ভীকভাবে এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিছু বেশী পরিমাণে চাহিয়াছিলেন। কাজটা বীরাচারী তান্ত্রিকের মত হইয়াছিল। সেদিন তিনি সাধারণ-সমাজে নিন্দিত ও ধিক্কৃত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-বন্ধুগণ বলিবেন, এই কারণেই তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের উপর বিরুদ্ধভাব। যাহা হউক, তাঁহার মনোভাব খুব বেশী রকম পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনিই সর্ব্বপ্রথম সাহসপূর্ব্বক প্রচার করিয়াছিলেন—বাঙ্গলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে-সব আন্দোলন হইয়াছে, তাহা আমাদিগকে আত্মপ্রকৃতি হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে, আমাদের মোহাবরণ বাড়াইয়া দিয়াছে। এ বড় ভয়ানক কথা! একথা 'ষোল আনা সত্য'—হউক বা না হউক, ইহা প্রচার করিতে খুব বড় বুকের পাটা দরকার ছিল, আর সে পাটা বিক্রমপুরের চিত্তরঞ্জনেরই ছিল। শুধু বুকের পাটা নয়, তাঁহার একথা বলার অধিকারও ছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে চিত্তরঞ্জনের স্থান হয় নাই, তিনিও স্থান চাহেন নাই, তাঁহাকে বাহিরে আসিতে হইয়াছিল। মনীষি বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহাকে লইয়া এক 'ত্রিশঙ্কু রাজার রাজ্য' গড়িতে চাহিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার মাথায় চাপাইয়াছিলেন Etherial নারায়ণ,—অর্থাৎ 'নারায়ণ' মাসিক কাগজ। কিন্তু ঐ 'বায়বীয় নারায়ণ'—ক্রমে স্থূল হইয়াছিলেন—আর 'নারায়ণ' অর্থাৎ শালগ্রাম শিলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ, বেদমন্ত্র, ক্রমশঃ সরস্বতী প্রতিমা চিত্তরঞ্জনের গৃহে ও অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্র বিপন্ন হইয়া তাল সাম্লাইতে না পারিয়া সরিয়া পড়িয়াছিলেন।

বিপিনচন্দ্র 'জাতি ব্রাহ্মণ' শুনিলেই ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়েন—যদিও তিনি বলেন, তিনি সাধু বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য। স্বর্গীয় ভুবনমোহন দাস মহাশয়ের শ্রাদ্ধে, দানের সময় মন্ত্র বদ্‌লাইয়া পড়াইয়াছিলেন "যথানামগোত্রায় মনুজায়";—'পুণ্ডরীকাক্ষ' শুনিলেও বিপিনবাবুর ভয় হয় বুঝি 'পৌত্তলিকতা' আছে—তাই আচমনের মন্ত্রে 'পুণ্ডরীকাক্ষং' বদ্‌লাইয়া 'পরমাত্মানং' বসাইয়াছিলেন। 'জাতিভেদ' ও 'পৌত্তলিকতা'র এই শুচিবায়ু দিয়া

চিত্তরঞ্জনকে হাতে রাখিতে পারেন নাই। কলিকাতার শিবাজী-উৎসবে ভবানীপূজায় যোগ দেওয়ার সময় স্বদেশপ্রেমের দিব্যজাগরণে মূর্ত্তিপূজাকে বিপিনবাবু যে চক্ষুতে দেখিয়াছিলেন, সেই চক্ষু আর সেই হৃদয় সাময়িক 'সঞ্চারী' না হইয়া বিপিনবাবুর হৃদয়ে যদি 'স্থায়ী' হইত, তাহা হইলে তিনি চিত্তরঞ্জনকে আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতন।

চিত্তরঞ্জন ছুটিয়াছিলেন,—গোটা দেশকে আপন করিয়া গোটা দেশের আপন হইতে। যে অশিক্ষিত বৈষ্ণববৈরাগীর নামে সামান্য লেখাপড়াজানা একালের বাবু নাসিকাকুঞ্চন করিত, চিত্তরঞ্জন তাহাদের মর্ম্মকথা মর্ম্ম দিয়া ধরিতে চহিতেন, তাহাদের ভাবোচ্ছ্বাসে মাতিতে চাহিতেন। কীর্ত্তনগায়ক গরিব বৈরাগীরা চিত্তরঞ্জনের ভালবাসায় যত মুগ্ধ, আমরা ইংরাজী-পড়া বাবুর দল তাহার অর্দ্ধেক মুগ্ধ হইলেও দেশের অবস্থা অন্যরূপ হইত।

নবদ্বীপে ধূলট উৎসব। প্রত্যেক ঠাকুর-বাড়ীতে কীর্ত্তন হইতেছে—মহাসমারোহ। রাত্রি ৮টার সময় খবর আসিল, চিত্তরঞ্জনের কারাদণ্ড হইয়াছে। দরিদ্র অশিক্ষিত গ্রাম্য কীর্ত্তনিয়া, নিতান্ত অসভ্য, শুনিবামাত্রই প্রত্যেকে গান বন্ধ করিল, প্রত্যেকেই কাঁদিয়া ফেলিল। ভদ্রসন্তান গোস্বামী, মূলধন নিয়োগ করিয়া ঠাকুরবাড়ীর ব্যবসায় করেন, তাঁহারা বলিলেন 'গান হইবে, নিশ্চয় হইবে, টাকা লইয়াছ, নিশ্চয় গাহিবে।' কীর্ত্তনিয়ারা বলিল—'টাকা চাহি না, কিছুতেই গাহিব না'। কীর্ত্তনিয়ারা গাহে নাই, ধনবান ও ভদ্র মন্দিরাধ্যক্ষ্যদের কথা রাখে নাই—কারণ অর্দ্ধলক্ষ তীর্থযাত্রী কীর্ত্তনিয়াগণের মতে মত দিয়াছিল।

এখন আমাদের সমাজের উপর ফেনের মত কতকগুলি চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে মানুষ ভাসিয়া বেড়াইতেছে—ইহারা ভদ্রলোক। ইহারা সহরে থাকে বা সহরের সঙ্গে জোড়া হইয়া থাকে, ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়। অনেকে ভাবে ইহারাই সমাজ, ইহারাই গোটা দেশ। কিন্তু এইটাই আমাদের বড় ভুল। এই ফেনের নীচে আসল জাতি, আর আসল জাতির আসল প্রাণ ও হৃদয় ;—আমরা কিন্তু সেখান হইতে চলিয়া আসিয়াছি। তাই আমরা মরিয়াছি। আবার সেখানে ফিরিতে হইবে। কীর্ত্তন গান, বৈষ্ণব কবিতা, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ইহার মধ্যেই চিত্তরঞ্জন অনুভব করিয়াছিলেন—খাঁটি বাঙ্গলার সেই বিশাল, বিরাট, গভীর ও নির্ম্মল হৃদয়।

ডোবে না, ডুবিতে পারে না,—তাহা ভাসে। সে যদিবা হৃদয়ের কথা, রসের কথা বলে,—সংজ্ঞা দিয়া বলে, যুক্তি দিয়া বলে—Definitive, scholastic ধরণে ভাবে ও বলে, ইহারা ডোবে না, ডুবিতে পারে না, Intuitive, meditative পদ্ধতি ইহারা জানে না। স্বদেশসেবার নামে কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া যাহারা দেশের গলদই কেবল দেখে, আর বকের মত শনৈঃ শনৈঃ পা ফেলিয়া, কেবল বলে এত গলদ,—জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা ইত্যাদি ইত্যাদি, চিত্তরঞ্জনের পদ্ধতি তাহারা বুঝিতেই পারিবে না। দেশের সেবা করিয়া নিজে ধন্য হইবে; তোমার সেবার দ্বারা দেশকে ধন্য করিবে, ইহা ভাবিও না; তাহা যদি ভাব, শুনিয়া রাখ, দেশ তোমার সেবা চায় না; সে গরিব,—বড় গরিব, কিন্তু জানিও সে মা, বড় অভিমানিনী, তার দাবি আছে! দেশের সেবা করিয়া নিজে ধন্য হইব বলিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে যাহারা নামিবে, তাহারা দেখিবে, বাধা নাই,—কোথায়ও বাধা নাই। সংস্কার হইয়াই রহিয়াছে—নিজের ভিতর সংস্কৃত হইলে দেখিবে বাহিরে কিছুই অসংস্কৃত নহে, সকলই সংস্কৃত। এই পথ চিত্তরঞ্জনের পথ—এ পথে বিপিনপালও তাঁহার বিপক্ষে, সার্ প্রফুল্লচন্দ্রও তাঁহার বিপক্ষে, যদিও তাঁহারাও বড়লোক, তাঁহারাও ভাল লোক।

পুরাতন বাঙ্গালা পুঁথি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িবেন, সে রসে রসিয়া আপনি মাতিয়া দেশকে আবার তেমনি করিয়া মাতাইবেন—যেমন করিয়া এই দেশ চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে নবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল; সে দিনের মত্ততায় হিন্দুমুসলমানের বৈষম্য বা অস্পৃশ্যতার প্রতিবন্ধকতায় কিছুই আটকায় নাই; মাতিলে আর আট্‌কাইবে না, কিন্তু না মাতিলে পদে পদে চিরদিনই আট্‌কাইবে; বৈষ্ণব কবিতাকে একালের লোকের বোধগম্য আকারে প্রচার করার অতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁহার অন্তরে চিরদিন জাগরূক ছিল। একজন উপযুক্ত লোককে এজন্য অর্থসাহায্যও করিয়াছিলেন—সে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে চিত্তরঞ্জনের নামও নাই।

৮

দেশ আমার, না, আমি দেশের। আমি দেশের নিকট যাইব, না, দেশকে আমার নিকট টানিয়া আনিব? ইহাই ভারতবর্ষে অন্যতম প্রকাণ্ড প্রশ্ন। এ প্রশ্ন এমনভাবে অন্য কোন দেশে কখনও জাগে নাই। ইংরাজের বাহাদুরি এই, যে এই প্রশ্ন ভারতবর্ষে

নিজেকে বড় বলিয়া মনে করি। এই মহামোহ, এখনও আমাদের চিত্তে প্রবলভাবে ক্রিয়াম্বিত। চিত্তরঞ্জনের বাহাদুরি এই—তাঁর শ্রেষ্ঠত্বও এইখানে, যে এই মোহ তাঁহার ভাঙ্গিয়াছিল। এই মোহ কি, তাহা দেশের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের কথায় অনেকস্থলেই ব্যক্ত হইয়াছে। একথা, পূর্ব্বে, যাহারা নিজেদের শিক্ষিত ভদ্রলোক বলিয়া মনে করে, তাহারা বড় শুনিত না ; কিন্তু এখন সার্ উড্রফের মত শ্বেতদ্বৈপায়নও যখন বলিতেছেন, তখন আর প্রকাশ্যে অস্বীকার করার সাহস ও সামর্থ্য কোথায় ? এই মোহ কি, সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কথা হইতেই বুঝা যাইবে—গত ২রা জ্যৈষ্ঠের 'বঙ্গবাসী' হইতে উদ্ধৃত হইল।

"বাল্যকাল হইতে দেশীয় শিক্ষার অভাবের সহিত কেবল বিদেশীয় শিক্ষা-প্রভাবে নব্যশিক্ষিত সমাজের অধিকাংশ গৃহীতবৎ (মিডিয়মের মত) হইয়া গিয়াছে। এখন ইহাঁদের আত্মা হইতে মন প্রাণ এবং সর্ব্বেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত সমাক্রান্ত হইয়া পরিভূত হইয়াছে। তাই ইহাঁদের সকলেরই স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্তবৎ দৃষ্ট হয়। এখন ইহাঁদের প্রাণ পরকীয় প্রাণের দ্বারা বিজিত, মনগুলিও পরকীয় মন কর্ত্তৃক আত্মহারা, শ্রবণ নয়নাদি ইন্দ্রিয়-গুলিরও সেই একই দশা। এজন্য ইহাঁদের নয়ন দেশীয় দৃশ্য দেখিতে ভালবাসে না, শ্রবণেন্দ্রিয় দেশীয় মহাভারত পুরাণাদির কথা শুনিতে চায় না ! এমন কি, দেশের নৃত্যবাদ্যেও সন্তুষ্ট হয় না। সেজন্য ইংরাজী বাদ্য এখন দেশীয় কাঁশী ঢোলাদির স্থান অধিকার করিয়াছে। ইংরাজী বাদ্য না হইলে আজকাল বিবাহই অসিদ্ধবৎ হয়। তান-পুরা সেতার বীণা বেহালার বাদ্যগুলিকে হারমোনিয়মে পরাজিত করিয়াছে। এখন রসনাগুলিও দেশীয় খাদ্য গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ। দেশজাত চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ মনোহর দ্রব্যের পরিবর্ত্তে পনীর কেক্ বিস্কুট পাঁওরুটি প্রভৃতির জন্য লালায়িত। তাঁহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়েরও এইরূপই অবস্থা। তাঁহারা দেশের চন্দন গুগ্‌গুলাদির গন্ধের তো পরিচয়ই রাখেন না, প্রকৃত আতর গোলাপাদির গন্ধও তুচ্ছ করিয়া বিদেশীয় গন্ধ পাইলেই অধিকতর আপ্যায়িত হন। ত্বগিন্দ্রিয় বিষয়ে আর কি বলিব ? ঘোরতর শীতরাজ্যে সমুৎপন্ন বিদেশীয় লোকের পক্ষে এদেশে থাকিয়া মাঘ মাসকেও আমাদের পক্ষে চৈত্র মাসের মত মনে করেন। সেজন্য আমাদের দেশেও এখন মাঘ হইতেই

ব্যতীত অপর দশ মাসেই এখনকার ত্বগিন্দ্রিয় গ্রীষ্মানুভবে কাতর হইয়া থাকে। মনের কথা বলাই বাহুল্য। সর্ব্বাগ্রে মনই বিদেশীয় মনের দ্বারা অভিভূত হইয়া ইন্দ্রিয়গণের বর্ণিত লীলা দেখাইয়া থাকে। তবে তাহার নিজের অস্তিত্ব কোথায়? ঐ দেখ অপর দেশীয়দিগের চা-পানের অনুকরণে এদেশে কোটী কোটী টাকার চা চলিয়া যাইতেছে। এদেশীয় মানুষের পক্ষে উহা বিষ কি অমৃত অথবা আবশ্যক কি অনাবশ্যক সে চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্যও কাহার মনে আসিতেছে না; এখন চা-পান না করাই অসভ্যতার চিহ্ন! এইরূপ আরো বহুতর উদাহরণ মন সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য। প্রাণের সত্তা তো অন্বেষণেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং ইহাঁদের সঙ্গে জীবও অস্তমিত। কারণ এই সকলকে লইয়াই জীবের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া জীবতত্ত্ব ধরিতে পারা যায় না। এজন্য বর্ণিত অবস্থাবলীর দর্শনে বর্ণিত শিক্ষিত দলের জীবগণকে অগত্যা পরগৃহীত জীব বলিতে হয়।

আবার আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যাহারা বিদেশীয় শিক্ষায় শিক্ষিত নহে, বিদেশীয় শক্তি তাহাদিগকে আরো যেন অধিকতর পরাজিত করিয়া ফেলিয়াছে। এখন তাহারা একেবারেই আত্মহারা হইয়া শিক্ষিত দলের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। ইহাদিগের অবস্থা আরো দুঃখজনক। এইরূপে নব্যসমাজের এখন বিদেশীয় কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে গৃহীত দশা দাঁড়াইয়াছে। এখন ইহাঁরা যাহা কিছু বলেন, তাহা গৃহীতেরই কথা, যাহা করেন তাহাও গৃহীতেরই কার্য্য। এখন ইহাদের 'স্ব'কেই অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় ইহাদের মুখে স্বাধীনতার উক্তি "গগন-কুসুম" কথার মত নিরর্থক। গৃহীত ভাব হইতে (মিডিয়ম ভাব হইতে) বিমুক্ত হইয়া যখন দেশের সকলেই "স্ব" হইতে পারিবে, তখন অনির্ব্বচনীয়-শক্তি জগদম্বাই আবশ্যক দেখিয়া স্বাধীনতা দিবেন। এখন সকলের "স্ব"ই (ইন্দ্রিয় মন প্রাণের সহিত জীবাত্মাই) পরাধীনতায় ডুবিয়া আছে, এ অবস্থায় স্বাধীনতার প্রসক্তি কোথায়? এখন বিহ্বলতা বশতঃ অন্যান্য দেশসমূহকে স্বাধীন দেখিয়া তদীয় পরিবার-নীতি সমাজ-নীত্যাদির অনুসরণ করিলেই এদেশ স্বাধীন হইবে, এইরূপ কল্পনা হইতে এদেশে বিধবা-বিবাহ, সধবা-বিবাহ, স্থবিরা-বিবাহ, বৃদ্ধা-বিবাহাদি প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে। আবার অন্যদেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতি ভেদ

জাতিভেদটারও ধ্বংসের আয়োজন হইতেছে। ইহার সঙ্গে অন্য কত প্রকার উদ্দেশ্যের মিলন করা হইতেছে, তাহা এ প্রসঙ্গে বলা নিষ্প্রয়োজন। ফলতঃ এই জাতীয় সমস্ত কথাই আমরা পরগৃহীতাবস্থার উক্তি বলিয়া মনে করি। এ সকল অনুষ্ঠান কদাচ এদেশে প্রচলিত হইবার নহে। আর দেশোদ্ধার পক্ষে যে, ইহা কোনরূপ আনুকূল্য করিতে পাবে, ইহাও কল্পনার যোগ্য নহে, প্রত্যুত ইহা দেশোচ্ছেদেরই কারণ বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে। এইরূপ ভয়ঙ্কর আন্দোলনের দ্বারা এখনই কোটী কোটী হিন্দুগণের মধ্যে ভাঙ্গাভাঙ্গি হইয়া ঘোরতর মনোবাদ, বিবাদ ও অশান্তির সৃষ্টি হইতেছে। অহিন্দুগণের তো কথাই নাই; তাঁহারা এই দেশের প্রকৃত রিপু বলিয়া প্রকৃত হিন্দুগণের বিশ্বাস হইতেছে, আবার তাঁহারাও প্রকৃত হিন্দুদিগকে শত্রুবৎ মনে করিয়া থাকেন। এখন ভাবিয়া দেখ, এই সকল অসদৃশ অনুষ্ঠান দেশের উদ্ধার কি আরো পতনের হেতু।"

* এই বর্ণনা কিছু বেশী হইতে পারে, কিন্তু মূলে সত্য। এই মূল সত্যে চিত্তরঞ্জন পৌঁছিয়াছিলেন, অন্ততঃপক্ষে পৌঁছিবার জন্য সরলপ্রাণে সুকঠোর তপস্যায় রত হইয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার ফলে চিত্তরঞ্জনও এই সত্যে আসিতেছিলেন বা আসিয়াছিলেন, তাঁহার রচনাবলী ও উক্তি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। দেশের জনসাধারণের মর্ম্মকথা তিনি ধরিয়াছিলেন, আর সেই কথা তাঁহারও মর্ম্মকথা হইয়াছিল; সেই কারণে রাজনীতিক নেতা হিসাবে তিনি যে প্রভাব ও প্রতিপত্তি করিয়াছিলেন, বাঙ্গলায় অন্য কোন নেতারই ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। তাঁহার জীবনের এই রহস্য, আজ আমাদের বুঝিতে হইবে, তিনি দেশকে নিজের কাছে আনিবার চেষ্টা করেন নাই, দীন ও অকিঞ্চন হইয়া দেশের কাছে যাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, 'আমি দেশের' এই 'তদীয়তাময়' ভাবই তাঁহার জীবনের মন্ত্র ছিল। এই কারণেই সুবিখ্যাত সংস্কারকের কুলে জন্মাইয়া এবং একালের বিলাতী বিদ্যা পরিপূর্ণরূপে পাইয়াও তিনি প্রতিবেশ-প্রভাবকে জয় করিয়াছিলেন, জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতাপূর্ণ দেশকে ও জাতিকে অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও কুসংস্কারান্ধ বলিয়া দূরে দাঁড়াইতে পারেন নাই। তিনি দেশের সমষ্টি জীবনে, সত্য, শিব ও সুন্দরকেই দেখিয়াছিলেন, তাই সর্ব্বত্যাগী হইতে পারিয়াছিলেন। হিন্দু-

ধর্ম্মের পুনরুত্থানের প্রভাব ও নবীন বঙ্গসাহিত্যের প্রভাব তাঁহার উপর যেমন পূর্ণরূপে ক্রিয়া করিয়াছে, এই দুইটি আন্দোলনকে তিনিও তেমনি প্রভাবান্বিত করিয়াছেন।

৯

প্রেমই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। তিনি আজন্ম-সিদ্ধ প্রেমিক ছিলেন। জনৈক ভদ্রলোক তাঁহার হাতের লেখা একটি নীতিবাক্য ও তাঁহার স্বাক্ষর চাহিয়াছিলেন—তিনি নীতিবাক্য লিখিয়াছিলেন—Love is life and life is love. ইহাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি প্রথম জীবনে প্রেমের কবিতাই লিখিতেন। তাঁহার দুইটি কবিতা উদ্ধৃত হইল—যাঁহারা পূর্ব্বে ভাল করিয়া পড়েন নাই—এখন ভাল করিয়া পড়িবেন।

কবিতা ও প্রিয়া

রচনা-বিভোর কবি যেমন করিয়া
আপন রচনাগুলি হাতে তুলি নিয়া
উলটি পালটি তারে পরাণ ভরিয়া
শতবার উচ্চারিয়া করে সম্ভাষণ,
সেইরূপ, হে প্রেয়সি! আমিও তোমার
সৌন্দর্য্য সম্পদ-রাশি হেরি বারে বার
শতবার চলি গিয়া ফিরিয়া আবার,
তবে প্রেম-মন্ত্র প্রিয়ে! করি উচ্চারণ।
কবিতা কবির আত্মা, তাই তারে টানে;
তুমি মোরে কিসে টান? কে জানে কে জানে।

সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩০৮।

সাধনা

ওগো প্রিয়! তুমি মোর পুণ্য জীবনের
চির প্রেমার্জ্জিত পূর্ব্ব জনমের ফল।
ওগো প্রিয়! তুমি মোর শূন্য মরণের
সহস্র আসন্ন আশা সহায় সম্বল!—
নিতান্ত আমারি তুমি!
আছ তুমি দাঁড়াইয়া বিরাট অটল,
অতি ঊর্দ্ধ দৃষ্টি তব স্বর্গ পানে ধায়।
সফল জীবন তব, স্বাধীন সফল!—
আমি ব'সে তোমারি ও চরণের ছায়,—
তোমারি চরণ চুমি!
যদি কোন দিন তব উন্নত নয়ন
ধরণীর পানে চায় দেব স্বপ্ন ভুলে!
আমি তাই পাতিয়াছি আমারি শয়ন
চেয়ে দেখ, তোমারি ও চরণের মূলে!
সফল করিও তুমি!
খুলিয়া হৃদয়-দ্বার আমি বিছাইব
যত না সৌন্দর্য্য আছে, যত না স্বপন!
সর্ব্ব কোমলতা মোর আমি পেতে দিব—
তুমি ক'র—ওগো ক'র—আমারি জীবন
তোমার চরণ ভূমি!

সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯।

১০

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠমানব মহাত্মা গান্ধি, বাঙ্গলায় ছিলেন; চিত্তরঞ্জনের মৃতদেহকে কলিকাতা ও বাঙ্গলাদেশ কিভাবে অভ্যর্থনা করিল, তাহা তিনি দেখিলেন। ইহা দেশের

ভাগ্যের কথা। পূজনীয় স্যর সুরেন্দ্রনাথ মৃত্যুর পরেই স্বরাজ দলকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিলেন, আর কিছু বলিবার পাইলেন না, ইহা সংসারেরই রীতি। শ্রদ্ধাস্পদ বিপিনচন্দ্র যাহা বলিলেন, তাহাতে তাঁহার সহিত চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের কথা ব্যক্ত করিলেন না। ইহা ভারতীয় রীতি নহে, কারণ সে কথা আর কখন বলিবেন? শ্রীমতী বেশান্ত যাহা বলিয়াছেন ঠিকই কথা, অমরবীর দেশপ্রাণ মহানুভব যাবেন কোথায়, এই ভারতের ও বঙ্গের আরও ভাল করিয়া তিনি সেবা করিবেন। আমরা বলি শীঘ্রই তিনি বাঙ্গলা-দেশে জন্মগ্রহণ করিবেন। কুড়ি বৎসর কাল প্রত্যহ যাঁহারা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে প্রেমের সহিত স্মরণ করিবেন, তাঁহারা কুড়ি বৎসর পরে আবার দেখিবেন তিনি দেশের কাজে লাগিয়া গিয়াছেন। সেই গৌরবের দিনের আয়োজন হইতেছে—তাই আহ্বান শুনিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার ব্রতে ব্রতী হইয়া দেশের কিশোর কিশোরী ও যুবক যুবতীগণ প্রতীক্ষা করুন।

মহাত্মাজির উক্তিই আজ সকলের উক্তি হউক।

Five days of communion with the great patriot which I had at Darjeeling brought us nearer to each other than we ever were before. I realized not only how great Deshbandhu was but also how good he was. India has lost a jewel but we must regain it by gaining Swaraj.

যে রত্ন আজ হারাইলাম, তাহা আমরা নিশ্চয়ই পাইব, স্বরাজ পাইলেই তাঁহাকে পাইব। ইহাই আমাদের ব্রত হউক, ইহাই আমাদের ধর্ম্ম হউক।

আজ কি শ্রীঅরবিন্দ আসিবেন, চিত্তরঞ্জনের সকল কাজের না হউক, কোন কোন কাজের ভার কি তিনি লইবেন? তিনিই আসুন, চিত্তরঞ্জনের সহিত তাঁহার ব্যক্তি-গত সম্বন্ধ কত গভীর, কত মধুর, প্রাণে প্রাণে যোগ, সাধনার যোগ, সে যে আরও গভীর!

আজ আর বেশী কি বলিব! সমগ্র ভারতের হৃদয় আজ শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিয়াছে—তাই প্রার্থনা করিতেছি—"অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ"—অসুরগণ, রাক্ষসগণ অপগত হও। আর প্রার্থনা করিতেছি—

মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্ত সিন্ধবঃ মাধ্বীর্ণ সন্তোষধীর্মধুনক্ত মুতোষসঃ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুদ্যৌরস্তনঃ পিতাঃ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাংস্ত সূর্য্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্ত নঃ॥

মধু, মধু, মধু!!

সিউড়ি, ৭ই আষাঢ়, ১৩৩২।

বীরভুমি] মাসিক পত্রিকা [৭—৫

১৩৩২

মদন-মোহন

২ শ্রীশ্রীরাসলীলার শেষ সন্দেহ

৩ দেশবন্ধু—প্রয়াণের পর

৪ বৈষ্ণব ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বাদানুবাদ

৫ বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মত

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

মদন-মোহন

জিনি পঞ্চশরদর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প,
রাস ক'রে লঞা গোপীগণ।
চড়ি গোপী-মনোরথে, মন্মথের মন মথে,
নাম ধরে মদনমোহন।

পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী শ্রীশ্রীরাসলীলার টীকার প্রারম্ভে যে শ্লোকে শ্রীরাসবিহারীর বন্দনা করিয়াছেন সেই শ্লোকটি এই,—

"ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়দর্প কন্দর্পদর্পহা।
জয়তি শ্রীপতির্গোপী রাসমণ্ডল মণ্ডনঃ ॥"

কন্দর্পের অর্থাৎ মদনের আর অহঙ্কারের সীমা নাই; ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতিকে কন্দর্প পরাস্ত করিয়াছে, সুতরাং অহঙ্কার হইবারই কথা। আজ শ্রীকৃষ্ণ সেই কন্দর্পের দর্প দূর করিবার জন্য গোপীমণ্ডলের শোভাস্বরূপ হইয়া রাসলীলা আরম্ভ করিলেন।

তাহা হইলে আমরা এইটুকু বুঝিলাম যে শ্রীধরস্বামীর মতে রাসলীলার উদ্দেশ্য কন্দর্পের দর্পজয়। শ্রীরাসলীলার শেষ শ্লোকে, যেখানে ফলশ্রুতি বর্ণনা করা হইয়াছে, সেখানেও এই কথা বলা হইয়াছে। সাধক ভক্তগণও চিরদিন এই লীলাকে কন্দর্পের দর্পজয়কারিণী লীলা বলিয়া আস্বাদন করিয়াছেন। কন্দর্পের দর্পজয় দুই প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছে এবং সাধনশাস্ত্রে এই দুই প্রকারের পথ উপদিষ্ট হইয়াছে। অধিকারভেদে ও রুচিভেদে সাধনভেদ; সুতরাং পথে পথে দ্বন্দ্ব নাই। দুইটিই সনাতন পথ। একটি পথে মদনদহন, আর একটি পথে মদনমোহন। কেহ কেহ বলেন এই দুইটি পথ পৃথক নহে; একটিই পথ, ইহার প্রথম সোপানগুলির নাম মদনদহন, আর শেষ সোপানগুলির নাম মদনমোহন। শ্রীরাসলীলা এই মদন-মোহনলীলা।

কেবল বাহির হইতে আমাদের সাধারণ লৌকিক জ্ঞানের সাহায্যে যদি রাসলীলা আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে মনে হইবে রাস-লীলায় মদন-মোহন কি প্রকারে হইল? কন্দর্পের দর্পজয় করার কথা বলেন কেন? এ যে ষোড়শোপচারে কন্দর্পের পূজার আয়োজন! যাঁহারা বহির্মুখ, তাঁহারা চিরদিনই এই প্রকারের সন্দেহ প্রকাশ করেন। পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামীর যুগেও এ সন্দেহ ছিল। তাঁহার টীকার ভূমিকাটুকু পড়িলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে।' শ্রীধরস্বামী যেমন বলিলেন, এই লীলায় কন্দর্পের দর্পজয় হইবে, অমনি আপত্তি উঠিল "নম্ন পরদারবিনোদনেন কন্দর্পস্য জেতৃত্ব প্রতীতেঃ" ঠিক কথাই তো, ব্রজগোপীগণ পরস্ত্রী, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের লইয়া আমোদ করিবেন, ইহাতে যে আজ কন্দর্পের বিজয় উৎসব হইবে। এই আপত্তির উত্তরে শ্রীধরস্বামী বলিলেন—এরূপ মনে করিবেন না, যদি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাস পঞ্চাধ্যায় পাঠ করেন তাহা হইলে চারিটি কথা দেখিতে পাইবেন; এই চারিটি কথার অর্থ বড়ই গভীর। এই চারিটি কথার অর্থ কি, তাহা প্রথমে অবধারণ করিবেন। এই চারিটি কথার অর্থ বুঝিয়া যদি এই লীলা ধ্যান করেন, তাহা হইলে বুঝিবেন যে এই রাসলীলায় শৃঙ্গার কথায় অপদেশ আছে অর্থাৎ এমন ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে পড়িলেই মনে হয়, ইহা প্রাকৃত নায়ক নায়িকার প্রাকৃত কামক্রীড়া মাত্র। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কথা চারিটির তাৎপর্য্য বুঝিলে বুঝিতে পারিবেন, শৃঙ্গার কথায় অপদেশ থাকিলেও এই রাসক্রীড়া বিশেষরূপে নিবৃত্তি-পরা। আমাদের বেদানুগত যাবতীয় সাধনের উদ্দেশ্যই নিবৃত্তি, এই রাসক্রীড়া আবার বিশেষরূপে নিবৃত্তিপরা, অর্থাৎ ইহা অতি সহজে ও সুগম উপায়ে সাধককে প্রবৃত্তির বন্ধন হইতে উদ্ধার করিয়া শাশ্বত অমৃতরাজ্যে, জীবের যাহা স্বরূপ, সেই স্বরূপে লইয়া যায়। শ্রীধরস্বামী প্রতিজ্ঞা করিলেন আমি ইহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিব। "শৃঙ্গার কথাপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরা ইয়ং পঞ্চাধ্যায়ী।"

শ্রীধরস্বামী যে চারিটি কথা দেখাইলেন সে চারিটি কথা এই—"যোগমায়া-মুপাশ্রিতঃ" "আত্মারামোহপ্যরীরমৎ" "সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ" "আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ"। এই চারিটি কথার সংক্ষিপ্ত অর্থ—(১) যোগমায়াকে সমীপে গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ এই রাসক্রীড়া করিলেন (২) যিনি ক্রীড়া করিলেন, তিনি আত্মারাম অথচ রমণ করিলেন (৩) মন্মথ জগতের সকলের মনকে মথন করে, কিন্তু যিনি রাসক্রীড়া করিলেন সেই

শ্রীরাধারমণ শ্রীকৃষ্ণ এমনি যে, তাঁহাকে দর্শনমাত্রেই মদনের মন মথিত হয় (৪) রাস-ক্রীড়ার নায়ক যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাতে সৌরত অবরুদ্ধ ; "ইত্যাদিষু স্বাতন্ত্র্যাভিধানাৎ" এই চারিটি কথা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র, পরতন্ত্র নহেন।

আমরা এই চারিটি কথার কিছু কিছু পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি—পরেও করা যাইবে। এখন শ্রীধরস্বামীর টীকা পড়িলে সাধারণতঃ আমাদের মনে যে সকল চিন্তার উদয় হয়, একটি নিতান্ত লৌকিক উদাহরণের সাহায্যে তাহা বর্ণনা করিতেছি।

আমরা ছেলে মানুষ, বিদ্যালয়ে নিম্নতম শ্রেণীতে পড়ি, দাগা বুলাই অর্থাৎ বর্ণমালা লিখিতে শিখি। উপরের শ্রেণীর বড় বড় ছেলেরা বীজগণিতের অঙ্ক কসে। তাহারা বোর্ডে লেখে $(ক+খ)^২ = ক^২ + ২কখ + খ^২$। আমরা তাহাদের বোর্ডের লেখা দেখি, আর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি, "আচ্ছা ইহারা এত বড় বড় ছেলে, ইহারা আবার 'ক, খ' লেখে কেন ?" আমাদের মধ্যে এই বিষয়ে প্রায়ই বাদানুবাদ হয়। আমাদের মধ্যে যাহারা কিছু বেশী বুদ্ধিমান্, তাহারা ইহার একদিন মীমাংসা করিয়া ফেলিল। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "দ্যাখ, আমরা যেমন পুরাতন পড়া ভুলিয়া যাই, ইহারাও তেমনি 'ক, খ' লেখা ভুলিয়া গিয়াছে ; আমরা যেমন পুরাতন পড়া ঘুরাইয়া পড়ি, ইহারাও তেমনি ঐ 'ক, খ,' ঘুরাইয়া পড়িতেছে।" বুদ্ধিমানেরা এই মীমাংসা করিয়া ফেলিল বটে, কিন্তু যাহারা কিছু বোকারকমের তাহাদের ইহাতে সন্তোষ হইল না—তাহাদের মনে সন্দেহ হইতে লাগিল "আমাদের 'ক খ' আর ইহাদের 'ক, খ,' ইহা কি একই জিনিষ ?" বুদ্ধিমানেরা বলিল "ক, খ,' কি আর দুরকম হয় ? আমাদের 'ক, খ, ও যা উহাদের 'ক, খ,' ও তাই।" যাহারা কম বুদ্ধিমান, তাহারা বুদ্ধির অভাবে ইহা স্বীকার করিতে পারিল না। তাহারা ভাবিল যে বোর্ডে যাহারা 'ক, খ,' লিখিতেছে, তাহাদের অনেককেই তো আমরা চিনি, তাহারা বৎসর বৎসর পারিতোষিক পায়, তাহারা সব খুব ভাল ছেলে, তাহারা আমাদের পড়া বলিয়া দেয়, পাড়ার সকল লোক তাহাদের খুব প্রশংসা করে, সুতরাং তাহারা যে 'ক, খ,' ভুলিয়া গিয়াছে, ইহা হইতেই পারে না। উহাদের ঐ 'ক, খ,'-এর অন্য কোনরূপ অর্থ থাকাই সম্ভব। তাহার পর বোর্ডে লেখা 'ক, খ,' বেশ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া তাহারা দেখিল যে তাদের 'ক, খ,'

পরিব্যক্ত। প্রথম ইহাদের 'ক' ও 'খ' এর মধ্যে একটা চিহ্ন + (যুক্তচিহ্ন), আবার 'ক' ও 'খ' বন্ধনী দিয়া ঘেরা, আবার বন্ধনীর উপরে একটা চিহ্ন—বর্গচিহ্ন; আবার একটা = চিহ্ন (সমান চিহ্ন)—এই চারিটি চিহ্ন দেখিয়া তাহাদের মনে হইল আমাদের 'ক, খ,' এর সহিত ইহাদের 'ক, খ,' এর কিছু তফাৎ আছে। বুদ্ধিমানেরা যে মীমাংসা করিয়াছে তাহা স্বীকার করা যায় না। সকল ব্যাপারেরই যে তাড়াতাড়ি একটা মীমাংসা করিতে হইবে তাহা নহে, ক্রমে ক্রমে সকল বিষয়ের মীমাংসা হইবে, ইহাই বিশ্বের স্বাভাবিক ব্যবস্থা; সুতরাং এই কম বুদ্ধিমানের দল অপেক্ষা করিতে লাগিল। বেশী বুদ্ধিমান্, সবজান্তাগণ তখন ঢাক বাজাইয়া নিজেদের মীমাংসা, তাহাদের অপেক্ষা কম-বয়সী ছেলেদের মধ্যে প্রচার করিয়া সবজান্তাদলের লোকসংখ্যা বাড়াইতেছিল। কম বুদ্ধিমানেরা অপেক্ষা করিতেছে, ক্রমে তাহারা বড় হইল, বৎসরে বৎসরে এক এক শ্রেণী অতিক্রম করিয়া আজ তাহারা বীজগণিতের শ্রেণীতে আসিয়া বোর্ডে বীজগণিত কষিতেছে। হঠাৎ সেই ছেলেবেলাকার কথা তাহাদের মনে পড়িয়া গেল, সেদিনকার কথা মনে করিয়া তাহারা খুব হাসিতে লাগিল। কিন্তু আজ সেই বুদ্ধিমান্, সবজান্তারা কোথায়? তাহারা আর এতদূর আসে নাই। তাহারা শিখিবার বা জানিবার জন্য সহিষ্ণুতার সহিত পরিশ্রম বা অপেক্ষা না করিয়া অপরকে শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

এই উপমাটি, শ্রীধরস্বামীর টীকা পড়িয়া মনে যে ভাব হয় তাহার সহিত তুলনীয়। আমরা কামজগতে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সুখান্বেষণ লইয়া রহিয়াছি, এখানে পুরুষ আছে, রমণী আছে, ইহাদের কামক্রীড়া আছে। ইহাই আমাদের 'ক, খ' লেখা, নিম্নতম শ্রেণীর পড়া বা দাগা বুলানো। হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণলীলা শুনিলাম, সেখানেও স্ত্রীলোক, পুরুষ, ভালবাসা-বাসি মিলন, বিরহ ইত্যাদি, ইত্যাদি। স্বভাবতঃই প্রশ্ন হইল, এসব কি? বুদ্ধিমান বলিলেন, আমাদের এই কামক্রীড়াই সেখানে হইতেছে। যাহারা কিছু বোকা তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিল না, তাহাদের মনে হইল ব্যাসদেব, শুকদেব হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, রূপ, সনাতন প্রভৃতি, তাহার পর আজও শত শত সহস্র সহস্র জিতেন্দ্রিয় সাধুপুরুষ, যাঁহারা আমাদের মত মানবের গুরু, তাঁহারা যখন অত্যন্ত আদরের সহিত এই লীলার অনুশীলন করিতেছেন, তখন সেখানে আমাদের 'ক, খ' থাকিলেও

সাহায্যেই হউক আর মূল ভাগবত পড়িতে পড়িতেই হউক, শ্রীধরস্বামীর টীকায় উল্লিখিত ঐ চারিটি কথা দেখিতে পাইল; তখন ভাবিল, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! যোগমায়াকে নিকটে লইয়া যিনি আত্মারাম, মন্মথ-মন্মথ ও অচ্যুত, তিনি কামক্রীড়া করেন, ইহা কিরূপে সম্ভব? অপূর্ণ জীব কামের তাড়নায় অনাত্মকে আত্মবস্তু বলিয়া ভুল করে এবং অনাত্মের শরণাগত হইয়া ক্লেশ পায়, এই ক্লেশ অভিজ্ঞতারূপে ক্রমশঃ তাহাকে বুঝাইয়া দেয়, সুখ বাহিরে নহে—ভিতরে, এই প্রকারে ঠকিয়া ঠকিয়া মোহাচ্ছন্ন ও কামার্ত্ত জীবের মোহ-ভঙ্গ হয় এবং সে আত্মরতি, আত্মক্রীড় বা আত্মারাম হয়। ইহাই সনাতন ধর্ম্মের চিরদিনের উপদেশ। কিন্তু এখানে দেখিতেছি সেই আত্মারাম রমণ করিতেছেন, এ যে বড়ই আশ্চর্য্য কথা! তাহা হইলে এখানে যদিও 'ক, খ' বা কামক্রীড়ার ভাষা আছে, কিন্তু ইহা প্রাকৃতিক কামক্রীড়া নহে; ইহার অন্যরূপ অর্থ আছে। তাহার পর মানুষ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া সাধনপথ আশ্রয় করিল। গুরুকৃপায় ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইতেছে, আজ মানুষ লীলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মধুরাখ্য ভক্তিরসের কিঞ্চিৎ আস্বাদন পাইয়া ধন্য হইয়াছে, আজ সে হাসিতেছে আর ভাবিতেছে, যখন শিশু ছিলাম তখন কি ভাবিতাম! কিন্তু ইহা বোকা লোকের কাজ। বুদ্ধিমানেরা এখনও তাহাদের সেই প্রাচীনমত প্রচার করিতেছে, এ সম্বন্ধে আর কিছু ভাবিবার বা জানিবার আছে, ইহা তাহারা স্বপ্নেও চিন্তা করেন না। রাসলীলা সম্বন্ধে মানুষের এইরূপ চিন্তাই স্বভাবিক।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে উজ্জ্বল-রস, শৃঙ্গার-রস বা আদি-রস সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছি তাহা এই স্থানে স্মরণীয়। সেখানে বলা হইয়াছে "এই রসের জীবনে ও রসের জগতে এই রসই আদি। অন্যান্য যাবতীয় রস এই রসের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি। এই রসকে স্থায়িত্ব দান করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। এই রস মনের ভূমিতে বা অহঙ্কারের ভূমিতে পতিত হইয়া শোণিতপুরে অবরুদ্ধ হয় এবং সেই কারণে স্থায়িত্ব লাভ করে না।"

শ্রীবৃন্দাবন-লীলা বলিতে প্রেমের বিজয় বুঝায়; একমাত্র প্রেমই বিজয়ী। হ্লাদিনী শক্তি বা আনন্দ শক্তির যেখানে অবন বা রক্ষণ হয়, তাহারই নাম বৃন্দাবন। এই প্রেমকে বিজয়ী হইতে হইলে এক নিত্য সংগ্রামের মধ্য দিয়া সেই বিজয় রক্ষা করিতে হয়, প্রকট লীলার ইহাই তাৎপর্য্য। যিনি বলবান্ তাঁহাকে যেমন সর্ব্বদাই

প্রতিবন্ধকতার সহিত সংগ্রাম করিয়া নিজের বলবত্তা প্রকট করিতে হয়, ঠিক সেইরূপ। প্রতিবন্ধকতা না থাকিলে বলবত্তার প্রাকট্য থাকে না। এই কারণে বৃন্দাবনের এত অন্তরায়। এই অন্তরায়কে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়, কংস, বেদবাদ ও দেবতা। এখন প্রশ্ন এই, দেবতার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল কে? একজন বলিলেন ব্রহ্মা, আর একজন বলিলেন ইন্দ্র, আবার কেহ অগ্নি বা বরুণের নাম করিতে পারেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীধরস্বামী বলিলেন কন্দর্প বা মদনই দেবতার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, কারণ যিনি কামদেব বা মদন, তিনি ইন্দ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতিকে যে পরাস্ত করিয়াছেন ইহা পৌরাণিকগণ বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং কন্দর্পের সহিত একটা বোঝা-পড়া হওয়া দরকার। আচ্ছা তাহার পূর্ব্বে দেখা যাউক এই 'কাম' কি?

কামের সাধারণ অর্থ "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা"। এই ইচ্ছা স্ত্রীপুরুষের যে সম্বন্ধ তাহারই মধ্যে পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে। যাঁহারা জীবনে উন্নতিলাভ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সকলকেই এই কামের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়।

বিশ্বসৃষ্টির প্রসার ও রক্ষার ভার দেবগণের উপর, আর দেবগণের মধ্যে কামদেবই এই কার্য্যসাধনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। দেবরাজ ইন্দ্র কন্দর্পকে বলিয়াছিলেন—

"বজ্রং তপোবীর্য্যমহৎসু কুণ্ঠং
ত্বংসর্ব্বতোগামী চ সাধকশ্চ।"

অর্থাৎ হে কন্দর্প, বজ্র ও তুমি আমার এই দুইটি অস্ত্রের মধ্যে বজ্রের এমন ক্ষমতা নাই, যে তপোবীর্য্যসম্পন্ন মহাপুরুষদিগকে আঘাত করিতে পারে, কিন্তু তুমি এমন অস্ত্র, যে তাহা সর্ব্বত্রই প্রয়োগ করা যায় এবং নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য-সিদ্ধিও হইয়া থাকে। এই কথা অত্যন্ত সত্য।

মদন দেবতার কার্য্য-সাধনের জন্য সর্ব্বত্রই নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে করিতে একদিন ইন্দ্রের আদেশে দেবাদিদেব মহাদেবের উপরেও সম্মোহন নামক শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে শিবের নেত্রজাত অগ্নিদ্বারা মদন ভস্মাবশেষ হইয়াছিলেন।

"তপঃ পরামর্শ বিবৃদ্ধমন্যোর্ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্য মুখস্য তস্য।

ক্রোধংপ্রভো সংহর সংহরেতি যাবদ্গিরঃখে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার॥

কুমারসম্ভবম্ ৩—৭১।

তপস্যার প্রতি আক্রমণ করাতে রুদ্রদেব তৎক্ষণাৎ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, ভ্রূকুটির আবির্ভাবে তাঁহার মুখমণ্ডল ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল; তাঁহার ললাটস্থিত তৃতীয় চক্ষু হইতে জাজ্বল্যমান শিখাশালী অগ্নি বহির্গত হইল। "হে প্রভো, ক্রোধ সম্বরণ করুন, সম্বরণ করুন", এই বাক্য আকাশস্থিত দেবগণের মুখ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই সেই বহ্নি তৎক্ষণাৎ মদনকে ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলিল।

মদন ধ্বংস হইলেন, কোন কোন ধার্ম্মিক লোক হয়ত মনে করিবেন ভালই হইল, আপদ্ গেল। কিন্তু মদন ধ্বংস হওয়ায় বিশ্বলীলাও যে শেষ হইয়া গেল। তাই রতি বিলাপ করিয়া বলিলেন :—

"পরলোক-নবপ্রবাসিনঃ প্রতিপৎস্যে পদবী মহং তব।
বিধিনা জন এব বঞ্চিতস্ত্বদধীনং খলুদেহিনাং সুখম্?"

হে নাথ! তুমি ত পরলোকের নবীন প্রবাসী হইলে, আমিও তোমার পথে গমন করিতেছি, কিন্তু বিধাতা এই ত্রিলোকস্থিত ব্যক্তিগণকে সুখসম্ভোগে বঞ্চিত করিলেন, কারণ তোমার অভাবে জীবগণের সুখ একেবারেই ফুরাইয়া গেল।

রতিও দেহত্যাগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে দৈববাণী হইল "স্মরপত্নি, তোমার স্বামী চিরকালের জন্য দুর্লভ হইবেন না, তুমি তাঁহাকে শীঘ্রই প্রাপ্ত হইবে। মহাদেব যখন পার্ব্বতীর তপস্যায় প্রসন্ন ও তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়া সুখ অনুভব করিবেন, তখন কন্দর্পকে তাঁহার শরীর পুনর্ব্বার প্রদান করিবেন।

তাহা হইলে আমরা দেখিলাম যে মদনকে ভস্মীভূত করিলে, বিশ্বলীলার স্রোতঃ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়—কাজেই মদনকে আবার বাঁচাইতে হইল। আমরা শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় দেখিতেছি মদনকে মোহন করা হইল। 'মোহন' কি প্রথমতঃ তাহাই আলোচনা করা যাউক। সর্প বিষধর, মানুষের অনিষ্ট করে, এই সর্পকে লাঠির আঘাতে মারিয়া ফেলা হইল, এই গেল এক ব্যবস্থা। আর এক ব্যবস্থা, মণি, মন্ত্র বা ঔষধাদির দ্বারা সর্পকে বশী

আছে, তাহার কোন কিছু অনর্থক নহে, সকলেরই মূল্য আছে, প্রয়োজন আছে। যাহার যেটি স্থান তাহাকে সেইখানে রাখিতে হইবে। প্রথম কথা, ধ্বংস বলিয়া একটা ব্যাপারই নাই—আমরা যাহাকে ধ্বংস বলি তাহা ধ্বংস নহে, রূপান্তর। যেখানে যাহার স্থান, তাহাকে সেইখানে না রাখিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেলেই বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়। সুতরাং কাম আমাদের যতই অনিষ্ট করুক না কেন, আর আমরা ক্রোধের উত্তেজনায় এই কামের যতই নিন্দা করি না কেন, আর ইহাকে ঘৃণা করিয়া ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করা যতই অবাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচনা করি না কেন, প্রথমতঃ সত্যের অনুরোধে ইহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে প্রাকৃত জগতে যে সমুদয় শক্তি ক্রিয়া করিয়া এই বিশ্বলীলার স্রোতঃ পরিচালিত করিতেছে, তাহার মধ্যে কামই সর্ব্বপ্রধান। প্রথমতঃ মানুষ বুঝিবে কাম সর্ব্বপ্রধান, তাহার পর বুঝিবে কামই মূলশক্তি, অর্থাৎ অন্যান্য যাবতীয় শক্তি এই কাম হইতেই উদ্ভূত এবং এই কামেই পরিণতি লাভ করিয়া থাকে। ধর্ম্মজীবনকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে এই কামতত্ত্বের আলোচনা করা আবশ্যক। বর্ত্তমানযুগে অনেক স্থলে ধর্ম্মজীবন কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ সত্য সত্য কোন ধর্ম্মজীবন নাই, কেবল তৎসম্বন্ধে কতকগুলি বড় বড় কথা আছে। এই কারণে অনেকে ভাবেন, ধর্ম্মকথার আলোচনায় কামের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় কেন ?

একটা উদাহরণ দিলেই বর্ত্তমান কালের ভীরুতা, সত্যের পুরোদেশে বীরের মত দাঁড়াইয়া সেই সত্যের সহিত যুদ্ধ করিবার অক্ষমতা, ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে। এই পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার শেষ কথা পুরুষ-যজ্ঞ। এই পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা-প্রসঙ্গে বৈদিক ঋষি দেখাইতেছেন সমগ্র বিশ্ব একটি যজ্ঞমাত্র। সর্ব্বত্রই যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতেছে। এই সমুদয় যজ্ঞের মধ্যে পুরুষ-যজ্ঞই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই পুরুষ-যজ্ঞ কি ? নরনারীর মধ্যে যে মিথুনধর্ম্ম আছে, তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া যে অপত্যোৎপাদন, তাহারই নাম পুরুষ-যজ্ঞ। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ম্যাক্স্‌মুলার পূর্ব্বদেশীয় পবিত্র প্রাচীন গ্রন্থসমূহের যে ইংরাজী অনুবাদ বাহির করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদেরও অনুবাদ আছে। এই অনুবাদে তিনি পুরুষ-যজ্ঞের স্থানটি অনুবাদ করেন নাই, অশ্লীল বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং ইংরাজী অনুবাদের পরিবর্ত্তে

বলিয়াছেন, তখন এ সম্বন্ধে অন্যকথা বলা একেবারেই বিফল। কিন্তু সম্প্রতি অর্থাৎ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকা দেশের একজন বিখ্যাত কবি ও পণ্ডিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। এই পুস্তকখানির নাম Love's Coming of Age, আর এই পুস্তকের যিনি গ্রন্থকার তাঁহার নাম এড্ওয়ার্ড কার্পেণ্টার। এই পুস্তকের প্রারম্ভেই গ্রন্থকার পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের জন্য অর্থাৎ পুরুষ-যজ্ঞের অংশটুকু অনুবাদ না করার জন্য এবং উহাকে অশ্লীল বলিয়া উপেক্ষা করার জন্য, মোক্ষমূলারের অনেক নিন্দা করিয়াছেন। কেবল যে নিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহা নহে, এড্ওয়ার্ড কার্পেণ্টার, এমন কথা বলিয়াছেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতা এই ভীরুতার জন্যই দূষিত ও দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে, এই কারণে পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের নৈতিক জীবন নিতান্ত কপটতাময় হইয়া পড়িয়াছে। এড্ওয়ার্ড কার্পেণ্টারের কথা অত্যন্ত সত্য। আমরা প্রকৃতিস্থ থাকিলে সাহেবের নামের দোহাই দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না, কারণ আমাদের দেশে তন্ত্রের কাম-কলাতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কালীমূর্ত্তির পূজা প্রভৃতিতে এই তত্ত্ব অনুস্যূত রহিয়াছে।

এখন দেখা যাউক মদনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় কিরূপে? মদন বিনষ্ট হইবার নহে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং মদনের দ্বারা যে কার্য্য সাধিত হয়, অন্য উপায়ে যদি তাহা সাধন করাইতে পারেন, তাহা হইলে মদনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রথম উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে। মনে করুন, আমরা আহার করি। এখন একদিন এই আহার পরিত্যাগ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িল। কি করিয়া আহার পরিত্যাগ করিব? আমি দেহাত্মবাদী, আমি আহার পরিত্যাগ করিলে ধ্বংস হইয়া যাইব। এখন উপায় কি? আহারের দ্বারা তিনটি কার্য্য সাধিত হয়, দেখা যাইতেছে। ক্ষুধানাশ, তুষ্টি ও পুষ্টি। আহারের সাহায্য ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে, অর্থাৎ কোন মন্ত্র, যোগক্রিয়া প্রভৃতির দ্বারা যদি এই তিনটি কার্য্য সাধন করিতে পারা যায় তাহা হইলে আহার পরিত্যাগ করা সম্ভব। নতুবা নিরাহারে দেহের অপকারই হইবে। এই গেল প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা, যাহাকে ভালবাসি তাহাকে খাওয়াইবার জন্য নিজের খাওয়া কমাইতে পারা যায়, ইহাও প্রত্যক্ষজ্ঞানের কথা। আজ আমার মনে যে সমুদয় বিষয় ভোগ করার

পুত্রকে, আমি সেই সব বিষয় ভোগ করাইতে পারিব, সেদিন আমার ভোগাসক্তি কমিয়া যাইবে। কিন্তু এই প্রকারে অর্থাৎ প্রেমাস্পদকে ভোগ করাইবার অনুরোধে যে ভোগ-ত্যাগ, তাহার দ্বারা আমি দুর্ব্বল হইব না, বরং সবল হইব। এই ত্যাগের দ্বারা আমার ভোগের অভাব হইবে না, পরন্তু আরও ভালরূপ ভোগ হইবে। কিন্তু এইখানে আর একটি কথা বিবেচ্য। সংসারে অর্থাৎ এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে প্রকৃত প্রেমাস্পদ কেহ নাই। প্রকৃত প্রেমাস্পদ যে কেবল একজন। সকল নদীর গম্যস্থান যেমন একই সমুদ্র, তেমনি "কৃষ্ণ-কৃপা-পারাবার" প্রেমে উচ্ছ্বসিত ও ধাবিত সমুদয় হৃদয়ের একমাত্র ঈপ্সিত ও প্রেমাস্পদ। সুতরাং আজ যদি সেই কৃষ্ণকে আমার এই কামজগতের ভোগের বস্তুগুলি সত্য সত্য দিতে পারি, তাহা হইলে আমার আশা পূর্ণ হয়। তাহা হইলেই আমি যাহা চাহিয়াছি ও খুঁজিয়াছি, কিন্তু কখনই পাই নাই,—পাইয়াছি বলিয়া মনে করিয়াছি, কিন্তু বাড়ী আসিয়া হিসাব করিয়া দেখিয়াছি পাই নাই, এবং না পাওয়ায় জন্ম জন্মান্তর কেবল কাঁদিয়াছি, সেই যে 'পরশমণি' প্রেম, শ্রীকৃষ্ণকে আমার সমুদয় কাম-ভোগ যদি দিতে পারি তাহা হইলেই তাহা সত্য করিয়া পাইব। এই গেল দ্বিতীয় কথা।

এইবার তৃতীয় কথা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃত জগতে যাহার নাম কাম, তাহার মূল কোথায়? তাহার বাড়ী কোথায়? বিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন—

"কালিন্দী-পুলিনাঙ্গন-প্রণয়িনং
কামাবতারাঙ্কুরং।
বালং নীলমমী বয়ং মধুরিম-
স্বারাজ্য মারাধুমঃ।"

আসুন, আমরাও আজ সেই তত্ত্বদর্শী বিল্বমঙ্গলের সুরে সুর মিলাইয়া বলি—"কামাবতারের যিনি অঙ্কুর, তিনি কালিন্দী পুলিনাঙ্গনের প্রণয়ী। সেই নীলবর্ণ (ইন্দ্রনীলমণিশ্যামং মূর্ত্তং শৃঙ্গার-রসম্—ইতি সারঙ্গরঙ্গদাটীকা) বালক প্রেমিক, সেই মাধুরীর চিরবাসস্থান, আসুন আজ আমরা সকলে সেই প্রণয়ীর আরাধনা করি।"

তাহা হইলে কামের অঙ্কুর এখানে নহে, কালিন্দী পুলিনাঙ্গনে সেই প্রণয়ী রহিয়াছেন। চলুন, এখানে যখন কাম জাগিয়াছে, তখন উহাকে লইয়া ভবের দিকে বা

পিছিল, কিন্তু সদ্‌গুরুর কৃপায় নির্ভর করিয়া চলুন বীরের মত, প্রকৃত বলবানের মত যাত্রা করি। সেই মূলের কাছে না গেলে, সেই মূলকে মূল বলিয়া না চিনিলে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবেন না। সেই মূলকে দেখাই শ্রীরাসলীলার আস্বাদন বা মদনমোহন।

শ্রীভগবান্ বাঞ্ছাকল্পতরু এবং সকলের সকল অভাবের পরিপূর্ণতা। শ্রীভগবান্‌কে পরিপূর্ণরূপে কেহই জানিতে পারে না। তাঁহার এক একটি ভাব আস্বাদন করিলে মানবের এক একটি অভাব দূরীভূত হয়। তাঁহাতে সবই আছে। নাই বলিয়া একটা কথা, তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। সেই শ্রীভগবানে রমণেচ্ছাও আছে, রমণও আছে। আপনার বা আমার প্রকৃতিতে এই দুইটি যে ভাবে আছে, তাঁহার প্রকৃতিতে ঠিক সেই ভাবে থাকিতে পারে না, ইহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তাঁহাতে যে আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বিলাস, তাঁহাতে কেমন করিয়া আছে, তাহা যখন আমার হৃদয়ে বুঝিতে পারিব তখনই আমি প্রাকৃত কামের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব, তাহার পূর্ব্বে নহে। রাসরসেশ্বর, গোপীজনবল্লভরূপে নায়কের শিরোরত্ন, শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে যখন প্রেমরসলীলাতরঙ্গে বিহ্বল অবস্থায় আমি ধরিতে বা বুঝিতে পারিব, তখন আর আমার প্রাকৃত কাম থাকিবে না। প্রাকৃত কাম থাকিবে না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া আমি ক্ষতিগ্রস্ত বা অভাবগ্রস্ত হইব না—আমি তখন প্রেমধনে ধনী হইব। তখনই মদনমোহন হইবে। কামের মধ্যে যাহা সত্য ও অমৃত, তাহাই প্রেম—শ্রীশ্রীরাসলীলায় বিহার করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ নিখিল বিশ্বকে প্রেমরসে অভিসিক্ত করিয়া 'মদনমোহন' এই আখ্যা লাভ করিয়াছেন। প্রাকৃত মদনকে পরাস্ত করিতে হইলে অপ্রাকৃত মদনের প্রয়োজন। আমাদের জগতে যে মদন কার্য্য করিতেছেন, তিনি 'পুরাতন' মদন, ইঁহাকে পরাজয় করিতে হইলে 'নূতন' মদনের প্রয়োজন। এই উভয় মদনেরই পূজায় কামবীজ ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃত পুরাতন মদনকে আশ্রয় করিলে এই বীজ বীজই থাকিয়া যায়, আর 'অপ্রাকৃত নবীন' মদন যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে আশ্রয় করিলে ঐ কামবীজে "প্রেমাঙ্কুর" উদ্গত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন :—

"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।

পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন ॥"

প্রাকৃত কাম "অন্ধতমঃ" আর অপ্রাকৃত প্রেম, "নির্ম্মল ভাস্কর" অথবা "চাঁদের হাট"।

কামগায়ত্রী মন্ত্র-রূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ,
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর হয়।
সে অক্ষর চন্দ্রচয়, কৃষ্ণ করি উদয়,
ত্রিজগৎ কৈল কামময় ॥
কৃষ্ণ মুখ দ্বিজরাজ-রাজ।
কৃষ্ণ বপু সিংহাসনে, বসি রাজ্য শাসনে,
সঙ্গে করি চন্দ্রের সমাজ ॥
দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণি দর্পণ,
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।
ললাট অষ্টমী ইন্দু, তাহাতে চন্দন বিন্দু,
সেহ এক পূর্ণচন্দ্র মানি ॥
করনখ চাঁদের ঠাট, বংশী উপর করে নাট,
তার গীত মুরলীর তান।
পদনখ চন্দ্রগণ, তলে করে নর্ত্তন,
নূপুরের ধ্বনি যার গান ॥
এ চাঁদের বড় নাট, পশারি চাঁদের হাট,
বিনামূলে বিলায় নিজামৃত।
কেহ স্মিত জ্যোৎস্নামৃতে কাহারে অধরামৃতে,
সব লোক করে অপ্যায়িত।

(২)

সৌন্দর্য্য ও ভোগের ইচ্ছা, ইহাদের মধ্যে যে একটা অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই! কিন্তু ভোগ নশ্বর, এবং ভোগের ভিতরে চিরদিনই নিষ্ফলতার হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। ভোগের এই নশ্বরত্ব বুঝিতে বেশী বিলম্ব হয় না।

নিষ্ফলতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া নিতান্ত সহজ কথা নহে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে সৌন্দর্য্যের নাম আনন্দ, আর এই ভোগ ও ভোগের ইচ্ছার নাম মদন। ভোগের মধ্যে যে নিষ্ফলতা ও নশ্বরতা আছে, সৌন্দর্য্য যে তাহাতেই সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ সুন্দরকে বা আনন্দকে পাইতে হইলে যে সকল সময়েই ভোগের এই নশ্বরতা ও পরাজয়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা নহে; অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের একটি নিত্য রূপ আছে, যাহা ভোগের মধ্যে মলিন হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, সৌন্দর্য্যের এমন একটি স্বরূপ আছে, যাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি। এই যে বোধ, ইহার উপরেই আনন্দ-ব্রহ্মের উপাসনা।

এখন দেখিতে হইবে, এই যে নিত্য-সুন্দর, ইহাকে পাইতে হইলে ভোগ ও ভোগের ইচ্ছা, ইহাকে কি ধ্বংস করিতে হয়? সাধারণতঃ মনে হয়, ভোগের ইচ্ছা ধ্বংস না হইলে নিত্যসুন্দরকে পাওয়া যাইবে না। কিন্তু এখানে আর একটি কথা আছে, ভোগের ইচ্ছা বা ভোগ তাহার ভিতরেও সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, সুতরাং সুন্দরকে পরিপূর্ণ-রূপে পাইতে হইলে ভোগের ইচ্ছার মধ্যে যে সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, তাহাকেই বা বর্জ্জন করি কি করিয়া? আমি সুন্দরকেই যদি চাই, তাহা হইলে তিনি যেখানে যেখানে আছেন, বা ছিলেন বা থাকিতে পারেন, তাহার কিছুই আমি ছাড়িতে পারি না। তাহার মধ্যে যেটুকু ছাড়িব, সেই টুকুই আমার পরিপূর্ণরূপে সুন্দরকে পাইবার অন্তরায় হইবে অথবা সেইটুকুর যাহা পরিমাণ আমার যে সুন্দরকে পাওয়া তাহা সেই পরিমাণে কমিয়া যাইবে। সুতরাং সমস্যা বড়ই ভয়ানক। এই ভয়ানক সমস্যার মীমাংসাই মদন-মোহন। রক্তমাংসময় স্থূল ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরূপে মানবের দেহ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, এই দেহ আশ্রয় করিয়া এক লোকাতীত সৌন্দর্য্য আপনাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতেছে। এই দেহ নশ্বর, পরমাণুপুঞ্জের যে বিচিত্র বিন্যাসের দ্বারা এই দেহ গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই বিন্যাস বিনশ্বর; কিন্তু এই দেহ আশ্রয় করিয়া যে চিরসুন্দর আপনার লাবণ্য-লীলা নব নব তরঙ্গে প্রকটিত করিতেছেন, তিনি নিত্য। আজ যদি সেই নিত্যকে ধরিতে পারিতাম, তাহা হইলে ঐ দেহ, আমার মধ্যে কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগলালসা জাগাইয়া আমাকে মৃত্যু বা পরাজয়ের দিকে লইয়া যাইতে পারিত না, আমি দ্রুতবেগে অমৃতরাজ্যের পথিক হইতাম। ইহারই নাম মদন-মোহন! মদনমোহনের আর একটি নাম মন্মথ-মন্মথ।

লীলাও আছে! যদি কোন প্রকারে এই "আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা" যখন জাগিয়া উঠে তখন তাহাতে ভাসিয়া না গিয়া বা তাহার আগমন-পথ একেবারে রুদ্ধ না করিয়া, তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার ভিতরে নিত্যসুন্দরের যে লীলা হইতেছে তাহা ধরিতে পারি তবে আমাদের প্রকৃত কল্যাণ হয়। ইহাই মৃত্যুসাগরের অমৃতভোগ।

"মদন-মোহন" এই তত্ত্ব, অনেকে অস্বীকার না করিতে পারেন, কিন্তু অধ্যাত্ম-সাধনায় ইহার স্থান কোথায়, এই প্রশ্নও স্বভাবতঃ জাগিয়া উঠিবে। এই প্রশ্নের উত্তর আবশ্যক। ধর্ম্মসাধনা কেবল তত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। জাতির জীবনে বা বিশ্ব-মানবের ইতিহাসে, কোন মহাপুরুষ আসিয়া একটি সত্য উপলব্ধি করিয়া যান, তাঁহার সেই উপলব্ধি, অনুভূতি ও আস্বাদন সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ক্রিয়া করে। ধর্ম্মসাধনার ইহাই ভিত্তি। কেবল তত্ত্ব নহে, সাধকের অনুভূতি। এই অনুভূতি সাম্প্রদায়িক পারম্পর্য্যের অনুসরণ করিয়া যতদিন অব্যাহতভাবে ক্রিয়া করে, ততদিন সেই অনুভূতি মানবের সাধন-সম্পদরূপে বিশ্বের প্রকৃত কল্যাণ-সাধন করে।

আমরা বলি এই "মদন-মোহন" একদিন ব্রজের গোপীগণের সাধনা আশ্রয় করিয়া মর-জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার পর কত শত সহস্র সাধক এই পথে পর্য্যটন করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। এই পথ একদিন রুদ্ধ হওয়ার মত হইয়াছিল, সেদিন আবার শ্রীচৈতন্যদেব আসিয়া বাধা দূর করিয়া দিলেন! আবার হয়ত আজ বাধা উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আশাও আসিতেছে যে আবার কেহ আসিয়া বাধা দূর করিবেন।

গোপীদের তত্ত্ব পরে বলা যাইবে। আপাততঃ শ্রীজীবগোস্বামীকৃত শ্রীশ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থ হইতে গোপীদের সাধন-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা হইতেছে।

আমরা সকলেই জানি, এবং শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন যে গোপীগণ 'জারবুদ্ধি'তে বা উপপতিভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছিলেন। উপপতিভাব সর্ব্বথা নিন্দনীয়, সন্দেহ নাই। এখন দেখিতে হইবে আচার্য্যগণ এই উপপতিভাব কি প্রকারে বুঝিয়াছেন। তাঁহারা কি ঔপপত্যের প্রশংসা করিয়াছেন? এ সম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামীর উক্তি এতই

যা নিত্যা এব কান্তা দনুজকুলরিপো রাধিকাদ্যা ন তাসাং।
শ্লাঘ্যং সা জারতাধীসচিব জনিরিয়াৎ কিন্তু রাগঃ স নিত্যঃ।
তাং ভিত্ত্বা বিঘ্নকর্ত্রীং দ্রুতমুদিতবতা তেন তং নিত্যকান্তং।
প্রাপুস্তা নাপগাসামিব বপুরপরং স প্রতীক্ষেত তাসাম্।

অর্থাৎ দৈত্যকুলনিহন্তা শ্রীকৃষ্ণের রাধিকা প্রভৃতি যে সকল নিত্য-সিদ্ধ পত্নী আছেন, তাঁহাদের জারত্ব-বুদ্ধির সহায়-স্বরূপ যে জন্ম, তাহা শ্লাঘা পাইতে পারে না; কিন্তু সেই নিত্য অনুরাগই শ্লাঘা পাইতে পারে। যেহেতু ঐ সকল নারী, নিত্য সমুদিত অনুরাগ দ্বারা বিঘ্নকারিণী সেই জারবুদ্ধিকে বিদীর্ণ করিয়া সেই নিত্য সিদ্ধ কান্ত শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন। অতএব সেই অনুরাগ, অথবা সেই কৃষ্ণ, গৃহমধ্যস্থিত সাধনসিদ্ধ নারীগণের ন্যায় সেই সকল নিত্যসিদ্ধ কান্তাদিগের শরীর প্রতীক্ষা করিতে পারে না।

পূর্ব্বোক্ত অংশের অর্থ এই। ব্রজগোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের একটি বিশেষ প্রকারের সম্বন্ধ হইয়াছিল, এই সম্বন্ধের মধ্য দিয়াও তাঁহাদের নিত্য অনুরাগ প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ যে লৌকিক সম্বন্ধ উহা ঘটনাচক্রে হইয়াছিল, সেই যে ঘটনাচক্র তাহাও অবোধ্য নহে। আচার্য্য বলিলেন এই যে সম্বন্ধ ইহা প্রশংসনীয় নহে; কিন্তু আমরা এই প্রকটলীলার সম্বন্ধটুকুতেই আবদ্ধ থাকিব, না প্রাকৃত সম্বন্ধকে অতিক্রম করিয়া যে শাশ্বত অনুরাগ ক্রিয়া করিতেছে, সেই অনুরাগের সন্ধান লইব? বৈষ্ণবাচার্য্য বলিলেন সেই অনুরাগেরই সন্ধান লইতে হইবে।

এইবার এই অনুরাগ কেমন, তাহা ঐ 'গোপালচম্পূ' গ্রন্থেরই বর্ণনানুসারে আলোচনা করা যাউক। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদের সম্বন্ধে উদ্ধবকে বলিলেন—

মদর্থং সন্ত্যজ্যাপ্যনিশমশনাদ্যং বরদৃশ
শ্চিরং জীবন্তীতি স্ফুরতি ন মৃষা বিশ্রুতিরসৌ।
ময়ি প্রাণাস্তাসাং সদমৃততনৌ মষ্যপি মনঃ
সদা সন্ত্যন্তীতি প্রবলমিহ যৎকারণমিদম্॥

সুনেত্রা ব্রজদেবীগণ আমার জন্য আহারাদি ত্যাগ করিয়াও চিরদিন বাঁচিয়া আছে অর্থাৎ অমরতালাভ করিয়াছে। এই জনশ্রুতি মিথ্যা নহে, সত্য। আহার ব্যতীত যে তাহারা

বাঁচিয়া আছে, তাহার কারণ এই। শ্রীকৃষ্ণ অমৃততনু, শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সর্ব্বদাই তাহারা বিহ্বল। এই কারণে গোপীগণ চিরদিন বাঁচিয়া আছে।

গোপীদিগের ভোগের ইচ্ছা বা ভোগ কিরূপ, তাহা ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। যাহা হউক গোপীদিগের কথা পরে আলোচ্য। গোপীর চেতনায় সৌন্দর্য্য ও ভোগ অর্থাৎ আনন্দ আর মদন কিরূপ সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা চিন্তা করিলেই মন্মথ-মন্থন যে কি তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। 'গোপালচম্পূ' গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে বিরহের সময় অতি তীব্র আবেগ-নিবন্ধন কৃষ্ণমূর্ত্তি যখন তাহাদের নিকট স্ফূরণ হইত তখন সেই স্ফূরিত মূর্ত্তিকেই তাহারা সত্য কৃষ্ণ বলিয়া বিবেচনা করিত, আবার কখন যদি হঠাৎ আসিয়া কৃষ্ণ সম্মুখে উপস্থিত হইতেন তাহা হইলে ইহা বোধ হয় কৃষ্ণমূর্ত্তির স্ফূরণ এইরূপ ভ্রম হইত।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার বলিয়াছেন যে এই রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীর মনোরথের রথী হইয়া মন্মথের মন মন্থন করিলেন। ইহার অর্থ কি তাহাও আলোচনা করা উচিত। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্ররূপে আসিয়া ত্রেতাযুগে রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণে উল্লিখিত না হইলেও লঙ্কাপতি রাবণকে বিনাশ করার একটি ঘটনা ভক্তসমাজে প্রচারিত আছে এবং আমাদের বাঙ্গালাদেশের ভক্তকবি কৃত্তিবাস সেই ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পূর্ব্বোক্ত অংশ বুঝিতে হইলে সেই বিবরণটি জানা আবশ্যক।

রাবণের সহিত যুদ্ধ হইতেছে। রাবণ ত্রিলোকবিজয়ী রাজা, অতি-উচ্চ রথে আরোহণ করিয়া কুড়ি হস্তে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছেন ; রাম, লক্ষণ দুই ভাই ; রাজপুত্র হইলেও আজ বনবাসী, জটাবল্কলযুক্তদেহ। তাঁহারা ভূমিতে দাঁড়াইয়া রাবণের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছেন। একজন উপরে আর প্রতিপক্ষ দুইজন নীচে, বড়ই অসুবিধা হইতেছে। এমন সময়ে হনুমান্ আসিয়া রামকে বলিলেন "ঠাকুর তোমার রথ নাই, তুমি মাটিতে দাঁড়াইয়া রাবণের সহিত কি প্রকারে যুদ্ধ করিবে?" রাম বলিলেন, "হনুমান্, আমি ভিখারী, আমি আজ বুঝিলাম সীতা উদ্ধার হইবে না। তোমরা বনের বানর, অকারণ তোমাদের কষ্ট দিলাম ; অকারণ সাগরে সেতু বাঁধিলাম। রাবণকে বধ করা

আমার দুই স্কন্ধে অরোহণ কর।" রামচন্দ্র প্রথমে সম্মত হইলেন না, হনুমান্‌কে বলিলেন, "তাহা হইলে তোমাকে আর বাঁচিতে হইবে না। রাবণের অস্ত্রাঘাতে এখনই তুমি মরিয়া যাইবে।" কিন্তু হনুমান্ ছাড়িবার পাত্র নহেন ; আর ভগবান্ যাহাই বলুন, তিনি চিরদিন ভক্তের অধীন। সুতরাং হনুমানেরই জয় হইল, শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, হনুমানের স্কন্ধে আরোহণ করিলেন ; যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণ অতিশয় নিপুণ যোদ্ধা। রাবণ তাঁহার যাবতীয় সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র রাম লক্ষ্মণের উপর প্রয়োগ না করিয়া হনুমানের উপর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এখন একবার হনুমানের অবস্থা চিন্তা করুন। রাবণের তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অস্ত্র-সমূহ বর্ষার জলধারার মত হনুমানের সর্ব্বাঙ্গে—পৃষ্ঠে বুকে উদরে হস্তে পদে মস্তকে অবিশ্রান্তভাবে পতিত হইতেছে। হনুমান্ মনে করিতেছেন "রাক্ষস রাবণ! কি বলিব আজ বড় সঙ্কটে পড়িয়াছি। রাম লক্ষ্মণ স্কন্ধের উপর, লাফাইবার তো উপায় না ইই, এমন কি কাঁপিবার পর্য্যন্ত স্বাধীনতা নাই। নতুবা এক লম্ফে তোমার দশটি মুণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সাগরে দশটি দ্বীপ রচনা করিতাম!" হনুমানের কাঁপিবার পর্য্যন্ত অধিকার নাই ; শেল শূল মুষল মুদগর, জাঠা, জাঠি প্রভৃতি অতি ভয়ঙ্কর রাক্ষসীয় অস্ত্রের আঘাতে হনুমানের দেহে যে কি যন্ত্রণা হইতেছে, তাহা অনির্ব্বচনীয়, কিন্তু তাহাতে কি হয়? রাম লক্ষ্মণ স্কন্ধের উপর। ধনুর্ব্বাণের যুদ্ধ। হনুমান্ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া "আঃ উঃ" করিলেই সমুদয় নষ্ট হইয়া যাইবে, সুতরাং হনুমান্ নীরবে রাবণের অস্ত্রের আঘাত সহ্য করিলেন। নিজের অমিত শক্তি সত্ত্বেও সহ্য করিলেন। হনুমানের দেহ শ্রীরামচন্দ্রের রথ।

পূর্ব্বে শুনিয়াছেন শ্রীরাসলীলা এক প্রকারের পরমানন্দরসময় নৃত্য গীত। এখন বলিতেছি রাসলীলা এক মহাযুদ্ধ। মদনের সহিত যুদ্ধ। এ যুদ্ধ বড়ই কঠিন। শত্রুকে যদি মারিয়া ফেলিবার অধিকার থাকে তাহা হইলে যুদ্ধ করা খুব কঠিন হয় না। কিন্তু শত্রুকে যদি অক্ষতদেহে বন্দী করিয়া বশীভূত করিতে হয় তাহা হইলে সে যুদ্ধ বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। ভগবান্ যুগে যুগে আসিয়া যুদ্ধ করিয়া তিনি যে অজিত, এই নাম সার্থক করিয়াছেন। আজ এই রাসলীলায় শ্রীহরির শেষ-যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পর আর যুদ্ধ নাই। এই যুদ্ধের পর প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, কামকে আত্মসাৎ করিয়া শ্রীভগবান্ প্রেমরূপে কেবল আত্মবিতরণ করিবেন। আজ কন্দর্পের সহিত এই যে

যুদ্ধ ইহাই শেষ যুদ্ধ। যুদ্ধে সহায়ক চাই ভগবানের যাঁহারা স্বগণ, ভগবান্ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। যুগে যুগে নানা যুদ্ধে যাঁহারা শ্রীভগবানের পক্ষ অবলম্বন করিয়া আত্মদান করিয়াছেন, আজ এই শেষ যুদ্ধে শ্রীভগবান্ তাঁহাদের আহ্বান করিলেন। স্বর্গের দেবতা আহ্বান শুনিলেন ; কিন্তু মদনের সহিত যুদ্ধ, সাহস করিয়া কেহই আসিতে পারিলেন না। মহর্ষিগণকে ডাকিলেন, তাঁহারাও মদনের নাম শুনিয়া ভয় পাইলেন, আসিতে পারিলেন না। হনুমানকে ডাকিলেন, হনুমান্ ভাবিলেন ঐ মদনের ভয়েই আমি বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াই—এ যুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া আমার কর্ম্ম নহে। কে আসিবে আজ ? আজ যে আসিবে, আজিকার এই যুদ্ধে সে শ্রীভগবানের সহায় হইবে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা ভগবানের আপনার জন হইবে। ঋষি, মুনি, যোগী প্রভৃতি কেহই আসিলেন না। এ আহ্বানে আসিলেন তরুণী গোপকন্যাগণ। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মনোরথের রথী হইলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মদনের তূণ একেবারে পরিপূর্ণ। তাহার একটি শরও ক্ষয় হয় নাই। কারণ সৃষ্টির প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া মদন যত যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে বড় একটা অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে হয় নাই। ধনুকে টঙ্কার দিয়াই যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন। মদন আজ প্রাণ ভরিয়া যুদ্ধ করিবেন বলিয়া প্রস্তুত হইলেন। শত্রু যদি দুর্ব্বল হয়, অল্প চেষ্টাতেই যদি তাহাকে পরাস্ত করা যায় তাহা হইলে বীরের তাহাতে তৃপ্তি হয় না। মদন ভাবিলেন আজ আমার তৃপ্তি হইবে। তাঁহার তূণে যত অস্ত্র ছিল, বাছিয়া বাছিয়া সমুদয় অস্ত্র অতি নিপুণভাবে ব্রজগোপীর উপর নিক্ষেপ করিতেছেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই ভাবিতেছেন, এমন নায়ক নায়িকা, আজ আমার বিজয় অবশ্যম্ভাবী। আনন্দ ও আশায় উৎফুল্ল হইয়া অস্ত্রনিক্ষেপ করিতে করিতে মদনের তূণ ফুরাইয়া গেল। সর্ব্বশেষে ধনুকখানিও ভাঙ্গিয়া গেল, মদন তৃপ্ত হইলেন এবং পরাস্ত হইলেন।

পূর্ণ তৃপ্তিই পরাজয়। মোহিত হওয়াই পরাজয়। মদন জগৎকে মোহিত করিয়া পরাস্ত করিয়াছিলেন, আজ মোহিত হইয়া তিনি নিজেই পরাস্ত হইলেন। ইহারই নাম মদন-মোহন।

এই লীলা নিত্য। এই লীলা ধ্যান করিয়া ও আস্বাদন করিয়া ভক্তগণ এখনও

তন্ত্রশাস্ত্রে মদনমোহনের প্রণালী বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রুদ্রযামল তন্ত্রে শ্রীরাধাকে রাকিনীশক্তি বলিয়াছেন। এই রাকিনীশক্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা ব্যতীত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাইবার অন্য উপায় নাই, ইহাও কথিত হইয়াছে। সারদা-তিলক-তন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের যে ধ্যান দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই মদনমোহন লীলারই ধ্যান। আমরা সেই ধ্যানমন্ত্রে রাসরাসেশ্বরকে স্মরণ করিতেছি—

"স্মরেদ্‌বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতম্।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যা-সহস্রশঃ॥
আত্মনো বদনাম্ভোজে প্রেরিতাক্ষি মধুব্রতাঃ।
পীড়িতা কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ॥
মুক্তাহারলসৎপীনতুঙ্গস্তনভরানতাঃ।
স্রস্তধম্মিল্লবসনা মদস্খলিতভাষণাঃ॥
দন্তপংক্তি প্রভোদ্ভাসি স্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ।
বিলোভয়ন্তীর্বিবিধৈর্বিভ্রমৈর্ভাব-গর্ব্বিতৈঃ॥
ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ম্।
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার কৌস্তভধরম্ পীতাম্বরং সুন্দরং॥
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসংঘাবৃতম্।
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥

শ্রীশ্রীরাসলীলার শেষ সন্দেহ

শ্রীমদ্ভাগবতের রাস-বর্ণনার শেষে মহারাজা পরীক্ষিৎ-কর্তৃক একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। শ্রীশুকদেব সেই প্রশ্নের উত্তরও দিয়াছেন। এই প্রশ্নটিকে রাসকথার শেষ সন্দেহ বলা যায়। প্রশ্নটি প্রথম শুনিতে বেশ স্বাভাবিক, কিন্তু শ্রীশুকদেব যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা বড়ই কঠিন। সমগ্র রাস-কথা উত্তমরূপে না বুঝিলে, এই যে সংক্ষিপ্ত উত্তর, ইহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা একরূপ অসম্ভব।

প্রশ্ন—

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ।

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥
স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মণ্ পরদারাভিমর্ষণম্॥
আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্।
কিমভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত॥

প্রশ্নের বঙ্গানুবাদ :—

'পরীক্ষিৎ বলিলেন—জগদীশ্বর ধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্য এবং অধর্ম্মের প্রশমনের জন্য অংশের বা বলদেবের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন।

'হে ব্রহ্মণ্, সেই ভগবান্ ধর্ম্মসেতু সমূহের কর্ত্তা ও অভিরক্ষিতা হইয়া কি প্রকারে পরদারাভি-মর্ষণরূপ প্রতিকূল আচরণ করিলেন?

'হে সুব্রত, যদুপতি আপ্তকাম, তাঁহার সমস্ত কামনাই পরিপূর্ণ। তাহা হইলে, তিনি কি অভিপ্রায়ে এই পরদারাভিমর্ষণ-রূপ নিন্দিত কর্ম্ম করিলেন? আমাদিগের এই সন্দেহ নিবারণ করুন।'

প্রশ্নটির তাৎপর্য্য-নিরূপণ প্রথমেই আবশ্যক। প্রাচীন আচার্য্যগণ এই প্রশ্নটি কি ভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহা দেখা যাউক।

প্রশ্নটির ভিতরে যে সন্দেহ রহিয়াছে, তাহা মহারাজ পরীক্ষিতের নিজের সন্দেহ নহে।

তবে মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করেন কেন? পরীক্ষিৎ এই যে নাম, এই নামটির একটি অর্থ আছে। এই নামের অর্থের দ্বারাই মহারাজ কেন প্রশ্ন করিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। পরীক্ষিৎ, এই নামের অর্থ, পরি অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে যিনি সকলের মনোগত ভাব জানিতে পারেন। মহারাজ স্বয়ং কোনরূপ দোষ-দর্শন করেন নাই। তিনি শ্রীশ্রীশুকদেবের নিকট সকল লীলার শিরোমণি এই পরমমধুর লীলা শ্রবণ করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখসাগরে ভাসিতেছেন। সে আনন্দ এতই নিবিড় এতই বিপুল, যে সেখানে চিত্ত ও বুদ্ধি আপনাকে হারাইয়া ফেলে, মানুষ একেবারে গলিয়া যায়; সুতরাং সে অবস্থায় সন্দেহ জাগিতে পারে না, সুতরাং প্রশ্ন অসম্ভব।

"এবং প্রীতিবিশেষেণ শ্রীবাদরায়ণিনা বর্ণিতায়াঃ শ্রীরাসক্রীড়ায়াঃ শ্রবণান্মিথোহপাঙ্গকুঞ্চনৈর্ব্বিলোকমানানামীষদ্ধসতাং শুষ্কতার্কিকমীমাংসকাদীনাং কেষাঞ্চিদবৈষ্ণবানামভিপ্রায়ং বিতর্ক্য কৃপয়া তেষামেব হিতার্থং তমুত্থাপ্য স্বসন্দেহব্যাজেন পৃচ্ছতি।"

ইহার অর্থ। 'শ্রীবাদরায়ণি অর্থাৎ শ্রীশুকদেব বিশেষ প্রীতির সহিত শ্রীরাসক্রীড়া বর্ণনা করিলেন। এই রাসক্রীড়া শ্রবণ করিয়া শুষ্ক তার্কিক এবং মীমাংসকাদি অবৈষ্ণবগণ পরস্পরের প্রতি বক্রদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন এবং অল্প অল্প হাস্য করিতে লাগিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ এই সমুদয় লোকের অভিপ্রায় বুঝিলেন, অর্থাৎ তাঁহাদের কোথায় সন্দেহ হইতেছে, তাহা বুঝিলেন। আর, সকল লোকের সন্দেহকে নিজের সন্দেহ বলিয়া তাহাদের মঙ্গলের জন্য শ্রীশুকদেবের নিকট প্রশ্নের আকারে নিবেদন করিলেন।'

শ্রীমদ্ রামনারায়ণকৃত ভাবাভাববিভাবিকা-টীকায় এইরূপ কথিত হইয়াছে—

"এবং বিচিত্রকামবিজয়খ্যাপক সর্ব্বজগদুদ্ধারক-প্রেমপথপ্রবর্ত্তকপরমানন্দঘনরাসাদিবিহারং শ্রুত্বা পরমভগবদীয়তয়া জাতপরমাহ্লাদঃ গর্ভে এব স্বরক্ষণরূপদৃষ্টভগবৎপ্রভাবঃ সর্ব্ব-বিস্মারক-যোনি-প্রভাবেণাপ্যবিস্মৃতভগবতৈব শুকরূপতয়োপদিষ্টতত্ত্বো হরিহরিজনকৃপাপাত্রং স্বয়মসন্দিহানোঽপি তত্রত্যানাঞ্চ সাক্ষাৎ শুকশ্রোতৃণাং তৎকৃপাদৃষ্টি-শুদ্ধমতীনাঞ্চ সন্দেহাসম্ভবেঽপি ভাবি-কলিজনানাং ধর্ম্মানভিজ্ঞানাং বৈষয়িকচিত্ততয়া স্বভোগানুকূল বিপরীত বিপরীতার্থ গ্রাহিণাং ভগবতঃ সদাচার প্রাপ্তমত্যা প্রবৃত্তির্ম্মাভূদিতি সন্দিহান ইব পৃচ্ছতি।"

ইহার অর্থ। "এই রাসলীলা অতি বিচিত্র, কামদেবের পরাজয়ের কথা এই লীলায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই লীলা সকল জগতের উদ্ধারক, প্রেমপথ প্রবর্ত্তক। এই লীলা পরমানন্দঘন। শ্রীমন্মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীভগবানের একান্ত ভাবে আশ্রিত, তিনি যখন গর্ভে ছিলেন সেই সময়ে শ্রীভগবান্ তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন, এই রক্ষণ ব্যাপারে তিনি শ্রীভগবানের প্রভাব দর্শন করিয়াছিলেন। তাহার পর শুকদেব। শ্রীশুকদেবের মহিমা অপূর্ব্ব। নানাযোনি ভ্রমণ করিয়া জীব যখন মানব-জন্ম প্রাপ্ত হয়, তখন সে স্বভাবতঃ সমস্তই ভুলিয়া যায়। এমনই এই জন্মের প্রভাব। কিন্তু শ্রীশুকদেবের জীবনে এই যোনিপ্রভাব কার্য্যকর হয় নাই। এই প্রকারে স্বয়ং জগদ্গুরু শ্রীশুকরূপে মহারাজ পরীক্ষিৎকে তত্ত্ব উপদেশ করিলেন। মহারাজ নিজে হরি ও হরিভক্তের কৃপাপাত্র, সুতরাং তাঁহার নিজের এই রাসলীলা-সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ নাই। তাহার পর সেই সভাস্থলে বসিয়া শ্রীশুকদেবের মুখে যাঁহারা এই রাসলীলা-কথা শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহাদেরও কোনরূপ সন্দেহ হওয়া সম্ভব নহে, কারণ শ্রীশুকদেবের কৃপাদৃষ্টিপাতে তাঁহারা সকলেই শুদ্ধমতি। তবে মহারাজা এই সন্দেহ প্রকাশ করেন কেন? ইহার কারণ এই। কলিযুগ আসিতেছে। কলিযুগের মানুষ ধর্ম্ম সম্বন্ধে

অনভিজ্ঞ। একমাত্র বিষয় চিন্তাতেই তাহাদের চিত্ত অভিভূত। তাহারা সকল কথারই এমন ভাবে বিপরীত অর্থ করিবে যাহাতে সকল কথাই তাহাদের ভোগের অনুকূল হয়। এই প্রকারের লোক ভগবানের নিকট সদাচার প্রাপ্ত হইয়াও, পাছে বিপরীত-প্রবৃত্তি-যুক্ত হয়, এই ভয়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ নিজেই যেন সন্দিহান হইয়াছেন, এই ভাবে প্রশ্ন করিতেছেন।'

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছেন—

"অথ পরীক্ষিৎসভোপবিষ্টানাং বিবিধ বাসনাবতাং কর্ম্মি-জ্ঞানি-প্রভৃতীনাং হৃদয়ে সন্দেহং সমুত্থিতমালক্ষ্য তদুচ্ছেদার্থং পৃচ্ছতি ।"

'অর্থাৎ মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় উপবিষ্ট বিবিধ বাসনাযুক্ত কর্ম্মি-জ্ঞানী প্রভৃতির হৃদয়ে সন্দেহ সমুত্থিত হইয়াছে দেখিয়া, সেই সন্দেহ দূর করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন।'

অধিকাংশ প্রাচীন টীকাকারই মহারাজের প্রশ্ন সম্বন্ধে এই প্রকারের কথা বলিয়াছেন। ঐ সভাতেই বিবিধবাসনাযুক্ত কর্ম্মী, শুষ্ক জ্ঞানী, তার্কিক, মীমাংসক প্রভৃতি নানা প্রকারের লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মনে যে সকল সন্দেহ জাগিতেছিল মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই সন্দেহগুলি প্রশ্নচ্ছলে শ্রীশুকদেবকে জানাইলেন। একজন টীকাকার বলিলেন, ভবিষ্যতের মানবগণের চিত্তে যে সমুদয় সন্দেহ জাগরিত হওয়ার সম্ভাবনা, মহারাজ ভবিষ্যতের প্রতি চাহিয়া সেই সন্দেহগুলি খণ্ডন করাইয়া লইবার জন্য শ্রীশুকদেবকে এই প্রশ্ন করিলেন।

এই প্রশ্নের পর শ্রীরাসলীলার আর এগারটি শ্লোক আছে। ইহার মধ্যে নয়টি শ্লোক পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর, একটি শ্লোক উপসংহার আর একটি শ্লোক ফলশ্রুতি। উপসংহারের শ্লোকেও এমন কিছু কথা আছে, যাহা মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, সুতরাং নয়টি বা দশটি শ্লোকে শ্রীশুকদেব এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।

এই উত্তরের শ্লোকগুলি একজন লোকের জন্য নহে। অধিকার-ভেদ অত্যন্ত সত্য কথা। শ্রীরাসলীলা নিত্য-সত্য বা উন্নততম আধ্যাত্মিক সত্য, (Highest Spiritual truth)। ইহা ভক্তগণের গূঢ়ধন, (The transcendental and innermost experiences of the mystics)। ইহা প্রপঞ্চে প্রকট হইয়াছে, সুতরাং এই সত্য সকলেই যে সমানভাবে বুঝিবে, তাহার কোনই সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বর সম্বন্ধে সকল মানুষেরই একটা ধারণা আছে, কারণ ঈশ্বরজ্ঞান মানব-চেতনায় 'সহজ' বা স্বাভাবিক (innate)। কিন্তু এই ধারণা কি সকলের একরূপ? সমগ্র জীবনের দ্বারা এই ভগবান্‌কে পাইতে হইবে, কেবল বিচার-বিতর্কের দ্বারা নহে। (Not by the intellectual process)। সুতরাং যাহার জীবন যেমন, ঈশ্বরজ্ঞানও তাহার তেমন। কেবল বক্তৃতা দ্বারা বা তর্ক-যুক্তি-দ্বারা মানবকে উন্নততর ঈশ্বর-জ্ঞানে দীক্ষিত বা অভিষিক্ত করা অসম্ভব। তপস্যার দ্বারা

জীবনের পূর্ণতা ও গভীরতার দ্বারা এই উন্নততর জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে। যাহার পক্ষে যেরূপ জ্ঞান স্বাভাবিক, তাহাকে সেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সৎকর্ম্মপরায়ণ করিতে হইবে। কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইবে, এবং তাহার ফলে ক্রমে ক্রমে এক জন্মে নহে, বহু জন্মে উচ্চ হইতে উচ্চতর জ্ঞানের ভূমিতে মানব আরোহণ করিবে; ইহাই সনাতন ব্যবস্থা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে শ্রীশুকদেব সভাস্থ বিবিধ অধিকারের জনমণ্ডলী ও ভবিষ্যের বিচিত্র অধিকার-সম্পন্ন মানবজাতির প্রতি চাহিয়া প্রশ্নটির উত্তর দিবেন, কারণ মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁহাদেরই প্রতিনিধি হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

শ্রীশুকদেব যেন সমগ্র মানবকে মোটামুটি সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লইলেন এবং সাত শ্রেণীর জন্য পরবর্ত্তী দশটি শ্লোকে প্রকৃত প্রস্তাবে সাতটি উত্তর দিলেন।

প্রথম উত্তর—একান্ত স্থূলবুদ্ধি মানব, যাহারা কোনই উচ্চ বিষয় চিন্তা করিতে পারে না, তাহারা যদি সকলের সকল কার্য্যের কৈফিয়ৎ চাহে, তাহা হইলে সমাজ অচল হইয়া পড়ে। এ যুগে আমরা দেখিতে পাই, সুলভ ছাপাখানার সাহায্যে অকালপক মূর্খ যুবক একজন প্রবীণ ও বিশ্ববিখ্যাত মহৎ ব্যক্তির চরিত্র বা কোন কার্য্য বা কোন রচনা নির্ভয়ে ও নির্লজ্জভাবে সমালোচনা করিয়া মূঢ় জনগণের নিকট বাহবা লইতেছে। ইহা সমাজদেহের স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে, ব্যাধির লক্ষণ। আমাদের দেশে ইহাকে মর্য্যাদালঙ্ঘন বলে। স্থূলবুদ্ধি মানবের বা অজ্ঞান বালকের এইটুকু জানিয়া রাখা উচিত যে, তাহার অনেক অবোধ্য বিষয় আছে। অবশ্য সে যে কখনই তাহা বুঝিবেনা, তাহা নহে; কিন্তু তাহাকে শ্রদ্ধাবান্, বিনয়ী ও সহিষ্ণু হইতে হইবে। এই প্রকারের অধিকার-সম্পন্ন লোকের জন্যই প্রথম উত্তর।

"ধর্ম্ম-ব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥"

অর্থাৎ, 'যাঁহারা ঈশ্বর, (অর্থাৎ কর্ম্মাদি-পারতন্ত্র্য-রহিত, বা তপোজ্ঞানাদি-ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন, যেমন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বৃহস্পতি, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি), তাঁহাদের এমন অনেক কার্য্য আছে যাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মের ব্যতিক্রম না হইলেও, অনেকের মনে হয় যে, ধর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটিল এবং মনে হয় যে, এই কার্য্য অবিবেচনায় করা হইল। 'মহৎ' বলিয়া যাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনে এরূপ কার্য্য দৃষ্ট হইলে, শীঘ্র শীঘ্র একটা কিছু সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। যাঁহারা তেজস্বী, তাঁহাদের অনেক কার্য্যেই দোষ হয় না। যেমন অগ্নি, তিনি সকল জিনিসই খাইতেছেন, কিন্তু তাঁহার ব্যাধিও হয় না, তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তও করিতে হয় না।

এই উত্তরটি উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে আরও কয়েকটী বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। শ্রীরাসলীলা

বর্ণিত হওয়ার শেষে মহারাজ পরীক্ষিৎ যে প্রশ্ন করিলেন, শ্রীশুকদেব লীলা বর্ণনা করিতে করিতেই, এমন কি শ্রীরাস পঞ্চাধ্যায়ের প্রথম অধ্যায়েই, সে প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ আর একবার প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরম কান্ত বলিয়া জানিতেন, পরমব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না, অতএব তাঁহাদের গুণ-প্রবাহের উপশম হইল কি প্রকারে ? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব লীলা রহস্য একবার বলিয়াছেন। তাহার পর আবার প্রশ্ন হইল এবং মনে করুন এই প্রশ্ন একজন নিতান্ত স্থূলবুদ্ধি লোক উপস্থিত করিল। এ সময়ে তাহাকে আবার সমস্ত কথা বুঝাইতে যাওয়া কি বিড়ম্বনা নহে ? এই লোক যদি পুরাণ শুনিয়া থাকে, তাহা হইলে কেবল একটি প্রশ্ন নহে, সে ক্রমাগত প্রশ্ন করিবে ব্রহ্মার কথা, ইন্দ্রের কথা, বৃহস্পতি, বিশ্বামিত্র, চন্দ্রের কথা, কত কথাই সে বলিবে। এ সকল কথার সদুত্তর নাই তাহা নহে, কিন্তু এই সমুদয় উত্তর কি সে যথার্থরূপে ধারণা করিতে পারিবে ? সুতরাং এ সময়ে উত্তর দিয়া তাহাকে না বুঝাইতে যাইয়া, তাহাকে শ্রদ্ধাবান্ ও স্বধর্ম্মরত হইতে বলিলেন।

শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—"পরমেশ্বরে কৈমুতিকন্যায়েন পরিহর্ত্তুং সামান্যতো মহতাং বৃত্তমাহ।" অর্থাৎ, 'কৈমুতিকন্যায়ানুসারে পরমেশ্বরে দোষ পরিহার করিবার নিমিত্ত, সামান্যরূপে মহদ্‌গণের বৃত্তান্ত বলিতেছেন'—তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মাদি মহদ্‌গণেরই যদি দোষ না হয়, তাহা হইলে মহতের মহৎ শ্রীভগবান দোষের আশঙ্কা কি প্রকারে হইতে পারে ?

দ্বিতীয় উত্তর—এই উত্তর যাহাদের দেওয়া হইতেছে তাহারও স্থূলবুদ্ধি এবং দেহাত্মবাদী, সূক্ষ্ম বিষয় ধারণা করিতে অক্ষম। কিন্তু প্রথম দলের সহিত ইহাদের বিশেষ প্রভেদ আছে। প্রথম দল শ্রদ্ধাবান্, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত উত্তর, বিশেষতঃ অগ্নির উদাহরণ শুনিয়াই, তাহারা বুঝুক বা না বুঝুক, নিরস্ত হইল। কথাটা এই। মানুষের ভিতর সমালোচনা করিবার একটা প্রবৃত্তি আছে। ইহা ভাল ; কিন্তু সমালোচনী বৃত্তির (critcal faculty) অপব্যবহার বড়ই ক্ষতিকর। প্রথমে শ্রবণ, তাহার পর মনন। সমালোচনী বৃত্তির ব্যবহার এই মনন-ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। যে শ্রবণ করে নাই, অথবা শ্রবণ করিবে না, সে যদি অবাধে কেবল সমালোচনা করিবার অধিকার পায়, তাহা হইলে তাহারও ক্ষতি, সমাজেরও ক্ষতি। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভেদ, সমাজে চিরদিনই থাকিবে।

যাহা হউক, প্রথমশ্রেণীর লোক নিরস্ত হইলে শ্রীশুকদেব দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। ইহারা স্থূলবুদ্ধি এবং দেহাত্মবাদী, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ; কিন্তু ইহা নিন্দার কথা নহে। কিন্তু ইহারা "স্বানুকূলে ব্যাখ্যাকারী"—অর্থাৎ ইহাদের যে যৎকিঞ্চিৎ বুঝিবার শক্তি জন্মিয়াছে, সেই শক্তির সাহায্যে তাহারা সমুদয় বিষয় নিজের অনুকূলে, অর্থাৎ নিজের যাহাতে সুবিধা

ভাবিতেছে বেশ ভাল হইল, শ্রীকৃষ্ণ পরদারাভিমর্ষণ করিলেন, আমরাও এখন ঠাকুরের দোহাই দিয়া নিজ নিজ দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিব। এই শ্রেণীর লোকের প্রতি চাহিয়া শ্রীশুকদেব দ্বিতীয় উত্তর দিলেন :—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচিরাৎ মৌঢ্যাদ্‌যথা রুদ্রোঽব্ধিজংবিষং॥

এই শ্লোকটির ঠিক্ কথায় কথায় অর্থ বলিলে শ্লোকটির শক্তি অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে।

"না, ইহা করিবে না, কখনই না, মনে মনেও না। অনীশ্বর! (দেহাত্মবাদী, ইন্দ্রিয়াসক্ত, ক্ষুদ্রজীব!) মরিবে, সঙ্গে সঙ্গে মরিবে, মূঢ়তাবশতঃ মরিবে। রুদ্র সমুদ্র মন্থনের বিষ খাইয়াছিলেন, সকলেই কি খাইবে?"

এই শ্লোকের যাহা অভিপ্রায় তাহা সিদ্ধ হইলেই মঙ্গল।

তৃতীয় উত্তর—এই উত্তর যাঁহাদের জন্য, তাঁহারা সরলহৃদয় লোক, শাস্ত্র-গ্রন্থাদি কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের সরল হৃদয়ে কতকগুলি সন্দেহ জন্মিয়াছে। তাঁহারা এই সন্দেহ লইয়া বৃথা বাগাড়ম্বর করিতে চাহেন না, তাঁহারা ধর্ম্মজীবন গঠন করিতেই ইচ্ছুক। ইঁহাদের মনে সন্দেহ হয় কেন? আমাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর গ্রন্থ বা শাস্ত্র প্রচলিত রহিয়াছে। একশ্রেণীর গ্রন্থ মহৎদিগের বাক্য বা উপদেশ; আর এক শ্রেণীর গ্রন্থ, তাঁহাদের কার্য্য। প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ ধর্ম্মশাস্ত্র। ইহাতে মহৎদিগের বাক্য বা উপদেশ লিখিত আছে। এই গ্রন্থে কোন গোল নাই। ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও যতির, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের, তদ্ব্যতীত স্ত্রী, ভিক্ষু, পরিব্রাজক প্রভৃতির কোন্ সাধনায় কি কর্ত্তব্য এই সমুদয় গ্রন্থে তাহা কথিত হইয়াছে; সুতরাং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য এই সব গ্রন্থ হইতে নিরূপণ করিতে পারেন। এই গেল এক শ্রেণীর গ্রন্থ। আর এক শ্রেণীর গ্রন্থ "লীলা-গ্রন্থ"। যাঁহারা জন্ম লইতে বাধ্য না হইয়াও জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা কর্ম্মপরতন্ত্র না হইয়াও কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের লোকাতীত আচরণ এই সমুদয় গ্রন্থে বিবরিত হইয়াছে। এই দুই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। সরলচিত্ত ব্যক্তির এই খানেই সন্দেহ। শ্রীশুকদেব এই সন্দেহ নিরাস করিতেছেন।

'ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং কচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ॥

—'ঈশ্বরগণের বাক্য, অর্থাৎ আজ্ঞা সত্য, অর্থাৎ প্রামাণ্যরূপে গ্রাহ্য; তাঁহাদের কার্য্য কখন গ্রাহ্য, অর্থাৎ অবলম্বনীয়, আবার কখনও নহে। (ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারা আমাদের কর্ম্মের আদর্শস্থাপনের জন্য যে সমুদয় কর্ম্ম করেন তাহা আমাদের অবলম্বনীয়, আর লোকাতীত অভিপ্রায়

লইয়া যাহা করেন, তাহা অবলম্বনীয় নহে) ; অতএব যে কার্য্য ঈশ্বরদিগের বাক্যযুক্ত (অর্থাৎ যাহা অনুষ্ঠান করিবে বলিয়া স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন) বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহারই অনুষ্ঠান করিবে।

চতুর্থ উত্তর—এই উত্তর যাঁহাদের জন্য দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা শাস্ত্রও পড়িয়াছেন এবং তর্কের সাহায্যে বেদশাস্ত্রের অবিরোধী যুক্তি প্রয়োগ করিয়া শাস্ত্রের কথা কিছু কিছু বুঝিতেও পারেন। কৈমুতিক-ন্যায়ের সাহায্যে দুইটি শ্লোকে এই উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

"কুশলাচরিতেনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্য্যয়েণ বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো॥
কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্যদিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ॥"

"যাঁহারা নিরহঙ্কার, অর্থাৎ দেহাদিতে যাঁহাদের আত্মাভিমান নাই, তাঁহাদের কার্য্যাদি বিচার করিবার পদ্ধতি (Standard of judgment), আমাদের প্রতি প্রযোজ্য যে পদ্ধতি, তাহা হইতে পৃথক্। আমরা যাহাকে কুশল কর্ম্ম বলি, আমরা তাহা করিতে বাধ্য, না করিলে অনর্থ অবশ্যম্ভাবী। আবার যাহাকে অকুশল কর্ম্ম বলি, তাহা পরিহার করিতে বাধ্য। আমাদের এই বাধ্যতা রহিয়াছে, কারণ আমরা অহঙ্কারী জীব। কিন্তু যাঁহারা অহঙ্কারের ভূমির ঊর্দ্ধে, তাঁহাদের এই বাধ্যতা নাই। তাঁহাদের পুণ্যাচরণের দ্বারা ইহলোকে বা পরলোকে কোনরূপ লাভ নাই, আবার পাপাচরণেও কোন অনর্থ নাই। নিরহঙ্কারীগণেরই যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে তির্য্যক্, মর্ত্ত্য ও দেবলোকবাসী, প্রকৃতির এই তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বগুণের সৃষ্টবস্তু সমূহ যাঁহার শাসনাধীন এবং নিখিল কর্ম্মের যিনি ফলদাতা, সেই স্বতন্ত্র পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের কুশল ও অকুশল কর্ম্মের ফলের সহিত কোনই সম্পর্ক নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

পঞ্চম উত্তর—এই উত্তর যাঁহাদের জন্য তাঁহারা ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রধান লক্ষণ এই যে, ইঁহারা যুক্তি, তর্ক ও বিচারের অতীত একটি গূঢ় আস্বাদন বা অভিজ্ঞতা পাইয়াছেন। তাঁহারা সেই অভিজ্ঞতার সাহায্যে অতীন্দ্রিয় বিষয় সমূহ বুঝিয়া থাকেন। শ্রীরাসলীলার প্রারম্ভে যে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, তাহারও উত্তর দিবার সময় শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের এই ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়া বলিয়াছিলেন "মহারাজ, তোমার ইহাতে বিস্মিত হওয়া উচিত নহে।" এখন ভক্তগণের অভিজ্ঞতার নিকট শ্রীশুকদেব বলিতেছেন,—

"যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা যোগপ্রভাববিধূতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানাস্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ॥"

এই শ্লোকেও কৈমুতিক ন্যায় অবলম্বন করা হইয়াছে। 'যাঁহার চরণপদ্মের পরাগ নিষেবণের

দ্বারা ভক্তগণ তৃপ্ত, মুনিগণ যাঁহার যোগপ্রভাবে যাবতীয় কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন, কিছুতেই অভিভূত হন না, সেই শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছায় স্বকীয় লীলাবিলাসের জন্য দেহধারণ করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রপঞ্চে প্রকট হইয়াছেন। সেই শ্রীভগবানের আবার বন্ধন কোথায়?'

যাঁহারা লীলাতত্ত্ববিৎ তাঁহাদের জন্য ষষ্ঠ উত্তর, আর যাঁহারা লীলারহস্যবিৎ তাঁহাদের জন্য সপ্তম উত্তর। নিম্নের তিনটি শ্লোকের মধ্যে প্রথম দুইটিতে ষষ্ঠ উত্তর আর তৃতীয়টিতে সপ্তম উত্তর।

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ এষ ক্রীড়নদেহভাক্॥
অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃশ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥
নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥

'যিনি গোপরমণীদিগের, তাঁহাদের পতিদিগের, শুধু তাহাই নহে যাবতীয় দেহধারীর অন্তরে অন্তর্যামি রূপে বিচরণ করেন, যিনি অধ্যক্ষ অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী, সেই এই ভগবান্, ক্রীড়া করিবার জন্য দেহ ধারণ করিয়া থাকেন।

'ভগবান্ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ বিধানের জন্য মানুষাকার দেহ প্রকটন করিয়া এমন সব চিত্তাকর্ষক ক্রীড়া সম্পাদন করেন, যাহা শুনিয়া সাধারণ মানুষও ভগবৎ-পরায়ণ হয়।

'শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া ব্রজবাসিগণ দেখিতেন, তাঁহাদের পত্নীগণ তাঁহাদেরই পার্শ্বে রহিয়াছেন, অতএব তাঁহারা এই রাসলীলার সংবাদও জানিতেন না এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়াও করেন নাই।'

এই শ্লোক তিনটি হইতে দুইটি কথা বিশেষরূপে আলোচ্য। আমরা অবতার-কথা আলোচনা কালে সাধারণতঃ মানবের বা জগতের প্রয়োজনের দ্বার দিয়াই অবতার লীলা দেখিয়া থাকি, কিন্তু ইহা সম্যক্ দর্শন নহে। ভগবানের প্রয়োজনের মধ্য দিয়াই, কেবল অবতারলীলা নহে, বিশ্বের যাবতীয় ব্যাপার দেখিতে হইবে। অবশ্য ইহা কঠিন ও সাধন সাপেক্ষ। শ্রীরাসলীলার শেষে বলিলেন, ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই ভগবান্ তাঁহার লীলা প্রকট করেন। অবশ্য ভক্তানুগ্রহ ও ভূতানুগ্রহ একই কথা।

দ্বিতীয় কথা এই, রাসলীলার কথা ব্রজের গোপেরা জানিতেন না, মাতা যশোদাও জানিতেন না। ইহা জানিতেন শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজগোপীগণ। তাহার পর ভক্ত পরম্পরায় এই রহস্য জগতে প্রচারিত হইয়াছে।

ইহার পরের শ্লোক, যাহাকে আমরা উপসংহার শ্লোক বলিয়াছি এবং যে শ্লোকে লীলার রহস্য ব্যক্ত করা হইয়াছে, সে শ্লোকটি এই,—

'ব্রহ্মারাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ।
অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ॥'

'ব্রহ্মরাত্র শেষ হইলে বাসুদেব কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া ভগবৎ প্রেয়সীগণ অনিচ্ছার সহিত নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন।'

যাঁহারা লীলার রহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মরাত্রি বলিতে সহস্র দিব্যযুগ অর্থাৎ ব্রহ্মার একরাত্রি বুঝিয়াছেন। আর বাসুদেব চিত্তের অধিষ্ঠাতা। তাঁহার প্রেরণায় গোপীগণ নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন, অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক সৃষ্টি লীলার বিকাশ হইল।

এই উত্তরগুলি আলোচনা করিলে দেখিবেন যে, আমরা প্রশ্নের উত্তর বলিতে যাহা বুঝি ইহার একটিও সে ধরণের উত্তর নহে। ইহাকে দিগ্‌দর্শন বলা যাইতে পারে। প্রয়োজনীয় সন্ধান বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, প্রত্যেক শ্রোতাকে এই সন্ধান ধরিয়া নিজে নিজে মীমাংসা করিতে হইবে।

দেশবন্ধু—প্রয়াণের পর

Man truly reveals himself through his gift and the best gift that Chittaranjan has left for his countrymen is not any particular political or social programme but the creative force of a great aspiration that has taken a deathless form in the sacrifice that his life represented.

Rabindranath Tagore.

১। নব্যবঙ্গের সাধনা

বিধাতার রাজ্যে সর্ব্বত্রই বিধির খেলা, ন্যায়ের শাসন; আকস্মিকতা নাই, খেয়াল নাই। বিধাতার রাজ্যে সাধনা ছাড়া সিদ্ধি নাই; চেষ্টা ছাড়া সাফল্য নাই, আবার দুর্ব্বলতা ও ত্রুটি ছাড়া নিষ্ফলতা নাই, পরাভব নাই। All, a realm of Law, not a strange region of arbitrary whim,—of results without endeavour, of failure without weakness.

চিত্তরঞ্জন আসিয়াছিলেন, ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দেশের সেবা করিয়াছিলেন, তাহাও এই নিয়মের অনুবর্ত্তনে, আবার চলিয়া গেলেন, কাঁদাইয়া চলিয়া গেলেন, তাহাও এই নিয়মের অনুবর্ত্তনে। এই নিয়মই 'ভাগবতী ইচ্ছা'। এই ভাগবতী ইচ্ছার জয়ঘোষণা কর।

কোন দেশে, সেই দেশের সুকৃতির ফলে,—কোন যুগে, সেই যুগের ও পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সাধনা ও তপস্যার বলে, একজন মহামানবের অভ্যুত্থান হয়। মহামানব—মানুষের মত মানুষ—এমনধারা মানুষ, যিনি শক্তিশালী, অমিত শক্তিশালী—অথচ এই শক্তির সাহায্যে নিজের জন্য ভাবেন না,—দেশের জন্য, দশের জন্য, সমগ্র মানবজাতির জন্য নিজের 'তনু মন ধন' দিয়া, ষোল আনা শক্তি দিয়া ভাবেন ও পরিশ্রম করেন; এমনভাবে ভাবেন আর খাটেন, যে এই ভাবা আর খাটা তাঁর কাছে একটা নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার—ঠিক সুস্থদেহের শ্বাস প্রশ্বাসের মত, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারার গতিবিধির মত,—প্রয়াস নাই, কষ্ট নাই, স্বভাবে আপনা আপনি হইয়া যায়। তিনি মহামানব, দিব্যমানব, অপরের জন্য, জগতের জন্য খাটিয়া যান, খাটিয়াই সুখ পান, বিনিময়ে কিছু চান না, বিনিময়ের কথা ভাবেনও না।

এমনধারা মানুষ সংসারে মাঝে মাঝে আসা যাওয়া করেন। পূর্ব্বে আসিয়াছেন, এখনও আসিতেছেন, ভবিষ্যতেও আসিবেন। "রুদ্ধ নহে বৈকুণ্ঠের দ্বার, পরিত্যক্ত নহে এ সংসার, চির-অভিশপ্ত নহে এ মানব জাতি।" ইহাই মানবের আশা ও সান্ত্বনা। এই প্রকারের মহামানব আসিয়া কর্ম্ম করিয়া যখন চলিয়া যান, তখন মনে হয় তাঁহাদের এই আসা যাওয়া বুঝি একটি বিধিবহির্ভূত আকস্মিক ব্যাপার, ইহার কোন নিয়ম নাই। কিন্তু নিয়ম আছে। মানুষের সাধনায় মানুষ গড়িয়া উঠে। দশ জনের, শত জনের, সহস্র জনের দীর্ঘকালব্যাপী নীরব ও অজ্ঞাত তপস্যার ফলে একজন মহামানবের আবির্ভাব হয়।

মহামানব বলিতে কেবল শক্তিশালী চালাক মানুষ বুঝায় না, কেবল সংসার-যুদ্ধের বিজয়ী মানুষ বুঝায় না। আত্মার আলো ছড়াইয়া দিয়া একটা গোটা দেশকে যাঁহারা জাগরিত করেন, উন্নততর কর্ত্তব্যপালনে উদ্বুদ্ধ করেন, তাঁহারাই মহামানব। এই প্রকারের একজন মানুষকে গড়িয়া তুলিতে পূর্ব্ব হইতে অনেক রকম আয়োজন চলে; এমন ধারা একজন মানুষকে কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়া রাখিতে হইলে, তাঁহার নিকট সত্য করিয়া কাজ আদায় করিতে হইলে, তাঁহার চারিদিকে তাঁহার সহযোগী ও অনুগতরূপে অনেককে তপস্যা করিতে হয়। বহুজনের ও বহুদিনের এই নীরব তপস্যার ফলেই একজন সত্যকার বড়মানুষের আসা ও কাজকরা সম্ভব হয়। ইহাই নিয়ম। আজ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন, অধ্যাত্মজগতের এই নিয়মটি স্মরণ করা, আর তদনুযায়ী, ছোট হই বড় হই, আমাদের প্রত্যেকের কর্ম্মরত হওয়া।

চিত্তরঞ্জন বড়, খুবই বড় ; ইহা যে বাঙ্গালাদেশ ও ভারতবর্ষ বুঝিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই 'বোধ' আমাদের হৃদয়েই ছিল, বা ধীরে ধীরে নীরবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, আজ তাহা ব্যক্ত হইয়াছে, বাহিরে আসিয়া পুঞ্জীভূত হইয়া উজ্জলভাবে প্রকট হইয়াছে। তাঁহার আকস্মিক তিরোধানে, এই 'বোধ' বড়রকমের ঝড়ের মতো আমাদের কাঁপাইয়া ও মাতাইয়া গোটা দেশের উপর দিয়া বাহিয়া গেল, এখনও বাহিয়া যাইতেছে। এটুকু স্বভাবের কাজ, কিন্তু ইহাতে তুষ্ট হইলে চলিবে না। স্বভাবের কাজের উপর আমাদেরও কিছু করিবার আছে, তাই আমরা মানুষ। এই "বোধ" এর প্রকৃতি আমাদের নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, এই 'বোধ' বা জাগরণ যে মহাসত্যের ইঙ্গিত করিতেছে, সেই মহাসত্যের যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠা হয়, প্রথমতঃ আমাদের নিজ নিজ জীবনে, তাহার পর দশের ও দেশের জীবনে সেই মহাসত্য যাহাতে যথার্থরূপে ক্রিয়ান্বিত হয়, সেজন্য শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সাধনরত হইব।

চিত্তরঞ্জন গিয়াছেন, আমরা কাঁদিয়াছি ও কাঁদিতেছি, কিন্তু আর শুধু কাঁদা কেন ? আমরা তাঁহাকে আমাদের জীবনে অমর করিব ? তিনিও বলিয়া গিয়াছেন, আমি আবার জন্ম লইব, এই বাংলাদেশে বাঙ্গালী হইয়া জন্ম লইব এবং আজ যে কাজ করিতেছি, সেই কাজই করিব, আজ কাজ যেখানে রাখিয়া যাইব, আবার আসিয়া ঠিক্ সেইখান হইতেই আরম্ভ করিব। একথা যে সত্য, কবির কল্পনা নহে, সাধু ইচ্ছামাত্র নহে, জন্মান্তরবাদী জানেন ইহা সত্য। সচরাচর পুনর্জন্ম হইতে বিলম্ব হয়, কিন্তু তীব্র সংবেগ থাকিলে তাহা অতি শীঘ্রই হইয়া থাকে। সুতরাং আবার তিনি আসিতেছেন ; আরও বেশী শক্তি লইয়া, আরও ভাল দেহ লইয়া আরও বেশী সুবিধা, প্রেম ও প্রতিভা লইয়া, শীঘ্রই তিনি আসিতেছেন, তোমরা, যাঁহারা তাঁহাকে সত্য করিয়া ভালবাস, তোমরা তাঁহার আসিবার পথ প্রস্তুত কর, তাঁহাকে আকর্ষণ কর, তাঁহার আসন্ন ভবিষ্যের কর্ম্মভূমি প্রস্তুত কর। তপস্বীর বংশধর আমরা, আমরা কি করিব না। যাঁহারা সত্য করিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতেন এ কাজ তাঁহারাই করিবেন। একাজ নীরবের কাজ, এ কাজ অবজ্ঞাত, অজ্ঞাত ও উপেক্ষিতভাবে করিতে হয়, আত্মার অন্তর্য্যামী যিনি, একমাত্র তিনি সাক্ষী এইভাবে করিতে হয়। দেখা যাউক নব্যবঙ্গ সে সাধনার পথ কতখানি ধরিতে পারে।

২। মৃত-সম্বন্ধীয় চিন্তাপ্রণালী

যাহারা চলিয়া যায় তাহাদের সম্বন্ধে কি প্রকারে ভাবিতে হয় ? আমরাও চলিয়া যাইব, এই কথাটা খুব ভাল করিয়া মনে রাখিয়া তাহাদের সম্বন্ধে ভাবিতে হয়। তাহা হইলে কিছু সত্য পাওয়া যায়, কিছু আলো পাওয়া যায়।

The way in which the departed rise before us depenbs on our discernment of what in them was vital and abiding.

যিনি গিয়াছেন, তাঁহার জীবনের অন্তরতম ও শাশ্বত তত্ত্ব আমরা যে প্রকারে যতটুকু ধরিতে পারিব, ঐ মৃতজনও ঠিক্ সেই প্রকারে ততটুকু আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবেন।

দেশবন্ধুর জীবনের এই অন্তরতম সত্য ও শাশ্বত-তত্ত্ব কি, তাহা যাঁহারা বলিয়া দিতে ও ধরাইয়া দিতে পারিবেন, দেশবন্ধুর প্রকৃত স্মৃতিরক্ষার তাঁহারাই সহায়ক। চিন্তাশীল পণ্ডিত শ্রীপ্রমথ চৌধুরী দেশবন্ধু সম্বন্ধে মাত্র দুটি কথা বলিয়াছেন, কথা দুটি মূল্যবান্। তাঁহার 'দুকথা' এই।

"উপনিষদের ঋষিরা বলে গেছেন "অল্পে সুখ নেই।" আমরা বেশির ভাগ লোক কিন্তু অল্পেতেই সন্তুষ্ট থাকি।

অপরপক্ষে চিত্তরঞ্জনের কখনই অল্পে মনস্তুষ্টি হত না। অল্পেতে সন্তুষ্ট হওয়া ছিল তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন উপনিষদকারদের সহজ শিষ্য। কি ধন কি মান, কি পদ, কি সম্পদ, কি ক্ষমতা, কি প্রভুত্ব, কি ভোগ, কি ত্যাগ কোন বিষয়েই তিনি স্বল্পের সাধনা কখনই করেন নি—নিজের জন্যও নয়, দেশের জন্যও নয়।

মহাভারতের একটি শ্লোকে বলে :—

সুপূরা বৈ কুনদিকা সুপূরো মূষিকাঞ্জলিঃ।
সুসন্তোষঃ কাপুরুষ স্বল্পকেনৈব তুষ্যতি॥

অর্থাৎ কাপুরুষেরাই স্বল্পে সন্তুষ্ট হয়, যেমন অল্প জলে কুনদী পূর্ণ হয়—অল্পেতেই মূষিকাঞ্জলি ভরে ওঠে।

এ সব শাস্ত্রীয় নিন্দাবাদ সত্ত্বেও আমরা অধিকাংশ লোক যে মূষিকাঞ্জলিতেই সন্তুষ্ট থাকি তার কারণ আমরা আমাদের অঞ্জলীর মাপ জানি এবং সেই সঙ্গে আমাদের শক্তিরও সীমাও জানি। সাধারণ লোকের অন্তরে আর যে শক্তিই থাক্ আত্মশক্তি নেই। চিত্তরঞ্জনের চরিত্রে যে শক্তির পরিচয় পেয়ে বাঙ্গালী জাতি মুগ্ধ হয়েছে, সেই অনন্যসাধারণ শক্তির নাম আত্মশক্তি। আত্মশক্তি জিনিষটে কি? বুদ্ধিবলও নয়, হৃদয়বলও নয়, মনোবলও নয়, এমন কি এ তিনের সন্নিপাতজ শক্তিও নয়। কেননা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, হৃদয়বল বুদ্ধিবলকে খর্ব্ব করে,—বুদ্ধিবল ইচ্ছাশক্তিকে পঙ্গু করে। মানুষের আত্মশক্তি হচ্ছে সেই জাতীয় শক্তি যার দেখা পেলে আমরা চিনতে পারি, যদিচ মুখে তার পরিচয় দিতে পারিনে। দেশের লোক একমনে চিত্তরঞ্জনকে যে অসাধারণ লোক বলে মেনে নিয়েছেন তার কারণ দেশের লোক অন্তরের অন্তরে অনুভব করেছেন যে তাঁর সকল কাজ সকল কথার মূলে ছিল আত্মশক্তি। অর্থাৎ সেই শক্তি যা দেশকাল অবস্থার দ্বারা সৃষ্টও নয় সম্পূর্ণ নিয়মিতও নয়, কিন্তু সকল প্রকার বাহ্য কারণের অতিরিক্ত। পুরাকালে সংস্কৃত ভাষায় ...

নাম ছিল ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ ঈশ্বরের বিভূতি অর্থাৎ আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা জানতেন যে এ হচ্ছে এক প্রকার লোকোত্তর শক্তি।" আত্মশক্তি ১২ই আষাঢ়. ১৩৩২।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাস "চিত্তরঞ্জনের জীবনের মূলধারা" নিম্নরূপে ধরিয়াছেন।

"দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনের মূলধারা ছিল বৈষ্ণবীয় প্রেমধর্ম্ম। ইহাই তাঁহার হৃদয়কে ভাবপ্রবণ ও কুসুমকোমল করিয়া তুলিয়াছিল। ভক্তকবি চণ্ডীদাসের দুছত্র কবিতায় তাঁহার জীবনের মূল সূত্রটী বোঝা যায় —

সব সমর্পিয়া, একমন হৈয়া,
নিশ্চয় হইলাম দাসী।

এই প্রেমে আত্মোৎসর্গের ভাব চিত্তরঞ্জনের সমগ্র জীবনে—কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি রাজনীতিক—বিশেষরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনি শত শত সহায়সম্পদবিহীন নিরন্নের অন্নদান করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাই তিনি অনাথ আতুরকে নারায়ণজ্ঞানে সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন; এবং তাই তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভগবানের সেবা মনে করিয়া দেশসেবায় ছুটিয়া আসিয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জন সমগ্র জীবনে ভিতরে বাহিরে ছিলেন খাঁটি বৈষ্ণব। তাঁহার বাক্যে তিনি বৈষ্ণব, তাঁহার সমাজ-সংস্কারে তিনি বৈষ্ণব এবং শেষে তাঁহার রাজনীতিক জীবনেও তিনি বৈষ্ণব। তাঁহার সমস্ত জীবনে এই একই ভাবগঙ্গার ধারা বহিয়া গিয়াছিল; রাজনীতিক অধিকার এই ধর্ম্মপালনের শ্রেষ্ঠ সোপান বলিয়াই তিনি ইহার অর্জ্জনে এত উৎসুক হইয়াছিলেন।

এই জন্যই তিনি দেশকে এত প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন; এই কারণেই উৎপীড়ন ও অত্যাচারের কথা শুনিলে তিনি পাগল হইয়া তাহার প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিতেন। পাঞ্জাবের অত্যাচার হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গলার অর্ডিন্যান্স প্রচার পর্য্যন্ত সকল অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার তাঁহার প্রধান কারণই ছিল;—এই আপনাভোলা দেশপ্রেম। তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মই তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিল দেশসেবা ও ভগবানের সেবার মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই, আর্ত্ত ও প্রপীড়িতের সেবা ও নারায়ণের সেবা অভিন্ন ও তাই জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি বলিতেন যদি পুনরায় জন্মগ্রহণ হয়, যেন চণ্ডাল হইয়া জন্মলাভ করি। এই সর্ব্বসমর্পণকারী প্রেমই চিত্তরঞ্জনের জীবনের মূলধারা, ইহাই তাঁহার সমগ্র জীবনকে এমনই অপরূপ মূর্ত্তিতে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল।" আত্মশক্তি ১২ আষাঢ় ১৩৩২।

পূর্ব্বে যে ইংরাজী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহারই অপরাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

The way in which the departed rise before us depends on our discern-

ment of what in them was vital and abiding. To be carnally-minded is not only death as regards ourselves—it excludes others from a spiritual life within us. If we knew them only "after the flesh" pictures or sepulchres are all that will by and by remain to us of them ; but if there is a divine spirit within us that spirit quickeneth whom it will.

Russel L. Carpenter.

অনুবাদ—যিনি গিয়াছেন তাঁহার জীবনের অন্তরতম ও শাশ্বত তত্ত্ব আমরা যে প্রকারে যতটুকু ধরিতে পারিব ঐ মৃতজনও ঠিক সেই প্রকারে ততটুকু আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবেন। কেবল এই স্থূল ও নশ্বর ব্যাপারে বদ্ধদৃষ্টি হইলে আমরা নিজেরাও মরিয়া যাইব, অপরকেও নিজের ভিতর অমর করিতে পারিব না। যাঁহারা চলিয়া যান, তাঁহাদের কেবল রক্তমাংসের অংশটুকুই যদি আমাদের জানা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের চিত্রপট বা মর্ম্মরমূর্ত্তিই আমাদের নিকট শেষ পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকিবে। কিন্তু আমাদের ভিতর ঐশ আত্মা যদি ক্রিয়ান্বিত অবস্থায় থাকেন, তাহা হইলে ঐ আত্মা যাঁহাকে স্পর্শ করিবে বা গ্রহণ করিবে, তাঁহাকে অমর জীবনে জাগাইয়া তুলিবে।

৩। দেশবন্ধুর বদান্যতা

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে সমগ্র ভারতবর্ষ বিশেষ করিয়া বাংলাদেশ যেভাবে বিচলিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, এরূপ ভাব আর কখনও হয় নাই। অনেকে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, পৃথিবীতে এরূপ ব্যাপার কখনও হয় নাই। যত কাগজ সব দেশবন্ধুর কথায় পরিপূর্ণ, তাঁহার সম্বন্ধে দেশের যে কত কথা বলিবার আছে তাহার সীমা নাই। আমরা অনেক কথা শুনিতেছি, আরও অনেক কথা শুনিব। তাঁহাকে ষোল আনা বোঝা আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। তবে বুঝিবার জন্য সাধনা করার অধিকার সকলেরই আছে। দেশবন্ধু সম্বন্ধে খুব বড় কথা যাহা সকলেরই জানা, চিন্তা করা ও মনে রাখা দরকার, তাহা তাঁহার বদান্যতা।

সুলেখক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় দেশবন্ধুকে ভালরূপেই জানিতেন। তিনি লিখিয়াছেন, "ব্যারিষ্টার মহলে যখন তিনি একচ্ছত্র সম্রাট্, যখন রাশি রাশি টাকার থলি তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া গড়াগড়ি যাইত, তখন সেই টাকার থলির সদ্ব্যবহার দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাইতাম। যখন যাঁহার অভাবের কথা তাঁহার কাণে আসিয়া পৌঁছিত, তখনই সেই টাকার থলি তাঁহার হাতে গিয়া পড়িত। এ বিষয়ে তাঁহার শত্রু মিত্র ভেদ ছিল না। মনে পড়ে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাহাতে বিরক্ত হইয়া যোগদান করেন নাই। ফলে গুজব রটে যে, চিত্তরঞ্জন বিপিনবাবুকে যে মাসিক সাহায্য করিতেন, তাহা তিনি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আমি এই গুজব সম্বন্ধে যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি হাসিয়া উত্তর করিয়াছিলেন—"বিপিনবাবু আমার যত শত্রুতাই করুন না কেন, ভগবান্ যতদিন আমার দিবার ক্ষমতা রাখিবেন, ততদিন তাঁহার টাকা বন্ধ হইবে না।" বিপিনবাবু নিজেও একবার চিত্তরঞ্জনের সাহায্যোপলক্ষে 'নায়ক' পত্রে লিখিয়াছিলেন, "যাঁরা যখন আমার ভারবহনে বিধাতার বাহন হইয়াছেন, তাঁরা তখন সকলেই আমার নিকটে 'চোরের মতন' থাকিয়াছেন।" কিন্তু চিত্তরঞ্জন শুধু বিপিনবাবুর নিকট নহে, যাঁহাকে কিছু দিতেন তাঁহারই নিকট চোরের মতন থাকিতেন। জীবনে অনেকবারই দেখিয়াছি যে লোক তাঁহাকে গালি দিতেছে, সেই লোকই এদিকে আবার তাঁহার নিকট হাতও পাতিতেছে, তিনি কিন্তু নির্ব্বিকারচিত্তে সে শূন্য হাত পূর্ণ করিয়া দিতেছেন। এমন দৃশ্য জীবনে আর কখনও দেখি নাই, আর কখনও ঘটিয়াছে কিনা, তাহাও শুনি নাই। সত্যই তিনি মানব-দেবতা ছিলেন।"

হিতবাদী, ১২ই আষাঢ়, ১৩৩২।

শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয় দেশবন্ধু সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহার দুইটি কথা উদ্ধৃত হইল। আমরা আশা করি এই প্রকারের অনেক ঘটনা আমরা ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিব।

"দেশবন্ধুর সঙ্গে আমার প্রথম দিনের পরিচয়ের কথা বলি। নবপর্য্যায় যুগান্তর সম্পাদনার জন্য জেল থেকে বেরিয়ে এসে আবার যুগান্তর প্রকাশ করবার আকাঙ্ক্ষা এত তীব্র হয়েছিল যে আমার আয়ের ওজন রেখে তার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। হাতে টাকা ছিল না অথচ প্রেসে কাগজ ছাপতে দিয়েছিলুম কি ভরসায় তা অন্তর্য্যামীই জানেন, অবশেষে যখন কাগজ বেরুতে একদিন মাত্র বাকি তখন তাঁর প্রাসাদে গিয়ে দেশবন্ধুর কাছে খবর দিলুম। দেশবন্ধু ভিতরে প্রাদেশিক নেতাদের নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, তবু অনুগ্রহ করে তখনই আমাকে ডেকে পাঠালেন—তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ না হলেও সেই আমার প্রথম পরিচয়।

ঐ প্রদীপ্ত মহিমাময় মহামানবের সম্মুখে এইভাবে উপস্থিত হয়ে এই তুচ্ছ আবেদন জানাতে স্বভাবতই আমার বাধা ছিল, কোন রকমে সসঙ্কোচে বলেছি, আমাদের কাগজের জন্য এসেছি, আমার রুদ্ধ কণ্ঠের অন্তরের কথা কেড়ে নিয়ে যেন তিনি বল্লেন, কি চাও? টাকা চাও ত? কত টাকা? আমি বল্লুম শ'দুই টাকা পেলে সুরু করতে পারি। তিনি বল্লেন, দু'শ টাকায় কি হবে? আবার কাল এসে বল্‌বে আরও চারশ টাকা দিন, পরশু বল্‌বে আরও টাকা দিন, তা হবে না। মোট কত টাকা চাই আজ বলে যাও, আরেকদিন এসে নিয়ে যেয়ো। আমি বল্লাম সে আলোচনা আরেকদিন

করা যাবে আজ আপাততঃ দুশো মাত্র দিন, আমাদের কাগজ প্রেসে। তিনি হাসতে হাসতে বল্লেন we are also in press এবং তখনই তাঁর খাজাঞ্চী দেবেনবাবুকে ডেকে টাকাটা দিতে বল্লেন। আমাকে তিনি তার আগে চিন্‌তেন না, এবং অমি নিজে ছাড়া আর কেউই তাঁর কাছে আমাকে পরিচিত করে দেয়নি, অথচ বিনাসর্ত্তে বিনাপ্রশ্নে অতগুলো টাকা অনায়াসেই আমাকে দিয়ে দিতে পারলেন। এতে তাঁর দানের শক্তি প্রকাশ পাচ্চে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়েও বড় এক রহস্যময় শক্তির ইঙ্গিত এর মধ্যে আছে, যার বলেই তিনি অত বড় নেতা হতে পেয়েছিলেন। তা হচ্চে তাঁর আত্মবিশ্বাস ও পরকে বিশ্বাসের শক্তি। তিনি যে নেপোলিয়ানেরই মত চিরদিন চোখের পলকে সবাইকে ও সবযুদ্ধ জয় করে গেছেন, তার গোড়ার কারণ এই।

* * * * * *

আরেকদিনের ঘটনা মনে পড়ে, তখন আত্মশক্তির সম্পাদকের কাজ ছেড়ে দিয়েচি, এজন্য তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন। বিশেষ কোনো কাজ ছিল না, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছলাম, কথায় কথায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আত্মশক্তির কাজ ছেড়ে দিয়েচ তোমার চলচে কি করে? কথাটা এড়াবার জন্য আমি বল্লাম, চলে যাচ্চে কোনো রকমে। তার পরেই তিনি বল্লেন, তাহলে তোমার ত বড্ড অসুবিধা হচ্চে। আচ্ছা আজ তুমি কিছু টাকা নিয়ে যও। এই বলে তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে কতকগুলা দশটাকার নোট বের করে দিলেন—এই অযাচিত দানে সেদিন আশ্চর্য্য হয়ে গেছলাম, যদিচ তাঁর চরিত্রে এতে আশ্চর্য্যের কিছু ছিল না। এ ছিল তাঁর বিপুল স্নেহের সহজ অধিকার।”

আত্মশক্তি ১২ই আষাঢ়, ১৩৩২।

মোঃ মহম্মদ আলীর বক্তৃতা

গত ১৮ই জুন দিল্লী নগরীতে দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশার্থ যে সভার অধিবেশন হয়, সেই সভার সভাপতিস্বরূপে মৌলানা মহম্মদ আলী নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন :—

“আজ আমি আশা করিয়াছিলাম যে, ভারতের এক জন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির বিয়োগে শোকপ্রকাশ করিবার জন্য এখানে অগণিত লোকের সমাবেশ হইবে, কিন্তু তদ্বিপরীতে এত অল্পসংখ্যক লোক দেখিয়া আমার মনে হইতেছে, আমার দেশবাসী এখনও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, আজ কি প্রকার শ্রেষ্ঠ মানবকে মৃত্যু তাহার করালকবলে কবলিত করিয়াছে। আমার দেশবাসীর যদি দাস মনোবৃত্তি না থাকিত, তাহা হইলে আজ ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে দেশবন্ধুর জন্য শোকের হাহাকার-ধ্বনি শুনিতে পাইতাম। চিত্তরঞ্জন কে, আপনারা কি তাহা জানেন? মহাত্মা গান্ধী ছাড়া দেশবন্ধুর

দেশবন্ধু যেভাবে জাতির কল্যাণের জন্য তিল তিল করিয়া নিজের জীবন দান করিয়া গিয়াছেন, এমন আর কেহ দিয়াছেন কি ? জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি

গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে

ভোট দিয়াছিলেন। নেতা দেশের অনেক আছেন, কিন্তু দেশবন্ধু জাতির দাসত্ব যেরূপ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন, এরূপ কেহ করিয়াছেন কি ? তিনি জাতির ভাগ্যরথ স্বাধীনতার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। "দাশ" মহাশয় সত্যই জাতির "দাস" ছিলেন।

মুসলমানদের প্রতি

আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য দেশবন্ধুর ন্যায় দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হউন। আমার সহিত দাশ মহাশয়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষের মুক্তির পর দাশ মহাশয় সম্ভ্রমের সোপানে আরোহণ করেন। কিন্তু দাশ মহাশয় যে কত বড় ছিলেন, তাহা তিনি নিজে উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। চিন্দওয়ারায় তাঁহাদের উভয়ের সহিত বন্ধুত্ব হয়।

স্বার্থত্যাগ

অমৃতসর কংগ্রেসে আমার পীড়াপীড়িতে দাশ মহাশয় সকল দলের একযোগে কার্য্যের মিট-মাটের প্রস্তাবে সম্মতি দেন। নাগপুর কংগ্রেসে আমি মতিলাল নেহেরু ও দাশ মহাশয়কে পরস্পর মতবিরুদ্ধতা করিতে দেখিয়াছি। আমার অনুরোধে দাশ মহাশয় বার্ষিক ছয় লক্ষ টাকা আয়ের ব্যারিষ্টারী পরিত্যাগ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় হাজার হাজার লোক যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিল, তন্মধ্যে অল্প লোকই জনসমাজে পরিচিত। কিন্তু তন্মধ্যে দেশবন্ধুর দান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দাশ মহাশয় দরিদ্রদিগকে অকাতরে দান করিতেন। হাজার হাজার কারামুক্ত ব্যক্তি ও কারারুদ্ধ ব্যক্তির পরিবারবর্গকে তিনি প্রতিপালন করিতেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, যে মুহূর্ত্তে আপনি ব্যারিষ্টারী পরিত্যাগ করিবেন, সেই মুহূর্ত্তে সমগ্র বঙ্গের ধনসম্ভার আপনার পদতলে আসিয়া জমায়েৎ হইবে। সে দিন সারা দিন সারা রাত্রি আমি একবার দাশ মহাশয় আর একবার মহাত্মার নিকট দৌড়াদৌড়ি করি। রাত্রি তিনটার সময় দাশ মহাশয় আমাকে ডাকিয়া বলেন যে, তিনি ব্যারি-ষ্টারী ছাড়িয়া দিবেন। আমি মনে করিয়াছিলাম, দাশ মহাশয় নিশ্চয়ই ব্যাঙ্কে ২০।৩০ লক্ষ টাকা জমা রাখিয়াছেন, কিন্তু ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করিবার পর দেশবন্ধু আমাকে বলেন যে, তাঁহার আড়াই লক্ষ

করিতেন কিন্তু আমার বিশ্বাস, যে মুহূর্তে দাশ মহাশয় ব্যারিষ্টারী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই ভারতের নিকট তাঁহার ঋণ পরিশোধ হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার মুসলমান সমাজের প্রতি সর্ব্বদা উদারতা প্রদর্শন করিতেন। দাশ মহাশয়

হিংসার বিরোধী

ছিলেন। দাশ মহাশয় গিয়াছেন। তাঁহার নির্ভীকস্বর চিরতরে রুদ্ধ হইয়াছে। ভগবান আমাদিগকে পরীক্ষা করিতেছেন, দাশ মহাশয়ের মৃত্যুর পরও আমরা "স্বরাজ" কথাটি উচ্চারণ করিতে সাহস করি কি না? আমরা দেশবন্ধুর শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে পারিব না, ইহা সত্য, কিন্তু আমরা কি তাঁহার পরিত্যক্ত অসমাপ্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে পারি না?"

বক্তৃতা অন্তে মৌলানা সাহেব শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, উর্ম্মিলা দেবী প্রভৃতির দেশের কার্য্যে যাহাতে সৎসাহস হয়, সেজন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন।

একটি কবিতা

আমরা গতবারে দেশবন্ধুর তিনটি পুরাতন কবিতা পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলাম। এবারো আর একটি নিম্নে মুদ্রিত হইল।

স্বপ্ন

তখনো হয় নি সন্ধ্যা, বিমল আকাশ,
কোমল যেন গো মোর প্রিয়ার বরণ—
ঢালিতেছে মৃদু মধু, স্বর্ণের আভাস
চুম্বি' সরোবর জল, আম্রের কানন!
তখনও আসেনি প্রিয়া, প্রাণ পেয়েছিল
সেই আলো মাঝে শুধু প্রিয়ার আভাস।
আম্রশাখা দুলাইয়া বহেছিল বায়,
বসেছিনু প্রিয়া লাগি প্রেম-প্রতীক্ষায়!
তারপর এল সন্ধ্যা ধুসর বরণ!
আমার প্রিয়ার যেন বক্ষের অঞ্চল,

ঢেকে দিল দেহ হিয়া ধরণী গগন !
করে' দিল সর্ব্ব মন অধীর চঞ্চল !
বাড়াইনু আলিঙ্গন !—প্রিয়া আসে নাই,
পাঠা'য়ে দিয়াছে শুধু প্রিয়ার স্বপন !
কাননের মাঝে শুধু পাখী গান গায়,
প্রাণ ছিল প্রিয়া লাগি প্রেম-প্রতীক্ষায় !
তারপর সন্ধ্যা গেল, আসিল রজনী,
পরশি' সকল দেহ প্রিয়ার কুন্তল
হিয়া মোর দিশাহারা !—আঁধার ধরণী !
'ওগো ঢাক, ঢাক মোরে প্রসারি অঞ্চল !'
কোন শব্দ নাহি, হায় ! প্রিয়া আসে নাই,—
প্রিয়ার কুন্তল-স্বপ্ন এসেছে রজনী !
তখন বহিল ঝড় অনন্ত বাতাস
তৃষার্ত্ত ভরসা-ভরা ধরণী আকাশ।
তখনো গভীর রাত্রি ধরণী ছাইয়া,
প্রিয়ার গভীর সেই প্রেমের মতন !
পাখীরা কানন-শাখে ছিল ঘুমাইয়া
ওকি—ওকি দেখা যায়—ছায়া না স্বপন ?—
এলোমেলো চুলে ঐ প্রিয়া আসিয়াছে
আবেশে অঞ্চল তার ভূমে লুটাইয়া !
এখন যে প্রভাতের পাখী গান গায়,
প্রিয়া মোর চলি গেছে কখন কোথায় ?

'সাহিত্য'-বৈশাখ, ১৩০৯।

ভাবুকতা

বাংলা দেশ, বাংলার গীতি-কবিতা, বিশেষ করিয়া বীরভূমের প্রেমিক কবি চণ্ডীদাসকে দেশবন্ধু কিরূপ ভাবুকতার চক্ষে দেখিতেন, তাহা আমাদের ধ্যানের বিষয়। সাহিত্য সম্মেলনে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেরই সুপরিচিত হইলেও তাহার প্রথমাংশ নিম্নে পুনর্ম্মুদ্রিত হইল।

"বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটীর মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই সত্য, যুগে যুগে আপনাকে নব নব রূপে নব নব ভাবে প্রকাশিত করিতেছে। শত সহস্র পরিবর্ত্তন, আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরন্তন সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে, যুদ্ধে, বিপ্লবে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, অজ্ঞানে, অধর্ম্মে, স্বাধীনতায়, পরাধীনতায় সেই সত্যই আপনাকে ঘোষণা করিয়াছে, এখনও করিতেছে। সে যে বাঙ্গলার প্রাণ ; বাঙ্গলার মাটী, বাঙ্গলার জল, সেই প্রাণেরই বহিরাবরণ। বাঙ্গলার ঢেউ খেলান শ্যামল শস্যক্ষেত্র, মধুগন্ধবহ মুকুলিত আম্রকানন, মন্দিরে মন্দিরে ধূপ ধূনা জ্বালা, সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মত কুটীর প্রাঙ্গন, বাঙ্গলার নদ নদী, খাল বিল, বাঙ্গলার মাঠ, তালগাছঘেরা বাঙ্গলার পুষ্করিণী, পূজার ফুলে ভরা গৃহস্থের ফুল বাগান, বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস, বাঙ্গলার তুলসী পত্র, বাঙ্গলার গঙ্গাজল, বাঙ্গলার নবদ্বীপ, বাঙ্গলার সেই সাগর-তরঙ্গে চরণ-বিধৌত জগন্নাথের শ্রীমন্দির, বাঙ্গলার সাগর সঙ্গম, ত্রিবেণী, সঙ্গম, বাঙ্গলার কাশী, বাঙ্গলার মথুরা বৃন্দাবন, বাঙ্গালীর জীবন আচার ব্যবহার, বাঙ্গলার সমগ্র ইতিহাসের ধারা যে, সেই চিরন্তন সত্য, সেই অখণ্ড অনন্ত প্রাণেরই পবিত্র বিগ্রহ। এই সবই যে-সেই প্রাণধারায় ফুটিয়া ভাসিতেছে, ছুলিতেছে।

সেই প্রাণ-তরঙ্গে একদিন অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠিল, এক অপূর্ব্ব অসংখ্যদল পদ্মের মত বাঙ্গলার গীতি-কাব্য ! কিন্তু ফুল ত একদিনে ফুটে না। তাহার ফুটনের জন্য যে অতীতের অনেক আয়োজন আবশ্যক। তাহার প্রত্যেক দলের মধ্যে যে অনেক গান, অনেক কথা, অনেক কাহিনী। তাহার গন্ধের মধ্যে যে অনেক কালের অনেক স্মৃতি, অনেক মধু জড়াইয়া থাকে। তাঁহার ডাঁটায় যে জন্ম জন্মান্তরের চিহ্ন লুকান থাকে, ফুল যে অনন্তকাল ধরিয়া ফুটিতে ফুটিতে ফুটিয়া উঠে।

বাঙ্গলার গীতি-কাব্য যে কখন্ কোন্ আদিম উষায় ফুটিতে আরম্ভ করিল, আমি জানি না। শুনিয়াছি, সন্ধ্যা-ভাষার লিখিত পুরাতন বৌদ্ধ দোঁহায় তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডি-দাসেরর সময় সেই গীতি-কাব্যের বিকশিত অবস্থা। কিন্তু তার আগে অনেক গীতি-কাব্য না লেখা হইয়া থাকিলে এরূপ কবিতা সম্ভব হয় বলিয়া মনে হয় না। আজকাল আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে। আশা করি, একদিন আমরা আমাদের গীতি-কাব্যের এই হারান ধারাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব। চণ্ডিদাসের লিখিত যে গীতি-কাব্য, ইহাই বাঙ্গলার যথার্থ গীতি-কাব্য ; এই কবিতাগুলির মধ্যে যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, তাহাই বাঙ্গলা গীতি-কবিতার প্রাণ। বাঙ্গলা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, রূপে রূপে এ বিচিত্র ভুবন ভরিয়া আছে। কত কাল, কত যুগ, কোন্ অন্ধকারের অন্ধকারে রূপের ধ্যানে মগ্ন আমার বাঙ্গলা জাগিয়া দেখিল, ঊর্দ্ধে অনন্ত নীল, নীলের পর নীল, অশ্রুধারে কলকল্লোলে গঙ্গা বহিয়া যায়, চরণতলে কলহাস্যময়

মহাসমুদ্র অনন্ত সুরে গাহিয়া উঠিয়াছে,—তাহার বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িয়াছে, শিরে হিমালয় কাহার ধ্যানে নিমগ্ন ! বাঙ্গলা দেখিল, তাহার আশে পাশে এতরূপ, এত সুর, এত গান,—মনপ্রাণ বিচিত্র রসে ভরিয়া উঠিল। ভরা মনে, ভরা প্রাণে ব্যাকুল হইয়া শুনিল প্রাণের ভিতর কাহার সাড়া, কাহার আকুল আহ্বান ! তখন বাঙ্গালীর কবি গাহিয়া উঠিল,—

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো

আকুল করিল মোর প্রাণ"

বাঙ্গলা তখন প্রাণের ভিতর ডুব দিয়া দেখিল, কত মণি, কত মাণিক্য তাহার সেই আঁধার প্রাণের পরতে পরতে আলোক বিকিরণ করিতেছে।

ভাবিল, আমার প্রাণে কে আছে, কি আছে ? কে আমাকে বাহির হইতে রূপে, রসে, গানে, গন্ধে জড়াইয়া জড়াইয়া আকুল করে, আবার অন্তরের অন্তরে আসিয়া এমন করিয়া স্পর্শ করে ? কাহাকে ব্যক্ত করিতে চাই ? কে বিনা চেষ্টায় আপনা আপনি এমন করিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠে ; বাঙ্গলা প্রাণে প্রাণে বুঝিল এ যে বাহিরের ও ভিতরের এক অপূর্ব্ব মিলন। এই মিলন উপভোগ করিবার জন্ম আকুল হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল অনন্তসাগর দূরে যেখানে দিকচক্রবালের পরিধি-পারে মিলিয়াছে, সেখানে শুধু এক রেখার মত সরল, শান্ত, নিবিড়, যেন মিলাইয়াও মিলায় নাই, মিশিয়াও মিশায় নাই, প্রভেদ অথচ অভেদ। আবার ফিরিয়া দেখিল, ধরণী মহাকালকে চুম্বন করিতেছে, ঢলিয়া পড়িয়া বলিতেছে, "হে আকাশ আমাকে লও, আমি যে তোমারই।" আকাশও ধরণীকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়াছে, বলিতেছে, "এস এস আমি ত তোমারই।" দেখিল সে এক মহামিলন। বুঝিল, জন্মে জন্মে সকলই সার্থক ! জন্ম সার্থক। মৃত্যু সার্থক ! দেহ সার্থক ! প্রাণ সার্থক ! আত্মা সার্থক। এই মহামিলন সার্থক ! বাহির শুধু বাহির নয়, অন্তর শুধু অন্তর নয়। ইন্দ্রিয় দিয়া যাহা প্রথম ধরা যায়, তাহা শুধু বহিরাবরণ। প্রত্যেক প্রত্যক্ষের, প্রত্যেক ভাবেরই একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সেই বহিরাবরণ ও অন্তঃপ্রকৃতি মিলিয়া মিশিয়া এক। তাহারই নাম বস্তু। জীবন এই মহামিলন মন্দির। কত বিচিত্র রূপ, কত বিচিত্র গন্ধ, কত বিচিত্র রস, কত না সুরের খেলা, কত না রসের মেলা,—আমরা যে তিলে তিলে নূতন হইয়া উঠিতেছি। বাঙ্গলার কবি তখন চামর ঢুলাইতে ঢুলাইতে গাইলেন,—

"নব রে নব নিতুই নব,

যখনি হেরি তখনি নব !"

———

বৈষ্ণব ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বাদানুবাদ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু-কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম কি, সেই ধর্ম্মের সাধন কি, ইহা লইয়া মতভেদ ও বাদানুবাদ স্বাভাবিক। বহুকাল হইতে, বোধ হয় এই মত প্রচারিত হওয়ার সময় হইতেই, মতভেদ ও বাদানুবাদ চলিতেছে। এই বাদানুবাদে প্রবেশ করা সকলের পক্ষে সম্ভবও নহে, সঙ্গতও নহে। এখন এই বাদানুবাদের যে স্তর চলিতেছে, তাহা নিরপেক্ষ বিচারের স্তর নহে, স্বার্থান্বেষণের স্তর। ধর্ম্মাচার্য্য বা গুরু হওয়া এখনও আমাদের দেশে বেশ নিরাপদ ও লাভজনক ব্যবসায়। কাজেই দেখা যায়, এক ব্যক্তি যখন কোনও একটি মত প্রচার করেন, তখন তিনি ঐ মত সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন বলিয়াই যে প্রচার করেন তাহা নহে, ঐ মত প্রচার করায়, তাঁহার পার্থিব স্বার্থ আছে, শিষ্যসংখ্যা বাড়িবার বা ঠাকুর-বাড়ীর আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে বলিয়াই সেই মত প্রচার করেন। এই প্রকারের নিতান্ত স্থূল ও বঞ্চনাময় স্বার্থের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে সকলে প্রবেশ করিতে পারেন না। তবে বাদানুবাদ যেভাবে চলিতেছে, তাহাতে ক্রমশঃ চিন্তাশীল, শাস্ত্রজ্ঞ ও নিরপেক্ষ লোক ইহাতে যোগদান করিবেন, এবং বোধ হয় কিয়ৎ পরিমাণে ইহা আরম্ভ হইয়াছে।

নানা বিষয়েই মতভেদ ও বাদানুবাদ হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে 'নাগর ভাবে' শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনা একটি বিষয়। বাঙ্গালাদেশে যাঁহারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বা শ্রীগৌরাঙ্গের মতাবলম্বী, তাঁহাদের মধ্যে প্রথম বিরোধ, শ্রীগৌরাঙ্গের স্বতন্ত্র উপাসনা-পদ্ধতি ও ধ্যান, মন্ত্র প্রভৃতি আছে কি না? একদল বলেন আছে, একদল বলেন নাই। যাঁহারা বলেন নাই, তাঁহারা বলেন শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীরাধা-কৃষ্ণের উপাসনাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এই গেল প্রথম বিরোধ। তাহার পর যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসক তাঁহাদিগের মধ্যে কথা উঠিল, শ্রীগৌরাঙ্গের শক্তি কে? যুগল-উপাসনাই যখন ব্যবস্থা, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত কাহাকে বসাইয়া 'যুগল' করা হইবে। একদল বলিলেন, 'গদাধর গৌরাঙ্গ'। শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় গদাধরই রাধা। আর একদল বলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ যখন "রাধাকৃষ্ণ-মিলিতাঙ্গ" তখন রাধা বা গদাধর শক্তি হইবেন কেন? এ লীলায় শ্রীনিত্যানন্দই শক্তি। কিন্তু নিত্যানন্দ যে পুরুষ, তাহার পর তিনি দাদা বলরাম। উত্তর হইল শ্রীনিত্যানন্দে অনঙ্গ-মঞ্জরীর আবেশ হয়, অতএব ইহাতে বাধা কি? এই গেল গৌরবাদীর দ্বিতীয় দল। তৃতীয় দল বলিলেন 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীগৌরাঙ্গ' এই যুগলই উপাস্য। তাহার পর এই মতই আরও বিকশিত হইল—নবদ্বীপ পুষ্পোদ্যান, বামে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, দক্ষিণে শ্রীলক্ষ্মী-প্রিয়া, আর চারিদিকে নদীয়া-নাগরীবৃন্দ। শেষ দৃশ্য অবশ্য শ্রীরাসলীলারই দৃশ্য।

কোনও বিষয়ে আপাততঃ মতামত দিবার কোন প্রয়োজন নাই ; প্রথমে আনুপূর্ব্বিক সমগ্র ব্যাপার শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে জানা আবশ্যক। স্বতন্ত্র শ্রীগৌরাঙ্গ-উপাসনা লইয়া পূর্ব্বে অনেক বাদানুবাদ ও বিচার-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। এই সব বিচারে যাহা হয়, তাহাই হইয়াছে, অর্থাৎ প্রত্যেক পক্ষই বলিতেছেন, আমরাই জিতিয়াছি, আর "হাসে অন্তর্যামী"। এখন বাদানুবাদ আরম্ভ হইয়াছে, "নাগর গৌরাঙ্গ" উপাসনা লইয়া। যাঁহারা এই মত চালাইতে চাহেন, তাঁহাদের যুক্তি পরে আলোচ্য, যাঁহারা ইহার বিরোধী তাঁহাদের কথাই প্রথম বলিতেছি।

এই বিরোধ নূতন নহে। ইহা যে প্রাচীন, তাহার প্রমাণ শ্রীচৈতন্য ভাগবত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্ত্রীলোকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন, শ্রীচৈতন্য ভাগবতে তাহার সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে। শ্রীচৈতন্য ভাগবত শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

সবে পরস্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস।
স্ত্রী দেখিলে দূরে প্রভু হয় একপাশ॥

পুনরায় বলিতেছেন—

এই মত চাপল্য করেন সভাসনে।
সভে স্ত্রী মাত্র নাহি দেখেন দৃষ্টি কোণে॥
"স্ত্রী" হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণো না করিলা বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
"গৌরাঙ্গ-নাগর" হেন স্তব নাহি বোলে॥
যদ্যপি সকল স্তব সম্ভব তাহানে।
তথাপিহ স্বভাবে সে গায় বুধগণে॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের যুগেই "গৌরাঙ্গ-নাগর" উপাসনা চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত' ইহার প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু ইহা যে সম্ভব তাহাও স্বীকার করিলেন। তাহার পর দেখিতে হইবে 'কীর্ত্তনগান'। কীর্ত্তনিয়া-গণের গানের দ্বারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। কীর্ত্তনগানের গৌরচন্দ্রের পদগুলি প্রায়শঃ নাগরভাবের পদ, সুতরাং শ্রীচৈতন্য ভাগবতের প্রতিবাদ সত্বেও শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগররূপে আস্বাদন করার পদ্ধতি সমাজে বন্ধ হয় নাই, বরং খুব জোরেই প্রচলিত হইয়াছিল। এখন এই নবযুগে খবরের কাগজে লিখিয়া ও বই ছাপাইয়া যখন ধর্ম্মমণ্ডলী-সমূহের মতামত প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন এই মতভেদ লইয়া সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করার বেশ সুবিধাই হইয়াছে।

'কালনা' হইতে প্রকাশিত 'পল্লীবাসী' পত্রে বাদানুবাদের কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যাইতেছে। ময়মনসিং—সেরপুরের জমিদার রায় বাহাদুর শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী মহাশয় 'পল্লীবাসী' পত্রিকায় ছোট ছোট তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধ তিনটি পুনর্মুদ্রিত হইল। চৌধুরী মহাশয় নিত্যধামগত শিশিরকুমার ঘোষ ও কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয়দ্বয়ের সহিত বিশেষভাবেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আধুনিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ খবরের কাগজ ও ছাপাখানার সাহায্যে, কমিটি করিয়া ও চাঁদা তুলিয়া যখন বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের প্রথম চেষ্টা হয়, এবং সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, কেদারবাবু যখন নুতন নবদ্বীপ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন এই চৌধুরী মহাশয় সেই চেষ্টার ভিতরে ছিলেন। অতএব তিনি অনেকদিন হইতেই বৈষ্ণব সমাজের একাংশে পরিচিত এবং সাধুসঙ্গও করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার মত নিম্নে পুনর্মুদ্রিত হইল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ।

বিশ্বভারতীয় বৈষ্ণব সমাজে গৌড়ীয় সম্প্রদায় আকারে সকলেই স্বীকার করিবেন ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র হইলেও ইহা যেমন পূর্ণতমরূপে ভগবদ্ভজনের উপযোগী, কোনও সম্প্রদায়ই তদ্রূপ সমর্থ নহে। ইহা আমার সম্প্রদায়-পোষক প্রশস্তি নহে, যিনিই তটস্থ হইয়া ধীরতার সহিত বিচার করিবেন, তাঁহাকেই এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আজ এ হেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রাঙ্গণ জঙ্গলাকীর্ণ, গৃহদ্বার আবর্জ্জনাময় এবং গৃহ ছিদ্রপূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং তৎসংশোধনের চেষ্টাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

অধ্যাত্মবাদ কিম্বা অদ্বৈতবাদ মতাবলম্বীদের সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবার নাই। তাঁহাদের ভজনপ্রণালী সম্পূর্ণ অন্যরূপ এবং ভগবত্তত্ত্বও তাঁহারা অন্য প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, উহা আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। বর্ত্তমানে ভারতীয় "হিন্দু" সম্প্রদায়ের পঞ্চোপাসকগণ সকলেই প্রকারান্তরে অদ্বৈতবাদ মতাবলম্বী। বৌদ্ধমত নিরসন করিয়া কতক বিচার দ্বারা এবং কতক রাজকীয় সাহায্যে, শক্তিপ্রয়োগে আচার্য্য শঙ্করস্বামী ভারতভূমে পুনরায় নামতঃ বৈদিক ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রচারিত বেদান্তের শারীরিক ভাষ্যের ছায়ায় বাস্তবরূপে বৌদ্ধমতই প্রচ্ছন্নরূপে শাক্ত, সৌর, শৈব, গাণপত্য এবং বৈষ্ণব—এই পঞ্চভাবে এই পঞ্চোপসনার আবরণে সমাজে অহংগ্রহ উপাসনাই চলিতেছিল এবং এখনও তাহাই চলিতেছে। ব্রহ্মের "রূপ কল্পনা" করিয়া আত্মচিন্তা দ্বারা আত্মার পরম নির্ব্বাণ লাভই এই মতের চরম সাধন।

আচার্য্য স্বামীর অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীরামানুজস্বামী প্রভৃতি ৪জন বৈষ্ণবগুরু ক্রমে আবির্ভূত হন। তাঁহারাও আচার্য্য প্রকটিত "দশনামী" সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্তই ছিলেন কিন্তু পঞ্চোপসনার প্রণালীতে করুণাময় ভগবানকে পাইবার কোন পন্থা নাই দেখিয়া অধীর হইলেন এবং করুণাময় ভগবানেরই

করুণায় ভক্তির আলোকে তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব দেখিতে পাইয়া তাঁহারা পঞ্চোপাসকগণ হইতে পৃথক্ হইয়া ভক্তিমার্গের প্রচার করিলেন। তদানীন্তন বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যাঁহারা এই নবপ্রাপ্ত ভক্তিমার্গের মাধুর্য্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না, তাঁহারা আচার্য্য প্রতিষ্ঠিত পঞ্চোপাসকগণ মধ্যেই রহিয়া গেলেন। এই পঞ্চোপাসকেরাই বর্ত্তমানে শাক্ত, সৌর, শৈব, গাণপত্য এবং বৈষ্ণবমত মণ্ডিত তথাকথিত 'হিন্দুসমাজ' এবং বর্ণিত পঞ্চমতের কোনও মতাবলম্বী হইয়া অহংগ্রহ উপাসনা দ্বারা 'নির্ব্বাণ' লাভই তাঁহাদের চরম লক্ষ্য।

অন্যদিকে শ্রীরামানুজ স্বামী, মধ্বাচার্য্য, নিম্বাদিত্য এবং বিষ্ণুস্বামী এই চারিজন আচার্য্য স্ব স্ব মতানুসারে ভক্তিমার্গকে চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া ভগবদ্ভজন প্রচার দ্বারা সাত্বত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন এবং কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের সম্পূর্ণ অতীত সেবাসহ ভগবদুপাসনার প্রণালী স্থাপন করিয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত শারীরিক ভাষ্যের মত খণ্ডনপূর্ব্বক শুদ্ধা ভক্তি মতানুযায়ী বেদান্তের চারিটি ভাষ্য রচনা করেন। তদনুসারে তাঁহাদের অনুগত এবং সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ ভক্তিমার্গে ভগবানে চির উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া পঞ্চায়নী হিন্দুমত হইতে পৃথকভাবে ভগবদ্ভজন দ্বারা দ্বৈতবাদ অবলম্বন করিলেন। তদবধি এই সাত্বত মতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ দ্বৈতবাদী এবং "সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া ভগবদ্দাসরূপে চিহ্নিত হইয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অবয়ব পরিষ্কাররূপে দেখাইবার জন্য আমাকে গতবারে অতগুলি কথা বলিতে হইল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ উপরে বর্ণিত "সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব" সমাজের অন্তর্গত। মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী এই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মূল। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার সতীর্থ শ্রীলক্ষ্মীপতি গোস্বামী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান মাত্র করেন, কিন্তু লোকশিক্ষার জন্য শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীই (লক্ষ্মীপতির শিষ্য) তাঁহাকে ভজন উপদেশ করেন সুতরাং তিনি তাঁহার উপদেষ্টা বা শিক্ষাগুরু। শ্রীসীতানাথ অদ্বৈতপ্রভু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট হইতে স্বয়ংই দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীপাদ পুরী গোস্বামীর অন্যতম প্রিয় শিষ্য শ্রীল ঈশ্বর পুরী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্ত্রদাতা। এই পর্য্যায়ে আমরা দেখিতে পাই, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আদিগুরু। যে অকৈতব প্রেমসম্পত্তি তাঁহাতে গূঢ়রূপে নিহিত ছিল, সেই "অনর্পিতচরী" (অর্থাৎ সৃষ্টির কোন কালে যাহা জীবে অর্পিত হয় নাই) শ্রীকৃষ্ণপ্রেম শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং আস্বাদন করিয়া ভাগ্যবান্ জীবকে যোগ্যতা অনুসারে বণ্টন করিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর। সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে ইহা অবিচার্য্য নিরাকরণ Non-controversial Point বটে।

এখানে এই প্রশ্ন হওয়া খুব স্বাভাবিক যে

ভগবত্তত্ত্ব আলোচনা কিরূপ ব্যাপার। সিদ্ধান্তশিরোমণি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থকার ঐ শ্রীগ্রন্থের আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে ইহার অতি চমৎকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "আমার মাধুর্য্য এমন কি অমৃতময় মধুর যাহার জন্য শ্রীরাধিকা সর্ব্বত্যাগিনী—আর উহা আস্বাদনেই বা তাঁহার কি সুখ হয়? শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর হইলেও তাঁহার নিজমাধুর্য্য কিরূপ অতুলনীয় তাহা বুঝিতে উৎসুক হইলেন এবং সেই মাধুর্য্য আস্বাদনে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী যে সুখ পান, তাহা পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন, কিন্তু শ্রীরাধিকা না হইতে পারিলে উহা আস্বাদন সম্ভবপর নহে, এ হেতু শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ কলিতে শ্রীরাধিকা হইয়া নিজ রস আস্বাদনের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন। এই শুভ যোগে যুগাবতারেরও আবির্ভাব সময় উপস্থিত হইল আর পীতবর্ণ-ধারী বরাঙ্গ কলিযুগস্বামী ছন্নরূপে একদেহে শ্রীশচীনন্দন সঙ্গে রহিয়া ষট্‌ত্রিংশ বৎসরকাল পর্য্যন্ত ভারত ক্ষেত্রের আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য সমগ্র প্রদেশে প্রধানতঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রসঙ্গে নাম প্রেম প্রচার দ্বারা কলিহত জীবকে মৃত্যু হইতে অমৃতে রক্ষা করিয়া অবতার প্রয়োজন সমাধান করতঃ কলিশেষ পর্য্যন্ত যুগপতিরূপে অবস্থান করার জন্য সংগোপন রহিলেন। আর চুরি করিয়া রাধিকা হইয়া নিজ রস আস্বাদনের জন্য আসিয়াছিলেন সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান্ নিজের অংশাবতারকে স্বকার্য্য সাধনে অবসর দিয়া এতাবৎকাল যিনি চুপটি করিয়া বসিয়া ছিলেন, সেই রসিকেন্দ্রশিরোমণি শ্রীনীলাচলে সিন্ধুকূলে নিজজন সঙ্গে গম্ভীরায় থাকিয়া মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার ভাবে স্বতঃ শ্রীরাধিকা হইয়াই দ্বাদশ বর্ষকাল পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্নরূপে সেই রস আস্বাদন করিয়া এবং করাইয়া সেই ব্রজের অচিন্তনীয় গূঢ় প্রেমিক ব্রজপথে অপ্রকট হইলেন। যাইবার পূর্ব্বে সৃষ্টিকাল অবধি যাহা কখনও জীবে অর্পিত হয় নাই—তাঁহার সেই সমুন্নত উজ্জ্বল রসান্বিতা নিজ-ভক্তি আকাঙ্ক্ষিত জীবকে করুণা করিয়া মুক্তরূপে দান করিয়া গিয়াছেন। ইহাই আমাদের revealed religionএর ভজন মুদ্রা (আমি "ধর্ম্ম" বলিতে প্রস্তুত নহি) কোনও দেশে নাই বা কোনও সম্প্রদায়ে নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরণে ঐকান্তিকরূপে যাঁহার আত্মসমর্পণ ঘটিয়াছে, তাঁহারই ভাগ্যে এ দুর্ল্লভ বস্তু ঘটে অন্যের নহে। ভগবৎ প্রেমিক Cardinal Newman আত্মার সহিত ভগবৎতত্ত্ব বিচার করিতে করিতে অধীর হইয়া একস্থানে লিখিয়াছেন all souls are women তারপর যখন একেবারে বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন একেবারে বলিয়া ফেলিয়াছেন 'আহা! দাম্পত্য প্রেম অপেক্ষা প্রেমের আর উচ্চতর সুমধুর দৃষ্টান্ত নাই, যদি থাকিত তবে ভগবান্ এবং জীবের মধ্যে সেই প্রেম বলিতাম।" প্রেমান্ধ আবার হতভাগ্য নিউম্যান! এ প্রেমের দেশে জন্মিলে বোধ হয় তোমার এ আকাঙ্ক্ষিত ভগবৎ প্রেমের পিপাসা মিটিত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমসমুদ্র মন্থন করিয়া যে প্রেমামৃত শ্রীরূপে ...

রায় প্রভৃতি নিজজনকে দিলেন, মহাজনগণ তাহার এই নির্য্যাস অবধারণ করিয়াছেন—শ্রীবৃন্দাবন-বিহারী যুগলকিশোর শ্রীরাধাগোবিন্দই একমাত্র আরাধ্য, আর শ্রীব্রজকিশোরীগণের প্রতিষ্ঠিত মধুর রসাশ্রয়ে ভজন ব্যতীত ঐ যুগলের আরাধনা অন্যরূপে হইতে পারে না। এ বিষয়ের প্রমাণ শ্রীভাগবৎ শাস্ত্র। প্রেমে এ ভজন আরম্ভ, প্রেমই এ ভজনের ফল। স্বর্গভোগ বা মুক্তির কোন কথা ইহাতে নাই বা যাহারা এ ভজন চায় তাহারা উহা জানে না এবং চাহেও না। ছুট কথায় নারী হইয়া সম্বন্ধ বাঁধিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে "পীরিত"ই এ পথের ভজন। অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতানুবর্ত্তী গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ভজন বা "ধর্ম্ম"। যদি তাহাই হইল, তবে আজ নূতন নূতন নবমত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে প্রবেশ করাইয়া বা সৃষ্টি করিয়া এ হেন উচ্চাধিকার সম্পন্ন সম্প্রদায়টিকে হাস্যাস্পদ করিবার ও পঙ্কিল করিবার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রচেতার মতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইতেছেন। বিশেষ তাঁহারা আচার্য্য স্থানীয় হইলে ন্যায় রক্ষার ত্রুটী করিয়া আরও দায়ী হইতেছেন। বড় দুঃখে এই কথা বলিয়া ফেলিয়াছি কাহারও শ্রীচরণে অপরাধ হইয়া থাকিলে ক্ষমা করিবেন।

প্রবন্ধারম্ভেই আমি নিবেদন করিয়াছি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের গৃহ ছিদ্রপূর্ণ, গৃহদ্বার অবর্জ্জনাময় এবং প্রাঙ্গণ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়াছে, সর্ব্বাগ্রে তাহারই সংশোধন প্রয়োজন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামের দোহাই দিয়া বিকৃত ভজন প্রচলনের চেষ্টাই আমি গৃহে ছিদ্র করা বলিতে চাই। "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধসঃ।" যাঁহার যুগ প্রবর্ত্তিত ভজন, এহেন করুণার অবতারকে "নাগর" সাজাইবার চেষ্টা কেন? এরূপ চেষ্টা একালে হইবে জানিয়াই বোধ হয় ত্রিকালজ্ঞ ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়া রাখিয়াছেন—"অতএব গৌরাঙ্গ নাগর না বলে বিজ্ঞজন।"

মির্জাপুরের "দাদা মা" কিম্বা রমণপুরের "স্বামীজী" প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতবিরোধী ভজন প্রচার করিলে কোনও ক্ষতি হয় না, কিন্তু আমার মাথার মণি আচার্য্য সন্তান বা মহান্ত সন্তানগণ যদি ঐরূপ মতের পোষণ করেন, তবে বড়ই কষ্টের কথা। দয়ানন্দী, ভারতী, পরমহংসী প্রভৃতি উপপাষণ্ডগণে আজ ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্র পূর্ণ হইয়াছে, তাহাতে আমাদের ভাবিবার কিছু নাই বরং নানারূপ রঙ্গিণ আলখেল্লা দেখিয়া একটুক আমোদ উপভোগ করা যায়। কিন্তু এ যে আমার নিজের গৃহদ্বার ও প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত আবর্জ্জনা ও জঙ্গলে ভরিয়া গেল! আজ ঘরে ঘরে অবতার আরম্ভ হইয়াছে। কৃপা করিয়া ইঁহারা যদি মহাপ্রভুর নামের দোহাইটা না দিতেন, তবেই আর কোনও আপত্তি ছিল না। এখন আর শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে সেই অপূর্ব্ব মধুর ভজন নাই, গুরুকে কৃষ্ণ সাজান হইতেছে, কোনও কোনও স্থানে বা ততোধিকও হইতেছে—ভুঁইফোঁর হঠাৎ অবতার কোনও স্থানে জাহের হইয়া আদেশ করিতেছেন—"এই ত্যাখ! তোরা যে হরিনাম করিস্ ওটা কিছুই নয়, এইটি খাঁটি প্রেমের

ধরণে" বলিয়া "ডহচকরাজ" প্রভৃতি অভূতপূর্ব্ব "হরিনাম" দ্বারা দেশময় তরঙ্গায়িত করিতেছেন। আর একদল বৈষ্ণব সাহিত্যিক, ইহারাও "শোন আমার দাদা শ্যামদাসের জীবনী" এবং "গুরু কালীদাসের অদ্ভুত চরিত" ইত্যাদি বিষয় সকল সাময়িক কাগজে লিখিয়া বা বই ছাপিয়া গোধের উপর বিষফোঁড়া বাড়াইতেছেন। এ সমস্তেরও সমূলে উৎপাটন এবং দূরীকরণও প্রয়োজন।

কিন্তু কার কথা শোনে কে? প্রভুপাদগণ নীরব বা শক্তিহীন। শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ, শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ রাধাবিনোদ অথবা তথা শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী প্রভু ইঁহাদের একজন উঠিয়া লাগিলেই সমস্ত আবর্জ্জনা দূর হয়, তিনজনের ত কথাই নাই। আমি প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছি, নতুবা ঘরে ঘরে যাইয়া সকলের চরণে ধরিয়া আমার প্রার্থনা জানাইতাম। তবে একটি প্রস্তাব আমি করিতে চাই, যে কোনও একটি স্থান ও সময় নির্দ্দেশ হউক। গৌড়ীয়সমাজের দোহাই দেন, অথচ বিভিন্ন মতের, এরূপ সকলেই সেখানে আহূত হউন এবং তাঁহারা নিজ নিজ মতের নেতাগণকে সেখানে প্রেরণ করুন, নিজ ব্যয়ে ও নিজ বন্দোবস্তে সেখানে সমাগত হইয়া বিচার দ্বারা এ গণ্ডগোলের মীমাংসা করুন। যদি সামঞ্জস্য সম্ভব হয় উত্তম। সকলেই প্রভুর পাদপদ্মে মতি রাখিয়া নিজ নিজ ভজন করিব। আর তাহা হইতে না পারিলে হয় তাঁহারাই "গৌড়ীয় সম্প্রদায়" নাম ত্যাগ করিবেন নতুবা আমরাই বাহির হইয়া যাইয়া "গৌর" বলিয়া কাঁদিয়া বেড়াইব তবু এ ঝক্‌মারির দলে থাকিব না। এই আমার প্রস্তাব এবং প্রার্থনা।

এ সম্বন্ধে কেহ কোন অভিমত বা প্রতিবাদ "পল্লীবাসীতে" প্রেরণ করিলে সম্পাদক মহাশয় যদি আমাকে অনুমতি করেন তবে আমার যথোচিত বক্তব্য আবার নিবেদন করিব।

শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয়ের এই প্রবন্ধগুলিরও প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে। শ্রীহরিনারায়ণ সেন এম, এ, মহাশয় রায় বাহাদুরের পক্ষাবলম্বন করিয়া একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন—

"তারপর শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের নামে প্রচলিত—অলসে অরুণ আঁখি, কহ গৌর একি দেখি" প্রভৃতি পদটি লইয়া দুই এক কথা নিবেদন করিব। শ্রীলোচন দাস ঠাকুরকে একদল লোক শ্রীগৌরাঙ্গের নাগরালীর প্রচারক মনে করেন এবং সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সময়ে সময়ে পদাদি রচনা করিয়া লোচন দাস ঠাকুরের স্কন্ধে চাপাইয়া দেন। যেমন সহজিয়ারা শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের নামে অনেক বই চালায়। লোচনের নামে যে ধামালিগুলি চলিত আছে, তাহা দেখিলেই মনে হয় যে উহা কোন বাউলের রচিত—শ্রীচৈতন্য মঙ্গলের লেখক ঐরূপ ইতর ভাষায় ওরূপ অশ্লীল কথা লিখিতে পারিতেন না।" তাহার পর শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে বর্ণিত শ্রীগৌরাঙ্গের বাসরঘরের বর্ণনা হইতে লেখক দেখাইয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্রের কিরূপ অসাধারণ দৃঢ়তা ছিল। পদকল্পতরুতে শ্রীল গোবিন্দদাসের একটি পদ আছে—

শচীর কোঙর গৌরাঙ্গসুন্দর দেখিনু আঁখির কোণে

এই পদটির টীকায় শ্রীরাধামোহন ঠাকুর মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, লেখক তৎপ্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন।

আমরা এবার একদিক মাত্র দেখাইলাম। বারান্তরে অপরদিক্ প্রদর্শিত হইবে। যাঁহারা স্বাধীনচিত্তে ও নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিবেন, ইহা তাঁহাদেরই জন্য।

বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মত

(১) বর্ণাশ্রম ও অস্পৃশ্যতা এই দুইটী এক বস্তু নহে। দুইটীর সুস্পষ্ট প্রভেদ বিদ্যমান।

(২) বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিজ্ঞানমূলক ও যুক্তিসম্মত। অস্পৃশ্যতা বিজ্ঞানসম্মত বা যুক্তিসঙ্গত নহে।

(৩) জন্মভেদ ও কর্ম্মভেদের উপর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব্যবস্থিত, এইজন্য উহা সমাজের মঙ্গলজনক।

(৪) বর্ণভেদের মধ্যে ঘৃণা বা বিদ্বেষের কোনও ভাব নাই। কর্ত্তব্য লইয়াই কর্ম্মভেদ। জন্মানুসারেই কর্ত্তব্যভেদ হইয়া থাকে এবং কর্ত্তব্যভেদই বর্ণভেদের নিয়ামক।

(৫) শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের মত সদাচারপরায়ণ ও গুণবান হয়, তবে পরজন্মে সে ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ অসদাচারী হইলে সে পরজন্মে নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিবে।

(৬) বর্ত্তমান জন্মেই একবর্ণ হইতে অন্যবর্ণে উন্নতির ব্যবস্থা হইলে অনেকস্থলে যথেচ্ছাচার ও প্রবঞ্চনা অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে এবং উহার ফলে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

(৭) ইহলৌকিক স্বার্থ সংসাধনের জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিহিত হয় নাই। ধর্ম্মোদ্দেশ্যেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব্যবস্থিত হইয়াছে।

(৮) পঞ্চমবর্ণ বলিয়া স্বতন্ত্র কোনও বর্ণ আছে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। মান্দ্রাজে যাহারা পঞ্চমবর্ণ বলিয়া অভিহিত, তাহারা বাস্তবিকই শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত এবং তাহাদিগকে শূদ্রবর্ণের সমস্ত অধিকার দেওয়া সঙ্গত।

(৯) মনুষ্যহিসাবে একজনের সহিত আর একজনের বস্তুতঃ কোনও প্রভেদ নাই, কিন্তু গুণহিসাবে একশ্রেণীর সহিত আর একশ্রেণীর প্রভেদ আছে। ব্রাহ্মণও পারিয়ার মধ্যে এরূপ প্রভেদ বর্ত্তমান।

(১০) বর্ণাশ্রম ও অস্পৃশ্যতার প্রভেদ যাঁহারা বুঝিতে না পারিয়া অস্পৃশ্যতার উপর আক্রমণ করিতে যাইয়া বর্ণাশ্রমের উপর আক্রমণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রধান পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইতেছেন।"

জগন্নাথবল্লভে শ্রীরাধা

২ বর্ণাশ্রম ও শ্রীগৌরাঙ্গ
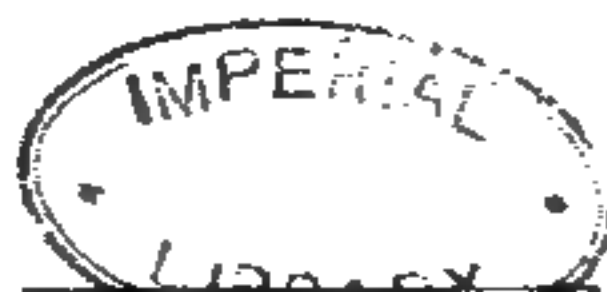
৩ অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী

৪ বিবিধ

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

জগন্নাথবল্লভ নাটকে শ্রীরাধা

১। রসিক ভক্ত শ্রীরামানন্দ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচল হইতে দক্ষিণদেশে যাইতেছেন, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহাকে একটি বিশেষ কথা বলিয়া দিলেন।

তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে। অবশ্য করিবে মোর এই নিবেদনে॥
রায় রামানন্দ আছে গোদাবরী তীরে। অধিকারী হয়েন তিনি বিদ্যানগরে॥
শূদ্রবিষয়িজ্ঞানে তারে উপেক্ষা না করিবে। আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহো একজন। পৃথিবীতে রসিকভক্ত নাহি তাঁর সম॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস—দোঁহার তেঁহো সীমা। সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা॥
অলৌকিক বাক্যচেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া। পরিহাস করিয়াছি 'বৈষ্ণব' বলিয়া॥
তোমার প্রসাদে এবে জানিল তাঁর তত্ত্ব। সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ত্ব॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের কথা অঙ্গীকার করিলেন। কিছুদিন পরে রায় রামানন্দের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মিলন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গোদাবরী নদী পার হইয়া স্নান করিলেন। তাহার পর—

ঘাট ছাড়ি কথোদূরে জলসন্নিধানে। বসি প্রভু করে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনে॥
হেনকালে দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়। স্নান করিবারে আইলা বাজনা বাজায়॥
তাঁর সঙ্গে আইলা বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ। বিধিমত কৈল তেঁহো স্নানতর্পণ॥

মহাপ্রভু বুঝিলেন, ইনিই রামানন্দ রায়। তাঁহার ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া রামানন্দের নিকট যান। কিন্তু তাহা করিলেন না, ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। রায় রামানন্দ দেখিলেন, অদূরে এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী বসিয়া রহিয়াছেন।

সূর্য্যশতসমকান্তি-অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ—কমললোচন॥

রায় রামানন্দ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভু একবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমিই কি রামানন্দ রায়? রামানন্দ বলিলেন,—আমিই সেই মন্দবুদ্ধি দাস, শূদ্র।

তবে প্রভু কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু ভৃত্য দোঁহে অচেতন॥
স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।
দোঁহা আলিঙ্গিয়া দোঁহে ভূমিতে পড়িলা॥
স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈবর্ণ্য।
দোঁহার মুখেতে শুনি গদ্‌গদ কৃষ্ণবর্ণ॥

এই অদ্ভুত দৃশ্যে উপস্থিত সকলেই চমৎকৃত। বৈদিক ব্রাহ্মণেরা বিচার করিতেছেন—

এই ত সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম।
শূদ্র আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন॥
এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভীর।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির॥

বহিরঙ্গ লোক দেখিয়া মহাপ্রভু ভাব সম্বরণ করিলেন। সুস্থ হইয়া উভয়ে নিজ নিজ স্থানে বসিলেন। মহাপ্রভু হাস্যমুখে রামানন্দকে বলিলেন—সার্ব্বভৌম আমাকে তোমার গুণ বলিয়া দিয়াছেন, তোমার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। সুখের বিষয়, সহজেই তোমার দর্শন পাইলাম।

রামানন্দ বলিলেন—সার্ব্বভৌম আমাকে ভৃত্যের ন্যায় জ্ঞান করেন। সার্ব্বভৌমের উপর আপনার অশেষ কৃপা। তাঁহার কৃপায় আপনার চরণদর্শন হইল, আমার মনুষ্যজন্ম আজ সফল হইল। সার্ব্বভৌমের প্রেমের অধীন হইয়া আপনি অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিলেন।

কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম॥
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদভয়।
মোর দরশন তোমা—বেদে নিষেধয়॥
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম্ম।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি—কে জানে তোমার মর্ম্ম॥
আমা নিস্তারিতে তোমার ইহাঁ আগমন।
পরম দয়ালু তুমি পতিতপাবন॥
মহান্তস্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজকার্য্য নাই তবু যান তার ঘর॥

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ॥

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন। তোমার দর্শনে সভার দ্রবীভূত মন ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম শুনি সভার বদনে। সভার অঙ্গ পুলকিত—অশ্রু নয়নে ॥
আকৃতে প্রকৃতে তোমার ঈশ্বর-লক্ষণ। জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ ॥
প্রভু কহে—তুমি মহাভাগবতোত্তম। তোমার দর্শনে সভার দ্রব হইল মন ॥
আনের কা কথা—আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী। আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি ॥
এই জানি কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে। সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে ॥
এইমত দোঁহে স্তুতি করে দোঁহার গুণ। দোঁহে দোঁহা দরশনে আনন্দিত মন ॥

এই সময়ে এক বৈষ্ণবমতাবলম্বী ব্রাহ্মণ, শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে বৈষ্ণব জানিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। রায় রামানন্দের মুখে কৃষ্ণকথা শুনিবেন, ইহাই মহাপ্রভুর ইচ্ছা। রায় রামানন্দ তাঁহাকে পাঁচ সাত দিন সেখানে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, মহাপ্রভু সম্মত হইলেন।

তাহার পর নিভৃতে রায় রামানন্দের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মিলন ও তত্ত্বকথার আলোচনা। আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়—মহাপ্রভু বলিলেন, রায়, এমন একটি শ্লোক বল যাহাতে 'সাধ্যের নির্ণয়' হইবে। মানুষের কি চাই, আর কি করিয়াই বা তাহা হইবে, শাস্ত্রীয় একটি শ্লোকের দ্বারা তাহাই বল। রামানন্দ রায় বিষ্ণুপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিলেন—

১। স্বধর্ম্মাচরণে অর্থাৎ বর্ণাশ্রমবিহিত আচরণের দ্বারা বিষ্ণুভক্তি হয়।

মহাপ্রভু বলিলেন—তুমি বাহিরের কথা বলিতেছ। রামানন্দ রায় গীতার শ্লোক পড়িয়া বলিলেন

২। কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্যসার।

মহাপ্রভু বলিলেন—ইহাও বাহ্য। রায় শ্রীমদ্ভাগবতের এক শ্লোক ও গীতার এক শ্লোক পড়িয়া বলিলেন—

৩। স্বধর্ম্মত্যাগ, এই সাধ্যসার।

মহাপ্রভু বলিলেন—ইহাও বাহ্য। রায় রামানন্দ গীতার আর একটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বলিলেন—

৪। জ্ঞানমিশ্রাভক্তি সাধ্যসার।

মহাপ্রভু বলিলেন—ইহাও বাহ্য। ইহার পরে কি তাহাই বল। রামানন্দ রায় বলিলেন—

৫। জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্যসার।

এবারে রামানন্দ শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক পড়িলেন।

মহাপ্রভু এইবার বলিলেন—ইহা হয়; কিন্তু আরও অগ্রসর হও, আরও পরের কথা বল। রামানন্দ রায় বলিলেন—

৬। প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার।

পদ্যাবলীর দুইটি শ্লোক এবার তিনি আবৃত্তি করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন —ইহা হয়, আরও আগের কথা বল। রায় বলিলেন—

৭। দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।

এবারে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক ও যামুন মুনি বিরচিত একটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—ইহা উত্তম, আরও আগের কথা বল। রায় বলিলেন—

৮। সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।

এবারে রামানন্দ রায় মহাশয়, শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন, ইহাও উত্তম, তবে আরও আগের কথা বল। রায় রামানন্দ বলিলেন—

৯। বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।

এই বলিয়া তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন—ইহাও উত্তম, কিন্তু আরও আগের কথা বল। রায় রামানন্দ বলিলেন—

১০। কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।

এবারেও রামানন্দ রায় মহাশয়, শ্রীমদ্ভাগবতের দুইটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। পূর্ব্বে যে কথাগুলি বলিলেন, তাহাই ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য রামানন্দ রায় মহাশয় বলিলেন—

কৃষ্ণপ্রাপ্তের উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তের তারতম্য বহুত আছয়॥

তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তর তম॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে। আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের রস মধুরেতে বৈসে ॥ দুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥

উদ্ধৃত অংশের অর্থ এই। আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ বলিয়াছেন—আকাশ, বাতাস, আগুন, জল, পৃথিবী—এই পঞ্চভূত। ইহাদের ভিতর আকাশের গুণ এক, কেবল শব্দ; বাতাসের গুণ দুই, শব্দ, স্পর্শ; আগুনের গুণ তিন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ; জলের গুণ চার, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস; পৃথিবীর গুণ পাঁচ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ।

আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে। দুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥

এই দুই চরণ কবিতার ইহাই অর্থ। এই সিদ্ধান্তটি উদাহরণ স্বরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। রামানন্দ রায় মহাশয় বলিতেছেন—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তাভাব, এই পঞ্চভাব; ইহার দ্বারা রসরূপী শ্রীভগবান্ আস্বাদিত হইয়া থাকেন। এই যে পঞ্চরস বা পঞ্চ প্রকারের আস্বাদন, ইহার মধ্যে কান্তাভাবের আস্বাদনই সর্ব্বাপেক্ষা নিবিড় ও গভীর, ইহাতে স্বাদেরও আধিক্য, গুণেরও আধিক্য। পৃথিবীতে যেমন আকাশ, বাতাস, আগুন ও জল এই চারিভূতের গুণ আছে, তাহা ছাড়া পৃথিবীর নিজের গুণ অর্থাৎ গন্ধ আছে, সেইরূপ কান্তাভাবের আস্বাদনে বা মধুর রসে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য এই চারি রসের গুণ ও স্বাদ আছে, তাহা ছাড়া মধুরের নিজের গুণ ও স্বাদ আছে। আবার বাৎসল্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য এই তিন রসের গুণ ও স্বাদ আছে, তাহা ছাড়া বাৎসল্যের নিজের গুণ ও স্বাদ আছে। সখ্যে, শান্ত ও দাস্যের গুণ ও স্বাদ ছাড়া তাহার নিজের গুণ ও স্বাদ আছে। দাস্যে, শান্তের গুণ ও স্বাদ ছাড়া তাহার নিজের গুণ ও স্বাদ আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে স্থানান্তরে ইহার বিশদ বর্ণনা আছে। সেই বর্ণনার ভাবার্থ এইরূপ—

ক। শান্ত—নিষ্ঠাময়

খ। দাস্য—সেবা ও নিষ্ঠাময়

গ। সখ্য—বিশ্বাস, সেবা ও নিষ্ঠাময়

ঘ। বাৎসল্য—মমতা, বিশ্বাস, সেবা ও নিষ্ঠাময়

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্য স্থানের বর্ণনা এইরূপ—

কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ, শান্তের দুই গুণ।
পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, কৃষ্ণে জ্ঞান প্রবীণ॥
কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্ত রসে।
পুর্ণৈশ্চর্য্য, প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥
ঈশ্বর জ্ঞান সম্ভ্রমে গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন।
অতএব দাস্য রসের এই দুই গুণ॥
শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়।
দাস্যের সম্ভ্রম গৌরব সেবা সখ্যে বিশ্বাসময়॥
কাঁধে চড়ে কাঁধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ।
কৃষ্ণে সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥
বিশ্রম্ভ প্রধান সখ্য গৌরব সম্ভ্রমহীন।
অতএব সখ্য রসের তিনগুণ চিহ্ন॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্য রসে বশ ভগবান॥
বাৎসল্যে শান্তের নিষ্ঠা দাস্যের সেবন।
সেই সেবনের ইহ নাম যে পালন॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার।
মমতা আধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার॥
আপনাকে 'পালক'জ্ঞান, কৃষ্ণে 'পাল্য'জ্ঞান।
চারিরসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥
সে অমৃতানন্দে ভক্তসহ ডুবেন আপনে।
'কৃষ্ণ ভক্তবশ' গুণ কহে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানিগণে॥
মধুর সে কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চ গুণ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥
এই ভক্তিরসের কৈল দিগ্‌দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধুপারে॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, বারাণসী ধামে শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয়কে যে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় ১৯শ পরিচ্ছেদে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিরচিত হইয়াছে।

প্রাচীন ও সম্মানিত শ্রীগ্রন্থ হইতে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, রায় রামানন্দের স্থান গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে অতিশয় উচ্চ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে গভীর উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রচার করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার অনেক ব্যাপারই রায় রামানন্দ পূর্ব্ব হইতে অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা এতই উচ্চ এবং এতই গভীর যে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায়

ভৌম এক অভিনব চিন্ময় জগতের পরিচয় লাভ করিয়া যখন ধন্য হইলেন, তখন তিনি সুস্পষ্টরূপে বুঝিলেন, রায় রামানন্দের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা খুবই সত্য এবং খুবই মহৎ। সেই জন্যই তিনি বিশেষ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন, যেন তিনি অবশ্য অবশ্য রায় রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইহা হইতেই, রায় রামানন্দের মহত্ব প্রমাণিত হইতেছে।

রায় রামানন্দের সাধনপথ রহস্যময় ও নূতন রকমের। সেযুগেও অনেকে তাহা বুঝিতেন না, এযুগেও অনেকে বুঝিতে পারেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুমোদনের প্রমাণ না থাকিলে, রায় রামানন্দের সাধন আমাদের নিকট একেবারেই প্রহেলিকা হইয়া থাকিত।

২। প্রদ্যুম্ন মিশ্র ও রায় রামানন্দ

প্রদ্যুম্ন মিশ্র একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিলেন, আমি অধম গৃহস্থ, বহুভাগে। আপনার চরণের আশ্রয় পাইয়াছি। আমার শ্রীকৃষ্ণকথা শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে, আপনি দয়া করিয়া নিজগুণে আমার ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

মহাপ্রভু বলিলেন, আমি কৃষ্ণকথা জানি না, রায় রামানন্দের নিকট আমি কৃষ্ণ-কথা শুনিয়া থাকি। তোমার সৌভাগ্য, তাই কৃষ্ণকথা শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে; তুমি রামানন্দ রায়ের নিকট যাও, তাঁহার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিয়া কৃতার্থ হইবে।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র রামানন্দ রায়ের নিকট গেলেন। রামানন্দ রায়ের একজন সেবক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। রামানন্দ কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত। বিলম্ব দেখিয়া প্রদ্যুম্ন মিশ্র ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভৃত্য উত্তর করিল—দুইটি কিশোরী পরম সুন্দরী দেবদাসী আছে, তাহারা নৃত্যগীতে অতিশয় নিপুণ। রায় মহাশয় তাহাদিগকে নিজ নাটকের গীত ও অভিনয় শিখাইতেছেন। আপনি বসুন, শীঘ্রই তিনি আসিবেন।

কিছুক্ষণ পরে রামানন্দ রায় ফিরিয়া আসিয়া প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিলেন, নিজের বিলম্বের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। সেদিন আর কৃষ্ণ-কথা হইল না, প্রদ্যুম্ন মিশ্রের মনেও রামানন্দ রায় সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ হইল। ইহার পর প্রদ্যুম্ন মিশ্র একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট রায় রামানন্দের কথা বলিলেন। প্রদ্যুম্ন

আমি ত সন্ন্যাসী, আপনা বিরক্ত করি মানি।
দর্শন রহু দূরে, প্রকৃতির নাম যদি শুনি ॥
তবহি বিকার পায় আমার তনুমন ॥
প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন ॥
রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্ব্বজন।
কহিবার কথা নহে আশ্চর্য্য কথন ॥
একে দেবদাসী আরে সুন্দরী তরুণী।
তার সব অঙ্গসেবা করেন আপনি ॥
স্নানাদি করায় পরায় বাস-বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গের হয় তাঁহা দর্শন স্পর্শন ॥
তভু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানাভাবোদ্গার তারে করায় শিক্ষণ ॥
নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ পাষাণ সম।
আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে নির্ব্বিকার মন ॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার ॥
তাঁহার মনের ভাব তেঁহো জানে মাত্র।
তাহা জানিবারে দ্বিতীয় নাহি পাত্র ॥
কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্ট্যা এক করি অনুমান।
শ্রীভাগবত শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ ॥
ব্রজবধূসঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই ইহা কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস ॥
হৃদ্রোগ কাম তার তৎকাল হয় ক্ষয়।
তিনগুণ ক্ষোভ নাহি মহাধীর হয় ॥
উজ্জ্বল মধুর প্রেমভক্তি সেই পায়।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদাই ॥
যে শুনে যে পড়ে তার ফল এতদৃশী।
সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি ॥
তার ফল কি কহিব কহনে না যায়।
নিত্য সিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তার কায় ॥
রাগানুগামার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধ দেহতুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন ॥
আমিহ রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণকথা।
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি পুন যাহ তথা ॥

ইহাই রায় রামানন্দের অধিকার। আমরা যে নাটকখানির আলোচনা করিতেছি, রায় রামানন্দ সেই নাটকের রচয়িতা, সুতরাং অতীব শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে এই নাটকের আলোচনা করিতে হইবে।

৩। প্রথম অঙ্ক।—পূর্ব্বরাগ

জগন্নাথবল্লভ নাটকের অন্য নাম রামানন্দ-সঙ্গীত-নাটক। নাটকখানি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম অঙ্কের নাম পূর্ব্বরাগ।

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শন শ্রবণাদিজা।
তয়ো রুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে ॥

মিলনের পূর্ব্বে দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতির দ্বারা নায়ক ও নায়িকার হৃদয়ে যে উৎকণ্ঠাময়ী

থাকে। সাক্ষাৎ-দর্শন, চিত্রে দর্শন, আর স্বপ্নে দর্শন। শ্রবণ ভাটের মুখে, দূতীর মুখে, সখীর মুখে ও সঙ্গীতাদিতে হইয়া থাকে।

'বিপ্রলম্ভ'-শব্দের অর্থ বিরহ। এই বিপ্রলম্ভ চারি প্রকার। পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ভাব লইয়া বিবিধ প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থে আলোচনা হইয়াছে। আমরা 'ভক্তমাল গ্রন্থ' হইতে পূর্ব্বরাগ-সম্বন্ধীয় কথাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

সঙ্গমের পূর্ব্বে যেই দেখিয়া শুনিয়া।
জনময়ে রাগ লোভ হৃদয়ে পশিয়া॥
সেই পূর্ব্বরাগ তার বিষয় যে শুন।
দর্শন শ্রবণ বহু ভেদ কহি পুন॥
চিত্রপট স্বপ্ন আর সাক্ষাৎ তিন ভাঁতি।
দরশনভেদ পূর্ব্বরাগের উৎপত্তি॥
যমুনার জলে যাইতে কদম্বের তলে।
হেরিয়া নাগর কানু পরাণ বিকলে॥
ঘরে গিয়া সুন্দরী স্তম্ভের ন্যায় রহে।
ধীরে ধীরে নির্জ্জনে সখীরে কিছু কহে॥
যমুনার তীরে সখী কাহারে দেখিনু।
প্রাণ মন দেহ মুঞি সোঁপিয়া আইনু॥
না দেখিলে সখি তারে প্রাণ বাহিরায়।
বুঝি ধর্ম্ম কুলশীল সব নাশ যায়॥
কৃষ্ণের মুরতি চিত্রপটেতে লিখিয়া।
দেখাইলা যবে সখী বিশাখা আনিঞা॥
দেখিয়া মুর্চ্ছিতা রাই হৃদয়ে ধরিয়া।
হাহাকার করি কান্দে ক্ষিতি লোটাইয়া॥
আজু সখি নিশিতে কি স্বপন দেখিনু।
অতি অপরূপ রূপ জলধর তনু॥
অঙ্গে অঙ্গে সখি তার আনন্দ নিছনি।
কিশোর বয়েস একজন কে না জানি॥
তাহারে দেখিতে পুনঃ লালসা জন্মায়।
না দেখিয়া প্রাণ মোর বাহিরিতে চায়॥
বন্দি-স্তুতি দূতীমুখে সখীমুখে আর।
পূর্ব্বরাগে শ্রবণ এই তিন পরকার॥
এ সভার মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণ।
শুনিঞা শ্রীরাধা ধরে ধূলায় লুণ্ঠন॥
পরম আনন্দে রাই পুষ্পের কাননে।
ফুল তুলি তুলি ফিরে সখীগণ সনে॥
হেনকালে বংশীধ্বনি কদম্বকাননে।
হইতে আসিয়া তথা লাগিল শ্রবণে॥
হৃদয় পশিয়া তবে উঠিল তরঙ্গ।
অঙ্গ অবশ হইল উছলি অনঙ্গ॥

ইহাই পূর্ব্বরাগ। জগন্নাথবল্লভ-নাটকের প্রথম অঙ্কে 'পূর্ব্বরাগ', নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সখা রতিকন্দল। (অন্যান্য গ্রন্থে এই সখার নাম মধুমঙ্গল ও কুসুমাসব)। সখাসহ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন।

দ্বাত্রিংশল্লক্ষণৈর্যুক্তো দেবদেবেশ্বরো হরিঃ।
গোপালবালকৈঃ সার্দ্ধং জগাম যমুনাবনং ॥

দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণযুক্ত দেবদেবেশ্বর হরি, গোপবালকসঙ্গে যমুনাতীরবর্ত্তী কাননে গমন করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ—

মৃদুতর-মারুত বেল্লিত-পল্লববল্লী-বলিত-শিখণ্ডং।
তিলকবিড়ম্বিত-মরকতমণিতল-বিম্বিত-শশধরখণ্ডং ॥
যুবতিমনোহরবেশং।
কলয় কলানিধিমিব ধরণীমনু পরিণতরূপবিশেষম্ ॥
খেলাদোলায়িত মণিময়কুণ্ডল রুচিরাননশোভম্।
হেলা-তরলিত মধুর বিলোকন জনিত বধূজন লোভম্ ॥
গজপতিরুদ্রনরাধিপ চেতসি জনয়তু মুদমনিবারম্।
রামানন্দ রায় কবি ভণিতং মধুরিপুরূপমুদারং ॥

যুবতীগণের মনোহারী বেশ ধারণ করিয়া মধুরিপু আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাকে দর্শন কর। শরতের চন্দ্র অপরূপ রূপ ধরিয়া ভূমিতলে উদিত হইয়াছেন। মধুরিপুর মাথার চূড়ায় পল্লবের গুচ্ছ আর ময়ূরের পুচ্ছ; মৃদুল পবনে মন্দ মন্দ কাঁপিতেছে। ললাটে উজ্জ্বল তিলক; মরকতমণিদর্পণে প্রতিবিম্বিত পূর্ণচন্দ্র তাহার নিকট পরাজিত। মণি-কুণ্ডল লীলায় দুলিতেছে, তাহার ছটায় মুখমণ্ডলের শোভা বাড়িয়া যাইতেছে। হেলায় লোচনযুগল মধুররূপে চঞ্চল হওয়ায় গোপবধূগণের লোভ জন্মিতেছে। রামানন্দ রায় কবির বর্ণিত মধুরিপুর এই মধুররূপ প্রতাপরুদ্র মহারাজের চিত্তে সর্ব্বদা আনন্দ বিস্তার করুক।

প্রাচীন বৈষ্ণব কবি লোচন দাস ঠাকুর, রায় রামানন্দরচিত এই সঙ্গীতের অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ এই—

যুবতীমনোহর ওনা বেশ গো।
অবনীমণ্ডলে সখি, চাঁদের উদয় যেন, সুধাময় রূপের বিশেষ গো ॥
চূড়ার উপরে শোভে, নানা ফুলদাম গো, তাহে উড়ে ময়ূরের পাখা।

সঘনে দোলায় কানে, মকর কুণ্ডল গো, কুলবতীর কুল মজাইতে।
উহার নয়নকুসুমশর, মরমে পশিল গো, ধৈরজ ধরিতে নারি চিতে॥
এমন সুন্দর রূপ, কোথা হৈতে এল গো, মনোভব ভুলিল দেখিয়া।
লোচন মজিল সই, ওরূপ সাগরে গো, কিবা সে নাগর বিনোদিয়া॥

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের বনশোভা দর্শন করিয়া আনন্দিত হৃদয়ে রতিকন্দলকে দেখাইতেছেন। বৃন্দাবন পৃথিবীর সার, তাহার শোভার তুলনা নাই। বৃন্দাবনে বাসন্তী শোভা। মলয় পবনে পল্লব সমূহ নাচিতেছে, সখে তাহারা তোমাকে ডাকিতেছে। আর বৃন্দাবন কোকিলের স্বরে তোমাকে নৃত্য করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

নিখিল ভুবনসার বিপিন আমার।
নয়ন ভরিয়া সখা দেখ একবার॥

রতিকন্দল বলিতেছেন, কোকিলের কণ্ঠস্বর মধুর, কিন্তু তোমার বংশীস্বর আরও মধুর। সখে, তুমি বাঁশি বাজাও। শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাইলেন। বাঁশি থামিলে রতিকন্দল নিজের মুখ অতিশয় বিকটাকার করিয়া কিছুক্ষণ চীৎকার করিয়া বলিলেন, সখে আমাদেরই জয়। তোমার বাঁশি শুনিয়া কোকিলেরা পরাজিত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু আমার গলার স্বরে তাহারা সব উড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। অতএব তোমার গর্ব্ব করিবার কিছু নাই।

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, বৃন্দাবনের অশোকপল্লবগুলি কে ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে। কি নিষ্ঠুরতা! অশোকপল্লব ভগ্ন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত ব্যথিত। শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে তাহা দেখাইয়া চিত্তব্যথা জানাইতেছেন।

রতিকন্দল বলিতেছেন, সখে, আমি শুনিয়াছি গোপিকারা এখানে ফুল তুলিতে আসে, তাহারাই অশোক-পল্লব ভাঙ্গিয়াছে।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব শ্রীরাধার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে। বংশীরবের কি অদ্ভুত প্রভাব! বাঁশি শুনিয়া শ্রীরাধা গাঢ় লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া সখীগণের নিকট উপস্থিত।

কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতং। কেলিবিপিনং প্রবিশতি রাধা।

বিনিদধতী মৃদুমন্থর পাদং।
রচয়তিকুঞ্জরগতিমনুবাদং॥
জনয়তু রুদ্রগজাধিপ মুদিতং।
রামানন্দ রায় কবিগদিতং॥

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের অনুবাদ—

চলনি ব্রজমোহিনী ধনী কুঞ্জরবরগমনী।
কেলিবিপিনে সাজলি রঙ্গে সঙ্গে বরজ-রমণী॥
মদন-আতঙ্গে পুলক অঙ্গ, নব অনুরাগে প্রেমতরঙ্গ, চঞ্চল মৃগনয়নী।
কবরীমণ্ডিত মালতীমাল, নবজলধরে তড়িতজাল, স্থগিত চকিত অমনি॥
বদনমণ্ডল শরদ চন্দ্র, মদনের মনে লাগল ধন্দ, নিখিল ভুবনমোহিনী॥
নীলবসনরতনভূষণ, মণিময় হার দোলয়ে সঘন, কটিতটে বাজে কিঙ্কিনী॥
চরণকমলে মাতল ভৃঙ্গ, মধুপান করি না ছাড়ে সঙ্গ, সদা করে গুণ গুণ ধ্বনি॥
চকিত যুগল নয়ন পদ্ম, খঞ্জন মনে লাগল ধন্দ, চম্পককাঞ্চনবরণী।
হেলিয়া ঢুলিয়া যখনি রঙ্গে, নব নব নব নাগরী সঙ্গে, লোচন মনরঞ্জনী॥

শ্রীরাধার সহিত মদনিকা ও বনদেবী। তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রতিকন্দল শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, বয়স্য, তিনটি সোণার পুতুল। আমি গরিব ব্রাহ্মণ, উহার একটি লইয়া পলাইতে পারিলে, চিরকালের মত দারিদ্র্য ভঞ্জন হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মুর্খ, সোণার পুতুল নয়, উহারাই গোপী। রতিকন্দল হাসিতে হাসিতে বলিলেন, সখে, তোমার বৃন্দাবনে আসা সফল হইল। এই গোপীগণের দ্বারাই বৃন্দাবন রক্ষা হইতেছে, ইহারাই বৃন্দাবনের নবপল্লবগুলি প্রতিপালন করিতেছে।

শ্রীরাধিকা অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন ও বলিলেন, আর্য্যে, মদনিকে, ঐ পুরুষটি কে? অতিকোমল নীলপদ্মের তুল্য কান্তি, কনকসদৃশ বসন পরিধান, কাঁধের উপর বাঁশিটি ঈষৎ লাগিয়া রহিয়াছে, আর তিনি সেই বাঁশি মধুরস্বরে বাজাইতেছেন?

মুলগ্রন্থে শ্রীরাধার উক্তি প্রাকৃত ভাষায় দেওয়া হইয়াছে। শ্রীলোচনদাস ঠাকুর শ্রীরাধার এই উক্তি নিম্নের সঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়াছেন।

সখি, কেও নাগর, রসের সাগর, দাঁড়ায়ে অশোকমূলে।
সে রূপলহরী, লাবণ্যমাধুরী, হেরিয়া নয়ন ভুলে॥
নীল উতপল, দল সুকোমল, জিনিয়া বরণ শোভা।
দলিত কাঞ্চন, জিনিয়া বসন, কুলবতী মনোলোভা॥

নব নব মালা, শশি ষোলকলা, গাঁথিয়া দিয়াছে গলে।
হাসির হিল্লোলে, নাসিকার তলে, সঘনে মুকুতা দোলে ॥
চঞ্চল নয়ন, কামের সন্ধান, যাহার মরমে হানে।
তাহার ভরম, ধরম সরম, সব দূরে যায় মেনে ॥
শ্রবণে কুণ্ডল, করে ঝলমল, সঘনে কম্পিত চূড়ে।
তাহার উপরি, ভ্রমরা ভ্রমরী, মধুলোভে বৈসে উড়ে ॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া, করে বেণু লঞা, মধুর মধুর বায়।
লোচন বচন, ভুবনমোহন, সেই শ্যামচাঁদ রায় ॥

মদনিকা শ্রীরাধাকে বলিলেন, সখি জান না, আমি যাঁহার নাম করিয়াছিলাম, ইনি সেই যুবা।

সোঽয়ং যুবা যুবতিচিত্ত বিহঙ্গশাখী
সাক্ষাদিব স্ফুরতি পঞ্চশরো মুকুন্দঃ।
যস্মিন্ গতে নয়নয়োঃ পথি সুন্দরীণাং
নীবিঃ স্বয়ং শিথিলতামুপযাতি সদ্যঃ ॥

এই যুবাই যুবতীগণের চিত্তপক্ষীর আশ্রয়রূপ বৃক্ষ। ইনি মুকুন্দ, সাক্ষাৎ কন্দর্পের ন্যায় প্রকাশিত। ইঁহাকে দেখিলেই সুন্দরীগণের নীবি আপনিই খসিয়া পড়ে।

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের অনুবাদ—

এ কথা শুনিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, মদনিকা কয় বাণী।
যার গুণাগুণ, তোমার সদন, সতত বলিল ধনি ॥
সেই সে নাগর, রূপের সাগর, নয়নে দেখিলে এবে।
দেখ নয়ন ভরি, ওরূপ মাধুরী, সব দুঃখ দূরে যাবে ॥
সেই সে নাগর, রসের সাগর, এ বটে কলপশাখী।
এ তরুর ডালে, বৈসে কুতূহলে, যুবতিহৃদয়-পাখী ॥
এই নটবর, পরম সুন্দর, কিবা সে সাক্ষাৎ কাম।
কিবা রসময়, কি মাধুরী হয়, কিবা সে গুণের ধাম ॥
ওরূপ মধুর, নয়নে যাহার, লাগয়ে পরাণ সখি।

হৃদয়ে যাহার, লাগে একবার, তার কুলশীল নাশে।
সে রূপতরঙ্গে, মগন হইয়া, লোচন প্রেমেতে ভাসে॥

শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধাকে ঈষৎ অবলোকন করিয়াছেন। তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন, এই বস্তুটি কি শুভক্ষণে জন্মিয়াছে! পদ্মই বল আর চন্দ্রই বল, এ মুখের তুলনা নাই।

মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। রতিকন্দল শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, সখে, এই সকল দাসী-পুত্রী গোপিকাদের দেখিয়া তোমার হৃদয় বড় আকুল হইয়াছে, আর এখানে থাকিতে হইবে না। বেলা হইয়াছে, চল ভাল সরবৎ (শিখরিণী রসালা) খাওয়া যাইবে। মদনিকাও শ্রীরাধাকে বলিলেন, অনেক বেলা হইয়াছে, তুমি ক্লান্ত হইয়াছ, চল আমরা যাই।

৪। দ্বিতীয় অঙ্ক—ভাবপরীক্ষা।

শ্রীরাধিকা পূর্ব্বরাগবতী। সখীমুখে শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়াছেন, বাঁশি শুনিয়াছেন, তাহার পর সাক্ষাৎ দর্শন হইয়াছে। পূর্ব্বরাগের পর শ্রীরাধার অবস্থা কি, দ্বিতীয় অঙ্কে তাহাই জানা যাইবে। শ্রীরাধার দুই সখী, মদনিকা ও অশোকমঞ্জরী। ইঁহাদের উভয়ের কথাবার্ত্তা হইতেই আমরা শ্রীরাধার অবস্থা জানিতে পারি। মদনিকা বলিতেছেন—

শশিনি নয়নপাতো নাদরাহ্নমদানাং
কৃতমনুচ পিকানাং কর্ণরোধশ্ছলেন।
প্রতিবচনমপার্থং যৎ সখীনাং কথাসু
স্মরবিলসিতমন্তাস্তেন কিঞ্চিৎ প্রতীতং॥

চন্দ্রের প্রতি নেত্রপাত করিতে অনাদর। কোকিলের রব শুনিয়া ছলপূর্ব্বক কর্ণরোধ। সখিরা কিছু জিজ্ঞাসা করিলে বিপরীত প্রত্যুত্তর। ইহাতেই হৃদয়ের বিকার অনুভূত হইতেছে।

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের অনুবাদ—

সখি, কি কব গো সব কথা।
রাধার অন্তর, হয় জর জর, পাইয়া সে সব ব্যথা॥

সেই সে অবলা, বৃষভানুবালা, কখন না জানে দুখ।
তার দুখ দেখি, শুন প্রাণসখি, বিদরে আমার বুক॥
না করে আদর, হেরি শশধর, দেখিলে মুদয়ে আঁখি।
শুনি পিকবাণী, কর্ণে দিয়া পাণি, ছল করি রোধে দেখি॥
সখীর বচনে, থাকে অন্যমনে, ডাকিলে না কয় কথা।
উত্তরে উত্তর, কহে কথান্তর, চিত আরোপিত তথা॥
অতএব শুন, মদন বেদন, জানিলাম অনুমানে।
তার দুখ দেখি, প্রাণ কাঁদে সখি, এ দাস লোচন ভণে॥

শ্রীরাধার অবস্থা আরও ভাল করিয়া বলা হইতেছে।

হরি হরি চন্দনমারুতপিকরুতমনুতনুরতনুবিকারং।
তিরয়িতুমিব সা কতি কতি সহসা রচয়তি ন শিশুবিহারং॥
উপনত মনসিজবাধা।
অভিনবভাবভরানপি দধতি শিব শিব সীদতি রাধা॥
অবিধয়-নিশ্চল-নয়ন-যুগল-গলদম্বুকণানুবারং।
রহসি হঠাদুপযাতি সখি মন্থুরচয়তি সৌহৃদসারং॥
গজপতিরুদ্র-মনোহরমহরহরিদমনুরসিকসমাজং।
রামানন্দ রায় কবি ভণিতং বিহরতু হরিপদভাজং॥

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের অনুবাদ—

কি কহব রে সখি, মনসিজবাধা।
নব নব ভাব ভরে, তনু অনু পুলকিত, শিব শিব জপতহি রাধা
শীতল চন্দন, পরশে সমাকুল, পিকরুতে শ্রবণ হি ঝাঁপ।
মলয় সমীর, পরশে হই জর জর, থর থর নিশি দিশি কাঁপ॥
অলিকুল গান, শুনই বরনাগরী, উথলত মদন বিকার।
গুরু পরিবাদ, গোপত লাগি, নাগরী রচয়তি বালক বিহার॥
নয়ন যুগলে গল, বারি নিরন্তর, ঝমরু বদন সরোজে।
তিমির তিরোহিত, নিভৃত নিকেতনে, চিন্তই ব্রজ কুলরাজে॥
রাইক বদন, বেদন হেরি সুন্দরি, ফাটত হৃদয় হামারি।

অশোক মঞ্জরীকে শ্রীমতী রাধিকা আদেশ করিয়াছেন, তুমি শীঘ্র যাও, নূতন ও কোমল পদ্মদল লইয়া আইস, আমি তাহার শয্যায় শয়ন করিব। তিনি সেই কার্য্যে যাইতেছেন, মদনিকা ভাবিতেছেন, মদন কি নিষ্ঠুর। দক্ষিণ পবন, কোকিল ও ভৃঙ্গের রব সহ্য করিতে পারিতেছেন না, তাই শ্রীরাধা শশিমুখি সখীকে গোপনে বলিয়াছেন—

বিদলিত-সরসিজ-দলচয় শয়নে।
বারিত সকল-সখীজন-নয়নে॥
বলতি মনো মম সত্বর বচনে।
পূরয় কামমিমং শশিবদনে॥

অভিনব-বিম্ব-কিশলয়চয় বলয়ে।
মলয়জরস পরিসেবিত নিলয়ে॥
সুখয়তু রুদ্র গজাধিপচিত্তং।
রামানন্দ রায় কবি ভণিতং॥

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের অনুবাদ—

আর নিবেদন, চন্দ্রা সখি শুন, পুরাও মোর মনকাম।
শয়ন মন্দিরে, আনহ সত্বরে, প্রফুল্ল নলিনী দাম॥
গোপত করিয়া, শেষ বিছাইয়া, দেহ না সুন্দরি মোরে।
যেন অন্তজনে, না হেরে নয়নে, বিরলে বলিল তোরে॥
মন্দির মাঝারে, মলয়জ নীরে, সেবন করলো ধনি।
না কর বিলম্ব, কুসুম কদম্ব, শীঘ্র দেহ মোরে আনি॥

অশোক মঞ্জরী স্বকার্য্যে গমন করিলেন, মদনিকা শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে বাহির হইলেন। শুকপাখীরা জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান বলিয়া দিল। শ্রীকৃষ্ণ শশিমুখীর সহিত ভাণ্ডীর তরুতলে রহিয়াছেন। মদনিকাই শশিমুখীকে নিযুক্ত করিয়াছেন। মদনিকা স্থির করিলেন, গোপনে থাকিয়া শুনিতে হইবে, শশিমুখীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের কি কথোপকথন হইতেছে।

এইবার শশিমুখী ও শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরাধা অনঙ্গ-পত্রিকা লিখিয়াছেন, তাহা লইয়া দূতীরূপে শশিমুখী শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন ও পত্র পড়িলেন। পত্র প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের অনুবাদ এইরূপ।

শুন বর নাগর কান।
[illegible]

মদনক দোষ ভরমে পরকাশ॥
কোথ নাহি হেরল এত অবিচার।

দিগ বিদিগে হাম তুয়া রূপ দেখি। অবজাতি জীবন লেখি দিল মোর।
কৈছন মদন হাম কাঁহু নাহি পেখি॥ লোচন বচন সকল ভেল তোর॥

শ্রীরাধা যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অর্থ এই। শ্রীকৃষ্ণ, তুমিই আমার হৃদয় দৃঢ়রূপ বিদ্ধ করিয়াছ। কিন্তু দুনাম হইতেছে মদনের। আমি যেদিকে চক্ষু ফিরাইতেছি, কেবল তোমাকেই দেখিতেছি, মদনকে কোথায়ও দেখিতে পাইতেছি না।

শ্রীকৃষ্ণ পত্র পাঠ করিয়াই বুঝিলেন, শ্রীরাধার অনুরাগ অসীম। কিন্তু প্রথমেই ধরা দেওয়া ঠিক নয়। ভাব গোপন করিয়া বলিলেন—সখি, মদন বলিয়া এই লোকটি কে? সে কিজন্য এখানে আসিয়াছে? সুলোচনা তাহার নিকট কি অপরাধ করিয়াছে? কেন সে সুলোচনার হৃদয়ে ব্যথা দিতেছে? সে কি কংসের অনুচর? সে দুরাত্মা কোথায়, বলিয়া দাও, আমি তাহাকে এখনই মর্দ্দন করিয়া সুলোচনার দুঃখনাশ করিব। আমি থাকিতে ব্রজনারীর ক্লেশ!

রতিকন্দল বা বিদূষক আসিতেছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া বলিলেন, আমারই নাম মদন, মদন কংসের কেহ নহে। আমি ব্রাহ্মণ, তুমি আমার কি করিতে পার?

মদনিকা নিকটবর্ত্তী লতাকুঞ্জে গোপনে দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিতেছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভাব দেখিয়া বুঝিলেন, শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগও অসীম।

শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার শ্রীরাধার পত্রখানি পড়িলেন ও বলিলেন—পত্রের অর্থ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিলাম না, আমি গোপবালক সঙ্গে যমুনাতীরে খেলা করিয়া বেড়াই, এই বাল হরিণনয়নী আমার মূর্ত্তি কি প্রকারে সকল জায়গায় দেখিতে পাইবেন? সখি, এই ব্রজ রাখালগণকে জিজ্ঞাসা কর। আমি কখনও সেখানে যাই নাই, শ্রীরাধা আমাকে কোথায় দেখিলেন, কি প্রকারে দেখিলেন, কেনই বা তাঁহার মোহ জন্মিতেছে? সখি, কথার কৌশল ছাড়িয়া সরলভাবে কথা বল। এই কথা যদি গোপ শিশুরা জানিতে পারে, আমাকে পরিহাস করিবে। শ্রীরাধা কুলমর্য্যাদা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু আমি বালক, আমার প্রতি তাঁহার এই রতি সঙ্গত নহে।

গোপ কুমার সমাজ মিমং সখি পৃচ্ছ কদাঽনুগতোঽহং।

সখি পরিহর বচনবিলাসং।
গোপশিশূনাং বিদিতমিদং মম জনয়তি গুরু পরিহাসং।
যদিচ কুলাচলযাপি কুলস্থিতিরনয়া পরিহরণীয়া।
কিমিতি তদা ময়ি রতিরতিবিকলা বালে কিল করণীয়া॥
গজপতিরুদ্র নৃপে মধুসূদন বচনমিদং রসিকেষু।
রামানন্দ রায় কবি ভণিতং জনয়তু মুদমধিকেষু॥

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের অনুবাদ—

সখি, তেজ হাস পরিহাস।
যদি এ বচন, শুনে সখাগণ, মোর হবে সর্ব্বনাশ॥
অহে শশিমুখি, জিজ্ঞাসহ দেখি, ব্রজবালকের স্থানে।
তার অনুগত, কভু নন্দসুত, নহে শয়নে স্বপনে॥
এ সব চাতুরি, সখি পরিহরি, যাহ আপনার বাস।
সেই কুলবালা, অবলা অথলা, রটাইবি তার হাস॥
আর নিবেদন, চন্দ্রা সখি শুন, সেই পতিব্রতা বালা।
তেজি কুলধর্ম্ম, মোর সনে মর্ম্ম, করিলে না যাবে জ্বালা॥
হাম অতি বালা, পিরিতে বিকলা, না হবে তাহাতে সুখ।
মদন দাহনে, দগধি পরাণে, বিদরিবে তার বুক॥
চতুর নাগর, কপট সাগর, চাতুরিতরঙ্গে ভাষে।
শুনি শশিমুখী, ছল ছল আঁখি, লোচন দেখিয়া হাসে॥

দূতী শশীমুখী, শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া বড়ই চিন্তাকুল ও দুঃখিত হইলেন। শ্রীরাধার অবস্থা ভাবিয়া তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে বিদূষক বা রতিকন্দল শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, সখে দুষ্টা গোপীর কথায় কাজ নাই। দেখ এক হংসী সূর্য্য কিরণে বড়ই কাতর হইয়া পদ্মগুচ্ছের ছায়া খুঁজিতেছে, কিন্তু পদ্ম বাতাসে কাঁপিয়া, যেন হংসীকে আশ্রয় দিবে না, এইরূপ ভাব দেখাইতেছে।

দূতী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, মহাভাগ, আপনার ন্যায় ব্যক্তি যদি অনুগত জনকে বঞ্চনা করেন, বড়ই অশোভন হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ দূতীর কথা শুনিয়া বলিলেন—ভদ্রে, তিনি কুলবালা, পতি তাঁহার প্রিয়—কেন তিনি সদাচারে জলাঞ্জলি দিবেন ?

বিদূষক কৌতুক করিয়া বলিলেন, দুষ্ট গোপালিকে, আমাদের বয়স্য ধার্ম্মিক হইয়াছেন, তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। এই কথা বলিয়া বিদূষক শ্রীকৃষ্ণের বুকে হাত দিয়া বলিলেন, গোপালিকে, ব্যস্ত হইও না। প্রিয় সখার বুকের ভিতর তোমাদের কুরঙ্গনয়নী কুর কুর করিতেছে!

এইবার বিদূষক শ্রীকৃষ্ণের কাণের কাছে বলিলেন, সখে, তুমি স্বপ্নে যাহাকে সহস্রবার দেখিয়া থাক, সেই বরাঙ্গনারই প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতেছ।

শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন, বিদূষকের কথায় তাঁহার হৃদয়ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়িল। যাহা হউক তিনি সখীকে কহিলেন—তুমি সেই বালাকে অনুনয় করিয়া নিবৃত্ত কর।

ইহার পর সকলে নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। 'জগন্নাথবল্লভ নাটকে' শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বরাগে ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, ক্লম, উদ্বেগ, ঔৎসুক্য, দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধ, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু পর্য্যন্ত সঞ্চারি-ভাবের উদয় হইয়া থাকে। প্রাচীন পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ দশ দশা বর্ণনা করিয়াছেন। লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু।

১। অভীষ্টকে পাইবার জন্য অত্যন্ত প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়। ইহার নাম লালসা। এই অবস্থায় ঔৎসুক্য, চপলতা, ঘূর্ণা ও শ্বাস প্রভৃতি হইয়া থাকে। পদাবলীতে দেখা যায় শ্রীরাধা—"ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার" "নিশ্বাস সঘন, কদম্ব কাননে চায়" অথবা শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিবামাত্র উন্মত্ত হইয়া চীৎকার করেন, শরীর কম্প হয়, কাল মেঘ দেখিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করেন;—এগুলি এই অবস্থার লক্ষণ।

২। মনের চঞ্চলতার নাম উদ্বেগ। এই অবস্থায় দীর্ঘশ্বাস, স্তব্ধতা, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, ঘর্ম্ম প্রভৃতি হইয়া থাকে।

৩। জাগর্য্যা; একেবারে নিদ্রা হয় না। এই অবস্থায় স্তম্ভ, শোষ ও রোগাদি উৎপন্ন হয়।

৪। শরীরের কৃশতার নাম তানব। ইহাতে দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি হইয়া থাকে।

৫। জড়িমা ; ইষ্ট অনিষ্টের জ্ঞান নাই, প্রশ্নের উত্তর দেয় না, দর্শন ও শ্রবণ-ক্রিয়াও ভালরূপ চলে না।

৬। ভাবের গভীরতা-প্রযুক্ত চিত্তের বিক্ষোভ হয়, তাহা আর সহ্য করা যায় না, এই অবস্থার নাম বৈরাগ্য। ইহাতে নির্ব্বেদ, খেদ ও অসূয়া প্রভৃতি হইয়া থাকে।

৭। শরীরের বৈবর্ণ্য হয়, দেহে উত্তাপ হয় ; শীত, স্পৃহা, প্রভৃতি হইয়া থাকে, ইহার নাম ব্যাধি।

৮। উন্মাদ ; সকল সময়েই অভীষ্ট বস্তুতে তন্ময়, কাজেই সকল কাজেই ভ্রান্তি হয়।

৯। মোহ—চিত্তের বিপরীত গতি।

১০। মৃত্যু।

কবি রামানন্দ রায় শ্রীরাধার যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অবশ্য অলঙ্কার শাস্ত্রের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলির অনুবর্ত্তনে করা হয় নাই,—তবে পাঠকগণ, এই লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখিবেন।

৫। তৃতীয় অঙ্ক—ভাবপ্রকাশ

শ্রীরাধা দীর্ঘ ও উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। মাধব কি সত্যই আমায় ত্যাগ করিলেন! কিনা করিলাম! কুলবনিতাগণের আচার তৃণের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়া কোনরূপ বিবেচনা না করিয়াই পরিত্যাগ করিলাম! এখন কি করি? কে কৃষ্ণকে বশীভূত করিবে? শিশু হইয়া যুবতীর ভাব লাভ করিয়াছি। "শিশুরপি-যুবতিরিবাহিতভাবা"।

হায় সখি, কি মোর করমগতি মন্দ।
হাম অতি শিশুমতি, যুবতীর সম রীতি, আচরিয়ে না মিলে গোবিন্দ॥
গোকুল-মণ্ডল মাঝে, কোন ধনি ত্যজে লাজে, মোর সম নহে বাউলিনী।
লোচন বচন মন, জাতি কুল সমর্পণ, তবু নাহি হেরি নীলমণি॥

শশিমুখী ও মদনিকা শ্রীরাধাকে প্রবোধ দিতেছেন। আর অশোকমঞ্জরী আসিয়া গোপনে সব দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন। শশিমুখী বলিতেছেন, সখি, সমুদয় ব্যাপার

শ্রীরাধা বলিতেছেন, সখি, পরব্রহ্ম হইতে প্রসূত সামবেদের ন্যায় তাঁহার বংশীধ্বনি শান্ত। আমি পুনঃ পুনঃ তাহাই শুনিলাম। ত্রিলোকীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, চির তরুণ, কন্দর্প-তুল্য যিনি, তাঁহারই লাবণ্যসার পুনঃ পুনঃ দেখিলাম। সূর্য্য ও চন্দ্র একসঙ্গে উদিত হইলে যেমন শোভা হয়, সেই প্রকারের শোভাশালি শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া, আমার একি হইল? আমার মন তুষানলের ন্যায় আমাকে দগ্ধ করিতেছে!

শশিমুখি—প্রিয়সখি অস্থানে আগ্রহ পরিত্যাগ কর। শ্রীকৃষ্ণকে কত কথাই বলিলাম। তিনি বালকভাব প্রকাশ করিয়া ধরাই দিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ত্যাগ কর।

শ্যাম গোঁয়ার, হাম বুঝল রে সখি, শুন তুহুঁ বচন সুঠাম।
তুহুঁ বর নাগরী, রূপে গুণে আগোরি, হারাওবি আপনার নাম॥
অঞ্জন সদৃশ, হৃদয় তছুঁ অঞ্জন, সরল হৃদয় নহু কান।
সুজন তুহুঁ রাই, কুজন সোই নাগর, তাকর প্রেম গরল সমান॥

শশিমুখীর কথা শুনিয়া শ্রীরাধিকা সজলনয়নে মদনিকাকে বলিলেন—দেবি মদনিকে, ব্যাপার কি? হরি প্রেমচ্ছেদের বেদনা জানেন না, প্রেম স্থানাস্থান জানে না, আমরা দুর্ব্বল বলিয়া মদন কৃপা করে না। হা কষ্ট, অন্যে কি কখন অন্যের দুঃখ বুঝিতে পারে? জীবন বশীভূত নয়, যৌবনও দুই তিন দিনের জন্য। হরি, হরি, বিধাতার কি গতি!

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের অনুবাদ—

সখি হে, কি কহব সে সব দুখ।
আমার অন্তর, হয় জর জর, বিদারিয়া যায় বুক॥
প্রেমের বেদন, না জানে কখন, নিদয়-নিঠুর হরি।
কুলিশ সমান, তাহার পরাণ, বধিতে অবলা নারী॥
প্রেম দুরাচার, না করে বিচার, স্থানাস্থান নাহি জানে।
সে শঠ লম্পট, কুটিল কপট, নিশিদিশি পড়ে মনে॥
হাম কুলবতী, নবীনা যুবতী, কানুর পিরিতি কাল।
তাহাতে মদন, হইয়া দারুণ, হৃদয়ে হানয়ে শেল॥
আনের বেদন, আনে নাহি জানে, শুনলো পরাণ সখি।

কি দোষ তোমার, পরাণ আমার, সেহ মোর বশ নয়।
কানু বিরহেতে, বলিলে যাইতে, তথাপি প্রাণ না যায়॥
নারীর যৌবন, দিন দুই তিন, যেন পদ্ম পত্রের জল।
বিধি মোয়ে বাম, না হেরিল শ্যাম, আমার করম ফল॥
সখীর বদন, করি বিলোকন, সজলনয়ন ধনী।
হেরিয়া লোচন, আশ্বাস বচন, কহে জুড়ি দুই পাণি॥

মদনিকা নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, উতরলা হইও না। নববিকশিত কেতকি ফুলের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মধুকরী তাহার নিকট যায়, কিন্তু যখন সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখে রস নাই, তখন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

মদনিকার কথা শুনিয়া শ্রীরাধা ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বলিলেন, তবে ত্যাগই করিলাম। এই কথা বলিতে বলিতে তিনি কাঁপিতে লাগিলেন, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল এবং বলিলেন—দেবি, আমার অপরাধ নাই। মধুরিপু যখন অকস্মাৎ আমার নয়নগোচর হইয়াছিলেন, তখনই পোড়া মদন আমার চিত্ত হরণ করিল। এই বলিয়া স্তব্ধ হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—আবার কি তিনি নয়নগোচর হইবেন না? যে দণ্ডে তিনি নয়নগোচর হইবেন, সেই দণ্ডকে রত্ন দিয়া খচিত করিব।

মদনিকা দেখিলেন আশা নাই, ছাড়িতে চাহেন, ভুলিতে চাহেন, কিন্তু শক্তি নাই। বুঝিলেন, শ্রীরাধার অনুরাগ অসীম। ভাবিলেন, শ্রীরাধাকে অন্যমনস্ক করি। অন্য কথা পাড়িলেন, কিন্তু অন্যমনস্ক করিতে পারিলেন না। সহসা শ্রীরাধা ত্রাসে কম্পিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—সখি, শশিমুখি, আমাকে ভুলিও না, মনে রাখিও। মদনিকা সবই বুঝিলেন। আর গোপন করা কেন? মদনিকা বলিলেন—রাধে আশ্বস্ত হও। তোমার প্রতি মাধবের হৃদয় অনুরক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। শশিমুখি যখন তাঁহাকে তোমার কথা বলিতেছিল, তখন আমি তাঁহার অঙ্গে পুলক দেখিয়াছি। অতএব ভয় পরিত্যাগ কর। বৎসে স্থির হও, মাধবের অভিপ্রায় জানিবার জন্য আমি মাধবীকে নিযুক্ত করিয়াছি, সে তোমার চিত্রফলক লইয়া মাধবের নিকট গিয়াছে।

বলিতে বলিতে মাধবী ফিরিয়া আসিয়া মদনিকার পাদবন্দনা করিলেন। মাধবী

আমার বিমুখভাব দেখিয়া শঙ্কা করিও না। সদ্যস্ফুট পদ্মিনী সকলেরই সুখবিধান করে, তরুণ ব্যক্তির ধৈর্য্য শিথিল হয়, কিন্তু সে কিছুক্ষণের জন্য কি তটস্থ ভাব আশ্রয় করে না?

মাধবী ও মদনিকা আনন্দ প্রকাশ করিলে শ্রীরাধা বলিলেন—এখনও বিশ্বাস হয় না। মদনিকাকে বলিলেন—আপনিই আমার আশ্রয়।

মদনিকা বলিলেন—চিন্তা নাই, আমি চলিলাম। শ্রীরাধা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—ভগবতি, অলিকুল গুঞ্জনে নিকুঞ্জগৃহ অতিশয় আকুল হইয়াছে। সূর্য্যদেব অস্তমিতপ্রায়, মলয়সমীরণ মল্লীপুষ্পগত মধুকরগণকে মন্দ মন্দ তরলিত করিতেছে, চন্দ্রদেবও উঠিতেছেন, এখন যাহা উচিত মনে হয় করিবেন।

নিকুঞ্জোঽয়ং গুঞ্জন্মধুকরকদম্বাকুলতরঃ
প্রযাতঃ প্রায়োঽয়ং চরমগিরিশৃঙ্গং দিনমণিঃ।
মরুন্মন্দং মন্দং তরলয়তি মল্লীমধুকরান্
কিমন্যদ্বক্তব্যং বিধুরপি বিধাতা সমুদয়ং॥

মঞ্জুতরগুঞ্জদলিকুঞ্জমতিভীষণং।
মন্দমরুদন্তরগগন্ধকৃতদূষণং॥
সকলমেতদীরিতং।
কিঞ্চগুরুপঞ্চশরচঞ্চলং মমজীবিতং॥

মত্তপিকদত্তরুজমুত্তমাধিকরং বনং।
সঙ্গসুখমঙ্গমপি তুঙ্গভয়ভাজনং॥
রুদ্র নৃপমাশু বিদধাতু সুখসঙ্কুলং।
রামপদধাম কবি রায় কৃতমুজ্জ্বলং॥

শ্রীলোচনদাস ঠাকুর কৃত অনুবাদ—

গুঞ্জ অলিপুঞ্জ বহুকুঞ্জে মন মাতিয়া।
মত্ত পিক দত্ত রবে ফাটে মঝু ছাতিয়া॥
বল্লীযুত মল্লীফুল গন্ধসহ মারুতা।
কুন্দকলি শৃঙ্গ অলিবৃন্দ কাঁহু নৃত্যতা॥
সখি মন্দমঝু ভাগিয়া।
কান্ত বিনা ভ্রান্ত প্রাণ কাহে রহু বাঁচিয়া॥

ভস্মতনু পুষ্পধনু সঙ্গে রস পুরিয়া।
অঙ্গ মঝু ভঙ্গ কর প্রাণ যাকু ফাটিয়া॥
পঙ্খ মঝু দুঃখ হেরি রোয়ে পশুপাখীরে।
বল্লী নবকুঞ্জ ভেল তুঙ্গভয় ভাজিরে॥
গচ্ছ সখি পুচ্ছ কিবা আনি দেহ নাহরে।
স্পর্শসুখ দর্শ লাগি লোচনক আশরে॥

৬। চতুর্থ অঙ্ক—রাধাভিসার

বকুলবৃক্ষে মূলে শ্রীকৃষ্ণ ও বটু (মধুমঙ্গল বা রতিকন্দল)। শ্রীকৃষ্ণ বিষণ্ণ, বটুর সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন। মদনমঞ্জরীর নিকট মদনিকা শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ পাইয়া আসিয়া-

ছেন, আর মাধবীগুচ্ছের অন্তরালে থাকিয়া উহাদের পরামর্শ শুনিতেছেন। মদনিকার বড় কষ্ট হইতেছে; শ্রীকৃষ্ণের মুখ মলিন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অনুতাপপূর্ব্বক বলিতেছেন—কমলনয়না প্রেম জানাইলেন, আর আমি উপহাস করিলাম! হায়! আমি মহামণি ত্যাগ করিলাম! আর কি সে সৌভাগ্য হইবে, আর কি তিনি আমার নয়নপথে পতিত হইবেন!

বিদূষক (বটু) বলিতেছেন,—বয়স্য, তখনই বলিয়াছিলাম, অনুরাগিণীকে পরিত্যাগ করিও না। যাহা হউক আমি মন্ত্র পড়িয়া সেই হরিণাক্ষীকে আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—তোমার ব্রাহ্মণত্ব আমার জানা আছে, বৃথা গর্ব্ব করিও না, এখন মদনিকাকে আহ্বান কর।

যেমন এই কথা বলা, অমনি মদনিকা উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—বাছার মঙ্গল হউক।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরের কথা মদনিকাকে বলিতে লজ্জাবোধ করিতেছেন। বিদূষক খোলাখুলি ভাবে মদনিকাকে সব কথা বলিলেন। বনমালির জন্য পদ্মবনের পদ্মের দল আর একটিও নাই, নব বিকশিত পল্লবও আর নাই। চন্দ্র দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাহুকে ডাকিতেছেন, এই তাঁহার অবস্থা।

শ্রীকৃষ্ণও মদনিকার নিকট তাঁহার মর্ম্মব্যথা ব্যক্ত করিলেন। মদনিকা শ্রীরাধার অবস্থা শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলেন।

মাধব, তুঁহু কঠিন পরাণ।
সো কুলকামিনী, তুয়া গুণ গণি গণি, নিশি দিশি ঝুরহ বয়ান॥
চম্পক কুসুম, জিতি তনু-লাবণী, অব ভেল কালিমকারা।
পূর্ণমিক চাঁদ, যৈছে ক্ষীণ অনুদিন, তৈছন হই পরচারা॥
নিরবধি নয়ন-সলিল-ভব-কর্দ্দম, তাহে অতি ক্ষীণ তনু রাধে।
চলই সুমন্থর, চলই না পারই, প্রতি পদে পততি চ সাধে॥
মনসিজ বিশিখে, বিষাদিত অন্তর, হরি হরি মাধব দারুণ বাধা।
তব গুণগ্রাম, গরল সম জারল, শিব শিব কথমপি জীবতি রাধা॥
যৈছন চাতক, জলদ নেহারই, কাতর প্রবল পিয়াসে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রেম ও শ্রীরাধার প্রেম, ইহাদের মধ্যে প্রবলতর কে? বিদূষক বলিলেন,—দেখ, গোপিকা এখন চন্দ্র (কর্পূর) চন্দন অঙ্গে অনুলেপন করিতেছে, কিন্তু আমার বয়স্য চন্দ্র দেখিলেই সূর্য্যকিরণ তাপিত পেচকের ন্যায় কোনস্থানে গিয়া লুকাইয়া চক্ষু দুইটি মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকেন, চন্দন-বায়ু অঙ্গে লাগিলে সিদ্ধমন্ত্র জপের ফলে সর্প যেমন এদিক ওদিক দৌড়িয়া পলায়, তিনিও সেইরূপ করেন।

সত্যই এই অবস্থা, বিদূষকের কৌতুক নহে। শ্রীকৃষ্ণের ভয়, বুঝিবা শ্রীরাধা তাঁহার অভিলাষ ত্যাগ করিয়াছেন। মদনিকা শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলেন—গুরুজনেরা কুবচন বলিতেছেন, শ্রীরাধার গ্রাহ্য নাই। সখীরা পরিহাস করিতেছে, তাহাতে সুখানুভব নাই। চন্দনে বিষ বোধ হইতেছে, চন্দ্রে অগ্নি বোধ হইতেছে।

স্থির হইল, মদনিকা শ্রীরাধাকে কেশরকুঞ্জে লইয়া আসিবেন। মদনিকা চলিয়া গেলেন।

এইবার সঙ্কেতোচিতবেশে অভিসারিকা শ্রীরাধা, সঙ্গে সখি মাধবী। পথ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। গিরি, গুহা কিছুই লক্ষ্য হয় না। সব সমান, অন্ধকারে একাকার। কৈ, দেবী মদনিকা এখন ত আসিলেন না? তিনি এখনও সেখানে কি করিতেছেন। বিধাতা কি আমার অহিতকারী হইলেন? কি কষ্ট অসীম সুদুর্গম কানন লঙ্ঘন কি বিফল হইল! সখি, তোমরা কি আমায় বঞ্চনা করিলে?

তিমিরতিরোহিতসরণী।
গিরিষু দরীষু সমেব হি ধরণী॥
চিরয়তি কিং সখি দেবী।
বিধিরপি ময়ি কিমু ন হি হিতসেবী॥

অতিবাহিতমতি ভীমং।
বিফলমিদং কিমু গহনমসীমং॥
সুখয়তু রুদ্রগজেশং।
রামানন্দরায়কৃতমণিশং॥

মদনিকা আসিলেন। শ্রীরাধার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের অনুবাদ—

নিন্দতি শশধর, পরিহরি চন্দন, দূতীক নব বনমালা।
মলয় সমীর, পরশে ভেই আকুল, মুকুলিত নয়নবিলোলা॥
পরিহরি কি কহব সো দুখ বাধে।

কুঞ্চিত সরসিজ-নিন্দিত বদনে, পততি সদা মকরন্দ।
দারুণ মদন, হুতাশনে জারল, মঝু মনে লাগল ধন্দ॥
বান্ধব পরিজন, না ভাবত সম্প্রতি, স্থানু সদৃশ রহু কান।
তুঁহক নিকুঞ্জে, শয়ন বর মাধব, কহইতে বিদরে পরাণ॥
ব্যাজ নাহি কর, আশু চল সুন্দরি, তেঁহি নবীন কিশোর।
তুয়া মুখ দরশ, পরশ বর পাওব, তবহুঁ লোচন মন ভোর॥

এদিকে নিকুঞ্জ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণও উৎকণ্ঠিত। তিনি ভাবিতেছেন, দেবী মদনিকা এত বিলম্ব করিতেছেন কেন? শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে নানারূপ আতঙ্ক হইতেছে। তিনি ভাবিতেছেন, একে ত শ্রীরাধা কৃশাঙ্গী, পীন পয়োধর ও গুরুজঘনের ভারে গতি মন্থর, আবার এই সঙ্কেত কুঞ্জ অনেক দূর। বালারমণী স্বভাবতঃ ভীরু। অরণ্য ঘোর অন্ধকারময়, কি প্রকারে তিনি আসিবেন? এ বিষয়ে কে আমার আশ্রয় হইবে? চুপ করিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন, আবার ভাবিতেছেন। আমি অপরিচিত, তাই কি বিমুখী হইলেন? সহচরীদিগের বাক্যে বোধ হয় বিশ্বাস হইল না। ঘোর অন্ধকার, পথভ্রম হইল নাকি? অতি ক্ষীণা, তাহাতে পঞ্চশরের বাণে আহতা, বোধ হয় আর চলিতে পারিতেছেন না! আবার একি, চন্দ্রদেব যে উদিত হইলেন। চক্রবাকসকল কাঁদিতেছে, বোধ হয় চন্দ্রোদয় হইতেছে। কি হইবে? অন্ধকারোচিত বেশে বালা আসিতেছেন, সঙ্কেতকুঞ্জের অর্দ্ধ পথ আসিয়াছেন। এদিকে চাঁদ উঠিতেছে। এখন কি করেন? যাইতেও পারিতেছেন না, আসিতেও পারিতেছেন না। শ্রীকৃষ্ণ কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতস্বরে বলিতেছেন—হে পূর্ব্বপর্ব্বত, হে সখে, তুমি কৃপা কর। তোমার শত শত শৃঙ্গ, এই শৃঙ্গগুলিকে খুব উচ্চে উত্তোলন কর। চন্দ্র যেন উদিত হইতে না পারেন। চন্দ্র উঠিলে হরিণলোচনার আগমন হইবে না, আমারও জীবন নাশ হইবে।

রুণু রুণু শব্দ শোনা যাইতেছে। একি খঞ্জনাক্ষীর নূপুরধ্বনি, না ভৃঙ্গনিকরের নিস্বন, না কাঞ্চীর শব্দ, বোধ হয় স্মরাতুর সারসকুলের কলরব। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীরাধা সখীর করে কর দিয়া কুঞ্জকেলিভবনে

চিকুরতরঙ্গকলেনগতঙ্গমিব কুসুমং দধতী কায়ং ।
কটিতপনসবাবৃশ্যা দিশতীব চ নাভিকুহরজুষবায়ং ॥
রাধা মাধববিহারা ।
হরিমুপগচ্ছতি মন্থরপদগতি লঘু লঘু তরলিত হারা ॥
খঞ্জিত লঞ্জিত রসভর চঞ্চল মধুরদৃগঞ্চলবেন ।
মধুমথনং প্রতি সমুপহসন্তী কুবলয়দামরসেন ॥
গজপতি রুদ্রনরাধিপ মধুনাতনমদনং মধুরেণ ।
রামানন্দ রায় কবি ভণিতং সুখয়তু রসবিসরেণ ॥

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের অনুবাদ—

হরিষ সদনে, খঞ্জননয়নী, রসভরে চলি যায় ।
সে রূপ দেখিয়া, আকুল হইয়া, মদন মুরছা পায় ॥
কুটিল কুন্তল, করে ঝলমল, বেষ্টিত মালতী মালে ।
যমুনা তরঙ্গে, ভাসয়ে সুরঙ্গে, যেমত কমল জালে ॥
ললাট সিন্দুর, তমঃ করে দূর, নাশার বেশর দোলে ।
উদয় শিখর, যেন শশধর, রবির সহিত মিলে ॥
পঙ্কজ নয়নে, অতুল বয়ানে, অমিয়া লহরী হাসি ।
তাহাতে উপমা, তাহাতেই সীমা, কি ছার শরদ শশি ॥
কনক কঠোর, পীন পয়োধর, বিচিত্র অম্বর তায় ।
কণ্ঠে অনুপাম, মুকুতার দাম, পবনে দুলিয়া যায় ॥
নব জলধর, বিচিত্র অম্বর, কটিতে কিঙ্কিনী সাজে ।
চরণ পঙ্কজে, শোভে বঙ্করাজে, কনক নূপুর বাজে ॥
হেরি মকরন্দ, ধায় অলিবৃন্দ, না ছাড়ে তিলেক পাশ ।
নূপুরের গানে, ভ্রমরের তানে, লোচন মন উল্লাস ॥

বিদূষক বলিলেন, আমাদেরই জয়, শ্রীরাধাই কেশরকাননে আসিলেন । মদনিকা আশীর্বাদ করিয়া রতিকন্দলের সহিত কুঞ্জান্তরে গেলেন ।

৭ । পঞ্চম অঙ্ক—রাধাসঙ্গম

উপভোগের চরম সম্পৎ। পঞ্চম অঙ্কে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। প্রভাতে বনদেবী নিদ্রামুকুলিত লোচনে ধীরে ধীরে আসিতেছেন, শশিমুখী তাঁহাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দ-বোধ করিতেছেন। মদনিকার মূর্ত্তিও অতি সুন্দর। তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেছেন, আহা বসন্ত যামিনীর অবসান কি রমণীয়! কমল-কানন-আলিঙ্গিত দক্ষিণ সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে, আমের মুকুল আস্বাদন করিয়া কোকিলকুল আনন্দে কূজন করিতেছে, কুসুমিত লতায় অলিকুল গুঞ্জন করিতেছে, চক্রবাকযুগল আনন্দচিত্তে মধুর আলাপ করিতেছে।

নিকুঞ্জগৃহের কৌতুক মদনিকা দেখিয়াছেন। শশিমুখী উৎসুক হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার নিকট সমুদয় ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক শুনিতেছেন। এদিকে কুঞ্জভঙ্গের পর শ্রীরাধা ও কিছুদূরে শ্রীকৃষ্ণ নিজ নিজ ভবনে গমন করিতেছেন। মদনিকা শশিমুখীকে দেখাইতেছেন। শ্রীরাধা আসিয়া মদনিকাকে দেখিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন।

এমন সময়ে এক অতি ভীষণ কোলাহল উপস্থিত হইল। অরিষ্টাসুর আসিয়া বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াছে। শৃঙ্গ ও ক্ষুরের দ্বারা সে সজোরে ভূমি খনন করিতেছে, তাহার গর্জ্জন প্রলয় জলদের তুল্য। তাহার নয়ন যুগলে অগ্নিশিখা, ব্রজবাসীগণ বিব্রত ও ভীত হইয়া কুঞ্জের ভিতর লুকাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীগণের সম্মুখে আসিয়া অভয় হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিতেছেন, ভয় নাই, ভয় নাই। ব্রজবাসীরা ভীত হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ বালক অরিষ্টাসুরের সহিত কি প্রকারে সংগ্রাম করিবেন! কিন্তু, এ ভয় আর কতক্ষণ? মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ দুষ্ট অরিষ্টাসুরের প্রাণ সংহার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জয়শ্রীমণ্ডিত শ্রীমূর্ত্তি মদনিকা দর্শন করিতেছেন। চূর্ণকুন্তল স্খলিত, শ্রমজলে ললাটের চন্দন লিপ্ত, ময়ূরপুচ্ছ চূড়া শিথিলিত, অঙ্গ ধূলিধুসরিত।

মদনিকার অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ বকুলতলে বসিলেন। মদনিকা শ্রীরাধাকে আনিয়া তাঁহার বামে বসাইয়া বলিলেন, বৎস, অতি দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছ, তোমাকে এই পারিতোষিক দিলাম। এই বলিয়া উভয়কে সাদরে বীজন করিতে লাগিলেন। মদনিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়, তুমি আর কি চাও? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমার অভীষ্ট পূর্ণ

পরিণত শারদ শশধর বদনা।
মিলিতা পাণিতলে শুক্রনদনা॥
দেবি কিমিহ পরমস্তিমদিষ্টং।
বহুতর সুকৃত ফলিত মনুদিষ্টং॥

পিকবিধুমধুপাবলি চরিতং।
হচয়তি মামধুনা সুখ ভরিতং॥
প্রণয়তু রুদ্র নৃপে সুখমমৃতং।
রামানন্দ ভণিত হরিরমিতং॥

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের অনুবাদ—

নির্ম্মল শারদ-শশধর-বদনী।
বিদলিত কাঞ্চন নিন্দিত বরণী॥
পিকরুতগঞ্জিত সুমধুর বচনা।
মোহন কৃত করি শত শত মদনা॥
দেবি শৃণু বচনং মম সারং।
কিল গুণধাম মিলিতমনুবারং॥

চিরদিন বাঞ্ছিত যদিহ মদিষ্টং।
তব কৃপয়াপি ফলিত মনোঽভীষ্টং॥
ইদমনু কিং মম যাচিতমস্তি।
নিখিল চরাচরে প্রিয়মপি নাস্তি॥
প্রণয়তু রসিক হৃদয় সুখ মমিতং।
লোচনমোহন মাধব চরিতং॥

বর্ণাশ্রম ও শ্রীগৌরাঙ্গ

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কি, তাহা এখন আমাদের দেশে আছে কি না, সে সম্বন্ধে আলোচনা বড় একটা হয় না। প্রচলিত জাতিভেদ-পদ্ধতি ও ছুৎমার্গকে বর্ণাশ্রম বলিয়া ধরিয়া লইয়া অনেকেই আলোচনা করেন। এ বিষয়ে বাঙ্গালার বৈষ্ণব মত বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত কি? প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এ বিষয়ে তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

"আজকাল অনেকের ধারণা, ছত্রিশ জাতিকে একাকার করিতে না পারিলে দেশ উদ্ধার হইবে না। ইহার সমর্থনের জন্য তাঁহারা বলিয়া থাকেন,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানিতেন না। এ ধারণা যারপরনাই ভ্রান্ত ধারণা। তাঁহার লোকপালনী লীলা আলোচনা করিলে বরং দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি কি গার্হস্থ্য, কি সন্ন্যাস, উভয় আশ্রমেই অক্ষুণ্ণভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা

শ্রীমহাপ্রভু প্রতিদিন সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন। প্রমাণ যথা—

"উষাকালে সন্ধ্যা করি ত্রিদশের নাথ।
পড়িতে চলেন সর্ব্বশিষ্যগণ সাথ॥"

[শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদি, ৭ম অধ্যায়]

"উঠে প্রভু যথোচিত নিত্যকর্ম্ম করি।
ভোজনে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥"

[ঐ, আদি, ১০ম অধ্যায়]

"ধর্ম্ম সনাতন প্রভু স্থাপে সর্ব্ব ধর্ম্ম।
লোকরক্ষা লাগি প্রভু না লঙ্ঘেন ধর্ম্ম॥"

[ঐ, ঐ ইত্যাদি]

সন্ন্যাস গ্রহণের পর ৺পুরীধামে প্রেম বিলাস অবস্থাতেও তিনি যথোচিত সন্ধ্যাদির অনুষ্ঠান করিতেন; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান আছে। নিম্নে একটি মাত্র উদ্ধৃত করিলাম; যথা—

"মধ্যাহ্নে করিয়া কৈল ভিক্ষানির্ব্বাহন।'
'সন্ধ্যাকৃত্য করি পুনঃ নিজগণ সঙ্গে॥"

[শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য ১৬শ]

যথাবিধি শ্রীবিষ্ণু পূজাদি না করিয়া তিনি কোন দিনই ভোজন করিতেন না। যথা—

"যথাবিধি করি প্রভু শ্রীবিষ্ণু পূজন।
তুলসীরে জল দিয়া করেন ভোজন॥"

[শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদি ৬ অধ্যায়]

পুনঃ—

"বিষ্ণু পূজা করি তুলসীরে জল দিয়া।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া॥" [ঐ ঐ]
"গৃহে আসি করে প্রভু শ্রীবিষ্ণুপূজন॥
তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি।
ভোজনে বসেন গিয়া ব'লে হরি হরি॥" [ঐ ৮ম]

ভোজনও তিনি যথাবিধি সম্পন্ন করিতেন—

[শ্রীহরিভক্তিবিলাস, ৮ম বিলাস, ৮৪।৮৭ শ্লোকে]

"বিশ্বক্‌সেনায় দাতব্যং নৈবেদ্যং তচ্ছতাংশকম্"

প্রভৃতি অংশে দেখা যায় যে, বিষ্ণুনিবেদিত অন্ন উক্ত প্রকার বিশ্বক্‌সেনকে অর্পণ করিয়া ভোজন করিতে হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবতে আবার তাহার প্রমাণ পাইতেছি। যথা—

"তুলসীরে জল দিয়া করিলা সেচন॥
যথাবিধি করি প্রভু গোবিন্দ পূজন।
আসিয়া বসিল গৃহে করিতে ভোজন॥
তুলসীর মঞ্জরীর সহিত দিব্য অন্ন।
মা'য়ে আসি সম্মুখে করিল উপসন্ন॥
বিশ্বক্‌সেনেরে প্রভু করি নিবেদন।
অনন্তব্রহ্মাণ্ডদেব করেন ভোজন॥"

[ঐ, মধ্য, ১ম]

অতিথিসেবা গৃহস্থের নিত্যকর্ম্ম। শ্রীগৌরাঙ্গদেব পঞ্চ যজ্ঞের অন্তর্গত এই নৃ-যজ্ঞের প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। যথা—

গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা গৃহস্থের মূল কর্ম্ম॥

[শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদি ১০ম]

যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানেও তাঁহার নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

শাস্ত্রবিধি মতে শ্রাদ্ধ কর্ম্মাদি করিয়া।
যাত্রা করি চলিলা অনেক শিষ্য লইয়া॥

[শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদি ১২]

এইমত সর্ব্বস্থানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া।
বাসায় চলিলা বিপ্রগণ সম্ভাষিয়া।

[ঐ, ঐ]

শ্রীগৌরাঙ্গদেব, ৺গয়াধামে যাইবার পূর্ব্বে বাড়ীতে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তথায় গিয়াও যথা-বিধি শ্রাদ্ধক্রিয়া সমাধান করেন। তারপর আপনি পাক করিয়া ভোজন করেন। যথা—

তবে মহাপ্রভু কতক্ষণে সুস্থ হইয়া।
রন্ধন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া॥

ভোজন বিষয় যে তাঁহার খুবই বিচার ছিল, তাহা নিম্নলিখিত পদ্যাংশ হইতেই যেন বুঝিতে পারা যায়। অন্য জাতি তো দূরের কথা, যে-সে ব্রাহ্মণের অন্নও তিনি অঙ্গীকার করিতেন না। যথা—

অভোজ্যান্ন বিপ্র যদি করেন নিমন্ত্রণ।
প্রসাদ মূল্য লৈতে লাগে কৌড়ি দুই পণ॥
ভোজ্যান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে।
কিছু প্রসাদ আসে কিছু পাক করে ঘরে॥

[শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ৮ম]

মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করে নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন॥
*　　*　　*　　*
শ্রীবাস আদি যত ভক্ত বিপ্র সব॥
এইমত নিমন্ত্রণ করে যত্ন করি।
বাসুদেব গদাধর গুপ্ত মুরারি
কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী আর কত জন।
জগন্নাথের প্রসাদ আনি করে নিমন্ত্রণ॥

[ঐ অন্ত্য, ১০ম]

কি অভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ, কি বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি, তাঁহারা শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদই শ্রীমহাপ্রভুকে সেবা করাইতে পারিতেন না, ইহা উল্লিখিত অংশ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের উপদিষ্ট এবং আচরিত ধর্ম্ম প্রতিপালন করা বড় সহজ নহে। তাই গরজের দায়ে অনেকে বলেন যে "তিনি এ মানিতেন না, ও মানিতেন না।"—এই সহজ পথই অবলম্বন করিয়া থাকেন। শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাদিগকে সুমতি দান করুন।"

অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী

৩। পদকর্ত্তা—রাধিকামুকুন্দ

গোষ্ঠে মিলন ॥

বটু সঙ্গে নানা রঙ্গে নাগর ত্রিভঙ্গে। কুসুম সরসীকূলে গেলা মনোরঙ্গে ॥
রাইভাবে গদগদ অন্তর উল্লাসে। পথ নিরীক্ষণ করে দরশন আশে ॥
কতক্ষণে সুদুর্লভ রাই চন্দ্রমুখ। বিধি কি করব হাম পাব মহা সুখ ॥
মহাভাবে মহানন্দ মনেতে হইল। রাধাভাবে সুবলের বদন হেরিল ॥
ওথা বিনোদিনী রাই গদ গদ হিয়া। অনিমিষে রহে শ্যাম সখী মুখ চায়া ॥
কানু দরশন আশে ভানু পূজন ছলে। বিরহ কৃশাণুতাপে কানু ভানু বলে ॥
সুবর্ণ কমল চলে নীল কমল পাশে। জলধি মিলনে গঙ্গা যেন যায় হর্ষে ॥
ললিতাদি সখী যেন গঙ্গা শতমুখী। নাগর সাগর ভেটে সব বিধুমুখী ॥
সুরধনী পাইলেন যেন জলনিধি। তেনধনী রসনিধি বিধির অবধি ॥
রাধাশ্যাম একাসনে হৈল নিমগন। উড়ুপতি বেঢ়ি উড়ু তেন আলীগণ ॥
শ্যাম গুণধাম পাইল পুরল কাম। উরে উরে করে করে শ্রীঅঙ্গ সুঠাম ॥
হেমমণি নীলমণি একত্র মিলন। তড়িত জড়িত জনু সুনীল রতন ॥
গৌরে শ্যাম মিশায়ল শ্যামে গৌর তনু। তনু তনু মিলনেতে বিলসে অতনু ॥
ভানুসুতা কানু যনু দাহিকা কৃশানু। তেঁহ বিনু নাহি ভিনু সদা রাধা কানু ॥
কিঙ্কিণী কঙ্কন কটক করে রুনু ঝুনু। ভূষিত গোক্ষুর রেণু করে মোহন বেণু ॥
মহাসুখে মগ্ন দুঁহু পরম আনন্দ ॥ পরস্পর নিরীক্ষয়ে রাধিকা মুকুন্দ ॥ ১১ ॥

সায়াহ্নে ভাবমিলন ॥

মণিময় সিংহাসনে বসিলা কানাই। শ্রীদামাদি সখী সঙ্গে বলরাম ভাই ॥
রাধিকার ভাব হৈল সুবলে হেরিয়া। অনিমিষে মুখ পানে রহয়ে চাহিয়া ॥
তথায় যাবট পুরে কমলিনী রাই। কৃষ্ণভাবে রহে শ্যামা সখী মুখ চাই ॥
গদগদ বাণী দুহু অন্তর আনন্দ ॥ মহাভাবে নিমগন রাধিকা মুকুন্দ ॥ ১২ ॥

অভিষেক মিলন ॥

অভিষিক্ত কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণানন্দ শ্রীগোবিন্দ আনন্দ মন্দিরে লীলাধাম।
উচ্চরতন মন্দিরে মহাসুখে বিহরে লাবণ্য মাধুর্য্য পূর্ণকাম ॥
তথা অভিষিক্তা ধনী বৃষভানু নন্দিনী ভানুপুরে অট্টালিকোপরে।
ললিতা বিশাখা সঙ্গে ক্রীড়া করে মনোরঙ্গে মহানন্দে সব স্বচ্ছন্দে বিহরে ॥
গবাক্ষের দ্বারে বসি প্রাণনাথ মুখশশী প্রেমভরে নিরীক্ষণ করে।
নন্দালয়ে নন্দসুত রাইভাবে উনমত দরশন হৃদয়েতে স্মরে ॥
হেনকালে গবাক্ষেতে রাইমুখ আচম্বিতে হেরি হরি জড়িত অন্তর।
দুনয়নে দুনয়ন পুলকিত ঘন ঘন নেত্রে ধারা বহে নিরন্তর ॥
প্রেমের সাগর দুহু অবশ হইল বহু শ্রীঅনন্ত অন্ত নাহি জানে।
ব্রহ্মাণ্ডের অগোচর ভাব গোপীর গোচর রাধিকা মুকুন্দ গুণগানে ॥ ১৩ ॥

হিন্দোলারম্ভ ॥ যথা রাগ ॥

বর্ষা ঋতু হেরি কিশোর কিশোরী দুহু নিকুঞ্জক মাঝ।
সখীগণ সব বুঝি অনুভব রচিলা হিন্দোলারাজ ॥
রত্ন পীঠ পর তুলি মনোহর চৌদিকে পাটের ডোর।
নীপ যুগ শাখে বান্ধিলা কৌতুকে শোভা পরম সুন্দর ॥
চন্দ্রভানু কিরে উদিত হেরিয়ে হইল দোহার প্রীত।
কর ধরাধরি নাগর নাগরী উঠি বৈঠে মনোনীত ॥
পূর্ণ শশধর ভানুসুতা তীর নীরবিন্দু কাদম্বিনী।
কানু জলধর বর্ষে নিরন্তর হর্ষে রাইচাতক দামিনী ॥
হেম নীল শশী কি যে প্রেমরাশি মহানন্দ দিবানিশি।
কমলে ভ্রমর চন্দ্রেতে চকোর যনু হৈল মেশামেশি ॥
সখীর সমূহ করিয়া আগ্রহ হিন্দোলা দোলায় সুখে।
সেবাপরা কোই বীজন বীজই তাম্বুল দেয়ই মুখে ॥
কোই মনোরঙ্গে বাজয় মৃদঙ্গে গায়য়ে মঙ্গল-গীত।
নৃত্য করে কোই মন্দিরা দেয়ই সবার আনন্দ চিত ॥
নিকুঞ্জ ভবনে প্রেমবরিখণে স্রোতে ভাসি সবে যায়।

হংস সারসঙ্ক চটক চাতক চকোর সুখী নিরন্তর।
বৃক্ষ গুল্ম লতা গন্ধর্ব্ব দেবতা মুনি মনু খগেশ্বর॥
নাচয়ে অপ্সর গায়ে বিস্তাধর কিন্নরী কিন্নর।
পাতালে অনন্ত সুখে নাহি অন্ত অস্থির স্থির জলচর॥
সর্ব্ব স্বর্গ বর্গ গর্ব্ব হৈল খর্ব্ব হিন্দোলা হেরে দোহাকার।
তেজি ধর্ম্ম কর্ম্ম মর্ম্ম শর্ম্ম নর্ম্ম অনিমিখে অনিবার॥
ঝুলায়ত সখী দোহারে নিরখি সুখের নাহিক ওড়।
সুখে নিমগণ হৈলা দুহুজন রাধিকা মুকুন্দ ক্রোড়॥ ১৪॥

৪। পদকর্ত্তা—জগদানন্দ ঘোষ

['মুকুন্দানন্দ'-গ্রন্থে, পদকর্ত্তা জগদানন্দ ঘোষের একটিমাত্র পদ সংগৃহীত হইয়াছে]

(১)

অথ বৎসচারণলীলা "শ্রীগৌরচন্দ্র"

আয় ভাই, খেলাইতে যাবি গোয়াচাঁদ।
শিশুগণ ডাকি বলে আয় ভাই গঙ্গার কুলে, নাচিব গাইব হরিনাম॥
শিরে অবতংশ কনক ঝুরি লম্বিত দোলত ললাট সুমাঝ।
তদুপরি চন্দন চিত্র বিচিত্রক দেখি মুখচন্দ্র বিরাজ॥
রতন হারাবলি বক্ষে বিলম্বিত টাড় বলয়া দোল করে।
গউর কলেবর নীল পাটের ধটী বেড়িয়াছে বাগর ঘুঙ্গুরে॥
হেদেরে বালকগণ লঞা যেছ প্রাণধন সকালে আনিহ গোরাচান্দে।
ঠাকুর সুন্দরানন্দ গোরা লীলা বিজ্ঞানত গায়ত ঘোষ জগদানন্দে॥

৫। পদকর্ত্তা—বিপ্রদাস ঘোষ

['মুকুন্দানন্দ'-গ্রন্থে, বিপ্রদাস ঘোষের একটিমাত্র পদ সঙ্কলিত হইয়াছে]

অথ বৎসচারণ লীলা—ধানসী

ওগো মা, আজি আমি চরাব বাছুর।
পরাইয়া দেহ ধড়া মন্ত্র পড়ি বান্ধ চূড়া চরণেতে পরাও নপুর॥
অলকা তিলক ভালে বনমালা দেহ গলে সিঙ্গা বেত্র বেণু দেহ হাতে।
শ্রীদাম সুদাম দাম সুবলাদি বলরাম সবাই দাঁড়াইয়া রাজপথে॥

বিলাস অর্জ্জুন জান কিঙ্কিণী অংশুমান সাজিয়া সবাই গোঠে যায় ।
গোপালের কথা শুনি সজল নয়নে রাণী অচেতনে ধরণী লোটায় ॥
চঞ্চল বাছুরী সনে কেমনে ধাইবে বনে কোমল দুখানি রাঙ্গা পায় ।
বিপ্রদাস ঘোষে বলে এ বয়েসে গোঠে গেলে প্রাণ কি ধরিতে পারে মায় ॥

৬ । পদকর্ত্তা—মগনচন্দ্র

['মুকুন্দানন্দ'-গ্রন্থে, এই অজ্ঞাতনামা পদকর্ত্তার চারিটি পদ সঙ্কলিত হইয়াছে]

(১)

অষ্ট কালীয় মতে যুগল বিলাস

চান্দনী রজনী হেরি গৌরাঙ্গসুন্দর ।
কৃষ্ণ অভিসার রসে প্রভু ভেল ভোর ॥
ভ্রমর কোকিল করু সুমধুর গান ।
সেজ ত্যাজি উঠিলা গোউর রসধাম ॥
ঠমকি ঠমকি যায় চরণ অথির ।
ভাবাবেশে আওল সুরধনী তীর ॥
একে সে নির্জ্জন পুন গঙ্গার তরঙ্গ ।
ফুলবন দেখি ভাব বাঢ়ল মতঙ্গ ॥
তঁহি প্রভু বৈঠল নীপতরু মুলে ।
সেজ বিছায়ল কিসলয় ফুলে ॥
দিশ হেরি রাধা বলি আঁখি ছল ছল ।
মগনচন্দ্র হেরি হৃদয় তরল ॥

(২)

নিত্যরাস

ললিতা উল্লাসপ্রাণী সুবর্ণ চিরুণী আনি সাধে সাধে আঁচরয়ে চুল ।
বিশাখা কবরী বান্ধে করি মনোহর ছান্দে সারি সারি দিয়া নানা ফুল ॥
চিত্রা সময় জানি অপূর্ব্ব সিন্দুর আনি সাধে সাধে পরায়ত ভালে ।
চম্পকলতিকা ধনি সুবর্ণের সিথা আনি যতনে পরায় সিথিমূলে ॥
রঙ্গদেবী রঙ্গ করি কুঙ্কুম কস্তূরী ঘুরি লেপই রাইর শ্রীঅঙ্গে ।
সুদেবী সুপুষ্পমালা শ্রীমতীর গলে দিলা সুমেরু বাহিয়া পড়ু গঙ্গে ॥
তুঙ্গবিদ্যা অনুমানি কিঙ্কিণী শৃঙ্খল আনি যতনে বান্ধিলা কটিমাঝে ।
ইন্দুলেখা ভয় মানি ক্ষীণ মাঝা ভাঙ্গে জানি পুনঃ তায় বান্ধে রত্ন জাদে * ॥
বাকী আভরণ ছিল শ্রীরূপ মঞ্জরী দিল পায়ে ধরি পরায় নূপুর ।
হেরইতে রাইরূপ মূরছে অনঙ্গ ভূপ মগনচন্দ্র রহু দূর † ॥

(৩)

প্রদোষ-লীলা

আজুরে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল।
পূরব চরিত্র বুঝি মনেতে পড়িল॥
সভা করি বসিলেন গৌরাঙ্গসুন্দর।
রামাই মুরারি গুপ্ত আর বক্রেশ্বর॥
চারিদি'ক ভক্তবৃন্দ নাচে হরি বলি।
আনন্দ হইয়া কেহ দেয় করতালি॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র শোভিয়াছে ভাল।
জগন্নাথ মিশ্রের ঘর করিয়াছে আলো॥
কোটি কাম মুরছিত নয়নের কোনে।
মগন হইয়া দয় হেরই নয়নে॥

(৪)

অভিসারানুরাগ

পাখরাজ ডম্ফ মুরলী ঘন গরজন শুনি শুনি মনোহি উল্লাস।
শ্রবণ মরম মোর তহি রহু লাগিয়া খসতহি অঙ্গ কি বাস॥
কহ সখি, কৈছে রহব ঘর মাহ।
দাম শ্রীদাম সুদাম মহাবল সঙ্গে খেলত মধু নাহ॥ ধ্রু॥
সুবল মধুমঙ্গল উজ্জলাদি সহচর মাঝে বিরাজ ব্রজচান্দ।
কুলবতী নয়ন প্রাণ সব উনমত হেরইতে মোহন ছান্দ॥
কৈছে হেরব সখি, উপায় বলহ দেখি তুহু সব চতুর সুজান।
না হেরিয়া শ্যাম ধাম মনো উচাটন কৈছে হোয়ব সমাধান॥
শুনি সব সহচরী রাইর দু'করে ধরি বলে চল শ্যাম দেখিবারে।
ইহা বলি সখী মেলি হয়্যা অতি কুতূহলী উঠিলেন অট্টালিকোপরে॥
হেরিয়া মোহনরূপ কত না হইল সুখ দুঁহু রহে দুঁহু মুখ চাঞা।
নয়নে নয়নবান্ পরস্পর সন্ধান মগন মগন তা দেখিঞা॥

শ্রীশিবরতন মিত্র

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্রের গান

বীরভূম জেলার অন্তর্গত 'চহটা' গ্রামের স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গান তিনবার প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়বারে অর্থাৎ সপ্তম খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায় যে গানগুলি বাহির হইয়াছে, তাহার সপ্তম গানটির পাঠ এমন বিকৃত হইয়াছে, যে অর্থবোধই কঠিন। সুখের বিষয়, ঐ গানটির বিশুদ্ধ পাঠ পাওয়া গিয়াছে। স্বর্গীয় সতীশচন্দ্রের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত তারেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গানটি ও অন্যান্য কয়েকটি গান পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা ঐ গানটি প্রথমেই প্রকাশিত করিলাম। অবিশুদ্ধ পাঠের সহিত বিশুদ্ধ পাঠ মিল করিয়া দেখায় বিশেষ লাভ আছে। মুখে মুখে প্রচারিত হইতে হইতে গানের বা কবিতার পাঠ-বিকৃতি হয়। এ বিকৃতিরও একটা পদ্ধতি আছে, যদিও সেই পদ্ধতি সঠিকরূপে অবধারণ করা কঠিন। যাঁহারা প্রাচীন পুঁথির পাঠান্তরের মীমাংসা করিতে চাহেন, তাঁহাদের উচিত নানাপ্রকারের পাঠ-বিকৃতির আলোচনা করা। এইরূপ আলোচনা করিলে বিকৃত-পাঠের সংশোধন করার ক্ষমতা জন্মায়। ইহা ছাড়া আরও একটু কথা আছে। রচয়িতা প্রথমে একরূপ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার পর তিনি নিজেও কিছু কিছু বদ্‌লাইতে পারেন। তবে যে অংশের একেবারে অর্থ ই হয় না, সে সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য নহে। অন্য গানগুলি নূতন।

১

ইমন্—একতালা।

একি বিষম দায়, বিপদ পায় পায়, কেম্‌নেতে যায়, এ ঘরে বাস করা।
আল্‌গা নিঠা-সাঙ্গা, মূল খুঁটি মন ভাঙ্গা, (কোন্‌দিন) ঘর ভেঙ্গে মা ডাঙ্গা, হবে ভবদারা ॥
কাল-ঝড়ে মা ঝরে পড়ছে আয়ুধুলা, করছে ঘরে কেবল পাঁচটা ভূতে খেলা,
ঘুরছে ছয়টা চোর নয়টা দুয়ার খোলা, দিবানিশি জ্বালায় জ্বলে হলাম সারা ॥
প্রবেশ [illegible] না ঘরে জ্ঞানসূর্য্য-ভাতি, অবিদ্যা-আঁধারে পোহায় মা মা রাতি,
জ্বালতে দেয় না ভুলে আনন্দের বাতি, কুপ্রবৃত্তি অতি মূর্ত্তি ভয়ঙ্করা ॥
শুয়ে আছি মলিন আশা-শয্যা পেতে, বিষয়-চিন্তা ছার ছাড়ে না মা খেতে,
[illegible] জীয়ন্তে মরা ॥

ঘরে বাকি নাই মা কারো হতে আমলজারী, দুরন্ত তাড়না মশার কামড় ভারি,
শক্তি নাই যে তাড়ি, ভক্তি চাপড় মারি, অনুরাগ-মশারি, তাও হয়েছে ছেঁড়া ॥
কেন্দে সতীশ বলে প'ড়ে কর্ম্মফেরে, আর এন না মা ফিরে এমন দুঃখের ঘরে,
নাও মা কোলে করে চরণ তলে পড়ে, বাঁচি আলিস ছেড়ে জন্মের মতন তারা ॥

২

কওয়ালি।

তারা, এই নিবেদন তব কাছে।
জননী থাকিতে কত, মা-মরা শিশুর মত,
কাঁদিয়া বেড়াব নাছে নাছে ॥
কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা তো কভু নয়,
বিশ্বময় ঘোষণা এই আছে।
দেহি দীনে পদছায়া, জুড়াতে তাপিত কায়া,
হরজায়া তুমি বই কে আছে ॥
পঞ্চানন-দারা যবে, সতীশ পঞ্চত্ব পাবে,
মম পঞ্চ মিশাইবে পাঁচে।
সে দিনে পঞ্চত্বহরা, করোনা চরণ-ছাড়া,
শমন দাঁড়ায়ে আছে পিছে ॥

৩

একতালা।

মিছে এলি ভবে, কতদিন বা রবে, হরি বল্‌বি কবে, হবেরে চেতন।
সেদিন বলা নাহি যাবে, জীবন পলাবে, জন্মের মত শোবে, উঠ্‌বে নারে মন ॥
খাট পালঙ্ক তোর হেম কণ্ঠহার, সবই পড়ে রবে কলসী কাছা সার,
কিসের দর্প কর কিসের অহঙ্কার, জগৎ অন্ধকার মুদিলে নয়ন ॥
(গলা) ঘর্ ঘর্ করা দিন নিকট হয়ে এল, ঘর ঘর করা তোর এখন না গেল,
যা' হবার তা হ'ল আর কেন ভোল, বদন ভরে বল শ্রীমধুসূদন ॥
কাল থাকিতে কালার কাল রূপটি হের, কালাচাঁদের নাম কর-মালায় ধর,

৪

ঝাঁপতাল।

কে কপট লম্পট নবীন নটরাজ শঠ বসি যমুনাতট নিকট বংশীবট বিটপিতে।
হেরিলে পর চরণ সরোরুহে আদর করে কেবা,
প্রভাকর প্রখরকর জিনি নখর করপ্রভা,
তদুপরি নূপুর নরসুর ত্রিপুর মনোলোভা,
বাড়ে লালসা বদনশোভা রজনী দিবা নিরখিতে॥
ললাটে ফোঁটা নিতম্ব মোটা, করে বিজটা শোভে অতি,
ক্ষীণ কটিতে আঁটা কনকপাটা পিন্ধন পাট পীতধটি,
কান্তি ছটা কাজল ফোঁটা অথবা ঘনঘটা জ্যোতি,
ওরূপ হেরে মুরতি, রবে কে সতি অবলাজাতি অবনীতে॥
উল্লসিত জগন্নিশিথ শ্রুতিভূষিত নিরখিয়ে,
চিকুরাসিত সুখ হসিত হেরি যোষিতচিত দহে,
(যদি) হৃদে আসিত, ভাল বাসিত, দুখনাশিত কথা কয়ে,
গৃহ ত্যজিয়ে কুল মজিয়ে, যেতাম ওপায়ে রজঃ নিতে॥
মীনকেতন মনমোহন বনপ্রসূনমালা গলে,
নাসাভূষণ দোলে সঘন মৃদুপবন অনুকূলে,
(তার) হিরাখচিত হেমরচিত, চূড়া ঈষত বামে হেলে
দ্বিজ সতীশ বলে সকল ভুলে, ঐ চরণমূলে বিকাইতে॥

৫

ঝাঁপতাল।

বহু কষ্ট পেয়ে জঠরদ্বারে, কৃষ্ণ ভজিবারে এলে.
সেদিন মুক্তি পেতে কারাগারে, কাতরে তারে ডেকেছিলে।
এবার জগতে গিয়ে জনমিয়ে, করিব যাগ যজ্ঞ,
বলেছিলে সেই বলানুজে, করিব বৈরাগ্য,
এখন সে রাগ প্রতি বিরাগ অতি, ডাকনা গতিনাথে ভুলে,

হল কামাদি ষড়রিপুদল, সহ অন্তরঙ্গ,
ছলনা ছাড়া বলনা কথা, কর না সাধুসঙ্গ,
কোথা কনক কোথা কামিনী, দিবা যামিনী কাটাইলে,
হলনা অবসর কভু, ডাকৃতে হরি হরি বলে ॥
দ্বিজ সতীশ বলে, থেকনা ভুলে, জেনরে নিঃসন্দ
যেদিন যমকিঙ্করে বাঁধিবে করে (সেদিন) বাধিবে ঘোর দ্বন্দ্ব।
নাসারন্ধ্রে বায়ু বন্ধ হবে, দেখে বন্ধুগণ সব পলাইবে,
সেদিন দীনবন্ধু বিনে বন্ধন কে দিবে খুলে ॥

শেষ চারিটি গান বর্দ্ধমান জেলার শ্রীগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত শশধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

শিরোমণি মহাশয়ের গান

সপ্তমখণ্ডের প্রথম সংখ্যায় নিত্যধামগত কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি মহাশয়ের ২১টি গান বাহির হইয়াছে। ধলছত্র নিবাসী প্রসিদ্ধ ভাগবত-প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের খাতা হইতে আর একটি গান সংগৃহীত হইল।

২

আমি এলাম ভবে একা, যেতে হবে একা, সঙ্গে যাবে যে তার সঙ্গে দেখা কৈ।
একদিন ছিল দেখা মনে নাই, সেই দেখা মনে থাকার মত দেখা হলো কৈ ॥
উপায় ত কিছু দেখি নাই ভেবে, সংসার-সাগরে তরী ডুবে যাবে,
সেই সময় কাণ্ডারী হয়ে সঙ্গে যাবে (ও তাঁর) শ্রীচরণাশ্রিত হলেম কৈ ॥
এখনত বিষয় নাহিক বিরাম ভাবিয়ে না দেখি আপন পরিণাম।
করিত না, শমন-হারা হরিনাম, পরিণামের বন্ধু সে বিনে আর কৈ ॥
যদি মনে থাকত সেই সময়ের দেখা তবে রূপের সঙ্গে হত নাকি দেখা,
কি কপালের লেখা হল না তার দেখা আমায় সেই সময়ের দেখা দিয়ে রৈল কৈ।
কান্ত বলে এবার যা হবার তা হল, আর কি চরণ পাবার আশার আশা রৈল,
বৃথা ভবে মানবজনম, হয়েছিল চিন্তামণির চরণ পরশিলাম কৈ ? ॥

পুরাণো পুঁথি

মালদহের সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনগায়ক আইহোনিবাসী শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র মৈত্র মহাশয় বীরভূমি-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়কে কয়েকখানি হাতের লেখা পুরাণো পুঁথি উপহার দিয়াছেন। সম্পাদক ভাগবতরত্ন মহাশয় আমার উপর এই পুঁথি কয়খানির পরিচয় সঙ্কলনের ভার দিয়াছিলেন, সে আজ কয়েক মাসের কথা। নানা কারণে আমারই ত্রুটীতে অযথা বিলম্ব হইয়া গেল, আমি তজ্জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। পুঁথিগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

(১) "স্বরূপ দামোদরের কড়চা" ২৮ পাতায় সম্পূর্ণ, সহজিয়া সম্প্রদায়ের পুঁথি। ভনিতা এইরূপ—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পদ মনের উল্লাস।
শ্রীনিত্যানন্দ পদে সদা করি আস॥
দামোদর স্বরূপ কহেন তত্ত্ব সার।
অনুবাদ বিধয় দুই তত্ত্ব অবতার॥"

স্থানে স্থানে "স্বরূপ কহেন দামোদর দেন সায়" এইরূপ ভনিতাও আছে। রচনার বা নকলের কোনো সন তারিখের উল্লেখ নাই। পুঁথিখানির বর্ণনীয় বিষয় সংক্ষেপতঃ এই—প্রথমে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" এই নামের ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যা অবশ্য সহজিয়া মতের; তৎপরে রায় রামানন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু সংবাদ। ইহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত ভাবে নকল করা। রূপান্তর এইরূপ,—প্রভু প্রশ্ন করিতেছেন—

সম্পত্ত মধ্যে জীবের কোন সম্পত্ত সার"। রায় উত্তর দিতেছেন—

"স্বীকয্যা রমণি বিনে ধন নাহি আর"।

ইহার পর "যঃ কৌমার হর" শ্লোকের ব্যাখ্যা,—(ইহাও সহজিয়া মতে) চারি প্রকার রাগের বিবরণ, সংক্ষেপতঃ নায়ক নায়িকার প্রকারভেদ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। নায়ক নায়িকা বর্ণন—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি সিবসিংহ রায়।
শ্রীরূপ নারায়ণ [illegible]॥

এই পঞ্চজনা হয় নাএক গণন।
নাইকার নাম এবে সুন ভক্তগণ ॥
কছিমা রাজার রাণি আর রজকিনি।
চিন্তামণি বেশ্যা আর পদ্মাঠাকুরাণি ॥
এইত চতুর্থ জনা নাইকা কহিল।
প্রিসিদ্ধ রসিক ভক্ত ধর্ম্ম আচরিল ॥”

লেখকের মতে চণ্ডীদাস প্রভৃতি কৃপাসিদ্ধ নায়ক, চণ্ডীদাসের অবস্থা বুঝাইবার জন্য চণ্ডীদাসের ভনিতাযুক্ত একটী পদ পুঁথিখানিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটী এইরূপ—

তথাথি পদং

তার পরদিনে দেবি য়ারাধনে
বসিলা যতন করি।
য়াজি শুভদিন দেবি সুপ্রসন্ন
য়াগিনায় দেখিনু গোরি ॥
হায় মন চলি গেল কেন।
জাতি কুল সিল সকল তেজিয়া
স্মরণ লইনু যেন ॥
সুন সুন দেবি তুয়া পদ সেবি
বিফল হইল মোর।
পুন্য ধর্ম্ম গেল মোক্ষাদি সকল
বচন না পানু তোর ॥
দেবি কহে সুন আমার বচন
বিরস না হও তুমি।
আজি পুর্ণোদয় স্বভাব উদয়
জোগ বলে জানি আমি ॥
এই সারাতসার ইহা বিনে আর
কি য়াছে জগত মাঝে।
আমা হেন যত দেবা দেবি কত
কি করে তোমার কাজে ॥

জনম সফল জরা মৃত্ত গেল
ঘুচিল মোনের দায়।
হরি হর ব্রহ্মা স্থষ্টাদি জে কর্ম্মা
ধেয়ানে নাহিক পায়॥
পিরিতি রতন করিয়া জতন
আমার কথাট মান।
শুদ্ধ শুদ্ধ রতি স্বরূপেতে স্থিতি
প্রেম পরিমাণে গুণ॥
চণ্ডীদাসে কয় যাদি সর্ত্ত হয়
স্বরূপ স্বভাব দেহা।
বাগুলি চরণে করে নিবেদনে
ধুবিনি সঙ্গেতে লেহা॥

চণ্ডীদাসের সহজিয়া পদগুলির মূল নির্ণয়ে উদ্ধৃত পদটী হইতে কিছু সাহায্য মিলিতে পারে। এই হিসাবে এই ধরণের পুঁথিগুলি নিতান্ত মূল্যহীন বলিয়া মনে হয় না। এই পুঁথিখানিতে চণ্ডী-দাসের পর বিদ্যাপতি বিল্বমঙ্গল জয়দেব প্রভৃতির নানা কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী বর্ণিত আছে। বিদ্যাপতির গল্পটী এইরূপ—

বিদ্যাপতি বহু শিষ্য সঙ্গে বাল্যকালে কোনো একস্থানে পাঠাভ্যাসের জন্য যাতায়াত করিতেন। ফিরিবার পথে জল ঝড় হওয়ায় একদিন তাঁহারা এক "অনাদি" মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরে বসিয়া তর্ক আরম্ভ হইল—শ্মশানে যে একজন চোর শূলে বিদ্ধ হইয়া আছে কে এই অন্ধকার রাত্রে সেই শ্মশানে গিয়া শূলে একটা চিহ্ন রাখিয়া আসিতে পারে? বিদ্যাপতি বলিলেন আমি পারি। সকলে বলিল যাও, বিদ্যাপতি গেলেন—ফিরিবার সময় কে পেছন হইতে ডাকিল দাঁড়াও। বিদ্যাপতি দেখিলেন জ্যোতিতে শ্মশান আলোকিত, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, চৈত্ররূপা গুরু তাঁহাকে অমনি সাধন ভজন উপদেশ দিয়া ছাড়িয়া দিলেন। উপদেশ লছিমা রাণীকে ভজিতে হইবে ইত্যাদি। বিদ্যাপতি তখন হইতেই কবি। বিল্বমঙ্গল অর্থাৎ লীলাশুকের ও জয়দেবের কাহিনী প্রচলিত কাহিনীর অনুরূপ, বিশেষের মধ্যে তাঁহারা পূর্ব্ব জন্মে কে ছিলেন, পরে গৌর লীলায় কে হইয়াছেন ইত্যাদি।

(২) "মীরা বাইয়ের কড়চা" ইহাও সহজিয়া পুঁথি। পুঁথিখানি সংস্কৃতে শ্লোক-ছন্দে লেখা, কিন্তু সংস্কৃত এত অশুদ্ধ যে অপাঠ্য বলিলেও চলে। স্বনামপ্রসিদ্ধ শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী ও প্রেমিকা

(৩) "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" ঠাকুর মহাশয় নরোত্তমের স্বনামপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। পুঁথিখানি নানাস্থান হইতে মুদ্রিত হইয়াছে।

(৪) "রসকদম্ব", "বিদগ্ধমাধবের" অনুবাদ। অনুবাদক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি যদুনন্দন দাস। বৈষ্ণবসমাজে মূল নাটক এবং এই অনুবাদ দুইয়েরই বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। অনুরাগী পাঠক-সমাজেরও অনেকেরই নিকট যদুনন্দন দাসের নাম অপরিচিত নহে, সুতরাং পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। রসকদম্ব গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে তবে তাহাতে ভ্রম প্রমাদও যথেষ্ট। আলোচ্য পুঁথিখানিতে ভ্রম প্রমাদ খুব কম। আমাদের মনে হয় এইরূপ দুই চারিখানি পুঁথিকে আদর্শ করিয়া রসকদম্বের একখানি বিশুদ্ধ সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কারণ রসকদম্ব—অনুবাদ হইলেও বাঙ্গলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটী উল্লেখযোগ্য বিষয়,—বিদগ্ধমাধবের নিম্নোক্ত শ্লোক দুইটীর যদুনন্দন দাস কৃত অনুবাদ কবিতাটীকে অনেকে চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। কীর্ত্তনগায়কদেরও কেহবা যদুনন্দনের ভনিতায় কেহবা চণ্ডীদাসের ভনিতায় এই পদ গান করিয়া থাকেন। এই ভুলের সংশোধন প্রয়োজন। আমরা নিম্নে বিদগ্ধমাধবের শ্লোক, রসকদম্বের অনুবাদ ও চণ্ডীদাসের পদ উদ্ধৃত করিতেছি।

"নাদঃ কদম্ববিটপান্তরতো বিসর্পন্
কো নাম কর্ণপদবীমবিশন্নজানে।
হা হা কুলীনগৃহিণী গণ গর্হণীয়াং
যেনাদ্য কামপি দশাং সখি লম্ভিতাস্মি ॥"
"অজড়ঃ কম্পসম্পাদী শস্ত্রাদন্যো নিকৃন্তনঃ।
তাপোনেহ মুক্তাধারী কোবায়ং মুরলীরবঃ ॥"

(বিদগ্ধমাধব)

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিঞা পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিঞা ফেলি সুমাধুর্য্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে প্রাণে ॥
সখিহে নিশ্চয় করিঞা কহি তোরে।
হা হা কুলরমণীর গ্রহণ করিতে ধীর
যাতে কেন দশা হৈল তোরে ॥

শুনিঞা ললিতা কহে অন্য কোন শব্দ নহে
মোহন মুরলী ধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিঞা কেনে হৈলা তুমি বিমোহনে
রহ নিজ চিত্তে বান্ধি থেহ॥
রাই কহে কেবা হেন মুরলী রাজায় যেন
বিষামৃতে একত্র করিঞা।
হিম নহে সব তনু কাঁপাইছে হিমে জনু
প্রতি তনু শীতল করিঞা॥
অস্ত্র নহে অঙ্গে ফুটে কাটারীতে যেন কুটে
ছেদন না করে তনু মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়াএ আমার মতি
বিচারিতে নাহি পাই ওর॥
এতেক কহিতে ধনি উদ্বেগ বাড়ল জানি
নারে চিত্ত প্রবোধ করিতে।
কহে শুন আরে সখি তুমি মিথ্যা বল দেখি
মুরলীর নহে হেন রীতে॥
কোন্ সুনাগর সেই মোহন মন্ত্র পড়ে এই
হরিতে আমার ধৈর্য্য যত।
দেখিঞা এ সব রীত চমক লাগয়ে চিত
দাস যদুনন্দনের মত॥

(রসকদম্ব)

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি কি মাধুর্য্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে মনে॥
সখিরে নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
হাহা কুলাঙ্গনাগণ গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ
যাহে হেন দশা কৈল মোরে॥

শুনিয়া ললিতা কহে অন্য কোন শব্দ নহে
মোহন মুরলী ধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে হৈলা তুমি বিমোহনে
রহ নিজ চিত্তে ধরি থেহ॥
রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু কাঁপাইছে সব তনু
শীতল করিয়া মোর হিয়া॥
অস্ত্র নহে মন ফুটে কাটারিতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়ায় আমার মতি
চণ্ডীদাস ভাবি না পায় ওর॥

রসকদম্ব পুঁথিখানি ১৫০ পাতায় সম্পূর্ণ। এ পুঁথিখানিতেও নকলের সন তারিখের কোনো উল্লেখ নাই।

মালদহ একটী পুরাতন জেলা, এক সময় ইহা সমগ্র বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। এই রাজধানীর অধীশ্বরগণের বঙ্গসাহিত্যানুরাগ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। চেষ্টা করিলে এই জেলা হইতে বহু পুরাণো পুঁথির সন্ধান মিলিতে পারে। আমরা সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনগায়ক মহাশয়ের নিকট হইতে আরো পুরাণো পুঁথির প্রত্যাশায় রহিলাম।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

বিক্রমপুরে জাতীয় বিদ্যালয়

বিগত কয়েক বৎসর বড়দিনের সময় বিক্রমপুর পরগণার কয়েকখানি গ্রামে পর্য্যটন করিয়াছি আর জাতীয় বিদ্যালয়ের কয়েকজন কর্ম্মীর সহিত জাতীয় শিক্ষা-সম্বন্ধে আলাপ ও আলোচনা করিয়াছি। বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে কতগুলি জাতীয় বিদ্যালয় আছে, গতবারে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তাহার পর আট মাস হইয়া গিয়াছে। কাজেই পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভাবনা। তথাপি

তালিকাটি নিম্নে মুদ্রিত হইল। বিদ্যালয়ের নাম, ছাত্রসংখ্যা আর প্রধান কর্ম্মীর নাম এই তালিকায় দেওয়া হইল।

১। মুন্সীগঞ্জ চিত্তরঞ্জন জাতীয় বিদ্যালয়—ছাত্র ১২৫। প্রধান শিক্ষক শ্রীপরেশপ্রসন্ন সেন।

২। বজ্রযোগিনী ১৫০ শ্রীরমানাথ মিত্র।

৩। পাইকপাড়া ৪০ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস।

৪। ফুরসাইল (মালখানগর পোঃ) ১০০ শ্রীধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৫। টঙ্গিবাড়ী ৮০ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুপ্ত।

৬। হাসাড়া ৭০ শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

৭। লোহজং ৪০ শ্রীলক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

৮। দিঘীরপার ৪৫ শ্রীগণেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

নিম্নের তিনটি স্থান বিক্রমপুর পরগণায় না হইলেও বিদ্যালয়গুলিকে বিক্রমপুরের ভিতরেই ধরা হইয়াছে।

৯। নবাবগঞ্জ ২৫০ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

১০। মালিকান্দা (পোঃ মেথুলা) ৪০ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

নিম্নলিখিত বিদ্যালয় কয়টি উঠিয়া গিয়াছে। ক। জৈনসার, খ। কামারখাড়া, গ। লানিহাটি ঘ। বানরী। প্রথম তিনটি বিদ্যালয় ছাত্র ও শিক্ষকের অভাবে উঠিয়া গিয়াছে। চতুর্থটি উঠিয়া যাওয়ার কারণ পদ্মার ভাঙ্গন। বানরীতে বিদ্যালয় উঠিয়া গেলেও সর্ব্বস্বত্যাগী কর্ম্মী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত আশ্রম করিয়া প্রচুর খদ্দর প্রস্তুত করিতেছেন।

মুন্সীগঞ্জ, বজ্রযোগিনী, লোহজং, এই তিনটি বিদ্যালয়ে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের মাসিক সাহায্য আছে। নবাবগঞ্জ বিদ্যালয় ছাত্রবেতনেই চলে। অন্যান্য বিদ্যালয়গুলি কংগ্রেসেরই কর্ম্মকেন্দ্র। কর্ম্মীগণ অতিকষ্টে নিজেদের কোনরূপ গ্রাসাচ্ছাদনে তুষ্ট হইয়া এই কার্য্য চালাইতেছেন। স্বদেশ-কর্ম্মী শ্রীজিতেন্দ্রনাথ কুশারি মহাশয় এই তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

বীরভূমি] মাসিক পত্রিকা [৭—৮

১৩৩২

শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব

২ আমার বার্ষিকী

৩ মরমী কবি চিত্তরঞ্জন

৪ দেশবন্ধু প্রসঙ্গ

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব

১। শ্রীজীব গোস্বামীর মত

সুবিশাল পৌরাণিক সাহিত্য,—পুরাণ, উপপুরাণ, তাহাদের ভাষ্য ও টীকা, সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা দুরূহ, কিন্তু নিতান্তই আবশ্যক। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সমগ্র সাধনার প্রতিবিম্ব এই পৌরাণিক সাহিত্যেই পাওয়া যায়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অবিকৃত হৃদয়-স্পন্দন যদি যথাযথরূপে হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে এই পৌরাণিক সাহিত্যেরই শরণাপন্ন হইতে হইবে।

যাহার দ্বারা বেদের অর্থ পূর্ণ হইয়াছে, তাহারই নাম পুরাণ। পুরাণ পঞ্চম বেদ। বেদের ন্যায় পুরাণের অর্থও নিশ্চল। বেদ সকলেই পুরাণেই প্রতিষ্ঠিত। বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে, পুরাণ সমূহের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। শ্রুতি ও স্মৃতিতে যাহা পাওয়া যায় না, পুরাণ হইতে তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। পুরাণ বিবিধ প্রকার দেবতার কথা বলিয়াছেন, সুতরাং পুরাণের প্রকৃত অর্থ দুর্ব্বোধ্য। কল্পভেদে পুরাণের বিভিন্নতা হইয়াছে। সাত্ত্বিক কল্পে শ্রীহরির মাহাত্ম্য, রাজস কল্পে ব্রহ্মার, তামস কল্পে অগ্নি ও শিবের মাহাত্ম্য অধিক পরিমাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সত্ত্বরজস্তমোময় সংকীর্ণ কল্প সকলে সরস্বতী ও পিতৃগণের মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থে পুরাণসমূহের শ্রেণীবিভাগ আছে। সাত্ত্বিকা পুরাণসমূহ শ্রেষ্ঠ হইলেও তাহাদের মধ্যে নানারূপ মতভেদ আছে। কেহ বলেন ব্রহ্ম সগুণ, কেহ বলেন নির্গুণ, কেহ বলেন জ্ঞানমূলক, কেহ বলেন জড়মূলক, সুতরাং প্রকৃত সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারণ করা কঠিন। ব্রহ্মসূত্র হইতে পরমার্থ তত্ত্ব নিরূপণ করা যায়। এই মত সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের

সূত্রগুলি অল্পাক্ষর ও গূঢ়। এখন উপায় কি? শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয় তাঁহার 'তত্ত্ব-সন্দর্ভ' নামক সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক প্রবন্ধে, এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া ইহার উত্তর দিয়াছেন। "যদি অপৌরুষেয় বেদ, ইতিহাস ও পুরাণসকলের সারার্থপ্রকাশক, ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য, এই জগতে সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত, এবং পুরাণের সমুদয় লক্ষণযুক্ত কোন একখানি পুরাণ থাকে, তাহা হইলে সেই পুরাণের সাহায্যে এই সংশয়ের সমাধান হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতই সেই পুরাণচক্রবর্ত্তী বা মহাপুরাণ।"

ভগবান্ বেদব্যাস সমুদয় পুরাণ আবিষ্কার করিলেন, ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিলেন, কিন্তু শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যপূর্ণ বিচিত্র গূঢ় লীলাসম্বন্ধে সন্দেহ থাকায়, তিনি চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি দেবর্ষি নারদের উপদেশে সমাধিস্থ হইয়া আপনার রচিত সূত্রসকলের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রাপ্ত হইয়া প্রচার করিলেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যান্য যাবতীয় শাস্ত্রের সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীকে অবলম্বন করিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পৌরাণিক সাধনার পূর্ণতা, এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রেই পরিদৃষ্ট হয়। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—শ্রীকৃষ্ণই ভগবান্, স্বয়ং ভগবান্—এই মহাসত্য শ্রীমদ্ভাগবতেই সর্ব্বপ্রথম যথাযথরূপে প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-কথার আলোচনার প্রারম্ভে, এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র কোথা হইতে কি প্রকারে জগতে আসিলেন, তাহার আলোচনা আবশ্যক।

২। চতুঃশ্লোকী

সৃষ্টির উষা। শ্রীভগবানের নাভিপদ্মে ব্রহ্মা উপবিষ্ট। জগতের পরমগুরু ব্রহ্মা প্রপঞ্চসৃষ্টির জন্য চিন্তাকুল। যে জ্ঞানে প্রপঞ্চের সৃষ্টি হইবে, তাঁহার সে জ্ঞান নাই। চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সে জ্ঞান পাইতেছেন না। চিন্তা করিতেছেন। এমন সময় শুনিলেন, কে যেন বলিতেছে "তপ"। কথাটি শুনিলেন, চারিদিকে চাহিলেন, কিন্তু কোথা হইতে শব্দটি আসিল, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। ব্রহ্মা তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। শ্বাস জয় করিয়া, জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া, সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন।

[illegible] ব্রহ্মাকে বৈকুণ্ঠলোক দেখাইলেন। ক্লেশ নাই,

ধাম। ভগবানের পার্ষদগণ সকলেই চতুর্ভুজ, শ্যামোজ্জ্বল বর্ণ, কমলায়ত চক্ষু, পীতবর্ণ বসন, সুকোমলাঙ্গ। লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া শ্রীভগবানের চরণপূজা করিতেছেন, আর ভ্রমর-গুঞ্জন শুনিয়া ভাবাবেশে দুলিতে দুলিতে ভগবানের গুণগান করিতেছেন।

শ্রীবৈকুণ্ঠধাম। ব্রহ্মা দেখিলেন ভক্তপতি, লক্ষ্মীপতি, যজ্ঞপতি, জগৎপতি শ্রীভগবান্ আসীন। ব্রহ্মার হস্তধারণ করিয়া ভগবান্ তাঁহাকে আদর করিলেন। তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি যখন চিন্তাকুল, তখন "তপ" এই উপদেশ আমিই তোমাকে দিয়াছিলাম। তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট হইয়াছি। তপস্যা আমার হৃদয়, আমি তপস্যার আত্মা, আমি তপস্যার প্রভাবেই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করি। তপস্যা আমার বীর্য্য-স্বরূপ। আমার সম্বন্ধীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ভক্তি, অতিশয় গুহ্য। সাধন-সহিত সেই সমুদয় তত্ত্ব আমি তোমাকে বলিতেছি। আমার যেরূপ স্বরূপ, সত্ত্ব, রূপ, গুণ ও কর্ম্ম আমার কৃপায় তুমি সকলই সম্যক্‌রূপে জানিতে পারিবে। এই বলিয়া ভগবান্ ব্রহ্মাকে চারিটি শ্লোকে উপদেশ দিলেন। এই চারিটি শ্লোকের নাম চতুঃশ্লোকী ভাগবত বা আদি ভাগবত। সেই শ্লোক চারিটি এই—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎপরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং ॥ ১ ॥
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথাতমঃ ॥ ২ ॥
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥ ৩ ॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ৪ ॥

পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীর মতানুযায়ী অর্থ :—সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম। অন্য কিছুই ছিল না। স্থূল ও সূক্ষ্মের কারণ যে প্রকৃতি, তাহাও তখন ছিল না। প্রকৃতি তখন অন্তর্মুখ হইয়া আমাতে বিলীন ছিল। "অহঞ্চ তদা আসমেব কেবলং ন চান্যদকরবং" আমিও তখন কেবল ছিলামই মাত্র, আর কিছু করি নাই। সৃষ্টির পর আমিই থাকি।

চানাদ্যন্তত্বাদদ্বিতীয়ত্বাচ্চ পরিপূর্ণোহমিত্যুক্তং ভবতি'—অনন্ত ও অদ্বিতীয়, অতএব আমি পরিপূর্ণ। ১।

বস্তুতঃ নাই এমন কিছু আত্মায় প্রতীত হইতেছে; আবার আছে, অথচ প্রতীত হয় না। যেমন দুই চন্দ্র—ইহা প্রথমোক্ত ব্যাপারের উদাহরণ; আর অন্ধকার, ইহা দ্বিতীয়োক্ত ব্যাপারের উদাহরণ। সত্য করিয়া দুই চন্দ্র নাই, কিন্তু মনে হইতেছে আছে; আর অন্ধকার আছে, মনে হইতেছে কিছুই নাই। যাহা হইতে এই দুই প্রকারের ব্যাপার ঘটে, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে। ২।

পূর্ব্বের শ্লোকে দুই চন্দ্রের প্রতীতির কথা বলা হইয়াছে। এই প্রতীতির নাম 'আভাস'। 'আভাস' কি, তাহাই এই শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে। যেমন সৃষ্টির পর মহাভূতসমূহ উচ্চ ও নীচ সকল ভূতে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্ট, কারণ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই মহাভূতসমূহ কারণরূপে বিদ্যমান ছিল, কার্য্যরূপী ভূতসমূহ তখন ছিল না; আবার কার্য্য-রূপী ভূতসমূহ ধ্বংস হইলেও মহাভূতসমূহ থাকিবে। সুতরাং, ভূতসমূহে মহাভূতগুলি প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্ট। সেইরূপ আমিও ভূত ও ভৌতিক পদার্থসমূহে আছি এবং নাই। আমার সত্তা এইরূপ। ৩।

যাঁহারা আত্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসু, তাঁহারা এইরূপ বিচার করিবেন। কার্য্যসমূহে কারণরূপে বা কারণ বলিয়া যে অনুবৃত্তি, তাহার নাম—'অন্বয়'; আর কারণাবস্থায় কার্য্যের সহিত যে ব্যাবৃত্তি তাহার নাম—'ব্যতিরেক'। এই প্রকারের 'অন্বয়' ও 'ব্যতিরেক'-পদ্ধতির দ্বারা বিচার করিলে, যাহা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা আছে বলিয়া বুঝা যায়, তাহাই আত্মা। "জাগ্র-দাদ্যবস্থাসু তত্তৎসাক্ষিতয়ান্বয়ঃ ব্যতিরেকশ্চ সমাধ্যাদৌ"—জাগ্রদাদি অবস্থাসমূহে সেই অবস্থাগুলির সাক্ষীরূপে আত্মার 'অন্বয়', আর সমাধি অবস্থায় 'ব্যতিরেক'। ৪।

শ্লোক চারিটি যে বেশ কঠিন, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মহাজনগণ বিস্তারিতরূপে এই শ্লোকচারিটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার দুএকটি কথা নিম্নে বিবৃত হইল।

অভিধেয়াদিচতুষ্টয় চারিটি শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে। প্রথমে, জ্ঞানের জন্য নিজের লক্ষণ বলিতেছেন। ভগবান্ বলিতেছেন,—সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম। এই [illegible] অতএব তিনি মূর্ত্তিবিশিষ্ট, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নহেন।

পরম মনোহর শ্রীবিগ্রহ যাহা ব্রহ্মার নিকট এখন প্রকাশিত হইয়াছেন, তিনি মহাপ্রলয়েও থাকেন, ইহাই তাৎপর্য্য।

দ্বিতীয় শ্লোকে মায়ার লক্ষণ। শ্রীল জীব গোস্বামী মহোদয় বলিতেছেন—

অর্থং পরমার্থভূতং মাং বিনা যৎ প্রতীয়েত। মৎপ্রতীতৌ তৎপ্রতীত্যভাবাৎ মত্তো বহিরেব যস্য প্রতীতিরিত্যর্থঃ। যচ্চাত্মনি ন প্রতীয়েত যস্য চ মদাশ্রয়ত্বং বিনা স্বতঃ প্রতীতির্নাস্তীত্যর্থঃ॥—আমি পরমার্থভূত, আমি ছাড়া যাহা প্রতীত হয় অর্থাৎ যেখানে বা যে অবস্থায় আমার বোধ নাই, সেই অবস্থায় যাহার বোধ হয়। আমার প্রতীতি হইলেই আর যাহার প্রতীতি থাকে না, অতএব আমার বাহিরেই যাহার প্রতীতি। আবার যাহা আত্মার আশ্রয়-ব্যতীত আপনা হইতে প্রতীত হয় না।

তথা লক্ষণাং বস্তু আত্মনো মম পরমেশ্বরস্য মায়াং জীবমায়াগুণমায়েতি দ্ব্যাত্মিকাং মায়াখ্যশক্তিং বিদ্যাৎ।—এই প্রকারের লক্ষণযুক্ত যে বস্তু তাহাকেই পরমেশ্বরের মায়া বলিয়া জানিবে। জীবমায়া ও গুণমায়া,—মায়াশক্তি এই দুইরূপ। (অন্যান্য কথা, সময়ান্তরে আলোচ্য।)

ব্রহ্মাকে এই চতুঃশ্লোকী ভাগবত বলিয়া ভগবান্ বলিলেন,—'তুমি একাগ্রচিত্তে আমার এই মতের অনুষ্ঠান কর। এইরূপ করিলে কল্পে কল্পে বিবিধ সৃষ্টি করিয়াও মুগ্ধ হইবে না, অর্থাৎ "আমি কর্ত্তা" এই প্রকার অভিনিবেশ তোমার কখনও হইবে না।

ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন, তিনি যেমন পদ্মের উপর বসিয়াছিলেন, তেমনিই বসিয়া আছেন। তাহার পর ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টির পর প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য ব্রহ্মা আবার তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে নারদ বিষ্ণুর মায়া জানিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ভক্তি সহকারে ব্রহ্মার সেবা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইলে নারদ তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই প্রশ্নগুলির উত্তরে ব্রহ্মা নারদকে যাহা বলিলেন, তাহা সেই চতুঃশ্লোকী আদি ভাগবতের তাৎপর্য্য বা অর্থ। শ্রীমদ্ভাগবতের যে দশটি লক্ষণ বা বর্ণনীয় বিষয়, এই চারিটি শ্লোকে তাহা আছে। (শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধ নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

৩। ব্রহ্মা ও নারদ

ইহা জানিতেন না। ব্রহ্মাকে তপস্যা করিতে দেখিয়া নারদের মনে আশঙ্কা হইল এবং তিনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনার বিজ্ঞানদাতা কে, আপনি কাহার আশ্রিত ও কাহার অধীন, আপনার স্বরূপই বা কি ?'

নারদের প্রশ্ন নিম্নের শ্লোকটিতেই বুঝিতে পারা যায়।

স্বরূপং যদধিষ্ঠানং যতঃ সৃষ্টমিদং প্রভো।
যৎসংস্থং যৎপরং যচ্চ তত্ত্বং বদ তত্ত্বতঃ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে নারদ ব্রহ্মার নিকট আত্মতত্ত্বনিদর্শন জ্ঞান প্রার্থনা করিয়াছেন। যে জ্ঞানের দ্বারা আত্মতত্ত্ব যথার্থরূপে পাওয়া যায় (নিতরাং দৃশ্যতে যেন তৎ নিদর্শনং) নারদ সেই জ্ঞানের প্রার্থী। 'উপলক্ষণভূতং বিশ্বমেবাত্মজ্ঞানসাধনং' বিশ্বজ্ঞান উপলক্ষণের দ্বারা আত্মজ্ঞানের সাধক, এই কারণে নারদ এই শ্লোকে এই প্রশ্নগুলি করিতেছেন।—এই বিশ্ব যেরূপে প্রকাশ পায়, যাহা আশ্রয় করিয়া আছে, যাহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট, যাহাতে লীন হয়, যাহার অধীন স্বয়ং যৎস্বরূপ, এ সকল বিষয়ের তত্ত্ব যথার্থরূপে বলুন।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম, এই তিন অধ্যায়ে ব্রহ্মা নারদের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। এই তিন অধ্যায়কে আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্তর বলিতে পারি।

ব্রহ্মা প্রথমেই নারদকে বলিলেন—

যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহং।
যথার্কোঽগ্নির্যথা সোমো যথর্ক্ষগ্রহতারকাঃ ॥
তস্মৈ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি।
যন্মায়য়া দুর্জ্জয়য়া মাং বদন্তি জগদ্‌গুরুং ॥
বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকথন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ ॥

পরমেশ্বর স্বপ্রকাশ। এই বিশ্ব তাঁহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আমি উহা সৃষ্টির দ্বারা অভিব্যক্ত করি। সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রাদি যেমন চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত বিশ্বকেই প্রকাশ করে, আমিও ঠিক্ সেইরূপই করি। অতএব সেই ভগবান্ বাসুদেবকে

বলিতেছ। মায়া এইরূপ দুর্জ্জয় হইলেও, পরমেশ্বরের দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জিতা হয়। পরমেশ্বরের আবির্ভাব হইলেই মায়া মনে করেন, ইনি আমার প্রভু, ইনি আমার কপট জানেন। কাজেই তাঁহার উপর মায়ার কার্য্য নাই। আমাদের ন্যায় যাঁহারা দুর্বুদ্ধি, মায়া তাঁহাদিগকেই মোহিত করে। দুর্ব্বোধদিগের জ্ঞান অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হওয়ায় তাহারা "আমি, আমার" এই প্রকার আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে।

ব্রহ্মা নারদকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা দ্বিতীয় স্কন্ধের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয়, কাল ও কর্ম্মাদি শক্তির দ্বারা বিরাট্ সৃষ্টি-রূপ হরির লীলা। ষষ্ঠ অধ্যায়ে

ষষ্ঠে বিরাড্বিভূতিশ্চ প্রোক্তাধ্যাত্মাদিভেদতঃ।
দৃঢ়ীকৃতঞ্চ পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বং পুরুষ সূক্ততঃ ॥—শ্রীধর

এই অধ্যায়ে, অধ্যাত্মাদি ভেদে বিরাট্ পুরুষের বিভূতি কথিত হইয়াছে, আর পুরুষ-সূক্তের দ্বারা ঐ বিষয় দৃঢ়ীকৃত করা হইয়াছে।

সপ্তমে ভগবল্লীলাবতারা ব্রহ্মণোদিতাঃ।
নারদায় তু তৎকর্ম্মপ্রয়োজনগুণৈঃ সহ ॥

সপ্তম অধ্যায়ে ব্রহ্মা নারদকে ভগবানের লীলাবতারগণের কথা, তাঁহাদের কর্ম্ম, প্রয়োজন ও গুণের কথা বলিয়াছেন।

(ক) সৃষ্টি-লীলা

পঞ্চমে নারদং প্রাহ তত্ত্বানাং সৃষ্টিমাত্মভূঃ।
তৈর্বিরাজশ্চ তৎপাদাদ্যৈর্ভূরাদি কল্পনাং ॥

প্রথম, তত্ত্ব-সমূহের সৃষ্টি, সেই তত্ত্বসমূহের দ্বারা বিরাট-সৃষ্টি, সেই বিরাটের পদাদি অঙ্গে ভূঃ প্রভৃতি লোকের কল্পনা,—এই তিনটি বিষয় পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

সৃষ্টি-লীলা বড়ই কঠিন বিষয়। শ্রীমদ্ভাগবত এইস্থানে যাহা বলিয়াছেন, তাহার দু একটি মাত্র কথা সংক্ষেপে বলা হইতেছে। মহাভূতসমূহ (দ্রব্যং), কর্ম্ম, কাল, স্বভাব, জীব,—এই পাঁচটি তত্ত্ব স্বীকার করিয়া সৃষ্টি-লীলার আলোচনা করা হইয়াছে। মহাভূতসমূহ উপাদান, কর্ম্মজন্মের নিমিত্ত, কাল সেই জন্মের বা গুণের ক্ষোভক, স্বভাব

পরিণামের হেতু, জীব ভোক্তা,—এই পঞ্চ লইয়া প্রপঞ্চ। বিশ্বের যে কোন ব্যাপারেরই আলোচনা করা যাউক না কেন, এই পাঁচটিকে ধরিয়া না লইলে উপায় নাই।

ব্রহ্মা নারদকে বলিলেন—

দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যোর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ॥

এই পঞ্চ, বাসুদেব হইতে ভিন্ন নহে। যেহেতু কারণ-ব্যতিরেকে কার্য্যের অর্থ নাই, ইহাই তত্ত্ব।

এই শ্লোকে বাসুদেবকে পরতত্ত্ব ও সর্ব্বকারণকারণ বলিয়াই পরবর্ত্তী দুইটি শ্লোকে নারায়ণের সর্ব্বময়তা ও সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। বাসুদেব ও নারায়ণ, এই উভয় তত্ত্বই এক, এ সম্বন্ধে কোন টীকাকার কোনরূপ আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করেন নাই।

নারায়ণ পরা বেদা দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ।
নারায়ণ পরা লোকা নারায়ণপরা মখাঃ॥
নারায়ণ পরো যোগো নারায়ণ পরন্তপঃ।
নারায়ণ পরং জ্ঞানং নারায়ণপরা গতিঃ॥

সেই নারায়ণই দ্রষ্টা (সর্ব্বসাক্ষী), কূটস্থ (সর্ব্বকালব্যাপী), সকলের অন্তর্যামী।

এই লক্ষণগুলি উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া বুঝিয়া রাখা আবশ্যক। প্রথমে এইগুলি না বুঝিলে, লীলা বুঝিবার সময় গোলযোগ হয় এবং অযথা বোধ হইয়া থাকে।

সৃষ্টির কথা আমাদের সব পুরাণেই প্রায় একরূপ। আদিতে নির্গুণ ব্রহ্ম, তিনি মায়া দ্বারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণকে গ্রহণ করিলেন। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, এই তিন গুণের দ্বারা হইবে। মায়ার দ্বারা তিনি গুণত্রয় গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বতন্ত্র। প্রথমে বলা হইয়াছে তিনি নির্গুণ, কিন্তু মায়ার দ্বারা গুণত্রয় গ্রহণ করিলেন। লীলাবাদী ভক্ত ইহার অর্থ করিলেন—

“অত্র মায়য়া নিত্যমেব তদ্গুণরূপত্বেঽপি গৃহীতা ইতি প্রয়োগো নিত্য নরবিগ্র-

মনে করিবেন না। শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের শেষ অধ্যায়ে আছে—শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছায় নরবপু গ্রহণ করিলেন। ইহার অর্থ এমন নহে যে, এই নরবপু তাঁহার ছিল না। প্রকৃত কথা, নরবপু নিত্য। তবে 'গ্রহণ করিলেন' কথার অর্থ কি? একথাটি লৌকিক উক্তির অনুকরণে বলা হইয়াছে। গুণত্রয়-সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই। কারণ তাঁহাতে সমুদয়ই নিত্যরূপে বিরাজমান। যাহা হউক, সৃষ্টিকথাও পরে আলোচ্য।

ভূত, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সৃষ্ট হইল, কিন্তু তাহাদের মিলন হয় না, তাহাদের দ্বারা কোন শরীর নির্ম্মাণ হয় না। তখন ভগবানের স্বীয় শক্তির আকার আবির্ভাব হইল। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইল। এই ব্রহ্মাণ্ড বহু সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জলে শয়ান ছিল। কাল, জীবের অদৃষ্ট ও স্বভাবে অধিষ্ঠান করিয়া, পরমাত্মা এই অচেতন অণ্ডকে সচেতন করিলেন। এই পুরুষ (হিরণ্যগর্ভের অন্তর্যামী) পরিশেষে অণ্ড হইতে বাহির হইলেন। ইনিই বেদের সহস্রশীর্ষা পুরুষ। ইঁহার সহস্র মস্তক, সহস্র বদন, সহস্র চক্ষুঃ, সহস্র বাহু, সহস্র উরু, সহস্র চরণ। ইঁহার দ্বারা এই অণ্ড পৃথকীকৃত হইল। এই পুরুষের অবয়বের দ্বারাই চতুর্দ্দশ ভুবন রচিত হইয়াছে। তাঁহার মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ জন্মাইয়াছে বা কল্পিত হইয়াছে।

(খ) বিরাট্ পুরুষের বিভূতি

আমাদের বাগিন্দ্রিয় সকল, বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা এবং অগ্নি, এই বিরাট্ পুরুষের মুখে জন্মাইয়াছে। বিরাট্ পুরুষের ত্বক্ প্রভৃতি সপ্ত ধাতু, গায়ত্রী প্রভৃতি সপ্তচ্ছন্দের উৎপত্তি স্থান। বিরাট পুরুষের রসনায় দেবতাদের অন্ন হব্য, পিতৃলোকের অন্ন কব্য, আর মনুষ্যগণের অন্ন অমৃত; ছয় প্রকার রস, রসনেন্দ্রিয় ও ঐ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বরুণের ক্ষেত্র। ইনিই আদ্য পুরুষ।

স এষ আদ্যঃ পুরুষঃ কল্পে কল্পে সৃজত্যজঃ।
আত্মাত্মন্যাত্মনাত্মানং স সংযচ্ছতি পাতি চ॥
বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্ সম্যগবস্থিতং।
সত্যং পূর্ণমনাদ্যন্তং নির্গুণং নিত্যমদ্বয়ং॥

আপনাকে সৃজন পালন ও সংহার করেন। তিনি বিশুদ্ধ অর্থাৎ উপাধি-শূন্য, সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ। তিনি সকলের অন্তর্যামী, সন্দেহাদি রহিত, তিনি নির্গুণ, গুণক্ষোভজাত কোনরূপ চাঞ্চল্য তাঁহাতে নাই। তিনি জন্মমৃত্যু রহিত, সর্ব্বদা পরিপূর্ণ ও নিত্য অদ্বৈত।

এই পুরুষবাদ বেদে আছে। পুরাণে এই বৈদিক সত্য বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পুরুষবাদ না বুঝিলে, লীলা বুঝা যায় না।

(গ) অবতার লীলা

ব্রহ্মা নারদকে সংক্ষেপে অবতারগণের নাম, কর্ম্ম, প্রয়োজন, গুণ প্রভৃতি বলিয়াছেন। এই অধ্যায়ে পর পর নিম্নলিখিত অবতারগণের নাম ও পরিচয় আছে।

১। **বরাহ**—ভগবান্ বিষ্ণু পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য এই শরীর গ্রহণ করেন। সেই সময়ে মহাসমুদ্র মধ্যে আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষ তাঁহার সম্মুখীন হয়। বরাহদেব দন্তের দ্বারা এই দৈত্যকে বিদীর্ণ করেন।

২। **সুযজ্ঞ**—ভগবান্, প্রজাপতি রুচির ভার্য্যা আকূতির গর্ভে এই নামে আবির্ভূত হন। সুযজ্ঞের স্ত্রীর নাম দক্ষিণা। সুযম প্রভৃতি দেবতারা তাঁহার পুত্র। সুযজ্ঞ নিজেই ইন্দ্র হইয়া ত্রিলোক পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম সুযজ্ঞ ছিল, ত্রিলোকের দুঃখ হরণ করেন বলিয়া তাঁহার মাতামহ স্বায়ম্ভুব মনু, তাঁহার নাম রাখিলেন "হরি"।

৩। **কপিল**—কর্দ্দম প্রজাপতির স্ত্রীর নাম দেবহূতি। তাঁহাদের নয়টি কন্যা ও একটি পুত্র। এই পুত্রের নামই কপিল। কপিলদেব তাঁহার মাতাকে আত্মজ্ঞান শিখাইয়াছিলেন, সেই জ্ঞানের ফলে তাঁহার মাতার মুক্তি হয়।

৪। **দত্তাত্রেয়**—অত্রি ঋষি পুত্র কামনা করিয়া অনেক তপস্যা করেন। তপস্যার ফলে ভগবান্ আসিয়া তাঁহাকে বলেন—'আমি পুত্ররূপে তোমাতে দত্ত হইলাম'। এই কারণেই তাঁহার নাম দত্তাত্রেয়। এই অবতারে তিনি তাঁহার ভক্তগণকে অনেক যোগৈশ্বর্য্য প্রদান করেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন তাঁহার ভক্ত। তিনি ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের [illegible] করিয়া ইহলোকে প্রচুর ভোগ ও পরলোকে মোক্ষ লাভ করেন।

৫। **চতুঃসন**—(সনৎকুমার, সনক, সনন্দন ও সনাতন) ব্রহ্মা তপস্যা করিতেছিলেন। অভিপ্রায় লোকসৃষ্টি। সেই তপস্যা ব্রহ্মা ভগবানে সমর্পণ করেন। ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া এই মূর্ত্তিচতুষ্টয় ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বকল্পের অবসানে যে প্রলয় হইয়াছিল, তাহাতে 'আত্মতত্ত্ব' লুপ্ত হইয়া যায়। ভগবান্ এই চতুঃ-সন অবতারে সেই আত্মতত্ত্ব অতি সুন্দররূপে পুনঃ প্রচারিত করিলেন। এমন সুন্দর-ভাবে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছিল যে, মুনিরা উহা শুনিবামাত্র তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন।

৬। **নারায়ণ ও নর**—দক্ষ প্রজাপতির এক কন্যার নাম মূর্ত্তি। ধর্ম্ম তাঁহাকে বিবাহ করেন। ভগবান্ এই দুই মূর্ত্তিতে তাঁহাদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নারায়ণ ও নর, ইঁহারা দুজনেই ঋষি। ইঁহারা কঠোর তপস্যা করিতে-ছিলেন। মদন তাঁহাদের তপোভ্রংশ সাধনের জন্য অপ্সরা পাঠাইয়াছিলেন। অপ্সরা-গণ আসিয়া দেখে—তাহাদেরই মত, এবং তাহাদের অপেক্ষা আরও সুন্দরী স্বর্গীয় বারনারী-গণ তাঁহাদের সেবা করিতেছে। ফলে অপ্সরাগণ নারায়ণ ও নরের তপস্যার বিঘ্ন ঘটাইতে পারে নাই।

৭। **পৃশ্নিগর্ভ**—উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুবকে কৃপা করিয়া ইনি ধ্রুবপদ প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে এই অবতারের নাম নাই। কেবলমাত্র তাঁহার কার্য্যের উল্লেখ আছে। শ্রীধর স্বামীও তাঁহার টীকায় এই অবতারের নামোল্লেখ করেন নাই। টীকায় বলিয়াছেন—"চরিত্রেণৈব কমপ্যবতারং সূচয়তি" চরিত্রের দ্বারা অর্থাৎ কার্য্যের দ্বারা কোন এক অবতারের কথা বলিতেছেন। আমরা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের টীকানুযায়ী এই নামের উল্লেখ করিলাম।

৮। **পৃথু**—বেণরাজা নিতান্ত বিপথগামী হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা অভিশাপ-রূপ বজ্রের দ্বারা তাঁহার পৌরুষ ও ঐশ্বর্য্য দগ্ধ করেন। ভগবান্ এই বেণরাজকে কৃপা করিয়া তাহার পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন। বেণরাজা পুত্র লাভ করিয়া নরক হইতে উদ্ধার হন। পৃথু অবতারে ভগবান্ রাজা হইয়া পৃথিবীকে দোহন করেন।

নাভি ও সুদেবীর পুত্রের নাম ঋষভদেব। তিনি মুক্তসঙ্গ, সমদর্শী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিত্য সমাধি আশ্রয় পূর্ব্বক পারমহংস্য পদের চিন্তা করিতেন।

১০। **হয়গ্রীব**—ব্রহ্মার যজ্ঞে সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ অশ্বের মস্তক ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণ স্বর্ণের ন্যায়। তাঁহার নিশ্বাস হইতে বেদবাক্য সমূহ বাহির হইয়াছিল। তিনি বেদময় ও যজ্ঞময় অখিল দেবতার আত্মা।

১১। **মৎস্য**—যুগান্তকালে ভগবান এই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীর ও যাবতীয় জীবের আশ্রয় হইয়াছিলেন। বৈবস্বত মনু তাঁহার ঐ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। প্রলয়কাল উপস্থিত দেখিয়া ব্রহ্মার মুখ হইতে সেই সময়ে বেদসমূহ স্খলিত হইতেছিল। মৎস্যদেব সেই বেদসমূহ গ্রহণ করিয়া প্রলয় সলিলে বিহার করেন।

১২। **কচ্ছপ**—দেবতা ও অসুরে মিলিত হইয়া অমৃত লাভের জন্য ক্ষীরোদ-সাগর মন্থন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা মন্দর পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড করিয়াছিলেন। ভগবান্ এই মন্থনদণ্ডকে যথাস্থানে রাখিবার জন্য কচ্ছপরূপ গ্রহণ করিয়া নিজের পৃষ্ঠদেশে মন্দর পর্ব্বতকে ধারণ করিলেন। ঐ পর্ব্বত যখন তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ঘূর্ণিত হইতেছিল, তখন তাঁহার কোনরূপ ক্লেশ হয় নাই, বরং আরাম হইতেছিল। এমনই আরাম হইতেছিল যে, সেই আরামে তিনি সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন।

১৩। **নৃসিংহ**—দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকে উরুদেশে রাখিয়া নখদ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করেন।

১৪। **হরি**—এক যূথপতি মহাগজ সরোবরে জলপান করিতেছিল। সেই সময়ে এক মহাবল কুম্ভীর তাহার পদ কামড়াইয়া ধরে। গজপতি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও যখন রক্ষা পাইল না, তখন শুণ্ডের দ্বারা একটি পদ্ম গ্রহণ করিয়া কাতরস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিল—"হে আদিপুরুষ, হে অখিল লোকনাথ, হে পুণ্যশ্রবঃ, হে শ্রবণ-মঙ্গল নামধারিন্, আমি আর্ত্ত, আমায় পরিত্রাণ করুন। এই প্রার্থনায় শরণাগতরক্ষক শ্রীভগবান্ গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং চক্রের দ্বারা কুম্ভীরের বদন বিদীর্ণ করিয়া গজেন্দ্রকে রক্ষা করিলেন।

১৫। **বামন**—কশ্যপ ও অদিতির পুত্র। অদিতির পুত্র দ্বাদশ আদিত্য।

পরিমাণ ভূমি যাচ্ঞা করেন। বলিরাজ ঐ ভূমি দান করিলে, তিনি পাদন্যাস দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করেন। এই প্রকারে বলিরাজের সমগ্র রাজ্য অধিকার করিয়া তাহা ইন্দ্রকে দান করিয়াছিলেন। বলি ধর্ম্মপথেই ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট করিতে হইলে, ভিক্ষা করা ব্যতীত আর উপায়ান্তর ছিল না; এবং ভগবান্ তাহাই করিয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্য ভ্রষ্ট করিয়া তিনি বলির অনিষ্ট করেন নাই, তিনি বলিকে সালোক্য দিবার জন্যই এই কার্য্য করিয়াছিলেন। বলিরাজের মহিমার সীমা নাই। তিনি ভক্তি সহকারে বামনদেবের চরণপূজা করিয়া পাদ প্রক্ষালন জল নিজের মাথায় ধারণ করিয়াছিলেন। শুক্রাচার্য্য বলিরাজের গুরু। বলি যখন বামনদেবকে ত্রিপাদ ভূমি দান করিতে উদ্যত, শুক্রাচার্য্য তখন দেবতাদের দুরভিসন্ধি বুঝিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বলি ধর্ম্মরক্ষার জন্য তাহাও শুনেন নাই।

১৬। **হংস**—এই অবতারে ভগবান্ ভক্ত নারদের প্রতি বিশেষরূপে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আত্মতত্ত্ব-প্রকাশক ভাগবত জ্ঞান ও ভক্তিযোগ শিখাইয়াছিলেন।

১৭। **মন্বন্তরাবতার**—ভিন্ন ভিন্ন মন্বন্তরে তিনি মনুবংশ পালক। তাঁহার সুদর্শনচক্রও যেমন দশদিকে অপ্রতিহত, তাঁহার তেজঃও তদ্রূপ। তাঁহার চরিত্র পবিত্র, কীর্ত্তি কমনীয়া। মহর্লোক, জনলোক ও তপোলোকের উপরিস্থ সত্যলোকেও তাঁহার কীর্ত্তি বিস্তৃত হয়, তিনি দুষ্ট রাজগণের দণ্ড বিধান করেন।

এই স্থানে কোন মন্বন্তরাবতারের নামের উল্লেখ নাই। শ্রীধর স্বামীর টীকার প্রারম্ভে আছে—"ততমন্বন্তরাবতারমাহ" মূলে আছে—"মন্বন্তরেষু।" সুতরাং চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের চতুর্দ্দশ অবতার বুঝিতে হইবে।

১৮। **ধন্বন্তরি**—দৈত্যেরা যজ্ঞভাগ অবরুদ্ধ করিয়াছিল—তাহা উদ্ধার করিয়া আয়ুর্ব্বেদ প্রবর্ত্তিত করেন।

১৯। **পরশুরাম**—ক্ষত্রিয়েরা ব্রহ্মদ্রোহী হইয়া বেদমার্গ পরিত্যাগ করেন। ভগবান্ এই অবতারে একবিংশবার ক্ষত্রিয় কুলকে বিনাশ করেন।

২০। **রামচন্দ্র**—ভরত প্রভৃতি অংশের সহিত ইক্ষ্বাকুবংশে আবির্ভূত হইয়া পিতৃসত্য পালনের জন্য প্রিয়তমা পত্নী সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বনে গমন

২১। **শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম**—অসুরগণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করায় পৃথিবী পীড়িতা হইয়া পড়েন। সিতকৃষ্ণ কেশধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার অংশ বলদেবের সহিত স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিয়া বহু বহু অলৌকিক কর্ম্ম করেন।

এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অনেক কথাই বর্ণিত হইয়াছে, আমরা পরবর্ত্তী গ্রন্থে সেই শ্লোকগুলির আলোচনা করিব।

২২। **বেদব্যাস**—কালের প্রভাবে মানুষের বুদ্ধি সঙ্কুচিত হয়। মানুষ আর বেদ বুঝিতে বা ধারণ করিতে পারে না। তখন ভগবান সত্যবতীর গর্ভে বেদব্যাসরূপে আবির্ভূত হইয়া শাখাভেদে বেদ-বৃক্ষকে বিভক্ত করেন।

২৩। **বুদ্ধ**—পূর্ব্বে যেসব অসুরেরা বেদের ও দেবতার বিরোধী ছিল, কালে তাহারাও বেদমার্গ অবলম্বন করিল। ময়দানবের সাহায্যে তাহারা আশ্চর্য্য রকমের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া নরহত্যা করিত। সেই অসুরদের বুদ্ধিভ্রংশ প্রয়োজন, ভগবান বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হইয়া এমন সব উপধর্ম্ম শিখাইলেন, যাহাতে তাহাদের মোহ ও লোভ বাড়িয়া গেল।

২৪। **কল্কি**—কলির শেষে অধর্ম্ম চরম সীমায় উপস্থিত হইলে, ভগবান্ কল্কিরূপে আসিয়া কলির শাস্তি বিধান করিবেন।

[শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে অবতারগণের একটি তালিকা আছে। এই তালিকায় নিম্নলিখিত নামগুলি পাওয়া যাইতেছে। ১। পুরুষ। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে এই পুরুষকে 'অবতারগণের অব্যয় বীজ ও নিধান বলিয়া সরাইয়া রাখা হইয়াছে, তালিকায় গণনা করা হয় নাই। সুতরাং, ভাগবতের মতেই আমরা গণনা করিতেছি। ১। সনৎকুমারাদি অবতার অর্থাৎ চতুঃসন বা ব্রাহ্মণ ২। বরাহ ৩। নারদ ৪। নরনারায়ণ ৫। কপিল ৬। দত্তাত্রেয় ৭। যজ্ঞ ৮। ঋষভ ৯। পৃথু ১০। মৎস্য ১১। কূর্ম্ম ১২। ধন্বন্তরি ১৩। মোহিনী ১৪। নৃসিংহ ১৫। বামন ১৬। পরশুরাম ১৭। ব্যাস ১৮। রামচন্দ্র ১৯। বলরাম ২০। শ্রীকৃষ্ণ ২১। বুদ্ধ ২২। কল্কি। শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয় এই তালিকা আশ্রয় করিয়া ও অন্যান্য স্থানের বর্ণনার সাহায্য লইয়া তাঁহার শ্রীলঘুভাগবতগ্রন্থে সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। আমরা

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে, ব্রহ্মা নারদকে পূর্ব্ববর্ণিত অবতারগণের কথা বলিয়া শেষে বলিলেন—

সর্গে তপোঽহমৃষয়ো নব যে প্রজেশাঃ স্থানেঽথ ধর্ম্মমখমন্বমরাবনীশাঃ ।
অন্তে ত্বধর্ম্মহরমন্যুবশাঽসুরাদ্যা মায়াবিভূতয়ঃ ইমাঃপুরুশক্তিভাজঃ ॥

সৃষ্টির সময় তপস্যা, আমি (ব্রহ্মা), অন্য নয়জন প্রজাপতি ; স্থিতি সময়ে ধর্ম্ম, বিষ্ণু, মনু, দেবতা রাজা প্রভৃতি ; সংহারকালে রুদ্র এবং ক্রোধপরায়ণ সর্প ও অসুরাদি ; ইহারা সকলেই বহুশক্তিধারী ভগবানের মায়াবিভূতি।

তাহার পর ব্রহ্মা বলিলেন,—'বৎস নারদ, সংক্ষেপে বলিলাম। ভগবানের বিভূতি বিস্তারিতরূপে বলিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। মায়া দুর্জ্ঞেয় হইলেও ভগবানের কৃপায় অনেকেই জানেন ইহা মায়া। আমি জানি, তোমরা জান ; আর জানেন ভগবান মহেশ্বর, দৈত্যপ্রবর প্রহ্লাদ, স্বায়ম্ভুব মনু, তাঁহার স্ত্রী শতরূপা, মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, মনুর কন্যা আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি, প্রাচীনবর্হিঃ, রিভু, বেণরাজার পিতা অঙ্গ, ধ্রুব, ইক্ষ্বাকু, ঐল, মুচুকুন্দ, জনক, গাধি, রঘু, অম্বরীষ, সগর, গয়, নহুষ, মান্ধাতা, অলর্ক, শতধনু, রন্তিদেব, ভীষ্ম, অমূর্ত্তরয়, দিলীপ, সৌভরি, উতঙ্ক, শিবি, দেবল, পিপ্পলন্দ, সারস্বত, উদ্ধব, পরাশর, ভূরিষেণ, বিভীষণ, শুকদেব, অর্জ্জুন, আর্ষ্টসেন, বিদুর, শ্রুতদেব প্রভৃতি। (ভাগবত-ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে, এই সমুদয় মহাজনগণের চরিত্র যে উত্তমরূপে জানা আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য।)

ভক্তের সঙ্গের দ্বারা সকলেই, স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর এমন কি, পশুপক্ষী পর্য্যন্ত ঐ মায়া জানিয়া উহা অতিক্রম করিতে পারে। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের উদার মত। তবে, সাধুসঙ্গ প্রয়োজন। ভগবান্ হরি ভিন্ন, কার্য্য অথবা কারণ কিছুই নাই ; তিনি কার্য্য কারণ স্বরূপ, কিন্তু অন্য কার্য্যকারণ হইতে অতিরিক্ত।

এই সমুদয় কথা বলিয়া ব্রহ্মা নারদকে বলিলেন,—ইহার নাম ভাগবত ; তুমি ইহা বিস্তার করিয়া বর্ণনা কর।

যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তির্ভবিষ্যতি।
সর্ব্বাত্মন্যখিলাধারে ইতি সঙ্কল্প্য বর্ণয় ॥

মায়াঃ বর্ণয়তোঽমুষ্য ঈশ্বরস্যানুমোদতঃ।
শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং মায়য়াত্মা ন মুহ্যতি॥

যে প্রণালীতে বর্ণনা করিলে সর্ব্বাত্মা ও অখিলাধার ভগবান্ হরিতে নরনারী সকলের ভক্তি হইতে পারে, সেইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বর্ণনা করিও। 'নতু ভক্তিরসবিঘাতেন কেবলং তত্ত্বম্' (শ্রীধরঃ)—ভক্তিরসের ব্যাঘাতকারী কেবল তত্ত্ব বর্ণনা যেন না হয়।

হরিলীলা মায়াশ্রয়া, কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরের মায়া বর্ণনা করেন, যিনি তাহার অনুমোদন করেন, যিনি শ্রদ্ধার সহিত তাহা নিত্য শ্রবণ করেন, তাঁহাদের আত্মা কখনও ঈশ্বরের মায়ার দ্বারা মুগ্ধ হয় না।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শেষ শ্লোকটির এইরূপে অর্থ করিয়াছেন। ভক্তি শ্রবণ কীর্ত্তনাদি লক্ষণ। এই শ্রবণ কীর্ত্তন ভগবানের নাম ও লীলা বিষয়ক। লীলা দ্বিবিধ। লীলাবতার কৃষ্ণরাম প্রভৃতির গোবর্দ্ধন ধারণাদি চিদানন্দময়ী। আর মায়াশক্তি প্রধান পুরুষাবতারের প্রকৃতিবীক্ষণ ও প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অলঙ্কার প্রভৃতি সৃষ্টিলীলা। এই লীলা মায়াসম্বন্ধিনী হইলেও, মহতত্ত্ব প্রভৃতি ভগবানের ভক্ত, শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে আছে, তাঁহারা ভগবানের স্তুতি করিতেছেন। অতএব শুদ্ধা ভক্তির সহিত এগুলি শুনিতে হইবে।

ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্তর। বেদব্যাস বেদ বিভাগ করিলেন, মহাভারত রচনা করিলেন, কিন্তু চিত্তের প্রসন্নতা হইল না। অপ্রসন্নচিত্তে বেদব্যাস, সরস্বতী নদীতীরে বসিয়া আছেন, সেই সময়ে নারদ আসিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। নারদ শেষে বলিলেন,—হে ব্যাস, তুমি সমাধিস্থ হও, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবত পাইবে। সমাধিস্থ বেদব্যাসের চিত্তে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকাশ বা আবির্ভাব,—ইহাই তৃতীয় স্তর। মহারাজ পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপের পর সর্ব্বত্যাগী হইয়া গঙ্গাতীরে অপেক্ষা করিতেছেন, এক সপ্তাহ পরে তাঁহার মৃত্যু নিশ্চয়। ভারতের যাবতীয় মুনি, যোগী, পণ্ডিত, সাধু, ভক্ত তাঁহার চারিদিকে বসিয়া, সেই সভায় ব্যাস-নন্দন শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন,—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্তর। তাহার পর, নৈমিষ্যারণ্যে শৌণকাদি ঋষিগণের সভায় অভ্যর্থিত ও জিজ্ঞাসিত হইয়া রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা সূত, ভাগবত বলিতেছেন,—ইহাই ভাগবতের পঞ্চম স্তর।

৪। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় ধারা

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের টীকার প্রারম্ভে পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী মহোদয় বলিয়াছেন—

"দ্বেধা হি ভাগবতসংপ্রদায়প্রবৃত্তিঃ। একতঃ সংক্ষেপতঃ শ্রীনারায়ণাদ্ব্রহ্মনারদাদিদ্বারেণ। অন্যতস্তু বিস্তরতঃ শেষাৎ সনৎকুমার সাংখ্যায়ণাদিদ্বারেণ। তত্র দ্বিতীয় স্কন্ধে শ্রীনারায়ণব্রহ্মসম্বাদেন সংক্ষেপতঃ চতুঃশ্লোক্যা শ্রীভাগবতং নিরূপিতং তদেব ব্রহ্মনারদ সম্বাদেন দশলক্ষণতয়া কিঞ্চিদ্বিস্তরেণোক্তং। তদেব শেষোক্তমতিবিস্তরতো বক্তুং তৃতীয়াদ্যারম্ভঃ।

দুই প্রকারে ভাগবতসম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি হইয়াছে। প্রথমতঃ সংক্ষেপে শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মনারদ প্রভৃতির মধ্য দিয়া। অন্যতঃ শেষ হইতে সনৎকুমার সাংখ্যায়ণ প্রভৃতির মধ্য দিয়া বিস্তারিতরূপে। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে শ্রীনারায়ণ ও ব্রহ্মসংবাদে সংক্ষেপে চারিটি শ্লোকের দ্বারা শ্রীভাগবত নিরূপিত হইয়াছে, তাহার পর ব্রহ্মনারদ সংবাদে দশলক্ষণের দ্বারা কিছু বিস্তারিতরূপে। শেষকর্তৃক বিস্তারিতরূপে কথিত ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে আরম্ভ। আমাদের এইবার শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় ধারার আলোচনা করিতে হইবে।

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের আয়োজনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলা অপ্রকটের কাল পর্যন্ত বিদুর তীর্থ পর্য্যটন করিতেছিলেন। ভারতের ইতিহাসে কত বড় বড় ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ; মহারাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যারোহণ, অশ্বমেধ যজ্ঞ; যদুবংশ ধ্বংস; শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট প্রভৃতি। তাহার পর যমুনাতীরে পরমভক্ত উদ্ধবের সহিত বিদুরের সাক্ষাৎ। বিদুরের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে কাতর উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণলীলা সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, তৃতীয় অধ্যায়ে মথুরা ও দ্বারকালীলা বর্ণিত হইয়াছে। লীলা অপ্রকট করার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে ভাগবত বলিয়াছিলেন। এই ভাগবত কি?

পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে পদ্মে নিষণ্ণায় মমাদিসর্গে।

পূর্ব্বে পাদ্মকল্পে আদিসর্গে আমার নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মাকে আমি আমার মহিমা প্রকাশক পরম জ্ঞান করিয়াছিলাম, জ্ঞানিগণ তাহাকেই ভাগবত বলেন।

বিদুর বদরিকাশ্রমে চলিয়া গেলেন, সেখানে নরনারায়ণ ঋষি কল্পান্তকালব্যাপী দুশ্চর তপস্যা করিতেছেন। বিদুর উদ্ধবের নিকট সেই পরম তত্ত্বকথা শুনিতে চাহিলেন। উদ্ধব তাঁহাকে বলিলেন—আপনি মৈত্রেয় ঋষির নিকট যান, তিনি আপনাকে সেই পরম কথা বলিবেন।

মৈত্রেয় ঋষির সহিত বিদুরের হরিদ্বারে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বিদুরের প্রশ্নে মৈত্রেয় যাহা বলিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। ভগবানের লীলা, মহদাদি সৃষ্টি, বিরাট্ মূর্ত্তির সৃষ্টি মৈত্রেয় বর্ণনা করিয়াছেন।

তৃতীয় স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে মৈত্রেয় ঋষি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় ধারা বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবান্ সঙ্কর্ষণ পাতালতলে অধ্যাসীন। তাঁহার জ্ঞান অপ্রতিহত, তিনি অকুণ্ঠসত্ত্বসম্পন্ন। ঋষিগণ সত্যলোক হইতে গঙ্গার মধ্য দিয়া পাতালতলে অবতরণ করিয়া তাঁহার নিকট শ্রীভাগবত শ্রবণ করেন। সঙ্কর্ষণ দেব সনৎকুমারের নিকট বলেন। সনৎকুমার বলেন সাংখ্যায়ন ঋষিকে। সাংখ্যায়ন বলেন পরাশর ও বৃহস্পতিকে। পরাশর, পুলস্ত্য ঋষি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মৈত্রেয়কে ইহা বলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থ স্কন্ধের শেষ পর্য্যন্ত, মৈত্রেয় মুনির উপদিষ্ট ভাগবত, যাহা বিদুর শ্রবণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে তেত্রিশটি অধ্যায় আছে, ইহার উনত্রিশ অধ্যায়, আর চতুর্থ স্কন্ধের একত্রিশ অধ্যায়—এই ষাট্ অধ্যায়, বিদুর-মৈত্রেয়-সম্বাদ, অর্থাৎ এই অধ্যায়গুলিতে সঙ্কর্ষণ-কথিত ভাগবত, মৈত্রেয় মুনি বিদুরকে বলিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত ষাট অধ্যায়ে মৈত্রেয় মুনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বলিয়াছেন। তত্ত্বসৃষ্টি, বিরাট সৃষ্টি, দশবিধ সৃষ্টি, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্টি, বরাহ অবতার, বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয় বিজয়ের অভিশাপ, হিরণ্যাক্ষ বধ, স্বায়ম্ভুব মনুর কথা, দেবহূতির সহিত কর্দ্দম ঋষির বিবাহ, কপিল দেবের জন্ম, কপিল-দেবের উপদেশ, মনুকন্যাগণের বংশবর্ণন, দক্ষযজ্ঞ, পৃথুরাজার কথা; আর প্রাচীন বর্হির কথা।

কোথায় কাহার দ্বারা কাহার নিকটে কোন্ প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। সেই কারণে শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ এইভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

৫। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদের সার এবং বর্ত্তমান কলিযুগের যুগ-ধর্ম্মের গ্রন্থ বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার মত জানিতে হইবে। দেবানন্দ পণ্ডিতকে কৃপা করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যাহা বলিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য ভাগবতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম লিখিত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমে, মধ্যে ও শেষে অর্থাৎ সর্ব্বত্রই এই কথা বলা হইয়াছে যে বিষ্ণুভক্তি নিত্যসিদ্ধ, অক্ষয় ও অব্যয়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র বিষ্ণুভক্তিই সত্য, মহাপ্রলয়েও ইহার পূর্ণশক্তি বিদ্যমান থাকে। কৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত এই ভক্তিতত্ত্ব জানা যায় না। নারায়ণ মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপন করেন। শ্রীমদ্ভাগবত এই ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, এই কারণে অন্য কোন শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতের সমান নহেন। মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি শ্রীভগবানের অবতার সমূহ যেমন নিত্য, সময়ে তাঁহাদের আবির্ভাব হয়, আবার সময়ে তাঁহাদের তিরোভাব হয়, সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রেরও কখন আবির্ভাব হয়, আবার কখন তিরোভাব হয়, ইনি নিত্য। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভক্তিযোগে শ্রীব্যাস-দেবের জিহ্বায় এই শ্রীমদ্ভাগবত স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঈশ্বরের তত্ত্ব যেমন অবোধ্য, শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্বও ঠিক্ সেইরূপ। যিনি মনে করেন যে ভাগবত জানেন, তিনি ভাগ-বতের প্রমাণ কিছুই জানেন না। অজ্ঞ হইয়াও যিনি ভাগবতের শরণ গ্রহণ করেন, ভাগবতের অর্থ তাঁহার নিকট আপনা হইতেই প্রকাশিত হয়। ভাগবত প্রেমময়, ইনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় গোপ্যলীলা এই গ্রন্থে প্রচারিত হইয়াছে। বেদব্যাস বেদ ও অন্যান্য পুরাণ প্রচার করিয়া চিত্ত প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত যে সময়ে নারদের কৃপায় ও উপদেশে তাঁহার জিহ্বায় স্ফূর্ত্তিলাভ করিলেন, সেই সময়ে তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইল।

৬। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোক

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং।

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ।
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্রকৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

১

বীরভদ্র গোস্বামী মহাশয়ের অনুবাদ—

কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড দেবতাকাণ্ড আর।
এই তিনকাণ্ড হৈতে সর্ব্ব সারাৎসার॥
শ্রোতার প্রবৃত্তি লাগি গ্রন্থের মহিমা।
সর্ব্ব পরাৎপর শাস্ত্র নাহিক উপমা॥
এই শাস্ত্রে পরম ধর্ম্ম করি নিরূপণ।
কপট-বিহীন ধর্ম্ম প্রেম প্রয়োজন॥
মহামুনি নারায়ণ তার কৃত শাস্ত্র।
নারায়ণ কর্ত্তা ইথে হয়েন অতি শ্রেষ্ঠ॥
আধ্যাত্মিকাদি তাপ করে উন্মূলন।
অখিল পুরাণশাস্ত্র সবার কারণ॥
বহুকালে অপর শাস্ত্রে যে ফল না ফলে।
সত্য এই শাস্ত্র হৈতে মহাফল মিলে॥
বহু পুণ্য বিনে ইহার শুশ্রূষা না হয়।
বহু পুণ্য বিনে নহে সেই পুণ্যোদয়॥

২

ভাগবতাচার্য্যের অনুবাদ—

কহিল পরম ধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবতে।
মুক্তিপদ পর্য্যন্ত কপট নাহি যাতে॥
নির্ম্মৎসর শান্ত জন যারা অধিকারী।
হেন মহাভাগবত ধর্ম্ম অবতারী॥
পরমার্থ তত্ত্ববস্তু জানি ভাগবতে।
তাপত্রয় বিনাশ হয়ে যাহা হৈতে॥
আর নানা শাস্ত্র যদি করিয়ে চিন্তন॥

শুনিবারে ইচ্ছা যদি ভাগবত করি।
সেই ক্ষণে চিত্তে কৃষ্ণ বাঁধিবারে পারি ॥

শ্রীধর স্বামীর টীকানুযায়ী ব্যাখ্যা—

শ্রীমদ্ভাগবত শুনিতে যাহাতে লোকের প্রবৃত্তি হয়, সেইজন্য কাণ্ডত্রয় যাহাদের বিষয়, এই প্রকারের সকল শাস্ত্র অপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা দেখাইতেছেন।

'অত্র শ্রীমদ্ভাগবতে' এই সুন্দর ভাগবত শাস্ত্রে 'পরমো ধর্ম্মঃ' নিরূপিত হইয়াছে। এই পরমতত্ত্বের হেতু কি, তাহাই বলিতেছেন। 'প্রোজ্ঝিতং' প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে—মোক্ষের অভিসন্ধি পর্য্যন্ত নিরস্ত হইয়াছে—'কৈতবং' ফলের অভিসন্ধি-লক্ষণ যাবতীয় ধর্ম্ম। অর্থাৎ যে ধর্ম্মের লক্ষণ কেবলমাত্র ঈশ্বরের আরাধনা, সেই ধর্ম্ম ইহাতে নিরূপিত হইয়াছে। এইবার অধিকারী-হিসাবে এই ধর্ম্মের পরমত্ব বলা হইতেছে। 'নির্ম্মৎসরাণাং' পরের উৎকর্ষ সহিতে না পারার নাম মৎসর—যাঁহাদের সেই মৎসর নাই, এই প্রকারের 'সতাং' ভূতানুকম্পী বা সর্ব্বভূতে দয়াশীল ব্যক্তিগণই এই ধর্ম্মের অধিকারী। কর্ম্মকাণ্ড যাঁহাদের বিষয়, সেই সমুদয় শাস্ত্র অপেক্ষা এই শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা বলা হইয়াছে, এখন জ্ঞানকাণ্ডের শাস্ত্রসমূহ হইতে ইহার শ্রেষ্ঠতা বলিতেছেন। 'বাস্তবং বস্তু বেদ্যং' পরমার্থভূত বস্তু এই শাস্ত্রে জানা যাইবে; বৈশেষিক মতবাদীদের দ্রব্যগুণাদিরূপ বস্তু নহে। বাস্তব শব্দের অর্থ—বস্তুর অংশ জীব, বস্তুর শক্তি মায়া, বস্তুর কার্য্য জগৎ, এই সমুদয়ই বস্তু, কেহ পৃথক্ নহে। বেদ্য, কথার অর্থ অযত্নে বা অনায়াসেই জানা যাইবে। এই বস্তু বা এই বস্তুর জ্ঞান কেমন? 'শিবদং' পরমসুখদ, 'তাপত্রয়োন্মূলনং' আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ ইহার দ্বারা সমূলে উৎপাটিত হইবে। ইহার দ্বারা জ্ঞানকাণ্ডবিষয়ক শাস্ত্রসমূহ অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতা নির্দ্ধারিত হইল। শাস্ত্রের কর্ত্তৃত্বহিসাবে দেখিলেও এই শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ। কারণ—'মহামুনিকৃতে' শ্রীনারায়ণ-কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ সংক্ষেপে সর্ব্বপ্রথম কৃত হইয়াছে। দেবতাকাণ্ডগত শ্রেষ্ঠতা বলা হইতেছে। অন্যান্য শাস্ত্র বা তদুক্ত সাধনসমূহের দ্বারা ঈশ্বর সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ে স্থিরীকৃত হন না। কিন্তু এই শাস্ত্রে 'শুশ্রূষুভিঃ' শ্রবণের ইচ্ছা যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহাদের কর্ত্তৃক 'তৎক্ষণাৎ' সঙ্গে সঙ্গে, 'সদ্য' অবিলম্বে, 'ঈশ্বরঃ' 'হৃদি' হৃদয়ে, 'অবরুধ্যতে' স্থিরীকৃত হইয়া থাকেন।

উত্তর—'কৃতিভিঃ' শ্রবণের ইচ্ছা, পুণ্য না থাকিলে উৎপাদিত হয় না। কাণ্ড-ত্রয় বিষয়ক যাবতীয় শাস্ত্রের সহিত তুলনা করিয়া এই শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইল, অতএব এই শাস্ত্র সর্ব্বদাই শ্রোতব্য।

আমার বার্ষিকী

অর্থাৎ

১৩৩১ সালের আশ্বিন মাস হইতে ১৩৩২ সালের আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত কার্য্যের সংক্ষিপ্ত তালিকা।

আমার বার্ষিক কাজের একটা বিবরণী ছাপাইলে ভাল হয়। দুএকটি বন্ধু এই কথা বলেন। আমিও বলি, মন্দ হয় না। পূজার সময় আমি সিউড়িতে থাকি—বাড়ীতে পূজা; কাজেই পূজার পর হইতে পর বৎসরের পূজা পর্য্যন্ত, ইহাই আমার বৎসর। সেই বৎসরের কার্য্য-বিবরণী পূজার সময়েই লেখা দরকার।

গতবার, অর্থাৎ ১৩৩১ সালের পূজার পূর্ব্বে শিমলা পাহাড়ে ছিলাম। ঠিক্ পূজার পূর্ব্বে ভয়ানক বৃষ্টি হয়। পাহাড়ের রেল দুজায়গায় ভাঙ্গিয়া যায়, গজিয়াবাদের কাছে রেলরাস্তা ভাঙ্গিয়া যায়। কাজেই যে সময়ে বাড়ী ফেরার কথা, সে-সময়ে ফিরিতে পারিলাম না। ভারি উদ্বেগ, কারণ এমন কখন হয় নাই, পূজার সময় বিদেশে কখন আটক পড়ি নাই।

২রা অক্টোবর ১৯২৪, ১৬ই আশ্বিন ১৩৩১, শিমলা হইতে দুপুর বেলা রওনা হইলাম। পাহাড়ের রেল দুজায়গায় ভাঙ্গিয়াছে, দুজায়গায় নামিয়া গাড়ী বদল করিয়া কালকা আসিলাম। পাঞ্জাবী ডাকগাড়ী চলিয়া গিয়াছে, এক্‌স্‌প্রেসে (৬ ডাউন) উঠিলাম। জলে জলময়, অতিকষ্টে গাড়ী বেলা ১০টা আন্দাজ দিল্লী আসিল। দিল্লীতে খবর পাওয়া গেল, আর এগাড়ী যাইবেনা। উপায়! বাড়ীতো যাইতে হইবে। মাথার উপর পূজার ভার। ছেলেবেলা হইতে পূজার মন্ত্র

টাইমটেবিল দেখিয়া জি, আই, পি'র বোম্বাই মেলে উঠিলাম। আগরা ক্যান্টনমেণ্টে নামিলাম। সঙ্গে এক বন্ধু ছিলেন, তিনি শিমলায় চাকুরী করেন, বাড়ী বাঁকুড়া জেলায়, তাঁহার বাড়ীতেও পূজা, আবার বার্ষিক মাতৃশ্রাদ্ধ। তিনিও উদ্বিগ্ন। আগরা ক্যান্টনমেণ্টে একাগাড়ী ভাড়া করিয়া আগরা ফোর্ট ষ্টেশনে গেলাম। এক গাড়ী পাইলাম, সে গাড়ী টুণ্ডলা যাইবে। ভয়ানক ভিড়। বাঙ্গালীরা হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে বা তীর্থ করিতে আসিয়াছিল, নিরাশ হইয়া ফিরিতেছে। অতিকষ্টে টুণ্ডলা আসিলাম। টুণ্ডলায় কোন দ্রুতগামী গাড়ী অর্থাৎ মেল বা এক্স্প্রেস নাই। ঘণ্টা তিনেক পরে এক প্যাসেঞ্জার মিলিল। তেমনি ভিড়। তাহাতেই চড়িলাম। পরদিন বেলা প্রায় ১০টায় মোগলসরাই আসিলাম। অল্পক্ষণ পরে কাশীর এক্স্প্রেস গাড়ী কলিকাতা যাইবে, মোগলসরাইএ নামিলাম, স্নান করিলাম, এক্স্প্রেসের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, এক ব্রাহ্মণ বন্ধু দেশের লোক ও আত্মীয়,—মোগলসরাইএ রেলে চাকুরী করেন। তিনি অনুরোধ করিলেন, "ভাত প্রস্তুত খাইয়া লও"। সেদিন দুর্গাষষ্ঠি, দেবীর আমন্ত্রণ অধিবাস না হওয়া পর্য্যন্ত উপবাসী থাকি, ছেলবেলা হইতে এই নিয়ম চলিতেছে, এ নিয়ম আর ভাঙ্গিবনা। খাওয়া হইল না। এক্স্প্রেসে উঠিলাম, পরদিন সপ্তমী পূজার দিন সকাল ৭টায় বাড়ী পৌছিলাম। পৌছিয়াই স্নান করিলাম, আর পুঁথি ধরিয়া কাজ আরম্ভ করিলাম। এই গেল গতবারের অভিজ্ঞতা। তাই ঠিক্ করিলাম—এবার আর কার্ত্তিক পূজা পর্য্যন্ত কোথায়ও যাইব না।

অন্যবারে দুর্গোৎসবের পরই বাহির হই, আবার শ্যামাপূজায় আসি। বাড়ীতে শ্যামাপূজা—আবার শ্যামাপূজার পরই বাহির হই, জগদ্ধাত্রী পূজায় আসি। বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজা। গতবারের গোলোযোগের জন্য স্থির করিলাম, কার্ত্তিক পূজা পর্য্যন্ত আর বাহিরে যাইব না। তাহাই করিলাম।

এক সামাজিক নিমন্ত্রণে একদিন হেতমপুর গিয়াছিলাম। ঢেঁকির স্বর্গযাত্রার ফলের ন্যায় হেতমপুর কলেজে বক্তৃতা হইয়াছিল—না হইলেই ভাল হইত—কিন্তু অনুরোধ। কারণ এসব বক্তৃতা অকারণ। শ্রোতাদের একটু আমোদ দেওয়া, Amuse করা ছাড়া আর কিছু [illegible] না।

২রা অগ্রহায়ণ ১৩৩১ রাত্রিতে রওনা হইয়া ৩রা সকালে কলিকাতা পৌছিলাম। ৪ঠা অগ্রহায়ণ কলেজ-স্কোয়ারে বঙ্গীয় তত্ত্বসভাগৃহে বক্তৃতা করি। বক্তৃতার বিষয় মনে নাই। কাহারও মনে থাকিলে, জানাইবেন। ৬ই অগ্রহায়ণ বেলা ১০টা ৫৪মিনিটের গাড়ীতে উঠিয়া বেগমপুর ষ্টেশনে নামিয়া, জনাই গ্রামে উপস্থিত হইলাম। বহুদিন পূর্ব্বে কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে কথা দিয়াছিলাম জনাই যাইব, সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিলাম। সেদিন শুক্রবার। শুক্র, শনি ও রবি, এই তিন দিন জনাই গ্রামে থাকিলাম ও বক্তৃতা করিলাম। রবিবারের দিন বড়ই তাড়াতাড়ি হইল, বেলা দুইটা হইতে বক্তৃতা করিয়া পদব্রজে বেগমপুর ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণে উঠিয়া কলিকাতা

আসিলাম। কলিকাতা বিডনষ্ট্রীটে ভোলানাথধামে বক্তৃতা ছিল। সনাতন তত্ত্বপরিষৎ বা সংঘ নামে একটি সভা হইয়াছে, তাহারই উদ্যোগে এই বক্তৃতা হইয়াছিল। পরদিন ৯ই অগ্রহায়ণ কলিকাতায় স্বর্গীয় নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে বক্তৃতা হয়। স্বর্গীয় নিমাইবাবুর পুত্র শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ মল্লিক সনাতন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য একটি সভা করিয়াছেন—সেই সভার উদ্যোগে এই বক্তৃতা।

পরদিন ১০ই অগ্রহায়ণ হইতে যাদবপুর জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদে বক্তৃতা আরম্ভ হয়। এই বক্তৃতার কথা, পরে বিশদরূপে আলোচনা করিব। যাদবপুরে বেলা ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা—তাহার পর ৬টা হইতে, ৭টা পর্য্যন্ত বঙ্গীয় তত্ত্বসভা—এদিনে আর একটি স্থানে অনুরুদ্ধ হইয়া শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে হয়—স্বর্গীয় মোহনচাঁদ শীল মহাশয়ের বাড়ী, চোরবাগান।

১১ই অগ্রহায়ণ হইতে প্রত্যহই যাদবপুরে বক্তৃতা হইয়াছে—রবিবার বাদ। ৭ই পৌষ অর্থাৎ ২২শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতায় ছিলাম। যাদবপুরে প্রায় প্রত্যহই বক্তৃতা হইয়াছে—বঙ্গীয় তত্ত্ব-সভাতে ও বক্তৃতা হইয়াছে—তাহা ছাড়া আরও দু-এক জায়গায় হইয়াছে। তবে, বেশী জায়গায় নহে, কারণ কলিকাতায় অন্য দু একটি জায়গা ছাড়া, কোন ব্যক্তিবিশেষের বাড়ী যাই না। এই সময়ের সব কথা লেখা নাই। বঙ্গীয় তত্ত্বসভায় দুদিনের বক্তৃতার বিষয় লেখা আছে—একদিন ছিল Religious Education in National School জাতীয় বিদ্যালয় সমূহে ধর্ম্মশিক্ষা, আর একদিন ছিল—The Religious Problem in India ভারতে ধর্ম্মসমস্যা।

২২শে ডিসেম্বর, ৭ই পৌষ রাত্রিতে ঢাকা মেলে রওনা হইয়া, বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত বাহেরক গ্রাম যাত্রা করিলাম। বাহেরকে বা বিক্রমপুরে এইবার তৃতীয় বার। ইহার পূর্ব্বে দুই-বারও বড় দিনের ছুটির সময়েই গিয়াছি। ২৩শে, ২৪শে, ২৫শে ও ২৬শে বাহেরক হরিসভার উৎসবে বক্তৃতা হয়। শেষ দিনের বিষয় ছিল—"বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা"। কয়েকটি বিশেষ কারণে এই বিষয়টির আলোচনা করিতে হইয়াছিল, সে কথা পরে বলিব।

বাহেরক হইতে বিক্রমপুরের ভিতরেই আর একখানি গ্রামে যাই। বাঘিরা—২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে ডিসেম্বর—সেখানে বক্তৃতা হয়। ৩০শে ডিসেম্বর দিঘিরপার জাতীয় বিদ্যালয়ে—জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। পরদিন ৩১শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে বানরী বিদ্যাশ্রমে যাই—সেদিন বিকালে হাসাইল গ্রামে বক্তৃতা হয়। পরদিন ১লা জানুয়ারী সকালে হাসাইল গ্রাম হইতে আমি, বানরী বিদ্যাশ্রমের ধীরেন বাবু, আর দিঘীরপার জাতীয় বিদ্যালয়ের শঙ্করানন্দ, বানরী বিদ্যাশ্রমে আসিলাম। লোহজং হইতে দুইটি ছাত্র আসিয়াছিল। তাহাদের সহিত লোহজং গেলাম। সেখানে ১লা জানুয়ারী বক্তৃতা হইল।

হইলাম। ১৪ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত মুঙ্গেরে ছিলাম। ইংরাজী ও বাঙ্গালায় বক্তৃতা হইয়াছিল—বাঙ্গালী অপেক্ষা বেহারবাসীদের উৎসাহ বেশী। ১৫ই জানুয়ারী জামালপুরে বক্তৃতা করিয়া ১৬ই সকালে সিউড়ি পৌছিলাম। ২৭শে জানুয়ারী পর্যন্ত সিউড়িতে থাকিয়া ২৮শে সপরিবারে নবদ্বীপযাত্রা। সেদিন কয়েক ঘণ্টা নবদ্বীপে ছিলাম। পরদিন ২৯শে জানুয়ারী শ্রীপঞ্চমী, সকালে কলিকাতা পৌছিলাম। আজ, নন্দের বাগানে নিয়োগী হাসপাতাল খোলা হইল। ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয় সভাপতি ছিলেন। এই উপলক্ষেই সকালে কলিকাতা যাইতে হইল। বিকালে বঙ্গীয় তরুণতায় বক্তৃতা, পরদিন তাহাই।

৩১শে জানুয়ারী কৃষ্ণনগর আসিলাম। ১লা ২রা ও ৩রা ফেব্রুয়ারী কৃষ্ণনগরে বক্তৃতা। ৪ঠা তারিখে নবদ্বীপ পৌছিলাম। নবদ্বীপে মাঘী মেলা। গত ৯ বৎসর এই দিনই, অর্থাৎ ভৈমী একাদশীর দিন নবদ্বীপ পৌছাই—একরূপ নিয়মই হইয়া গিয়াছে। ১৩ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সেবাশ্রমে প্রত্যহ বক্তৃতা। নবদ্বীপ হইতে আসিব—এমন সময়ে বাড়ীতে ব্যাধি আসিল—ফলে ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত নবদ্বীপে থাকিতে হইল। ২৫শে সিউড়ি আসিলাম। ৭ই মার্চ্চ, ২৩শে ফাল্গুন কলিকাতা। পরদিন ২৪শে ফাল্গুন জাহাজে উঠিলাম—রেঙ্গুণ যাত্রা করিলাম। রেঙ্গুণের কয়েকটি ভদ্রলোক কয়েক বৎসর হইতেই রেঙ্গুণ যাওয়ার জন্য ডাকিতেছিলেন। এতদিন সময় হয় নাই। এইবার প্রথম সমুদ্রযাত্রা। ১১ই মার্চ্চ সকালে রেঙ্গুণ পৌছিলাম। আর ৩০শে এপ্রিল ১৭ই বৈশাখ বিকালে কলিকাতা, আর রাত্রিতে সিউড়ি পৌছিলাম। এই সময়ের মধ্যে ১১ দিন 'মেমিও'তে ছিলাম—আর বাকি সময় রেঙ্গুণ। রেঙ্গুণ হইতে ফিরিয়াই পুরীর আহ্বান—জরুরি আহ্বান। ২৪শে বৈশাখ রওনা হইলাম। ২৫শে তারিখে সারাদিন কলিকাতায় ছিলাম। রাত্রিতে রওনা হইয়া ২৬শে, সকালে পুরী পৌছিলাম। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত পুরীতে ছিলাম। প্রথম কয়েকদিন নরেন্দ্র সরোবরে চন্দন যাত্রায়, তাহার পর মন্দিরে, তাহার পর রাধাকান্ত মঠে বক্তৃতা হয়। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ পুরী হইতে যাত্রা করিয়া ১৬ই সিউড়ি পৌছিলাম। পরদিন কাকিনা যাত্রা করিলাম। ৫ দিন কাকিনায় ছিলাম। ৬ই জুন ২৩শে জ্যৈষ্ঠ কাকিনা হইতে রওনা হইয়া, পরদিন সিউড়ি পৌছিলাম।

কিছুদিন বিশ্রাম করিলাম। বিশ্রামের পর বাহির হইব, এমন সময়ে সিউড়ি মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচনের আয়োজন আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে কখনও এই সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করি নাই। এবার স্বরাজের দল বাহির হইতে বক্তা প্রভৃতি আনাইতে লাগিলেন। সহরে খুব ধুম পড়িয়া গেল। স্বরাজদলের অনুরোধে এবং ব্যাপারটা দেখার জন্য সিউড়িতে থাকিলাম। ১৮ই জুন জয়নগর পৌছাই—দুদিন বক্তৃতা করিয়া আবার ২০শে তারিখে সিউড়ি ফিরিলাম। জয়নগর দীনকুটিরের উৎসব—দীনকুটির লইয়া অকারণ গোলযোগ হইতেছে, কাজেই সেখানে না গেলেই নয়। ...

সভায় অনেক বাদানুবাদ হইল- শেষে কোনরূপে মীমাংসা হইল। ২৬শে জুলাই উখ্‌রা যাই। ৩১শে জুলাই হইতে ৩ দিন মেহেরপুর, তাহার পর ৩ দিন চুয়াডাঙ্গা। ৬ই আগষ্ট রাত্রিতে সিউড়ি আসিলাম।

৮ই ও ৯ই আগষ্ট বারুইপুর—১০ই হইতে ৪ দিন কাঁথি। ১৫ই আগষ্ট সিউড়ি। ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০শে আগষ্ট মামুদবাজার। ২১শে সিউড়ি পৌঁছিলাম। ২৯শে আগষ্ট শিমলা যাত্রা করিলাম, আর ১৬ই সেপ্টেম্বর সিউড়ি পৌঁছিলাম।

যে বৎসর চলিয়া গেল, সেই বৎসরে অর্থাৎ ১৩৩০ সালের বিজয়া দশমীর পরদিন হইতে ১৩৩১ সালের দেবীপক্ষের পঞ্চমী পর্য্যন্ত ৩৫০ দিন পাওয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে সিউড়িতে ১৪৫ দিন, ব্রহ্মদেশে ৪৮ দিন, কলিকাতায় ৩৪, নবদ্বীপ ২২, পুরি ২০, শিমলা ১৪, বিক্রমপুর ১১, মুঙ্গের ৯, মামুদবাজার ৫, কাকিনা ৫, কাঁথি ৪, কৃষ্ণনগর ৪, জমাই ৩, মেহেরপুর ৩, চুয়াডাঙ্গা ৩, জয়নগর ২, বারুইপুর ২, উখরা ১। এই ৩৩৫ দিন। বাকি ১৫ দিন রেলে ও জাহাজে।

অন্যবারে সিউড়িতে বিশেষ কোন কাজ থাকে না, কাজেই সিউড়ির দিনগুলি বিশ্রামের দিন। কিন্তু এবার, তাহা হয় নাই। প্রথম মিউনিসিপ্যাল-নির্ব্বাচন ব্যাপার। তাহার পর, আর এক ব্যাপার হয়—তাহাই একটু লিখিয়া রাখা দরকার।

দেশবন্ধুর মৃত্যুসংবাদ আসার পরদিন সিউড়িতে এক সভা হয়। আমি সে সভায় যাই নাই। তাহার পর তাঁহার শ্রাদ্ধের দিনে আবার সভা হয়। এই সভায় আমাকে উপস্থিত থাকিয়া সভাপতির কার্য্য করিতে হইবে, কয়েকজন বন্ধু এইরূপ ব্যবস্থা করেন। তাঁহাদের সহিত অনেকরূপ আলোচনা হইল। দুএকজন স্বদেশকর্মী ভাবিয়াছিলেন, এই উপলক্ষে কিছু চাঁদা তুলিতে হইবে। আমি বলিলাম—সিউড়ি সহরে চাঁদা তুলিবার তোমাদের কাহারও নৈতিক অধিকার নাই, সুতরাং চাঁদা তোলার উদ্দেশ্য থাকিলে, আমি সে সভায় যাইব না। প্রথমদিন যাঁহারা সভা করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশবন্ধুর নামে সভা করিয়া নিজেরা এত বড় কাজ করিয়াছিলেন যে—মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনের সময় তাঁহারা কাগজে ছাপাইয়াছিলেন—আমরা দেশবন্ধুর সভা করিয়াছি, অতএব আমাদের ভোট দাও। একটা বড় নামের আওতায় মতলববাজীর আগাছার কাঁটাবন, বিধাতাপুরুষ যে কবে পরিস্কৃত করিবেন, তাহা আমরা কেহই জানি না, কারণ এই কাঁটাবন ক্রমে বাড়িতেছে।

দ্বিতীয় সভা, অর্থাৎ শ্রাদ্ধের দিনের সভায় আমি একখানি কাগজ ছাপাইয়া বিলি করিলাম, সেই কাগজখানি দরকারী বলিয়া আবার ছাপাইলাম—

স্বর্গীয় দেশবন্ধুর মহাপ্রস্থান উপলক্ষে স্মৃতি-সভা

ঐদিন অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহাকে স্মরণ করিবার জন্য সভা হইবে। মহাত্মা গান্ধী জানাইতেছেন—এই সভা যেন সার্ব্বজনীন হয়; ইহাতে যেন কোনওরূপ সাম্প্রদায়িকতা না থাকে।

মহাত্মাজীর আদেশে ও দেশবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমরা সকলকে জানাইতেছি ঐ তারিখে অর্থাৎ ১৭ই আষাঢ় ১৩৩২ বুধবার ইং ১ লা জুলাই ১৯২৫ তারিখে, সিউড়ি সহরে শ্রীশ্রী৺রাধা-বল্লভ জীউর মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটী সভার অধিবেশন হইবে। এই সভায় যাঁহারা কিছু বলিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন ঐ সভায় মতদ্বৈধযুক্ত কোনরূপ রাজনীতি বা সমাজনীতি সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উত্থাপন না করেন। দেশবন্ধুর জীবনে যাহা অন্তরতম, শাশ্বত ও সার্ব্বজনীন, কেবল তাহারই আলোচনা করেন। আমরা চাই, জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ ও অন্যরূপ পার্থক্য ভুলিয়া মানুষরূপে নিত্যধামগত মহাপুরুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য প্রদান করিতে। আমাদের সাদুনয় নিবেদন, সকলেই আসিবেন। সরকারী কর্ম্মচারীগণও নির্ভয়ে আসিয়া যোগদান করিবেন। কারণ সকলেই দেখিতেছেন ত্যাগবীর মহামানবরূপে আজ সমগ্র পৃথিবী দেশবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত। ভারতসচিব, বড়লাট, বঙ্গের লাট, সকল সম্প্রদায়ের সংবাদপত্র ও ভিন্ন ভিন্ন জেলায় উচ্চতম রাজ-কর্ম্মচারীগণ এই শোক-প্রকাশে ও শ্রদ্ধাঞ্জলি দানে অগ্রসর হইয়াছেন। সুতরাং, আমরা আশা করি ও প্রার্থনা করি, সকলেই সভাস্থলে উপস্থিত হইবেন। কি প্রকারে এই সভায় আলোচনা হইবে, তাহা নির্দ্ধারিত করার জন্য এবং শ্রোতা বক্তা সকলকে পূর্ব্ব হইতে জানাইবার জন্য, জনৈক মনীষির লিখিত নিম্নের অংশটুকু উদ্ধৃত হইল :—

"The way in which the departed rise before us depends on our discernment of what in them was vital and abiding. To be carnally-minded is not only death as regards ourselves, it excludes others from a spiritual life within us. If we knew them only "after the flesh" pictures and sepulchres are all that will by & by remain to us of them ; but if there is a divine spirit within us that spirit quickeneth whom it will." যাঁহারা ইংরাজী জানেন, তাঁহারা পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশটী স্মরণ করিবেন। মোটকথা, সরকারী কর্ম্মচারী, জমিদার, মহাজন, কৃষক, শ্রমজীবি হিন্দু মুসলমান স্ত্রীলোক পুরুষ প্রভৃতি সকলেই সভায় যোগদান করিবেন। ১৭ই আষাঢ় ১৩৩২ ইং ১লা জুলাই ১৯২৫ বুধবার অপরাহ্নে ৫ ঘটিকায় সিউড়ির শ্রীশ্রী৺রাধাবল্লভ জীউ মন্দির প্রাঙ্গণে সভার অধিবেশন হইবে।

সর্ববিধ মতাবলম্বী লোকের অকৃত্রিম ও সুগভীর অনুরাগের জন্যই হউক, হিন্দুর মন্দিরে দেববিগ্রহের সম্মুখে সকল সম্প্রদায়েরই লোক মিলিত হইয়াছিলেন।

মার্কিণ দেশবাসী একজন পাদরী সাহেব ইংরাজী ভাষায় প্রার্থনা করেন, দুইজন মুসলমান বন্ধু সেই স্থানে বসিয়া প্রার্থনা করেন, একজন ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্র পাঠ করেন, তাহার পর সভার কার্য্য যথারীতি সম্পাদিত হয়। এই সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, মাসে মাসে কৃষ্ণা একাদশীর দিন অর্থাৎ দেশবন্ধুর তিরোধানের দিন, সিউড়ি সহরে একটি করিয়া সভা হইবে, সেই সভায় দেশবন্ধু সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। আজ পর্য্যন্ত এই প্রকারের তিনটি সভা হইয়াছে। সিউড়ির কয়েকজন উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া, হেতমপুর কলেজের অধ্যাপকগণও এই কার্য্যে যোগদান করায় কার্য্যটি আপা-ততঃ একরূপ চলিতেছে। এই স্মৃতি-সমিতির নিতান্ত শৈশব অবস্থা; সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা উচিত নহে।

পূর্ব্বে সিউড়িতে যতদিন থাকিতাম, বিশ্রাম লাভ করিতাম। এই সব কারণে, এখন আর তাহা হয় না।

ইহাই আমার গত বৎসরের অর্থাৎ ১৩৩১ সালের আশ্বিন হইতে ১৩৩২ সালের আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত সংঘের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী।

সিউড়ি
১২ আশ্বিন, ১৩৩২, শুক্লা একাদশী।

মরমী কবি চিত্তরঞ্জন

(হেতমপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীতারকব্রহ্ম চক্রবর্ত্তী এম, এ লিখিত)

দেশবন্ধুর অকালমৃত্যুতে সমস্ত দেশ আজ শোকে মুহ্যমান। হঠাৎ সেদিন যে মুহূর্ত্তে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল তন্মুহূর্ত্তেই বোধ হইল যেন বক্ষের অস্থিপঞ্জর শতধা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইলে সে দিকটা যেমন ফাঁকা বলিয়া বোধ হয়, দেশবন্ধুর মৃত্যুতে তেমনই চারিদিক শূন্য বলিয়া মনে হইতেছে, এমন লোক নাই যে দেশবন্ধুর মৃত্যুতে শোকাভি-

আত্মীয়স্বরূপ ছিলেন। আত্মীয় বিয়োগজন্য আমরা শোকমগ্ন হই কেননা সে ব্যক্তির সুখদুঃখের সঙ্গে আমরা নিজেদের সুখদুঃখ এক করিয়া লই। দেশবন্ধু সমস্ত দেশের সুখদুঃখকে নিজের সুখদুঃখ রূপে অনুভব করিতেন। তাই তাঁর দধিচী ও শিবির মত বিরাট ত্যাগ এবং বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেবের ন্যায় অপূর্ব্ব সন্ন্যাস। ভাষার এমন শক্তি নাই যে তাহা অতি সুবক্তার কণ্ঠনিঃসৃত হইলেও তাঁহার বিরাট স্বার্থত্যাগ ও অপূর্ব্ব দেশপ্রেম বিবৃত করিতে সমর্থ হয়। দেশে স্বরাজ আনিবার জন্য তিনি কিরূপভাবে প্রাণপাত করিয়া গেলেন তাহা সকলেই বিদিত আছেন।

তিনি অসহযোগ ব্রত অবলম্বন করিয়া দেশের মঙ্গলজন্য কি কি কাজ করিয়াছেন তাহার পরিচয় দেওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সাধারণ ব্যক্তি সংবাদপত্রপাঠে ও যাঁহারা তাঁহার সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে সে সব কার্য্যের কথা অবগত আছেন। আমরা এ প্রবন্ধে সেই ভাবের মাত্র আলোচনা করিব যে ভাবের প্রেরণায় মানুষ মানুষের জন্য, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের জন্য, পীড়িত দীন দরিদ্রের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে, যে ভাবের উন্মাদনায় মানুষ লোভ মোহের আগার এই সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বিরাটের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। আমরা সেই ভাব উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিব যে ভাবে ভাবিত হইয়া দধিচি, শিবি, কর্ণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন প্রভৃতি মহাত্মাগণ ত্যাগের অপূর্ব্ব মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, যে ভাব আজ মহাত্মা গান্ধীকে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করাইয়াছে এবং যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া মহাত্মাজীর শিষ্য দেশবন্ধু মাসিক ৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের ব্যবসা ও প্রচুর গচ্ছিত ধন দেশমাতৃকার চরণে অর্পণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ভাবের অভিব্যক্তি ভাষা ও কর্ম্ম। ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার স্বরচিত কতকগুলি কবিতা আমরা পাইয়াছি ; এই সমস্ত কবিতার সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও এক চন্দ্র যেমন সমস্ত তমোরাশি দূর করিতে সমর্থ হয় সেইরূপ অল্পসংখ্যক কবিতা দ্বারাও তাঁহার রহস্যময় ভাব ও বিরাট প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। ভগবৎসত্তা উপলব্ধির জন্য তাঁহার প্রাণের অসীম ব্যাকুলতা, হৃদয়ের উদ্দাম আবেগ, কখন আশায় উৎফুল্লতা, কখন বা নিরাশায় হা হুতাশ, সাগর-সঙ্গীতের নিম্নলিখিত কবিতাগুলিতে পাওয়া যায়—

মুক্ত বায়ু প্রভাতের—আনন্দকীর্ত্তন ভারে
নাচিছে পাগল হ'য়ে অন্তরের চারিধারে
দেবতার তরে আজি আমার আকুল হিয়া
ঢেকেছ ঢেকেছ মরি কি মধু বিরহ দিয়া
প্রাণারাম প্রাণারাম তোমা পাই কিনা পাই
আমি ভেসে ভেসে উঠি আমি ডুবে ডুবে যাই

এপারে আলোকভরা ওপারে আঁধার
পার ক'রে দাও মোরে ওগো পারাবার
হোথায় তোমার মাঝে
কি জানি কি বাজে
তোমার গানের মাঝে আলো কি আঁধার
দেখিব ওপারে গিয়ে
শুনিব পরাণ দিয়ে
তোমার গানের মাঝে আলো কি আঁধার
আমারে ভাসায়ে লও তোমার ওপার।

তাঁহার বিপুল ধনরাশি ও যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি থাকাতেও তিনি নিজেকে অত্যন্ত দীন কাঙ্গাল বলিয়া মনে করিতেন; তাঁহার হৃদয় যাহা অনন্তের প্রকাশ তাহা বাস্তবিকই শান্ত সসীম জাগতিক কোন বস্তু দ্বারা তৃপ্ত হইতে পারে না। তাই ঈপ্সিত ধন পাইবার জন্য তাঁহার করুণ বিলাপ। অত্যন্ত প্রিয়বস্তু পাইবার জন্য যে উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা তাহা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। পাছে বা প্রিয়বস্তুর মিলন না হয়, এই আশঙ্কায় প্রাণের ভিতর একটা হাহাকার উঠে; তাই তিনি গাহিতেছেন—

ওপারে কি আলো জ্বলে রহস্যের মত
যে আলো দেখেনি কেহ প্রভাতে সন্ধ্যায়?
ওপারে কি গীতধ্বনি জাগে অবিরত
যে গান শুনেনি কেহ দিবসে নিশায়?
ওপারে কি বসে কেহ তৃষ্ণার্ত্ত আকুল
পরাণ পরশতরে আমারি মতন?
ওপারে কি দেখা যায় অনন্ত অতুল
তোমার অন্তর ছায়া পরাণ স্বপন?
আমি যে তৃষিত বড় ওগো মহাপ্রাণ
আমি যে তৃষ্ণার্ত্ত অতি পরাণ মাঝারে
আমারে ডুবায়ে দাও ওগো মহাপ্রাণ
আমারে ভাসায়ে লও তোমার ওপারে
তবে কি মিলিবে মোর আশার স্বপন?

আজি যে ঘিরেছে মোরে গাঢ় অন্ধকার
সাড়া শব্দ নাহি পাই পরাণ মাঝার
নীরব ক্রন্দনে ভরা চোখে নাহি জল
আজি যে তোমার তরে পরাণ পাগল।

"তবে কি মিলিবে মোর আশার স্বপন, কাঙ্গাল পরাণ হবে রাজার মতন" এই দুই চরণে যে কি ভাব, কি দৈন্য, কি হৃদয়ের মহাশূন্যতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহার মহত্ব তাহার গরিমা তাহার প্রাচুর্য্য বাস্তবিকই আমাদের অনুভব করিবার ক্ষমতা নাই। যাঁহারা ঐ পথের পথিক তাঁহারাই ঐ সব মহাভাবের আভাস পাইয়া নিজেকে ও জগৎকে ধন্য করিতে পারেন। সাধকপ্রবরের সাধনাপথ যে কত তীব্র জ্বালাময়, কত যে বিঘ্নবহুল, সেখানে কত যে আশা নিরাশার তাণ্ডব নৃত্য দেশবন্ধুর জীবন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—

কোন পথে যাব আজ ভেবে নাহি পাই
কে দেখাবে আলো মোরে কেহ নাই কেহ নাই
কিছু নাই কিছু নাই পরাণের চারি পাশে
আঁধার নয়নে আরো আঁধার ঘনায়ে আসে
হে মোর বিজন বঁধু হে আমার অন্তর্যামী
কতদিন কতবার আভাস পেয়েছি আমি
আজ কি বঞ্চিত হব ফেলে যাবে একবারে?
এ মহা বিজন রাত্রে এই ঘোর অন্ধকারে?
হাহা হাহা করি উঠে পরিচিত হাস্যরব
কোথা তুমি কোথা তুমি এ যে অন্ধকার সব
যেখানেই থাক নাথ আছ তুমি আছ তুমি
সকল পরাণ মোর তোমার চরণভূমি
ভাবনা ছাড়িনু তবে এই দাঁড়াইনু আমি
যে পথে লইতে চাও ল'য়ে যাও অন্তর্যামী

এই যে 'পরিচিত হাস্যরব' এই যে 'আছ তুমি আছ তুমি' ভাব, ইহারই নাম mysticism; এই ভাবচক্ষুর সাহায্যে সাধক ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করে; এইরূপ ভাবেন্দ্রিয় দ্বারা মানুষ ভগবানের দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণজনিত আনন্দ লাভ করিয়া পাগল হয় উন্মাদ হয়। প্রকৃত তথ্যই এই যে মানব-দেহস্থিত জীবাত্মা পরমাত্মার প্রকাশ মাত্র পাশ্চাত্য-দর্শনও ভূয়োদর্শনের ফলে এই সত্যেই আসিয়া পৌঁছিয়া-

ছেন ; তাঁহাদেরও মতে Man is the reproduction or reduplication of God. ঈশ্বর সর্ব্বদাই আমাদের অন্তর্দ্দেশে বিরাজ করিতেছেন কিন্তু সংসার-মায়ায় মুগ্ধ হতভাগ্য জীব আমরা তাঁহার প্রাণঃস্পর্শী আহ্বানে সাড়া দিই না। তাই সর্ব্বদা আমার পুত্র, আমার ধন, আমার বাড়ী আমার আমার বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকি। ভগবানই বলিয়া দিতেছেন "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রামযন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।" এই সর্ব্বভূতে হৃদিস্থিত ভগবানের উপলব্ধি বা জ্ঞান, দার্শনিকদের যুক্তি তর্ক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা ছাড়া আরও একটি পথ আছে, যাহা দেশবন্ধু তাঁহার কবিতা গুলি আমাদের সম্মুখে ধরিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছেন ; ইহারই ইংরাজী নাম Mysticism. বর্ত্তমানে কতক পাশ্চাত্য চিন্তাশীল ব্যক্তিগণও স্বীকার করেন যে "the heart has reasons which the intellect knows not of" আমাদের ভারতের চিন্তাপ্রবাহের ধারা দেখুন "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" বর্ত্তমানযুগে ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই ভাবেরই শিক্ষা দিয়াছেন, যদিও তিনি জ্ঞানমার্গ দ্বারাও ভগবৎ প্রাপ্তির বিষয় স্বীকার করিতেন। উপনিষদের শিক্ষক বাস্তবিকই বলিয়াছেন যে তাঁহাকে জানিলে সব জানা যায়। ভগবান জানিতে পারিলে এমন জিনিষ থাকে না যে যাহা জানা যায় না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনে এই সত্য উজ্জ্বল ভাবে পরিস্ফুট। বাল্যকালে তিনি সামান্য লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন, শুভঙ্করী ধাঁধাঁ লাগিত। উত্তরকালের সেই ব্যক্তির অপার শাস্ত্রজ্ঞান ও অমূল্য উপদেশ এমন কি সুদূর আমেরিকাবাসীকেও মুগ্ধ করিয়াছিল। বাস্তবিকই Mystic এর পক্ষে সমস্ত জগৎ-রহস্য একটী হৃদয়-সংবেদ্য সত্য। মাত্র অনুভূতির মধ্য দিয়া সকল সত্য সকল তথ্য তিনি জ্ঞাত হন। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতে তখন তিনি পার্থক্য বোধ করেন না। অনুভূতি দ্বারা বহির্জগৎ তাঁহার নিকট অন্তর্জগতে পরিণত হয়। এই জাতীয় অনুভূতির আলোক দেশবন্ধুর হৃদয়কেও উদ্ভাসিত করিয়াছিল। তাই তিনি বলিতেছেন—

কোন ছায়ালোক হ'তে প্রাণের আড়ালে
এমন সোহাগ ভ'রে প্রদীপ জ্বালালে
ওগো ছায়ারূপী কোন ছায়ালোকে তুমি
তুলিতেছ গীতধ্বনি হৃদি তন্ত্রী চুমি
মোহন পরশে ? আমি কথা নাহি কই !
বঁধু হে নয়ন মুদে শুধু চেয়ে রই !

Mysticism এর ভাব এই যে Mystic যাহা নিজ অন্তরে সত্য বলিয়া অনুভব করেন তাঁহার জীবনকেও তিনি সেইভাবে পরিচালিত করেন। সামাজিক আচার ব্যবহার ও বিধি-নিষেধ

তাঁহার কার্য্যের গতিকে প্রতিহত করিতে পারে না। চিত্তরঞ্জনের স্বাধীন মুক্তিকামী মন, হিন্দুধর্ম্মের আচার ব্যবহার মধ্যে যে গুলিকে কুসংস্কার বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাঁহার বিবেক যাহাকে অন্যায় ও অধর্ম্ম বলিয়া দিয়াছে, তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ বিষবৎ বর্জ্জন করিয়াছেন। লোকের স্তুতিনিন্দা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। বাস্তবিকই যে সব মহাপুরুষ মহাভাবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া আত্মদৃষ্টি করিতে সক্ষম, তাঁহারা কোনরূপ গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে পারেন না। সমাজের বিধিনিষেধ তাঁহাদের কর্ত্তব্যের ধারাকে নিয়মিত করিতে পারে না; পরন্তু ইঁহাদেরই কর্ত্তব্যের তালিকানুযায়ী উত্তরকালে বিধি-ব্যবস্থার প্রণয়ন হয়। এইরূপ দৃঢ় আত্মপ্রতিষ্ঠা Mystic-এর জীবনের প্রধান বিশেষত্ব। এ সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের একটি পারিবারিক ঘটনার উল্লেখ করিব। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে Mystic হইলেই যে তিনি কোন ধর্ম্মাবলম্বী হইবেন না তাহা নয়। তিনি যে-কোন ধর্ম্মাবলম্বী হইতে পারেন। চিত্তরঞ্জন নিজের বিবেকবুদ্ধি অনুসারে মনে প্রাণে হিন্দু ছিলেন। অথচ তিনি বহু হিন্দু নৈষ্টিক আচার ব্যবহার নিজের বিবেকবিরুদ্ধ বলিয়া মানিতেন না। তিনি ব্রাহ্মণের জাতিগত প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না। তাই তিনি বৈদ্যবংশজ হইয়াও, বেদোক্ত বিধানে ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, আবার পুত্র চিররঞ্জনের বিবাহ দিয়াছিলেন পশ্চিম বঙ্গের কোন বৈদ্যবংশে। অথচ এই সব বিবাহই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের ব্যবস্থামতে সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। তিনি সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন বটে; কিন্তু তাই বলিয়া পাশ্চাত্য আচার ব্যবহারের অনুকরণ কখনই পছন্দ করিতেন না। তিনি বড়ই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে "আমরা ভাবে ভাষায় আহারে বিহারে আচারে বিচারে ধর্ম্মে কর্ম্মে প্রায় সকল বিষয়েই বিলাতের অনুকরণ করিয়াছি। মন্দিরের বদলে সভা করিয়াছি, সদাব্রতের বদলে হোটেল খুলিয়াছি, লটারি করিয়া অনাথ আশ্রমের চাঁদা তুলি; দেশের যত রকমের স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার সহজ উপায় ছিল, তাহাদের পরিবর্ত্তে বিলাতী খেলা আমদানি করিয়াছি; অর্থোপার্জ্জন যে আমাদের জীবনযাত্রার উপায়মাত্র তাহা ভুলিয়া গিয়া বিলাতী Industrialism এর অনুকরণ করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের জন্যই জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করিতেছি।"

আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি যে চিত্তরঞ্জন প্রকৃতই মূর্ত্তিমন্ত প্রেরণা। তিনি যে ভাবের ভাবুক হইয়াছিলেন, তাহাতেই তন্ময় হইয়াছিলেন। মহাত্মাজীর ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়ায়, বিপুল ভোগবিলাস সমুদ্রের তরঙ্গে তৃণগুচ্ছের মত ভাসিয়া গিয়াছিল। একলব্য নিজ গুরু দ্রোণকে করাঙ্গুলি উপহার দিয়াছিলেন। দেশবন্ধু, নিজ গুরু মহাত্মাজীকে তাহা অপেক্ষাও বড় উপহার নিজসর্ব্বস্ব দিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন—

ওগো কর্ণধার
আমার মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন
ভাবনা কিবা তার—
তোমারে করি নমস্কার।
কেবল তুমিই আছ আমিই আছি
এই জেনেছি সার—
তোমারে করি নমস্কার।

আমরা সাধারণভাবে বলিয়া আসিলাম যে দেশবন্ধু ভাবের প্রেরণা দ্বারা সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব, তাঁহার এই হৃদয়ের তন্ময়তা কোন্ ভাব দ্বারা অধিকতর অনুপ্রাণিত বা পরিপুষ্ট হইয়াছিল। হৃদয়মধ্যে ভাবের অন্নাধিক স্ফূর্ত্তির তারতম্য অনুসারে আমরা ভাবকে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথম—করুণার ভাব। অসীম ঐশ্বর্য্যশালী ও অপার প্রভাবসম্পন্ন ঈশ্বরের নিকট আমি মানুষ অতি ক্ষুদ্র, অতি হীন, অতি দরিদ্র, অতি হতভাগা। অনন্তের তুলনায় নিজ শান্ত সসীম ক্ষমতাহীন আত্মার জ্ঞান বা অনুভূতি, হৃদয়ে স্বতই ভয় ও বিস্ময়ের ভাব উদ্রেক করে। এই ভাবের ঈশ্বর ভগবান রুদ্রদেব শৈব ভাবের উপাসনায় ভক্তের এইরূপ ভাব আমরা দেখিতে পাই। ভগবান মহাদেব কালান্তক, শ্মশানচারী, পরমযোগী, গলায় হাড়ের মালা, বিষপানে কণ্ঠ নীল, যুগপৎ বিস্ময় ও ভয়ের সঞ্চারক। কিন্তু এই ভয়ে ভাবুক অভিভূত হইয়া মনুষ্যত্ব হারায় না। প্রথমতঃ এইরূপ ভাব মনে ভয়ের উদ্রেক করে, যেহেতু ঐভাবে হৃদয় অভ্যস্ত নয়; এই ভয়ই কিছুকাল পরে বিস্ময়ে পরিণত হয় এবং বিস্ময়ই পরে জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া নির্ম্মল শান্তি দান করে। এই ভাবের উক্তি গীতায় ভগবান করিতেছেন—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

আবার অর্জ্জুন, যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে বলিতেছেন—

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে
তদেব মে দর্শয় দেবরূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥

দ্বিতীয়—প্রেম ভাব। হিন্দু বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপাসনা এইভাবে অনুপ্রাণিত। জীবাত্মার সহিত পর-

জীবের যে এই সখ্য সাম্য বা একত্ব ভাব, ইহা হিন্দুদিগের চিন্তার একটী বিশিষ্টতা, তাই ভগবদ্গীতা শিক্ষা দিতেছেন—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎ পরায়ণঃ॥

তৃতীয়—সমত্বভাব (Pantheistic mysticism) আমাদের দেশের উপনিষদের শিক্ষা কতকটা এই ভাবের। উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন—এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ সেই পরমাত্মা। তিনিই সত্য। তুমিই তিনি, তত্ত্বমসি একণে কেহ বলিতে পারেন এই ভাব মানুষকে সহজেই অসৎ পথে চালিত করিতে পারে। কারণ আমি যদি ভগবানই হই তাহা হইলে যে কিছু মন্দ কার্য্য আমার দ্বারা কৃত হয় তাহা ভগবানই করাইয়া থাকেন। মন্দও তিনি করেন, ভালও তিনিই করেন, অতএব আমার ভাল মন্দ বিচারের কোন প্রয়োজন নাই। যদিও এই ভাব হইতে সাধারণ যুক্তির সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তথাপি এইরূপ ভাবের এইরূপ প্রেরণার প্রকৃত ফল সম্পূর্ণ বিপরীত। ভাবুক নিজকে ঈশ্বর ভাবায় সমস্ত আত্মা ঈশ্বরীয় ভাবে পরিপূর্ণ হয়। প্রবল স্রোতে একগাছি তৃণ ফেলিয়া দিলে তাহা যেমন তৎক্ষণাৎ অতি সুদূরে ভাসমান হইয়া চলিয়া যায়, তদ্রূপ সোঽহং ভাব উপস্থিত হইলে পাপ, তাপ, হীনতা, দৈন্য, ঘৃণা প্রভৃতি অসৎ প্রবৃত্তি সকল হৃদয় হইতে তন্মুহূর্ত্তে অপসৃত হইয়া পবিত্রতার পুণ্যধারায় হৃদয় আপ্লুত হইয়া যায়। যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু উদার, যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু বিশাল—এক কথায় যাহা কিছু উত্তম, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতা একমাত্র ভগবান। মানুষ যদি নিজকে সেই ভগবান বলিয়া ভাবে, তখন তাহার ভিতর ঐ সব পবিত্র উদার ভাব ভিন্ন অন্য কোন ভাবের উদয় স্বভাবতঃই হয় না।

চতুর্থ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু সবই ভগবানের প্রতিবিম্ব, এই বিশ্বমায়া কল্পিত নয়, ইহা ভ্রমাত্মক নয়—ইহা পূর্ণ সত্য। তাই বলিয়া ইহার বহিরাকৃতিটাই সত্য নয়, সত্য ইহার অন্তর্প্রকৃতি। আকার অবয়ব, বর্ণ পরিমাণ, সম্বন্ধ, আবির্ভাব, তিরোভাব প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ ঠিক সূত্রে গ্রথিত মণিগণ সদৃশ। পর্ব্বত, প্রান্তর, সমুদ্র, অরণ্য, আকাশ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহ ভাবুকের হৃদয়ে ভগবানের অনন্ত অসীম শক্তি ও অপার সৌন্দর্য্যের মহিমা জাগরূক করিয়া দেয়। এই ভাবের ভাবুক প্রত্যেক অণু পরমাণুতে প্রেম, সৌন্দর্য্য, মঙ্গল, মিলন দর্শন করেন। বৃক্ষ লতা গুল্ম স্থাবর জঙ্গম, কীট পতঙ্গ, ভূচর খেচর প্রভৃতি সমস্ত বস্তুতে ভগবানের রূপ দর্শন করিয়া ভাবুকচিত্ত আনন্দে

পঞ্চম—অনু পরমানু হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ সেই এক বিরাটের উদ্দেশ্য সফল করিবার উপায়মাত্র। আবার মানুষের মধ্যে সাধারণ মানব অপেক্ষা কতিপয় বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন মানবদ্বারা ভগবানের উদ্দেশ্য অধিকতররূপে প্রকাশিত হয়। ইঁহারাই গুরু নামে অভিহিত হন। ভক্ত সাধক এই গুরুকে ভগবানের স্বরূপ ভাবিয়া, তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া গন্তব্যপথ আলোকিত দেখেন।

ভাবুকের হৃদয়ের ভাবের আধিক্যানুযায়ী উপরি উক্ত শ্রেণীবিভাগ দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। এক্ষণে স্বভাবতই মনের মধ্যে প্রশ্ন হইবে—এই দেশবন্ধু উপরি উক্ত ভাবসমূহের মধ্যে কোন্ ভাব দ্বারা অধিকতর অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। এস্থলে বলা বাহুল্য যে, ভক্তহৃদয় উপরোক্ত ভাব সমূহের মধ্যে কেবল একটী ভাব দ্বারাই যে মুগ্ধ হয় তাহা নহে। সকল ভাবগুলিই, ঐ সমস্ত গূঢ় তত্ত্বানুভূতির প্রত্যেক ভাবটীই এককভাবে সম্পূর্ণ। যে কোন ভাবের একটীই সাধককে ভগবানের নিকট পৌঁছাইতে পারে, অথবা একই সাধক জীবনে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঐ সমস্ত ভাবের একটি একটি ভাব সাধনা করিতে পারেন। দেশবন্ধুর সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছিল। কবির হৃদয় কখনও করুণভাবে পরিপূর্ণ হইয়া নিজের হৃদয়ের দৈন্য, শূন্যতা, কাতরতা প্রকাশ করিতেছে, তাই কবি গাহিতেছেন—

অশান্ত বেদনভরে দুলিছে ফুলিছে
কাঁপিছে গর্জ্জিছে যেন মহা হাহাকার
আজি যে আকাশভরা ধূসর আঁধার
আজি যে বক্ষের মাঝে মহা হাহাকার

তাঁহার কবিতাগুলির মধ্যে অসাধারণ কবিত্ব থাকিলেও ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে তিনি যেন কবিতা লিখিয়া মোটেই তৃপ্ত নহেন। বিধাতা তাঁহাকে কর্ম্ম করিবার জন্য ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছেন—তাই তিনি প্রকৃত কর্ম্মের পথ খুঁজিতেছেন। খুঁজিতে খুঁজিতে সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয় পড়িতেছেন, তাই বলিতেছেন—

ওই ছায়া মন্দিরের কোথারে দুয়ার
কোন পথে যেতে হবে
কে বল আমায় কবে ?
যেন হেরি মনে মনে বদ্ধ চারিধার
ওই ছায়া মন্দিরের কোথা রে দুয়ার

হৃদয়ের কাতরতার এই যে ভাব—ইহারই নাম Mysticism of Grace. আবার কখন কখন কবি তাঁহার নিজের ভিতর কি যেন কি এক বিচিত্ররূপ, কি যেন কি এক আশা, কি যেন কত গরব অনুভব

করিতেছেন। প্রতি পদবিক্ষেপ যেন কি এক তাল মান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। জীবন যেন কি এক গানে ভরপুর হইয়া যাইতেছে। তাই তিনি গাহিতেছেন—

কতনা সোহাগভরে তুলিতেছি ফুল
কতনা গরবে মোর হৃদয় আকুল
কতনা বিচিত্র রাগে পরাণ কাঁপিছে
কতনা আশার আশে হৃদয় নাচিছে
যেন কার তালে তালে ফেলিছি চরণ
যেন কার গানে গানে ভরিছি জীবন।
তোমারি মোহিনী এ যে তোমারি মোহিনী
ভাবে ভোর তাই বঁধু বুঝিতে পারিনি।

আবার তন্মুহূর্ত্তেই তিনি তাঁহারে সোহাগের পাত্র, গরবের বস্তু, আশার কেন্দ্রস্থল, ভাবের বঁধুকে নিজের বুকের মাঝে দেখিতে পাইতেছেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী কথা শুনিতে পাইতেছেন, তাঁহার স্পর্শ স্বপ্নসম বোধ হইতেছে। ভাবুক তখন চোখের জলে ভাসিয়া নিজের অস্তিত্ব একেবারে ভুলিয়া যাইতেছেন। প্রাণের প্রাণ, প্রাণারাম প্রাণাবলম্বনকে প্রাণের মধ্যে পাইয়া পূর্ব্ব বিরহজনিত জ্বালা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হওয়ায় তাঁহার হৃদয় ছিঁড়িয়া যাইতেছে, বুক গরজিয়া উঠিতেছে। তিনি আর কাঁদিতে পারিতেছেন না, কথা কহিতে পারিতেছেন না; নয়ন মুদিয়া শুধু নীরবে পড়িয়া আছেন—

কেমন ক'রে লুকিয়ে থাক এত কাছে মোর
বুকের মাঝে কেমন করে চোখে বহে লোর
পরশ তব স্বপনসম প্রাণে আনে ঘোর
নিশ্বাস তব মুখে লাগে কাঁপে প্রাণ মোর

প্রাণের বঁধুকে হৃদয় মাঝারে পাইয়া হৃদয়-জ্বালা আরও বর্দ্ধিত হওয়ায় বলিতেছেন—

এত ক'রে চাপি বুক তবু হাহাকার
ছিঁড়িয়া হৃদয় মোর উঠে বারবার
সে শুধু তোমারি তরে তোমা পানে ধায়
তোমারে না পেয়ে মোর বুক গরজায়
এই অশ্রু এই ব্যথা এই হাহাকার
তুমি না লইবে যদি কারে দিব আর?

এত ক্রন্দনে এত হাহাকারেও যখন হৃদয়ের জ্বালা প্রশমিত হইতেছে না, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই

হইতেছে, তখন অভিমানে করি বলিতেছেন, তবে আর আমি কাঁদিব না, কেবল নয়ন মুদিয়া নীরবে পড়িয়া থাকিব—

আমি কাঁদিব না আর কথা নাহি কব
নয়ন মুদিয়া শুধু পথে প'ড়ে রব।

এই ভাবের প্রেরণার ইংরাজী নাম Pantheistic Mysticism. ভাবুক কখন কখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুতে ভগবানের বিকাশ দেখিতে পান। জল বাতাস, কন্দর প্রান্তর, পর্ব্বত সমুদ্র সমস্তই ভগবানের বিভূতি বলিয়া বোধ করেন। সমস্ত বিশ্বসংসার ঈশ্বরের প্রতিবিম্বস্বরূপ দেখেন। উষার আগে সূর্য্যের কিরণ, বিহঙ্গের গান, সন্ধ্যার অন্ধকার, গভীর রজনীর নিস্তব্ধতা, সমুদ্রের তরঙ্গের ধ্বনি—একাকালে দেশবন্ধুর প্রাণে যে কি সুর সৃষ্টি করিয়াছিল, তাঁহার হৃদয় যে কি ভাবে ভরপুর হইয়াছিল, তাহা তাঁহার 'সাগর-সঙ্গীতে'র মাত্র দুএকটি কবিতা শুনিলেই বুঝিতে পারা যায়—

হে অর্ণব, আলোঘেরা প্রভাতের মাঝে
এ কি কথা, এ কি সুর
প্রাণ মোর ভরপূর
বুঝিতে পারিনা তবু কি জানি কি বাজে
তোমার গানের মাঝে কি জানি বিহরে
আমার সকল অঙ্গ শিহরে শিহরে
আনন্দে উৎসবে ভরা সূর্য্যকররাশি
তোমার সর্ব্বাঙ্গ আজ আনন্দে লুটায়
উজল উছল জলে কুসুম ফুটায়।

এই যে ভাব, ইহা সুখ কি দুঃখ, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। কখন সুখের রাশি পুষ্প হইয়া তাঁহার হৃদয়ে ফুটিতেছে, কখন বা সকল দুঃখ যেন গীত হইয়া উঠিতেছে। তরঙ্গে তরঙ্গে গগণে পবনে সেই গীতধারা প্রবাহিত হইতেছে এবং সেই গীতধারে তাঁহার মনখানি যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিয়া উঠিতেছে— কথার মোহ বা ভাষার বিন্যাস দ্বারা হৃদয়ের এ ভাব তাঁহার প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। তাই তিনি যেন যন্ত্রস্বরূপ যন্ত্রী দ্বারা পরিচালিত বা অনুপ্রাণিত হইতেছেন। তাই তিনি গাহিতেছেন—

আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী—বাজাও আমারে

আমার জীবন ল'য়ে কি খেলা খেলিলে
আমার মনের আঁখি কেমনে খুলিলে
আমার পরাণ ছিল কুঁড়ির মতন
তোমার সঙ্গীতে তারে ফুটালে কেমন

এই যে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে গূঢ়তত্ত্বের অনুভূতি—ইহারই ইংরাজী নাম Nature Mysticism.

এইবার যে প্রেরণার নাম করিতেছি, তাহার প্রভাব তিনি যুগাবতার মহাত্মা গান্ধীর নিকট পাইয়াছিলেন। নব-ভারতের মুক্তিমন্ত্রের গুরু যে সাধনার বাণী প্রচার করিতে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহা দেশবন্ধুর হৃদয় কি ভাবে আলোড়িত করিয়াছে, আপনাদের অবিদিত নহে। হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার, ধনী, ভোগী চিত্তরঞ্জন—আর দেশের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগী চিত্তরঞ্জন। ইহা দ্বারাই বুঝা যায় দেশবন্ধুর জীবনে মহাত্মাজীর কি অসামান্য প্রভাব, তাই তিনি মহাত্মাজীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

কেবল তুমিই আছ আমিই আছি
এই জেনেছি সার
তোমারে করি নমস্কার—

এখানে মহাত্মাজীর উপর তিনি তাঁহার সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন (Theosophical Mysticism.) যদিও উপরি উক্ত বিভিন্ন ভাবসমূহ দ্বারা বিভিন্ন সময়ে তিনি অনুপ্রাণিত হইতেন, তবুও তাঁহার মধ্যে আমরা একটি ভাবের বা একটি তত্ত্বানুভূতির প্রাধান্য সর্ব্বদাই লক্ষ্য করি। সেটী, বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবির প্রাণস্পর্শী প্রেমের গান, ত্যাগের গান, বৈরাগ্যের গান। এই যে প্রেমভাব বা মধুর রসাস্বাদন, তাহা তাঁহার জীবনের উৎস ছিল। চিত্তরঞ্জন ব্রাহ্মপরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেও, বাল্যকাল হইতেই হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। অনেক সময় তাঁহার গৃহে গীতাপাঠ, শাস্ত্রব্যাখ্যা ও নাম সঙ্কীর্ত্তন হইত। এই যে ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার গাঢ় নিষ্ঠা ও আন্তরিক অনুরাগ, তাহা তিনি তাঁহার মাতার নিকট হইতে অনেকটা পাইয়াছিলেন। বৈষ্ণবকবির পদাবলীতে তিনি যে প্রেমের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহারই ফলে তাঁহার অপূর্ব্ব দেশপ্রেম ও বিরাট স্বার্থত্যাগ। প্রেমের কবি চণ্ডিদাস গাহিয়াছেন—

পুত্র পরিজন সংসার আপন
সকল ত্যজিয়া সেবে

এই যে ত্যাগের বোধ, ইহা প্রাণের ভিতর পৌঁছিলে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রীপুত্র, ধন পরিজন, দাসদাসী, বিলাস ঐশ্বর্য্য—এসবের মোহ ঐ প্রেমতৃষ্ণার আকুলতাকে তৃপ্ত করিতে পারে না। এই সার্ব্বজনীন প্রেমভাবই দেশবন্ধুর নিজের অভাবগ্রস্ত অবস্থাতেও দুঃখীর দুঃস্থের অভাব মোচন

করাইয়াছে। এই প্রেমে উন্মাদ হইয়া স্বেচ্ছায় বাৎসরিক ৫।৬ লক্ষ টাকার আয়, তিনি এক মুহূর্ত্তে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। বৈষ্ণব কবির চিন্তার ধারা, তাঁহাদের রচিত পদাবলীসমূহ দেশবন্ধুর অন্তর্নিহিত প্রেমকে তাঁহার হৃদয়-উদ্যান হইতে আহরণ করিয়া, দেশমাতৃকার চরণে উপহার দিয়াছিল। কাম ও প্রেমে যে কি প্রভেদ,কামের গণ্ডী কত যে সঙ্কীর্ণ ও প্রেমের বক্ষ কত যে বিস্তীর্ণ, তাহা তিনি যেরূপ সত্য ও সরলভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেরূপ উপলব্ধি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? যেখানে প্রেম, সেখানে নিজের সুখের বিচার মোটেই স্থান পায় না। ব্রজগোপীগণের প্রেমে আমরা এইরূপ আত্মত্যাগ দেখিতে পাই। কবি তাই বলিয়াছেন—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে কহি কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ
কৃষ্ণসুখ লাগিমাত্র কৃষ্ণের সম্বন্ধ
আত্মসুখদুঃখে গোপীর নাহিক বিচার
কৃষ্ণসুখ হেতু করে সঙ্গেতে বিহার

আবার প্রেমের কবি চণ্ডিদাস প্রেমের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন—

"পিরীতি পিরীতি সব জন কহে
পিরীতি সহজ কথা
বিরিখের ফল নহেত পিরীতি
নাহি মিলে যথা তথা
পিরীতি অন্তরে পিরীতি মন্তরে
পিরীতি সাধিল যে
পিরীতি রতন লভিল সে জন
বড় ভাগ্যবান সে
পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে"

এই যে পিরীতি, ইহা ধন ঐশ্বর্য্য, পুত্র পরিজন প্রভৃতির মায়া ত্যাগ করাইয়া প্রেমিককে সন্ন্যাসী সাজায়। ইহাতে নিজ সুখ দুঃখ বিচার নাই। আপনাকে ভুলিতে হয়, পরকে আপন করিতে হয়।

বাস্তবিকই আপনা ভুলিতে না পারিলে, পরেতে মিশিয়া পরকে আপন করিতে না পারিলে, পিরীতি মুখের কথাই বটে। এইরূপ প্রেমতন্ময়তা হৃদয়ে জাগিলে জাগতিক সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য তুচ্ছ জ্ঞান হয়। এই যে তন্ময়তা, এই যে ভাব, ইহা বাস্তবিকই বুদ্ধির গোচর নয়, ইহা কেবল অনুভূতির বিষয়। ইহাই Mysticism। এই যে ত্যাগ এই যে বৈরাগ্য, এই যে সন্ন্যাস ইহা বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিলে দুঃখকর বলিয়া বোধ হইতে পারে, কারণ প্রেমিক হৃদয় আত্মসুখ জন্য মোটেই লালায়িত নয়। কিন্তু এই অদ্ভুত ভাবের এমনই স্বভাব যে ইহাতে আত্মসুখ ইচ্ছার লেশমাত্র না থাকিলেও আপনা আপনিই অপার সুখ বোধ হয়। যেমন গোপীগণের সুখ। তাঁহাদের নিজের সুখবাঞ্ছার লেশমাত্র না থাকিলেও কৃষ্ণ দরশনে তাঁহারা কোটী গুণ সুখ অনুভব করেন। তাই গোপীপ্রেমের বর্ণনা দেখিতে পাই—

আর এক অদ্ভুত গোপী ভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥
গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখ বাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটী গুণ॥
তাঁ সবার নাহি কিছু সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ॥

দেশবন্ধুও তাই বলিতেছেন, এই যে প্রেমপুষ্প তোমার জন্য সাজায়ে রেখেছি যাহা তোমারই জিনিষ, যে কুসুম তুমিই ফুটাইয়াছ তাহাই তোমাকে দিব। কিন্তু এই দানের ফল কি? না প্রাণ জুড়াবে, হৃদয় লুটাবে। তখন তিনি করিবেন কি? কাঁদিবেন আর হাসিবেন, ডুবিবেন আর ভাসিবেন—অন্তর্যামীতে তাই গাহিতেছেন—

এস আমার মন বাগে টিপি টিপি পাও
চরণতলে প্রাণে প্রাণে কুসুম ফুটাও
এস মন বনবাসে এস বনমালী
চরণতলে কোটি ফুল তারি বরণ ডালি
সাজায়ে রেখেছি আজ নয়নজলে ধুয়ে
পরাণ ভ'রে প্রাণ জুড়াব তোমার পায়ে থুয়ে
তোমার পায়ে কোটিফুল কাঁটা নাহি তায়
কত না আনন্দে মোর হৃদয় লুটায়
এস মনব্রজবাসে এস বনমালী
তোমার ফুলে সাজায়েছি তোমার বরণ ডালি!

এই কবিতাগুলির মধ্যে ব্রজগোপীগণের কান্ত ভাব আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই। এই প্রেম-ভাবের আবেশে তিনি দিশাহারা হইয়া যাইতেন, পাগলপ্রায় হইতেন। তাঁহার সমস্ত অঙ্গ শিথিল হইয়া আসিত, তখন তিনি অশ্রুজলে ভাসিতেন। পরাণবঁধুর হৃদয়ে স্থান পাইবার জন্য যেন ছট্‌ফট্‌ করিতেন, তাই তিনি গাহিয়াছেন—

কি আর কহিব বঁধু আমি যে পাগল
নয়ন দরশহীন হৃদয় বিকল
আমি যত দিশাহারা, দীন কাঙ্গালের পারা
একটি আশার আশে পথের পাগল
ফিরে ফিরে গৃহে আসি, শুধু অশ্রুজলে ভাসি
বুকে টেনে লও ওগো পরাণ পাগল
পাগলেরে আর তুমি ক'রনা পাগল

তাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি নানা রসকে আশ্রয় করিয়া যদিও দেশবন্ধু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত সেই গূঢ় তত্ত্বের অনুভব করিতেন, তবুও তাঁহার জীবনে এবং তাঁহার কবিতাগুলিতে প্রেমরসের আশ্রয়ই অধিক পরিমাণে দেখিতে পাই। ইহারই নাম Mysticism of Love। তাঁহার এই ভাবের দৃষ্টান্তস্বরূপ অনেক কবিতা উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। কিন্তু তাহাতে এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পায়, এই আশঙ্কায় আমরা নিরস্ত হইলাম।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধি জনের দেশবন্ধুর ন্যায় বিরাট স্বার্থত্যাগী সন্ন্যাসী মহাপুরুষের জীবনের গূঢ়তত্ত্ব আলোচনার চেষ্টা করিয়া তন্মধ্যস্থিত নিহিতভাব সমূহকে আপনাদিগের নিকট প্রকট করা দুঃসাধ্য বা অসম্ভব। তবুও যে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি তাহা গীতার ঐ অমূল্য উপদেশটী স্মরণ করিয়া—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্ম ফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত কর্ম্মণি॥*

* দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের শ্রাদ্ধদিনে সিউড়ি সহরে জনসাধারণের যে সভা হয়, তাহাতে দেশবন্ধু স্মৃতি-সমিতি নামে একটি সমিতি গঠিত হয় এবং স্থিরীকৃত হয় যে প্রত্যেক মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে দেশবন্ধুর স্মরণে একটি করিয়া সভা হইবে। এই সভার দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে এই প্রবন্ধটি পঠিত হয়। দেশবন্ধু-স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী এম্‌-এ, বি, এল্‌। সমিতির কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিতেছে।

দেশবন্ধু-প্রসঙ্গ

১। **বিশ্বাসের মন্ত্রত্রয়ী**—মৃত্যুর পর বেশ ভাল করিয়া বোঝা গেল, দেশবন্ধু দেশের জনসাধারণের হৃদয়ের উপর কিরূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। অনেক লোক, যাঁহারা মনে করেন তাঁহার দেশের কথা সবই জানেন, তাঁহারাও ভাবেন নাই যে দেশবন্ধু সর্ব্বসাধারণের এতদূর প্রীতিভাজন ছিলেন। মৃত্যুর পরেও দেখা যাইতেছে দেশবন্ধুর স্মৃতি ও আদর্শ দেশের ভিতর সজোরে কার্য্য করিতেছে, আর আশা হইতেছে এখনও দীর্ঘকাল ইহা বাঙ্গালায় এবং সমগ্র ভারতে কার্য্য করিবে।

এখন আপনা হইতেই জানিতে ইচ্ছা হয়, দেশবন্ধুর এই প্রভাবের হেতু কি? প্রমথ চৌধুরী মহাশয় এই স্বাভাবিক প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন। এই প্রভাবের হেতু "বিশ্বাস"। এখনকার দিনে আমাদের দেশে 'বিশ্বাস' একেবারেই কমিয়া গিয়াছে। আমরা এমন শিক্ষা পাই, এমন আব্‌হাওয়ার মধ্যে বাস করি, যে 'বিশ্বাস' বলিয়া একটা জিনিস আমাদের মধ্যে গজাইতেই পারে না, যদি বা কাহারও হৃদয়ে গজায় তাহা হইলে তাহা স্থায়ী হয় না। আমরা 'বিশ্বাসী'কে অজ্ঞান বলি, অন্ধ বলি এবং মনে মনে তাহাকে ঘৃণা করি বা করুণা করি।

দেশের জন্য যাহারা কাজ করে বলিয়া আমরা মনে করি, তাহারা কয়জনে সত্য সত্য দেশের উপর বিশ্বাস রাখে। খুব কম লোকেই যে রাখে তাহা অনেক দেশসেবকের জীবন ও কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কেহ নিরুপায় হইয়া দেশের সেবা করে, কেহ বা সুবিধায় আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য দেশের সেবা করে—ইহার ভিতর নমস্য তিনি, যিনি দেশের উপর সত্য করিয়াই বিশ্বাস রাখেন বা নানারূপ পরীক্ষা ও প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে ঐ বিশ্বাস অটুটভাবে রক্ষা করিতে পারেন।

দেশবন্ধু বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি সুদৃঢ়রূপে ও সুনিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করিতেন, ভারতের এই বর্ত্তমান দৈন্য, দুর্ব্বলতা ও গ্লানি থাকিবে না, ভারতবর্ষ অচিরে উন্নততম গৌরবের আসনে সমাসীন হইবে। কাহারও করুণার উপর নির্ভর করিয়া নহে, অপর কাহারও সাহায্য লইয়া নহে, আত্মবিস্মৃত ভারতবর্ষ নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ও প্রয়োগের দ্বারা নিজের এই সৌভাগ্য অর্জ্জন করিবে। দেশবন্ধুর বিশ্বাসের ইহাই ছিল প্রথম মন্ত্র। দ্বিতীয় মন্ত্র এই, যে তিনি যে কার্য্যে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, এবং যে হৃদয়ভাব লইয়া এই কার্য্য করিতেছিলেন—সেই কার্য্যকে তিনি উন্নততম ও পবিত্রতম কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন, মনে করিতেন ইহা আমার ধর্ম্ম, ইহা ছাড়া আর

আমার অপর কিছু করণীয় নাই। ইহাই তাঁহার বিশ্বাসের দ্বিতীয় মন্ত্র। দেশবন্ধু নিজের উপর বিশ্বাস করিতেন। তিনি জানিতেন, যিনি মানব জাতির ভাগ্যবিধাতা ও চিরসারথী, ভারতের অতীতের ইতিহাসে যিনি পার্থ-সারথিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আজও আমাদের অদৃষ্টের রথ পরিচালনা করিতেছেন, আমরা সত্য করিয়া তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিতে পারিনা বলিয়াই এখনও পরাজিত, নতুবা বিজয় অবশ্যম্ভাবী। তিনি নিজেকে সেই শ্রীকৃষ্ণের, ভারতের সেই ভাগ্যবিধাতা, চিরসারথির সৈনিকরূপে বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহার ভয় ছিল না, উদ্বেগ ছিল না, সকল অবস্থাতেই আশাশীল ছিলেন। ইহাই তাঁহার তৃতীয় মন্ত্র। দেশের উপর, নিজের উপর ও নিজের কাজের পবিত্রতা ও মহত্ত্বের উপর অবিচল বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি দেশের জনসাধারণের হৃদয় এমনভাবে অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। এই সংশয়ের যুগে এই বিশ্বাস বড়ই দুর্লভ, কিন্তু আমাদের কর্ম্মীগণকে বিশ্বাসের এই ত্রিবিধমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে।

কার্ডিনাল নিউম্যান এই বিশ্বাস-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—These beliefs, be they true or false in the particular case, form the mind out of which they grow and impart to it a seriousness and manliness which inspires in other minids a confidence in its views and is one secret of persuasiveness and influence in the public stage of the world. (চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধে উদ্ধৃত) ইহার অর্থ। এই বিশ্বাসগুলি যাহার উপর হয়, তাহা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, তাহারা যে মনে জন্মায়, সে মনকে একটি বিশেষভাবে গড়িয়া তোলে, আর সেই মনে এমন একটি অত্যাগ্রহ ও সাহসিকতা সঞ্চারিত করে, যে ঐ মন অন্যান্য লোকের মনে নিজের মতসম্বন্ধে সুদৃঢ় বিশ্বাস জাগাইয়া দেয়। সংসারের রঙ্গমঞ্চে লোককে আকর্ষণ করিয়া তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তারের ইহাই রহস্য।

২। **রাজনীতি ক্ষেত্রে**—দেশবন্ধু দাস একজন নেতা বা দলপতিমাত্র ছিলেন, তাহা নহে। তিনি স্রষ্টা ছিলেন। স্বরাজ্য দল তাঁহারই সৃষ্টি। এই দল গঠন করিতে প্রথমতঃ প্রয়োজন হইয়াছিল, দিব্যদৃষ্টি। দেশের সমুদয় অবস্থা ও প্রয়োজন তাঁহাকে বুঝিতে হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সকল প্রকার বিরোধের সামঞ্জস্য কোথায় এবং কি প্রকারেই বা তাহা হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইয়াছিল। কেবল প্রতিভার দ্বারা তাহা হয় না, প্রতিভা চাই, দিব্যদৃষ্টিও চাই। স্বরাজ্যদল কি করিয়াছে বা কি করিতে পারে তাহা ক্রমশঃ বুঝিতে পারা যাইতেছে। মুডিম্যান্ কমিটির মন্তব্যের আলোচনায় শিমলা শৈলে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহা বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছে। আশা করা যায় বাঙ্গালা দেশেও তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

যাহারা দেশবন্ধুর বিশ্বস্ত অনুগামীরূপে স্বরাজ্যদলের ভার নিয়াছেন, তাঁহারাও যদি বিশ্বাসী ও

ত্যাগী হন, তাহা হইলেই বাঙ্গালাদেশ স্বরাজ্যমন্ত্রের সুফল বুঝিবে, আর মহাপুরুষের নামের দোহাই দিয়া, করিয়া কর্ম্মিয়া খাওয়ার বা নিজের নিজের পার্থিব সুবিধা করার মতলব যদি থাকে, তাহা হইলে পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্ম্মমণ্ডলীসমূহের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, ইহারও তাহাই হইবে। ধর্ম্মমণ্ডলী পচিয়া গিয়াও পার্থিব চালাকিতে টিকিয়া থাকিতে ও ব্যবসায় চালাইতে পারে, তাহার নিদর্শন নব্যবঙ্গের আধুনিক ইতিহাসেও আছে, কিন্তু এখন যে যুগ আসিয়াছে তাহাতে রাজনীতিক দল পচিয়া গেলে টিকিতে পারিবে না। আমরা ভরসা করি দেশবন্ধুর নাম ও আদর্শ আর দেশবন্ধুর হাতে গড়া মণ্ডলী, এ প্রকারে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে না। কিন্তু তবুও বলি "সাধু সাবধান"।

এই স্বরাজ্যদল গড়িয়া তুলিতে দেশবন্ধুকে যে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল এবং প্রতিকূল অবস্থার সহিত যে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, তাহা অমানুষিক। বিজ্ঞ লেখক প্রমথ চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন—The fashioning of the Swaraj party has always struck me as a wonderful piece of political craftmanship. স্বরাজদলের গঠন দেখিয়া আমি সর্ব্বদাই ভাবিয়াছি, খুব আশ্চর্য্য রকমের রাজনীতিক গঠননৈপুণ্য!

রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বরাজদলের অভ্যুত্থান খুবই চমকপ্রদ ব্যাপার। চিত্তরঞ্জনের মানসিক শক্তি, প্রতিভা ও ত্যাগের দ্বারা ইহা সম্ভব হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে দার্জ্জিলিঙ্ পাহাড়ে যাঁহারা চিত্তরঞ্জনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই একটি কথা বলিতেছেন, তাহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা উচিত। চিত্তরঞ্জন দৃঢ়চিত্ত ভাবুক ছিলেন, নিজের মতকে সর্ব্বদাই সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রবলভাবে সংগ্রাম করিতেন। কিন্তু শেষ সময়ে তাঁহার চরিত্রে এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের বিকাশ হইয়াছিল। তিনি কাহারও বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতেন না। তাঁহার এমন একটি দৃষ্টি বিকশিত হইয়াছিল, তিনি সর্ব্বত্রই, এমন কি বিরোধী মতের ভিতরও সত্য দেখিতে ছিলেন। জাতীয় মহাসমিতিতে আবার যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের রাজনীতিকগণ মিত্রভাবে মিলিত হইয়া একযোগে কাজ করিতে পারেন, সেজন্য তাঁহার অন্তরে একটি আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়াছিল। আমাদের মনে হয় তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। সম্প্রতি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার দেশীয় ও নির্ব্বাচিত অধিকাংশ সদস্য যেভাবে কার্য্য করিতেছেন, হিন্দুস্থান টাইমস্ পত্র আগামী জাতীয় মহাসমিতি সম্বন্ধে যেভাবে লিখিতেছেন, তাহাতে বেশ আশা করা যায়, দেশবন্ধুর শেষ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে, রাজনীতিক ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী কর্ম্মীগণ অচিরে সম্মিলিত হইবেন।

৩। **জীবন-নীতি**—যাঁহারা চিন্তা করেন ও মহত্ত্বের শিখরে আরোহণ করেন, তাঁহাদের জীবনে কতকগুলি ধ্রুবনীতি থাকে। এই নীতি বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত; আর যাঁহারা

অনলকুণ্ডে পরীক্ষিত হইয়া থাকে। দেশবন্ধুর জীবনের এই নীতি সুলেখক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তী (বর্ত্তমান সময়ে 'ফর্ওয়ার্ড' পত্রের সম্পাদক) মহাশয় বর্ণনা করিয়াছেন।

Desbandhu beleived that the One and the Many are both real, immanent in, and necessary to each other for mutual self-realisation and further that what we call phenomena are but concrete manifestations in this process of mutual self-realisation of the One and the Many. Not only did he believe in these doctrines but he lived them.

দেশবন্ধু বিশ্বাস করিতেন, এক (ব্রহ্ম) যেমন সত্য, এই বহু বা জগৎও তেমনি সত্য। একের মধ্যে বহু আছেন, এই বহুর মধ্যেও এক আছেন। একেরও দরকার বহু, বহুরও দরকার এক। এক ছাড়া বহুর তৃপ্তি নাই, বহু ছাড়া একেরও তৃপ্তি নাই। আমরা যাহাকে প্রপঞ্চ বা প্রকাশিত বিশ্ব বলি, তাহা, এই একের বহুকে পাইবার এবং বহুর এককে পাইবার যে প্রয়াস ও পদ্ধতি তাহাতেই মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি যে এই মত কেবল মানিতেন তাহা নহে এই মতের উপরেই তাঁহার জীবন প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এই কারণে তিনি যখন তাঁহার শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত দান করিতেন, বা ধার করিয়া দান করিতেন তখন সত্য সত্যই অনুভব করিতেন, আমি কিছুই নই, ভগবানেরই টাকা ভগবানই আনিয়াছেন আর ভগবানই লইতেছেন।

দেশবন্ধু শুষ্ক বৈরাগ্যের বিরোধী ছিলেন, আত্মপীড়ন তাঁহার ধর্ম্ম ছিল না। তাঁহার বাসনা ছিল, জীবনের রসও ভোগ করিয়াছেন, কিন্তু ভোগে বদ্ধ ছিলেন না। আইনের ব্যবসা করিতেন, কাজেই অধিকার ও স্বত্ব, Ownership, possession সম্বন্ধে মানুষে যাহা জানে, তাহার সবই জানিতেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত জীবন-নীতির জন্য নিজেকে কখনও কোন কিছুর মালিক বলিয়া মনে করিতেন না। মালিক একজন, লীলাময় শ্রীভগবান্; সকলই তাঁহার; আমাদের ভোগবাসনার মধ্যেও তিনি, এই প্রকারের ধারণার দ্বারা চালিত হইয়া পদ্মপত্রের উপর দিয়া যেমন জল গড়াইয়া যায়, সেই প্রকারে জীবনের সর্ব্ববিধ ভোগের উপর দিয়া গড়াইয়া গিয়াছেন, জোরে ভোগও করিয়াছেন, কিন্তু ভোগের বাঁধনে বাঁধা পড়েন নাই, নিজের ভোগের ভিতরেও লীলাময়ের লীলাতরঙ্গে তাড়িত ও বাহিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় বিগত কুড়ি বৎসর কাল দেশবন্ধুর একজন অন্তরঙ্গ ও অনুরক্ত বন্ধু ছিলেন। তিনি কি প্রকারের বন্ধু তাহা শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—দেশবন্ধু যে সময়ে হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করিতে আসিলেন, সেই সময়ে Here, too, was a friend by his side—Kumar Krishna Datta—labouring for him with a devotedness, appreciation and admiration, which had in it something of the spiritual, something afar from the hard matter-of fact world of the lawyer.

শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় বন্ধুরূপে দেশবন্ধুর জন্য খাটিতেন। তিনি দেশবন্ধুর যেরূপ অনুরক্ত বন্ধু ছিলেন, দেশবন্ধুর গুণাবলী তিনি যেরূপ বুঝিতেন এবং যেরূপ গুণমুগ্ধ ছিলেন, আইন-ব্যবসায়ীর হিসাবের জগতে তাহা একেবারেই দুর্ল্লভ।

শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় কিরূপ সাত্বিক প্রকৃতির লোক, তাহা, যিনি তাঁহার সঙ্গ করিয়াছেন, তিনিই জানেন। শ্রীযুক্ত কুমারবাবু দেশবন্ধুর জীবন নীতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। কুমারবাবুর কথায় সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই।

ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।

এই মহাসত্যে দেশবন্ধু আজীবন বিশ্বাসবান ছিলেন। প্রত্যেক মানব নিজের প্রকৃতি-কর্তৃক নির্দ্ধারিত পথে বিকশিত হইবে। এই বিকাশপথে কোনই বাধা থাকিবে না। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে কতকগুলি বৃত্তি বিকশিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই বৃত্তিগুলি বিকশিত হউক। ইহাদের বিকশিত হইবার বিরুদ্ধাচরণ করিবার অধিকার কাহারও নাই। এই ছিল দেশবন্ধুর নীতি। কাজেই যে সমুদয় সামাজিক বা রাজনীতিক ব্যবস্থা মানবের এই স্বাভাবিক বিকাশের প্রতিবন্ধক, তিনি সেই সমুদয় ব্যবস্থা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না।

এই প্রতিবন্ধক দূর করাই ছিল তাঁহার জীবনের তীব্রতম আকাঙ্ক্ষা। এই চেষ্টাতেই তিনি তাঁহার অর্থ সামর্থ্য দেহ মন সকলই সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। একদিন বাঙ্গালার লাট লর্ড রোণাল্ডসের নিকট হইতে পরলোকগত বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের মধ্যস্থতায় এক টেলিফোন্ আসিল। চৌধুরী মহাশয় লাট সাহেবের অনুরোধে দেশবন্ধুকে জানাইতেছেন যেন দেশবন্ধু তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বাসন্তী দেবী ও অন্যান্য মহিলাগনকে খদ্দরের কাপড় ফেরি করিতে না পাঠান। দেশবন্ধু জবাব দিলেন, তিনি এই অনুরোধ রক্ষা করিতে অক্ষম। সার্ আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় তখন স্বয়ং আসিয়া দেশবন্ধুকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু দেশবন্ধু কিছুতেই রাজি হইলেন না। এই উপলক্ষে সার্ চৌধুরীর সহিত দেশবন্ধুর যে কথোপকথন হয়, তাহাতে সার্ চৌধুরী বলেন, লর্ড সাহেব আমাকে (সার্ চৌধুরীকে) বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে এমন কোন নেতা নাই, যাহাকে সরকার ইচ্ছা করিলে নিজের দিকে আনিতে না পারেন। ইহার উত্তরে দেশবন্ধু গম্ভীরভাবে বলিলেন সরকার একবার অসহযোগী নেতাদের পরীক্ষা করিয়া দেখুন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, তাঁহাদের ধারণা সম্পূর্ণরূপ ভ্রান্ত।

৪। স্বভাবের আকর্ষণ—এক একজন মানুষের ভিতর এমন একটা কিছু থাকে যাহাতে অপরে স্বভাবতঃই তাহাকে ভালবাসে ও বশীভূত হইয়া পড়ে। ইংরাজী ভাষায় ইহাকে বলে Personal magnetism। চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, মানুষের এই শক্তিও তেমনি অপর মানুষকে আকর্ষণ করে। এ এক মোহিনী শক্তি। এ শক্তি যে সকলেরই উপর ক্রিয়া করে, তাহা নহে। তবে অনেকের উপর ক্রিয়া করে। দেশবন্ধুর যে এই শক্তি খুব বেশী পরিমাণে ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, অনেকেই তাহা অনুভব করিয়াছেন ও তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন।

যে শক্তির দ্বারা দেশবন্ধু সত্যই দেশের বন্ধু হইয়াছিলেন, এত লোকের উপর এমন আশ্চর্য্য রকমের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, সে শক্তির উদ্ভব কোথায়– শ্রীযুক্ত ডি, সি, ঘোষ মহাশয় এই প্রশ্নের নিম্নরূপ উত্তর দিয়াছেন। It depended essentially upon his individuality,—an individuality that was powerful because of qualities that were not merely physical. It commanded respect and submission because it impressed on

those with whom it came in contact, a sense of largeness and of great intellectual power

দেশবন্ধুর সুপরিস্ফুট ব্যক্তিত্বই এই প্রভাবের হেতু। এই ব্যক্তিত্ব বড়ই শক্তিমান্ আর এই শক্তি কেবল দেহের শক্তি নহে। যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিত সেই অনুভব করিত দেশবন্ধুর ভিতর একটা অসাধারণ মহত্ব ও মানসিক শক্তি রহিয়াছে; এই অনুভূতি হইতে সম্মান ও বশ্যতা জাগিয়া উঠিত।

এই মোহিনী শক্তি জন্মান্তরীণ তপস্যার ফল, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—Chittoranjan drew men to him who remained life-long friends and experienced their highest happiness in rendering him help. His innate magnetism has been manifested to the men of to-day on a continental scale; but the magnetic emanations of his personality had been in evidence throughout his life and impelled people towards him with almost a visible pull. I suppose all leaders of men bring this quality with them as a pre-natal pre-possession; and it is little wonder therefore that Chittoranjan possessed so much of it, more of it impart than any other Indian I Know, with the single exception of Mr. Gandhi whose immediate presence coustitutes a danger-zone of magnetism.

ইহার অর্থ;—চিত্তরঞ্জন যাঁহাকে একবার টানিয়া আপন করিতেন, তিনি চিরদিন তাঁহার বন্ধু হইয়া থাকিতেন আর তাঁহারা অনুভব করিতেন চিত্তরঞ্জনকে সাহায্য করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর। তাঁহার এই আকর্ষণী শক্তির প্রভাব এখন সমগ্র দেশেই দেখা যাইতেছে। কিন্তু ইহা আকস্মিক নহে; ইহা তাঁহার চরিত্রে চিরকালই ছিল। মানুষ বেশ বুঝিতে পারিত তাঁহার টানে পড়িয়া গিয়াছি। আমার বিশ্বাস প্রত্যেক জননায়কেই এই জন্মান্তরসিদ্ধ গুণ পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং ইহা বিস্ময়কর নহে—মহাত্মা গান্ধির নিকটে গেলেও এই প্রভাব অনুভব করা যায়।

৫। **বাঙ্গালী**—বিলাতী বিদ্যা ও বিলাতী ভাব সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াও তিনি খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন, ইহা তাঁহার চরিত্রের একটি খুব বড় কথা। শ্রীযুক্ত ডি, সি, ঘোষ মহাশয়, লিখিয়াছেন—To Bengal he was the very image of its soul. That emotional abandon of his is essentially of Bengal. His tastes in literature, in music, and in all other matters were typical of Bengal. And none Knew more accurately the Bengalee temperament than he did, and none made so irresistible an appeal to the Bengalee mind as he did.

তিনি বাঙ্গালাদেশের আত্মার মূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন। ভাবের প্রেরণায় নিজেকে ষোল আনা ভাসাইয়া দেওয়া, ইহা বাঙ্গালারই বৈশিষ্ট্য। সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতিতে তাঁহার রুচিও খাঁটি বাঙ্গালী-ধরণের। বাঙ্গালীর ধাত্ তিনি যেমন সঠিক্‌রূপে জানিতেন, তেমন আর কেহ জানে না। বাঙ্গালীর চিত্ত তিনি যেমন উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, তেমন আর কেহ পারে নাই।

বীরভূমি] মাসিক পত্রিকা [৭—৮

১৩৩২

শ্রীমদ্ভাগবতের ভূমিকা

২ অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী

৩ জয়দেব

৪ বিদ্যাপতি

৫ চণ্ডীদাস

৬ নাটকে শ্রীরাধা

৭ আলোচনা ও সংবাদ

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

শ্রীমদ্ভাগবতের ভূমিকা

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্তরে স্বয়ং ভগবান্ বক্তা, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা শ্রোতা। দ্বিতীয় স্তরে, ব্রহ্মা বক্তা, নারদ শ্রোতা। তৃতীয় স্তরে, নারদ বক্তা বা উপদেষ্টা, বেদব্যাস শ্রোতা ও গ্রহীতা। চতুর্থ স্তরে, ব্যাসদেব বক্তা, শ্রীশুকদেব শ্রোতা। পঞ্চম স্তরে, শ্রীশুকদেব বক্তা, মহারাজ পরীক্ষিত মূল শ্রোতা, আর রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা সূতও একজন শ্রোতা। ষষ্ঠ স্তরে, উগ্রশ্রবা সূত বক্তা, আর শৌণকাদি ঋষিগণ শ্রোতা। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত ষট্সংবাদ গ্রন্থ।

[মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ও ষট্সংবাদ। মেধস্ ঋষি, সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যকে ইহা প্রথম বলেন। তাহার পর মার্কণ্ডেয় ঋষি ভাগুরিকে বলেন। বিন্ধ্যাচলবাসী পক্ষিগণ দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া ইহা জৈমিনি ঋষিকে বলেন। ঠিক্ শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় পারম্পর্য্য নাই, কিন্তু মার্কণ্ডেয় চণ্ডীও ষট্সংবাদ।]

শ্রীমদ্ভাগবত ষট্সংবাদ গ্রন্থ বলিলেও শেষ কথা বলা হইল না। কারণ, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম অধ্যায় এই ষট্সংবাদের বহির্ভূত। প্রথম অধ্যায়ের নাম—"ঋষিপ্রশ্ন"। প্রারম্ভে তিনটি শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। প্রথম শ্লোকে—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য পরদেবতার বন্দনা। সব শাস্ত্রের ও সব সম্প্রদায়ের পরতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় ধারণা (Conception) ঠিক্ একরূপ নহে। শ্রীমদ্ভাগবত কি প্রকারের ধারণা লইয়া আলোচনা করিবেন, প্রথম শ্লোকে তাহাই কথিত হইয়াছে। (১) দ্বিতীয় শ্লোকে—ভাগবত-ধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম কি, সেই ধর্ম্মের অধিকারী কে, সেই ধর্ম্মের সাধনা করিলে কি ফল হইবে, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় শ্লোকে—শ্রীমদ্ভাগবতের মহত্ত্ব বলা হইয়াছে। এই তিনটি শ্লোকের পরে নৈমিষারণ্যে ঋষিদের সভার কথা। শৌণকাদি ঋষিগণ এক দীর্ঘকালসাধ্য যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, সেই যজ্ঞস্থলে

রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা সূত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উগ্রশ্রবা জিজ্ঞাসিত হইয়া এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র ঋষিগণের সভায় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

উগ্রশ্রবা সূত-সম্বন্ধে একটি প্রয়োজনীয় সংবাদ পদ্মপুরাণে পাওয়া যায়। উগ্রশ্রবার পিতার নাম রোমহর্ষণ বা লোমহর্ষণ। ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতঃ" ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে জাতি ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে সূত বলে। ইঁহারা বিলোমজাত, কাজেই শূদ্র। ইঁহাদের বেদে অধিকার নাই। পুরাণে কেবল যে অধিকার আছে, তাহাই নহে, ইঁহারা পুরাণের বক্তা বলিয়া অতিশয় সম্মানিত; মহর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ পর্য্যন্ত আদরপূর্ব্বক ইঁহাদের নিকট পুরাণ-শ্রবণ করিয়া থাকেন। রোমহর্ষণ সূত সুবিখ্যাত। পদ্মপুরাণে আছে ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, কূর্ম্ম, মৎস্য, বামন, বরাহ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, নারদীয়, ভবিষ্য, আর অগ্নিপুরাণের পূর্ব্বার্দ্ধ, অর্থাৎ সাড়ে দশখানি পুরাণ শৌণকাদি ঋষি লোমহর্ষণের নিকট শুনিয়াছিলেন। তাহার পর বলরাম রোমহর্ষণকে বধ করেন। (২) তখন ঋষিরা রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবাকে সেই পদে অভিষিক্ত করিয়া অগ্নিপুরাণের অপরার্দ্ধ হইতে শ্রীমদ্ভাগবত-পর্য্যন্ত অবশিষ্ট সাড়ে সাতখানি পুরাণ শুনিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমাধ্যায়ে ঋষিগণ সূতকে ছয়টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম হইতে সূত উত্তর দিতে আরম্ভ করিয়াছেন; সুতরাং, প্রথমাধ্যায়ের তেইশটি শ্লোক সূত-প্রোক্ত শ্রীমদ্ভাগবত নহে।

ক। ঋষিপ্রশ্ন

এই ছয়টি প্রশ্ন-সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে (ভাগবতধর্ম্ম—২য় ভাগ) বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিয়াছি। প্রথম প্রশ্ন, পুরুষসকলের একান্ত শ্রেয়ঃ কি? দ্বিতীয় প্রশ্ন, সকল শাস্ত্রের সার কি? তৃতীয় প্রশ্ন, ভগবান্ দেবকীর পুত্ররূপে কেন আবির্ভূত হইয়াছিলেন? চতুর্থ প্রশ্ন, সেই দেবকীনন্দন ভগবানের কর্ম্মসমূহ বল। পঞ্চম প্রশ্ন, হরির অবতারগণের লীলা বল। ষষ্ঠ প্রশ্ন, যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট হইলে ধর্ম্ম কাহার শরণাগত হইলেন? শ্রীল বিশ্বনাথ বলেন—ষড়েব প্রশ্নাঃ। এতৎ প্রত্যুত্তরাণ্যেব সপ্রসঙ্গানি শ্রীভাগবতমিতি বিবেচনীয়ম্। এই ছয়টি প্রশ্নের উত্তরেই অন্যান্য প্রসঙ্গসহ শ্রীভাগবত কথিত হইয়াছে।

এই ছয়টি প্রশ্নের ভিতর দুইটি প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ রহিয়াছে। তিনি দেবকী-নন্দন ও যোগেশ্বর। তাঁহার প্রকট-লীলায় ধর্ম্ম তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি ধর্ম্মের রক্ষক ছিলেন, এখন তিনি চলিয়া গিয়াছেন। কেবল যে এই প্রশ্ন করিলেন, তাহা নহে। ঋষিগণ বলিলেন, এই ভগবান্ দেবকীনন্দনের অবতার ভূতসকলের রক্ষার জন্য ও মঙ্গলের জন্য। যে ব্যক্তি ঘোর সংসারে পতিত হইয়াছে, সে বিবশ হইয়া তাঁহার (ভগবান্ দেবকীনন্দন বা বাসুদেবের) নাম গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করে। স্বয়ং ভয় তাঁহাকে ভয় করে। তাঁহার চরণ মুনিগণের আশ্রয়। পুণ্যশ্লোক মনুষ্যগণ তাঁহার কর্ম্মসকলের সর্ব্বদা স্তব করিয়া থাকেন।

এই প্রশ্ন হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে—শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র নৈমিষারণ্যের ঋষি-সভায় প্রচারিত হওয়ার পূর্ব্বে, বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত শ্রীভগবানের লীলাকথা ও মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছে। ঋষিগণ তাহা সাধারণভাবে জানেন। তবে সকল শাস্ত্রের সার এবং সকল তত্ত্বের ও সকল সাধনের শিরোমণিরূপে এই তত্ত্ব বা এই ব্যাপার তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে জানিতেন না, সূতের নিকট তাহাই এখন জানিতে চাহিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট হইয়াছেন, পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থানে গিয়াছেন, তাহার পর মহারাজ পরীক্ষিত রাজ্য করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মশাপে পতিত হইয়া শ্রীশুকদেবের মুখে সপ্তাহকাল শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া তক্ষকদংশনে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাহার পর উগ্রশ্রবা সূত আসিয়া নৈমিষারণ্যে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন।

(খ) সূতপ্রোক্ত ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে উনিশ অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ের কথা বলা হইল। অবশিষ্ট আঠার অধ্যায়কে সূতপ্রোক্ত ভাগবত বলা যাইতে পারে। এই আঠার অধ্যায়ের পর পরীক্ষিত মহারাজের নিকট শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবত বলিবেন। কাজেই আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে, এই আঠার অধ্যায়ে কি আছে, এবং ইহার ভিতর শ্রীকৃষ্ণকথাই বা কিভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তরে উগ্রশ্রবা সূত শ্রীশুকদেবকে বন্দনা করিলেন। শ্রীশুক-

দেব তাঁহার ও মুনিগণের গুরু, আজ এই ঋষিসভায় তিনি যাহা বলিবেন, তাহা শ্রীশুকদেবের কৃপাতেই তিনি পাইয়াছেন। সূত যেমন শ্রীশুকদেবের বন্দনা করিলেন, তেমনি বেদসার ও অধ্যাত্মদীপ শ্রীমদ্ভাগবতেরও বন্দনা করিলেন। সূত বলিলেন—কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রশ্ন লোকের পরম মঙ্গলদায়ক, ইহাতে চিত্ত প্রসন্ন হয়; আপনারা এ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া অতি উত্তম কার্য্যই করিয়াছেন।

ঋষিগণ ছয়টি প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দুইটি প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ আছে। সূত বলিলেন—আপনারা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে, ঋষিগণের ছয়টি প্রশ্নের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রশ্নই মূল প্রশ্ন, অন্যান্য প্রশ্ন আনুসঙ্গিক। শ্রীধর-স্বামী টীকায় এই কথাই বলিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের মুখ্য বা প্রধান আলোচ্য বিষয় শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে হইলে, আরও অনেক বিষয় বুঝিতে হইবে। এই সব প্রাথমিক বিষয় যাহারা বুঝে নাই, বা স্বীকার করে না, তাহা-দিগের নিকট শ্রীকৃষ্ণকথা বলা একরূপ বিড়ম্বনামাত্র। এইসব প্রাথমিক বিষয় কি? শ্রীমদ্ভাগবত তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়াছেন। অন্যান্য পুরাণেও অবশ্য সে-সব কথা আছে। এই ভারতবর্ষে এমন দিন ছিল, যেদিন সকলেই এইসব কথা মোটামুটি জানিত, মানিত এবং এইসব কথায় বিশ্বাস করিয়া তদনুযায়ী নিজ নিজ জীবন ও চরিত্র গঠন করিতে চেষ্টা করিত। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ সে সময়ে ভারতের উপাস্য ছিলেন। এখন যেমন শ্রীকৃষ্ণকথায় অনেকের সন্দেহ হয়, তখন তাহা হইত না। তখন শ্রীকৃষ্ণকথা শুনিবামাত্রই, এই ভক্ত নরনারীর হৃদয় ও মন প্রেমরসে জাগিয়া উঠিত।

(গ) প্রাথমিক কথা

এই সব প্রাথমিক বিষয় অন্যান্য পুরাণে ও শাস্ত্রে এবং বিশেষভাবে সুশৃঙ্খলায় শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণসমূহের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হওয়া আবশ্যক। ভার-তের দর্শনশাস্ত্রসমূহে যে সকল তত্ত্বকথা বিচারিত ও প্রচারিত হইয়াছে, জনসাধারণের সুবোধ্য করিয়া পৌরাণিকগণ তাহাই বলিয়াছেন। পুরাণের সাহায্যব্যতীত বেদ ও দর্শনের প্রকৃত জ্ঞান হয় না। দর্শনশাস্ত্রে এবং পুরাণে আত্মতত্ত্ব, বিশ্বতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব

বা অপরোক্ষানুভূতি। এগুলি না জানিলে শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারিব না। আত্মা কি, ঈশ্বর কি, জগৎ কি, কে চালাইতেছে, কেন চালাইতেছে, লক্ষ্য কি? জীবন কি, মরণ কি, সৃষ্টি কি, প্রলয় কি? এ সমুদয় বিষয় না জানিলে লীলা বুঝিব কি করিয়া, অবতারই বা বুঝিব কি করিয়া? লীলা বুঝিলাম না, অবতার বুঝিলাম না, মন্বন্তর বুঝিলাম না, দেবতা বুঝিলাম না; ভক্তি বুঝিলাম না, ভক্ত বুঝিলাম না; যোগী বুঝিলাম না, জ্ঞান বুঝিলাম না, যোগ বুঝিলাম না; সাধন করিলাম না, হৃদয় মন যেমন তেমনি থাকিয়া গেল; আমি বদ্ধ জীব, নিতান্ত মলিন, আমি দেহাত্মবাদী ও ইন্দ্রিয়াত্মবাদী, অতএব অজ্ঞান আমি ঈশ্বর বুঝিব কি করিয়া, আর তাঁহার অবতার-লীলাই বা বুঝিব কি করিয়া? কাজেই প্রাথমিক বিষয়গুলি প্রথমে বুঝিতে হইবে। এই কারণেই শ্রীমদ্ভাগবতে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ ও মুক্তি—এই নয়টি বিষয় বলার পর দশম স্কন্ধে দশম তত্ত্ব যে শ্রীকৃষ্ণ, যিনি আশ্রয়তত্ত্ব, অর্থাৎ যাঁহার আশ্রয়ে ও ইচ্ছায় এই সমুদয় হইয়া থাকে, তাঁহার কথা বলা হইয়াছে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়,—আত্মা কি, তাহা না জানিলে ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য, পরিণাম, বিপাক প্রভৃতি কিরূপে বুঝা যাইবে? ঈশ্বর কি, তাহা না বুঝিলে ঈশ্বরের অবতার ও তাঁহার কার্য্য কি করিয়া বুঝা যাইবে? বিশ্ব কি, তাহা না জানিলে, এই বিশ্বে ঈশ্বরের আবির্ভাব কেন হয়, কখন হয়, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না। এই কারণেই এই সব প্রাথমিক বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা। এই আলোচনাকে নিরর্থক বলিয়া মনে করিবেন না।

নিত্যধামগত বাবা প্রেমানন্দ ভারতী মহাশয় ইংরাজী ভাষায় শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য দেশের অনেক মনীষি (রুশিয়াদেশের টলষ্টয়-প্রমুখ) এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই তিনি বলিয়াছেন—It is the history of the Universe from its birth to its dissolution. এই বিশ্বের সৃষ্টি হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত ইতিহাস লিখিতেছি। এই ইতিহাসই পুরাণ। এই ইতিহাস না জানিলে, শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারা যাইবে না। এই কারণে তিনি তাঁহার গ্রন্থের প্রথমভাগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করিয়াছেন। ১। জীবন কি,

ঈশ্বর নিরাকার ও সাকার ৩। ভগবান্ ও ব্রহ্ম (Concrete and Abstract God) ৪। সৃষ্টিকথা ৫। সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন স্তর ৬। পরিবর্ত্তনসমূহের বৃত্তাকার পথ (The Cyclic Motion or Changes) ৭। সত্যযুগ ৮। ত্রেতাযুগ ৯। বর্ণ ১০। আশ্রম ১১। দ্বাপরযুগ ১২। কলিযুগ ১৩। মন্বন্তর ১৪। কল্প ১৫। প্রাকৃত প্রলয় ১৬। স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ ১৭। কর্ম্ম ১৮। জন্মান্তর ১৯। কর্ম্মক্ষয় ২০। পরমাণুর প্রত্যাবর্ত্তন (The Atom's Return Journey) ২১। যোগ ২২। ভক্তিযোগ ২৩। বৈষ্ণব।

এতগুলি বিষয়ের আলোচনার পর, বাবা ভারতী মহোদয় শ্রীকৃষ্ণ লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতও তাহাই করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তসাধকগণের জন্য বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিয়াছেন, আর বাবা ভারতী একালের সংশয়ীদিগের জন্য একালের বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যসহ সংক্ষেপে বলিয়াছেন। মোটকথা, বাবা ভারতী প্রাচীন পথেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন, রাজা রামমোহন বা বঙ্কিমচন্দ্রের ধরণে আলোচনা করেন নাই।

(ঘ) ভগবদনুবর্ণন

এইবার আমরা মূল বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রত্যেক অধ্যায়েরই একটি করিয়া সংক্ষিপ্ত নাম আছে। যেমন প্রথম অধ্যায়ের নাম—ঋষিপ্রশ্ন, তেমনি দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম—ভগবদনুবর্ণন। টীকাকারগণ বলিয়াছেন, প্রথমাধ্যায়ে কথিত ছয়টি প্রশ্নের ভিতর এই অধ্যায়ে চারিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এই উত্তরের মুখ্য সার্থকতা কি, অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের যাহা প্রতিপাদ্য বিষয় সেই শ্রীকৃষ্ণকথার সহিত ইহার সম্বন্ধ কি, আমাদিগকে একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া তাহা বুঝিতে হইবে। সূত, তাঁহার গুরু শ্রীশুকদেবকে বন্দনা করিয়া, শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য ব্যক্ত করিয়া, নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবীসরস্বতী ও ব্যাসদেবকে নমস্কার করিয়া, 'সকল শাস্ত্রের সারস্বরূপ শ্রেয়ঃ বা মঙ্গল' কি, তাহাই বলিতে আরম্ভ করিলেন। এই শ্রেয়ঃ কি। শ্রীল জীব-গোস্বামী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকগুলির সার কথা বলিয়া দিয়াছেন। ভক্তিই সেই

"স্বতএব সুখরূপত্বাদহৈতুকী ফলানুসন্ধানরহিতা অপ্রতিহতা তদুপরি সুখদুঃখদ পদার্থান্তরাভাবাৎ কেনাপ্যববোধয়িতুমশক্যা চ।"

এই ভক্তি আপনা আপনি সুখরূপ, কাজেই অহৈতুকী, অন্য কোন ফলের অনুসন্ধান করে না, কাহারও সাধ্য নাই ইহাকে বাধা দেয়, এখানে অর্থাৎ এই ভক্তি যেখানে বিরাজ করেন, সেখানে সুখ ও দুঃখদায়ক অন্য কোন পদার্থ নাই, অতএব কেহই তাহার বাধা দিতে পারে না।

এই ভক্তির কথাই সূত সর্ব্বপ্রথম কেন বলিলেন ? শ্রীজীবগোস্বামী মহোদয় তাহারও উত্তর দিয়াছেন। শ্রীভগবানের আবির্ভাবই পরম ও চরম কথা—কিন্তু এই আবির্ভাব কোথায় হয় ? ভক্তের অনুভূতিতে। কাজেই, ভক্তির কথাই প্রথম বলা প্রয়োজন। এই ভক্তিলাভই তোমাদের সকলের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু হউক, এই প্রেমভক্তি লাভের জন্য তোমরা সাধনভক্তি অবলম্বন কর। তোমাদের অন্যরূপ কামনা দুরীভূত হউক, তোমরা নির্ম্মল হও, তবেই সেই সত্য জ্ঞানানন্দ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে। আরও তোমরা যেমন আছ যদি তেমনিই থাক, তাহা হইলে তোমাদের প্রশ্নের উত্তরে আমি যাহা বলিব, তাহার কিছুই তোমরা সত্য করিয়া বুঝিতে পারিবে না।

আমাদের দেশে বলে, দেব হইয়া দেবপূজা করিবে। ইহাই সকল উপদেশের সার। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার প্রারম্ভেই শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন, এই পুরাণ ব্রহ্মবিদ্যা। আমাদেরও আনেকেরই ইচ্ছা এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করি, কিন্তু আমি অধিকারী না হইলে ইহা কেহই আমাকে দিতে পারিবে না। আমাকে অধিকারী হইতে হইবে। এই অধিকার কি ? মানুষ তুমি দৃঢ়রূপে অনুভব কর, তুমি সেই নিত্যানন্দ সমুদ্রের একটি তরঙ্গ! বুঝিতে পারিতেছ না ? জীবন কেমন অবসাদে, ভয়ে ও নৈরাশ্যে ডুবিয়া যাইতেছে ? চিন্তা কর, ধ্যান কর, সাধুসঙ্গ কর, সৎকর্ম্মপরায়ণ হও। বুঝিতে পারিবে, তুমি নিত্যানন্দ সমুদ্রের একটি তরঙ্গ। ইহাই প্রথম সোপান, হৃদয়ের প্রতি চাহিয়া, নিজের মানসিক অবস্থা, আশা, আকাঙ্ক্ষা সত্যরূপে নিরূপণ করিয়া, ভাবিয়া বল, এই সোপানে আরোহণ করিতে পারিয়াছ কি না ? You are of the Eternal Joy. তুমি সেই চিদানন্দ সাগরের একটি তরঙ্গমাত্র।

তুমি ভিখারীর ন্যায় মলিন বদনে ঘুরিতেছ! পিতার গৃহে বাস করিতেছ, অথচ ভাবিতেছ, আমি নির্ব্বাসিত! ভুলিও না—তুমি অমৃতের পুত্র। নূতন হৃদয় ও নূতন চক্ষু লইয়া এই জীবনের প্রতি, এই জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। প্রত্যক্ষের মলিন ধূলায় অন্ধ হইয়া পড়িয়া পড়িয়া কেবলই আর্ত্তনাদ করিতেছ! অমৃতের পুত্র, ভাবুক হও, রসিক হও, ভাবের জগতে প্রবেশ কর—ভাবের জগৎই রসের জগৎ, আনন্দ ও প্রেমের রাজ্য। Accept the world of ideals, of beauty, and love, as your own. কিসের ভয়? ভয় নাই। এই যে জীবন, ইহাই ত্যাগের জীবন, তপস্যার জীবন; এই জীবনই নিষ্কাম কর্ম্ম ও প্রেমভক্তির জীবন; এই জীবনই শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জীবন! এই প্রকারের জীবন লাভ করিবার জন্য যাহার চেষ্টা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, তাহার নিকট শ্রীভগবানের লীলাকথা বর্ণনা করা, অন্ধের নিকট আলোকের তত্ত্ব বলার মত পণ্ডশ্রমমাত্র।

শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু তাঁহার টীকায় আর একটি কথা বলিয়াছেন, তাহাও ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত বা সূত, যে ভক্তির কথা বলিলেন, তাহা নিবৃত্তি-লক্ষণা নহে। তাহাতে আবেগ আছে, চেষ্টা আছে, উদ্বেগ আছে। ইংরাজীতে যাহাকে quietism বলে, এই ভক্তি তাহা নহে। জীবনের অর্থ আনন্দ। আনন্দ আত্ম-প্রকাশ (self-expression)। প্রেমে আনন্দ, সেবায় আনন্দ, সুন্দরের সঙ্গলাভ, আনন্দ; আবার দুঃখের সহিত সংগ্রাম আনন্দ, সত্যের জন্য দুঃখভোগ আনন্দ, বিশ্ব-রহস্যের, সেই বহুরূপী একের অন্বেষণই আনন্দ। অহৈতুকী ভক্তিকে জীবনের লক্ষ্য বলিয়া প্রথমেই গ্রহণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, সূতের দ্বিতীয় কথা পরতত্ত্বের ত্রিবিধ প্রকাশ। যে শ্লোকে এই কথা বলিয়াছেন, আচার্য্যগণ সেই শ্লোকটিকে খুব বিস্তার করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্লোকের অর্থ—তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। এই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব তিন প্রকারে কথিত হইয়া থাকেন—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্। শ্লোকটির সাধারণ অর্থ এইরূপ। জ্ঞানীরা বলেন ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ উপাসকেরা বলেন পরমাত্মা, আর ভক্তেরা বলেন ভগবান্। 'শ্রীমদ্ভাগবত' এই নাম হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, ভগবান্‌কে লইয়াই এখানে আলোচনা; সুতরাং এই ভগবত্তত্ত্ব কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে হইবে।

(ঙ) ভগবত্তত্ত্ব

কোথায় ভগবান্ ? আমাদের দেশের যেমন একজন রাজা আছেন, তিন সাতসমুদ্র তের নদীর পারে এক সুন্দর দ্বীপের মধ্যে সিংহাসনে বসিয়া আছেন, আর তাঁহার অসংখ্য কর্ম্মচারী তাঁহার আদেশে সুবিশাল রাজ্য শাসন করিতেছে, আমাদের খাজনা আদায় করিতেছে, শাসন করিতেছে, তিরস্কার ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করিতেছে। সেইরূপ আকাশের উপরে আকাশ, তাহার উপর আকাশ, তাহার উপর বাতাস, নদী, সমুদ্র তাহার উপর দ্বীপ, দ্বীপের মধ্যে দ্বীপ, আবার তাহার উপর দ্বীপ, সেইখানে সকল রাজার রাজা, মহারাজার মহারাজা শ্রীভগবান্ চন্দ্র বসিয়া আছেন। আর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যে তাঁহার অসংখ্য কর্ম্মচারী, তাঁহার হুকুমে রাজ্য শাসন করিতেছে। তারকেশ্বরের মোহান্ত, গয়ার পাণ্ডা, নদীয়ার গোস্বামী, তাঁহার এক একজন নায়েব গোমস্তা, গুরুঠাকুরেরা তাঁহার এক একজন আদায়কারী পঞ্চায়েৎ, ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণবেরা, সন্ন্যাসীরা কেহ তাঁহার দারোগা, কেহবা পেয়াদা, কেহ বা বরকন্দাজ। এইভাবে মানুষ ভগবান্‌কে বুঝিতেছে—ইহার নাম স্থূল ও ইন্দ্রিয়জ্ঞানমূলক ধারণা, (Materialistic Conception) ইহারই নাম পৌত্তলিকতা, ইহা মানুষকে ভ্রান্তির কারাগারে বন্দী করিয়া রাখে। এই ধারণা ছাড়িয়া একটি সত্য ধারণায় না আসা পর্য্যন্ত মানুষের কল্যাণ নাই।

আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি—ভগবান্ কেমন ? কেহই বলিতে পারে না, তিনি কেমন। বেদ বলিয়াছেন, তিনি নিজেই নিজের দ্রষ্টা, তিনি নিজেই নিজের জ্ঞাতা। তিনি নিজেই নিজেকে দেখিতেছেন, তিনি নিজেই নিজেকে জানিতেছেন। এই যে দেখা আর এই যে জানা, ভাবিবেন না, ইহা আমাদের দেখা ও জানার মত। এই দর্শন ও জ্ঞান কিরূপ রহস্যময়, তাহা বাঙ্গালার বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জগৎকে যেমনভাবে শিখাইয়াছেন, তেমনভাবে আর কেহ শিখান নাই। কেমন করিয়া জানিব তিনি কেমন, কোন্ ভাষায় বলিব তিনি কেমন ? শক্তির দ্বারাই শক্তিমানের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার অনন্তশক্তি। এই অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটি প্রধান শক্তির কিছু কিছু পরিচয় আমাদের আছে।

শ্রীমদ্ভাগবত আশ্রয় করিয়া যে সকল সিদ্ধ আচার্য্যগণ শ্রীভগবানের পরিচয় [illegible]

বাসীকে দিয়াছেন, তাহা অমূল্য। কারণ-সমুদ্র, বৈকুণ্ঠলোক, কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী পদ্মনাভ, ক্ষীরোদকশায়ী জীবের অন্তর্যামী বিষ্ণু প্রভৃতির কথা তাঁহারা যেমন সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, আমরা মনে করি, তেমন সুস্পষ্ট করিয়া আর কেহ বলেন নাই বা বলিতে পারেন নাই। কিন্তু আমাদের মত স্থূলবুদ্ধি জড়বাদী মানুষের অসুবিধা আছে। এই সব বর্ণনা আমরা যখন শুনি তখন ভুলিয়া যাই, এই সমুদয় প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, এই সমুদয় চিদাকার। শ্রীভগবান্ কখনও কাহারও প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যও হইতে পারেন, তাঁহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। কিন্তু আমাদিগকে শ্রীভগবানের অভিমুখী হইতে হইলে, তাঁহার চিদানন্দময় স্বরূপ লইয়াই আলোচনা আরম্ভ করিব। Must start with a spiritual conception of God.

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু দ্বিতীয় অধ্যায়ের নিম্নলিখিত শ্লোকটি যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, সূত ঠিক্ তাহাই করিয়াছেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য স্থূলজ্ঞানের সাহায্যে শ্রীভগবান্-সম্বন্ধে চিন্তা করিবার যে বদ্ধমূল অভ্যাস আমাদের প্রকৃতিতে আছে, তাহা উন্মূলিত করিয়া অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে অভ্যস্ত করিয়া চিৎবস্তুর চিন্তায় প্রবৃত্ত হইতে বলিয়াছেন। ইহা করিতে হইলে নিয়মিতরূপ ধারণা ও ধ্যান আবশ্যক। শ্লোকটি এই—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

যাহা জ্ঞান ও অদ্বয়জ্ঞান, তত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাকেই তত্ত্ব বলেন। "জ্ঞানং চিদেকরূপং"—চিৎ ও একরূপ যিনি, তিনিই জ্ঞান। 'অচিৎ' বলিতে জড় বুঝায়। যাহা স্থূল ও বহির্মুখ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, তাহাই জড় বা অচিৎ। এই অচিৎ বা জড় বহুরূপ। এই বহুরূপ জড়কেই আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। ইহাই আমাদের বন্ধনের হেতু। আজ চিন্তা কর, এই অচিৎ বা জড়, সত্য নহে, তত্ত্ব নহে। চিৎ বা চৈতন্যবস্তুর আশ্রয়েই এই অচিৎ বা জড় সম্ভব হইয়াছে। এই চিৎ, বা চৈতন্যবস্তু আমাতে আছেন, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্রই আছেন। এই চৈতন্যের চিন্তায় অভ্যস্ত হইতে হইবে। ইহাই সাধনার আরম্ভ, শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত লীলারাজ্যে প্রবেশ করিয়া লীলাময় শ্রীভগবানকে জানি-

তত্ত্বচিন্তার ইহাই সর্ব্বজনসম্মত প্রথম কথা। বেদে আছে, ব্রহ্মা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্ম্মুখ করিয়া রচনা করিয়াছেন, কাজেই আমরা স্বভাবতঃ বাহিরের বস্তু-গুলিকেই দেখি, আর তাহাদিগকেই সত্য বলিয়া মনে করি। কিন্তু আমার ভিতরে বসিয়া যিনি এই সব খেলা দেখাইতেছেন, তাঁহাকে দেখিতেও পাই না, দেখিবার জন্য চেষ্টাও করি না। এই প্রথম অবস্থার নাম "বস্তু-সত্য-বাদ" বা বেদের ভাষায় "বহিঃ-প্রাজ্ঞ" অবস্থা। Objective Stage of Consciousness. এই অবস্থা হইতে শান্ত চিত্তে চিন্তা করিয়া করিয়া, বহির্ম্মুখী চিত্তবৃত্তি সমূহকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া "জ্ঞান-সত্যবাদ" বা 'অন্তঃপ্রাজ্ঞ' অবস্থায় প্রবেশ করিতে হইবে। ইহাই প্রথম সোপান।

নানা প্রকারেই এই সোপানে আরোহণ করা যায়। আমরা কয়েকটি অতিসাধা-রণ ও সুপরিচিত যুক্তি দিতেছি। আমি দেখিতেছি, একটি পুষ্প। বলুন দেখি, কি দেখিতেছি। স্পর্শের দ্বারা, গন্ধের দ্বারা, বর্ণের দ্বারা আমি বুঝিতেছি মাত্র। ইহার সবটাই আমার বোধ বা আমার জ্ঞান ; তাহা হইলে জ্ঞানের বাহিরে বস্তু কোথায় ? যাহা কিছু আমাদের নিকট প্রতীত বা প্রকাশিত হইতেছে, তাহার সবটাই জ্ঞান। জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নাই।

শ্রীধরস্বামী তাঁহার টীকায় বলিলেন, জ্ঞানই সত্য। কিন্তু ক্ষণিক জ্ঞান নহে। "অদ্বয়মিতি ক্ষণিকজ্ঞানপক্ষং ব্যাবর্ত্তিতি।" তত্ত্ব কি ? অনুমান-করা আন্দাজী কথা, মতভেদপূর্ণ তর্কবিতর্কের কথা শুনিব না। সূত বলিতেছেন, তাহা বলিবনা। যাঁহারা তত্ত্ববিৎ, যাঁহাদের কথায় ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও কারণাপাটব' নাই, তাঁহারা বলিয়া-ছেন, জ্ঞানই তত্ত্ব। এই জ্ঞান কেমন ? ক্ষণিকজ্ঞান ? সূত বলিলেন, না অদ্বয়জ্ঞান। অদ্বয়জ্ঞান কি ? শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ব্যাখ্যা করিলেন—"অদ্বয়ত্বঞ্চাস্য স্বয়ংসিদ্ধ-তাদৃশাতাদৃশতত্ত্বান্তরাভাবাৎ স্বশক্ত্যেক সহায়ত্বাৎ পরমাশ্রয়ং তং বিনা তাসামসিদ্ধত্বাচ্চ।" এই জ্ঞানের অদ্বয়ত্ব স্বয়ং সিদ্ধ, কারণ তাঁহার তুল্য বা তাঁহা হইতে অন্যরূপ অপর কোন তত্ত্ব নাই। তিনি একমাত্র নিজশক্তির সাহায্যেই অদ্বয়, তিনি পরমাশ্রয়, তিনি ব্যতীত ঐ শক্তিসমূহ থাকিতে বা ক্রিয়া করিতে পারে না।

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের যাহা শেষ কথা, তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু এই 'জ্ঞানসত্যবাদ' ভিন্ন ভিন্ন সাধকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, আমার ভিতর 'জানা' বলিয়া যে একটা ব্যাপার বা ক্রিয়া রহিয়াছে, তাহাকে ছাড়াইয়া আমরা কিছুতেই যাইতে পারি না। সুতরাং জ্ঞানই সত্য, আর সবই মিথ্যা। তাহার পর বুঝিতে পারা যাইবে, এই জ্ঞানের কোন আকার নাই—ইহা 'একরূপ' বা বিশুদ্ধ। এই জ্ঞানের জ্ঞাতাও নাই, জ্ঞেয়ও নাই, কারণ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, উভয়েই জ্ঞানের রূপ মাত্র। তাহা হইলে পাওয়া গেল—ভেদশূন্য অদ্বয় জ্ঞানই একমাত্র সত্য। এই একশ্রেণীর সাধক। ইঁহারা এই অদ্বয় জ্ঞানকে 'ব্রহ্ম' বলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে অনেক শ্লোকে এই ব্রহ্মভাবের পরিচয় আছে, তাহা শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার টীকায় দেখাইয়াছেন।

'অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব'-সম্বন্ধে এইবার আর একপ্রকারের চিন্তা আরম্ভ হইল। বেদে আছে সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত। পূর্ব্বে দেখা গেল—জ্ঞানই সত্য। কিন্তু সত্য যে অনন্ত। তাহার যে সীমা নাই। সত্যকে জানিয়া বুঝিয়া বা পাইয়া শেষ করিয়াছি, একথা কেহই বলিতে পারে না। সুতরাং, সত্য, এই সত্য ও ঐ সত্য এই বলিয়া সত্যান্বেষী সাধক অনন্তের পথে ছুটিতেছেন। পথ যে অনন্ত, সীমা নাই, শেষ নাই। বাধার পর বাধা, আবরণের পর আবরণ। সত্যেরও শেষ নাই, আবরণেরও শেষ নাই, অন্বেষণেরও শেষ নাই। তিনই অনন্ত, তিনই অসীম। আবরণ বা বাধার প্রতি বিরক্ত হইবেন না। সত্য যখন অনন্ত, তখন এই বাধা যে সত্যের ভিতরেই রহিয়াছে, সত্যের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে চিরদিন গাঁথা হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে জ্ঞানের আকার নাই, এখন দেখা গেল আকার তো নাই, কিন্তু সত্য যে আকারের মধ্য দিয়াই প্রকাশিত হইতেছে। এই আকার আর এই বাধা বা আবরণ, ইহা যে একই জিনিস, ইহা আছে এবং নাই। বড় মজার কথা হইল। ইহাই হইল অবিদ্যা, ইহাই হইল মায়া, ইহাই হইল শক্তি। ইহা সেই অদ্বয়-জ্ঞানের মধ্যেই আছে। এইপ্রকারে যাঁহারা বুঝিলেন, তাঁহারা নাম দিলেন "পরমাত্মা।"

এই দুইটি ভাবের সামঞ্জস্য আছে। ব্রহ্মকে বা সত্যকে বা অদ্বয়-জ্ঞান অনন্তকে একটা শেষ-হইয়া-যাওয়া বা পরিনিষ্পন্ন তত্ত্ব অর্থাৎ Static Principle বলিয়া দেখেন কেন? তিনি ক্রিয়াস্বরূপ (A moving principle), তিনি নিজেকে ক্রমেই বিকশিত করিতেছেন—নিত্য নিত্যলীলাময় (Always manifesting Himself as an Eternal Process).

এইবার আমরা যাঁহাকে পাইলাম, তিনি "ভগবান্"। আচার্য্য শঙ্করের পর শ্রীরামানুজ প্রভৃতি এই পথে পদার্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই শেষ সত্য আমরা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃপাভাজন গোস্বামী-পাদগণের নিকট পাইতেছি। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ এইবার বোঝা গেল। আমরা পূর্ব্বে এই শ্লোক বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছি, এখানে আর বাড়াইবার দরকার নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মতত্ত্বও আছে, পরমাত্মতত্ত্বও আছে। কিন্তু ভগবত্তত্ত্বই শ্রীমদ্ভাগবতের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। এই ভগবত্তত্ত্ব বুঝিলেই, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণলীলা বুঝিতে পারা যাইবে। আর এই ভগবত্তত্ত্ব না বুঝিয়া, ভগবান্-সম্বন্ধে যাহা হউক একটা বাজার-চল্‌তি মত লইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলার তত্ত্ব সমালোচনা করিতে গেলে, বিড়ম্বনা হইবে। বর্ত্তমান যুগে অনেকেরই সেই বিড়ম্বনা হইয়াছে। অতএব, সাধু, সাবধান!

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকটিও ভাল করিয়া শুনিতে হইবে। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন—"তিন প্রকারের আবির্ভাবযুক্ত যে তত্ত্বের কথা বলা হইল, তাহার সাক্ষাৎকার হয় কিরূপে? উত্তর—ভক্তির দ্বারা। সেই ভক্তি কেমন? ভক্তির পরাবস্থারূপা যে প্রেমভক্তি, যাহার দ্বারা ভগবৎকথায় রুচি হয়, সেই প্রেমভক্তি। সেই তত্ত্বের সাক্ষাৎ হয় কোথায়? শুদ্ধ চিত্তে বা আত্মায়। সেই তত্ত্ব কেমন? স্বরূপাখ্য, জীবাখ্য ও মায়াখ্য শক্তিবর্গের আশ্রয়।

চ। লীলা

এই ভগবত্তত্ত্বে চিত্ত প্রতিষ্ঠিত হইলে লীলাতত্ত্ব বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষের পাঁচটি শ্লোকের বঙ্গানুবাদমাত্র নীচে দিলাম, বিস্তারিত ব্যাখ্যার আপাততঃ প্রয়োজন নাই। এই পাঁচটি শ্লোকের মর্ম্ম মোটামুটি বুঝিলেই, লীলাতত্ত্বে চিত্ত প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সেই ভগবান্ প্রথমতঃ কার্য্যকারণাত্মিকা গুণময়ী মায়াদ্বারা সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু তিনি অগুণ ও বিভু (সর্ব্বব্যাপক)। ২৯।

আকাশাদি উৎপন্ন হইলে তিনি তাহাদের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। গুণসমাচ্

তিনি গুণবান্ বা গুণাধীনরূপে প্রকাশিত হইতেছেন, কিন্তু তিনি গুণাধীন নহেন। তিনি চিচ্ছক্তির দ্বারা অত্যুর্জ্জিত। ৩০।

অগ্নি, ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠ আশ্রয় করিয়া যেমন ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করেন, তিনিও সেইরূপ নানারূপে প্রকাশিত। ৩১।

তাঁহার ভোগরূপ লীলা। এই হরি, ভূত-সূক্ষ্মসমূহ, ইন্দ্রিয়সমূহ, আত্মা ও মনের দ্বারা নির্ম্মিত ভূতসমূহে অর্থাৎ স্বনির্ম্মিত জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ ভূতে প্রবিষ্ট হইয়া, ইন্দ্রিয় ও মনোরূপ গুণময় ভাব দ্বারা তাহাদের বিষয়সকল স্বেচ্ছানুসারে ভোগ করেন। ৩২।

[পরের শ্লোকটি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের ব্যাখ্যানুসারে অনূদিত হইতেছে।] প্রতিযোনিতে নানারূপ উপাধি গ্রহণ, ইহা অন্তর্যামী পুরুষের। ভগবানের কোন উপাধি নাই। তিনি নিত্যলীলার দ্বারা স্বরূপে দেব, তির্য্যক্ ও নরাদিতে আবির্ভূত হইয়া লোকসমূহকে প্রেমযুক্ত করেন। ৩৩।

ছ। ভাগবত

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভক্ত, ভগবান্ ও লীলা, এই তিনটি প্রাথমিক কথা বলিয়া উগ্রশ্রবা সূত, তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবানের অনেকগুলি অবতারের কথা বলিলেন। অবতার অসংখ্য তাহাও বলিলেন, আর শ্রীমদ্ভাগবতের যেটি মর্ম্মকথা—শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্—স্বয়ং ভগবান্—তাহাও বলিলেন। শ্রীভগবানের জন্ম ও কর্ম্ম সাধারণের জীবনের জন্ম কর্ম্মের ন্যায় নহে, অর্থাৎ একালের ইতিহাস বা উপন্যাস নহে। শ্রীভগবান্ ইহা গীতায় বলিয়াছেন, কিন্তু আমরা যে ভুলিয়া যাই। তাই সূত আবার সে কথা বলিলেন, আর বলিলেন—উহা অর্থাৎ শ্রীভগবানের জন্ম ও কর্ম্ম বেদগুহ্য অর্থাৎ রহস্য। অধিকারী হইয়া তত্ত্বের সাহায্যে ইহা বুঝিতে হইবে। এই পর্য্যন্ত সাধারণ ভূমিকা করিয়া সূত বলিলেন, হে ঋষিগণ, আমি আপনাদিগকে ভাগবত পুরাণ বলিতেছি, ইহা সর্ব্ববেদতুল্য ; ইহাতে ভগবান্ উত্তম শ্লোকের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। মহর্ষি বেদব্যাস জগতের মঙ্গলের জন্য এই শাস্ত্র করিয়াছেন। ইহা সর্ব্বপুরুষার্থ প্রাপক, পরমমঙ্গলজনক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মহর্ষি

শ্রেষ্ঠ শুকদেবকে শিখাইয়াছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন গঙ্গাতীরে প্রায়োবেশন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীশুকদেব তাঁহাকে এই পুরাণ শুনাইয়াছিলেন। হে ঋষিগণ, আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটের পর ধর্ম্ম কাঁহার শরণাগত হইলেন, তাহার উত্তর এই 'শ্রীমদ্ভাগবত'। শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদির সহিত স্বধামে গমন করিলে কলিকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। মানুষ অন্ধকারে পথহারা হইল; তখন, এই পুরাণ সূর্য্যের ন্যায় সমুদিত হইলেন। শ্রীশুকদেব যখন মহারাজ পরীক্ষিৎকে এই পুরাণ বলেন, তখন শ্রীশুকদেবের কৃপায় আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম; আমি ইহা যেরূপ অধ্যয়ন করিয়াছি, আপনাদের নিকট সেইরূপ বলিব।

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতং।
উত্তমঃশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ।
নিঃশ্রেয়সায় লোকস্য ধন্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ॥
তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাম্বরং।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতং ॥
স তু সংশ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতং।
প্রায়োপবিষ্টং গঙ্গায়াং পরীতং পরমর্ষিভিঃ ॥
কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্ট দৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥
তত্র কীর্ত্তয়তো বিপ্রা বিপ্রর্ষের্ভূরিতেজসঃ।
অহঞ্চাধ্যগমং তত্র নিবিষ্টস্তদনুগ্রহাৎ।
সোঽহং বঃ শ্রাবয়িষ্যামি যথাধীতং যথামতি ॥৩।৪৩

(জ) পুনরায় ঋষিপ্রশ্ন

উগ্রশ্রবা সূত ব্যাসদেব-প্রণীত ও শুকপ্রোক্ত শ্রীমদ্ভাগবত, ঋষিগণের সভায় বলিবেন। এখন তিনি তাহার ভূমিকা করিতেছেন। ভূমিকায় ভক্তি, ভগবান, লীলা ও অবতার, এই চারিটি বিষয় বলিয়া বলিলেন—ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়া নিজপুত্র শুকদেবকে তাহা শিখাইলেন, শুকদেব তাহা প্রায়োপবিষ্ট মহারাজা পরীক্ষিতকে শুনাইলেন। ঋষিসভার যিনি শ্রেষ্ঠ, সেই কুলপতি ঋগ্বেদী শৌণক এই পর্য্যন্ত শুনিয়া সূতকে

পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন—(১) ব্যাসদেব কখন, কি কারণে ও কি প্রকারে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন ? (২) শুকদেবের সহিত মহারাজা পরীক্ষিতের মিলনই বা কি প্রকারে হইল ? (৩) মহারাজ পরীক্ষিত কেনই বা প্রায়োপবেশন করিলেন ?

শুকপ্রোক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের কথা এখন থাকিল, সূত শৌনিক ঋষির এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। সূত বলিলেন—বেদবিভাগ করিয়া ও মহাভারত রচনা করিয়া ব্যাসদেবের চিত্তে প্রসন্নতা হয় নাই ; তিনি দুঃখিত চিত্তে সরস্বতী নদীতীরে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিতে উপদেশ দিলেন। ব্যাসদেবের চিত্তের প্রসন্নতা বিধানের জন্য নারদ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম অপেক্ষা হরিকীর্ত্তনই সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত। সৎসঙ্গে হরিকথা শ্রবণের ফল যে কত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। নিজের জীবনবৃত্তান্তের দ্বারা নারদ তাহা ব্যাসদেবকে বুঝাইলেন। পূর্ব্বকল্পে নারদ দাসীপুত্র ছিলেন, সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ করিয়া ও সাধুসেবা করিয়া তিনি দেবর্ষিত্ব লাভ করিয়াছেন।

উপদেশ দান করিয়া নারদ চলিয়া গেলে, ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিম তীরে শম্যাপ্রাস নামক বদরীবৃক্ষশোভিত আশ্রমে সমাধিস্থ হইয়া বেদব্যাস ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। এই অবস্থায় তিনি শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। শ্রীশুকদেব শ্রীহরির গুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীব্যাসদেবের ভাগবত রচনা ও শ্রীশুকদেবের এই গ্রন্থ-অধ্যয়নের কথা বলার পর সূত বলিলেন :—

পরীক্ষিতোঽথ রাজর্ষে র্জন্ম কর্ম্মবিলাপনং।
সংস্থাঞ্চ পাণ্ডুপুত্রাণাং বক্ষ্যে কৃষ্ণকথোদয়ং ॥

হে ঋষিগণ! আমি আপনাদিগের নিকট রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্ম, জন্ম ও মৃত্যুর বিবরণ এবং পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান বর্ণনা করিব, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণকথার উদয় হইবে।

প্রথম পরিশিষ্ট

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোক

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বাঙ্গালা কবিতায় এই শ্লোকের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

"প্রকাশিত পরিদৃশ্য, বিশ্ব চরাচর।"
সমভাবে সদা কাল, সর্ব্বদৃগোচর॥
এই জগতের "সৃষ্টি" "স্থিতি" আর "ক্ষয়"।
নিরূপিত নিয়মিত, যাঁহা হতে হয়॥
সৃজিত পদার্থ সবে, "তিনি" বর্ত্তমান।
সৎ-রূপে হয় তাই, সত্তার প্রমাণ॥
বিস্তারিত না থাকিলে, বিভুর বিভাস।
"অসৎ জগৎ" কভু, হতো না প্রকাশ॥
"অবস্তুতে" নাহি হয়, বস্তুর বিস্তার।
কেমনে করিব তার, সত্তার স্বীকার?
"বন্ধ্যার সন্তান" আর "আকাশের ফুল"।
কেবল অলীক মাত্র, নাহি তার মূল॥
জগতের জন্মাদির, হেতুমাত্র যিনি।
"সিদ্ধজ্ঞান" স্বতঃ "সত্য" "সর্ব্বগত" তিনি॥
তিনিই "সর্ব্বস্বধন" "সর্ব্বমূলাধার"।
"নিরাধার" "নিরঞ্জন" "নিত্য" "নির্ব্বিকার"॥
বিমোহিত যে বেদে বিবিধ বুধগণ।
যে "বেদের" মহিমা না হয় নিরূপণ॥
"আদি কবি" "বিধাতার" হৃদয়-আকাশে।
যাঁহার করুণাবলে সে "বেদ" প্রকাশে॥

"তেক্র" "জল" "কাচ" এই তিনে পরস্পরে
"অসত্যে" সত্যের ভান, যে প্রকার ধরে ॥
"বিকার বিশিষ্ট বোধে" "জলভ্রম" হয়।
বাস্তবিক "অসত্য" সে "সত্য" নয় নয় ॥
"ত্রিগুণের" সৃষ্টি হেতু, সেরূপ প্রকার।
"সত্যরূপে" বোধ হয় অখিল সংসার ॥
ফলত "অলীক" এই, মিথ্যা সমুদয়।
একমাত্র "তিনি" বিনা, "সত্য" কিছু নয় ॥
"যিনি" হন, আপনার প্রভাবে প্রচার।
"যাঁতে" নাই, কোনরূপ, উপাধি সঞ্চার ॥
সেই "সত্য" "স্বরূপ" বিকার নাই "যাঁর"।
"পরম পুরুষ" তিনি, ধ্যান করি "তাঁরে" ॥

গুপ্ত কবির এই পদ্যানুবাদ শ্রীধর স্বামীর টীকার অনুসরণ।

"শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী"-নামক শ্রীমদ্ভাগবতের এক পদ্যানুবাদ আছে। ইহা চারিশত বৎসর পূর্ব্বের। গ্রন্থখানি ভাগবতাচার্য্য-কৃত। এই ভাগবতাচার্য্যের নাম রঘুনাথ মিশ্র। অনুমান, ইনিই বরাহনগরের সুবিখ্যাত ভক্ত ও পণ্ডিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলেন, তাঁহার মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "ভাগবতাচার্য্য" উপাধি দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা অনুমান। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন, কিন্তু বিদ্বৎসভার উপযোগী কোন বিচার বা ভূমিকা তাঁহাদের গ্রন্থে নাই। বটতলায় এই গ্রন্থ পূর্ব্বে ছাপা হইয়াছিল।

এই গ্রন্থে প্রথম শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ—

সত্য পর নিত্য ব্রহ্ম করিব চিন্তন।
যাঁহা হৈতে উতপতি-প্রলয়-পালন ॥
চরাচর জগতে যাহার পরবেশ।
জগতের ভিন্ন নাহি নাহি সঙ্গলেশ ॥
পুরুষ প্রকৃতি পর নিত্য পরকাশ।
সহজে করুণানিধি আনন্দবিলাস ॥

ব্রহ্মার মানসে কৈল বেদ সমর্পণ।
যে বেদে মোহিত হয় মহামুনিগণ॥
ত্রিগুণজনিত যত এ ভব সংসার।
মিছা হেন জ্ঞান সব কৃপায় তাঁহার॥
নিজ তেজে কৈল সব কপট খণ্ডন।
হেন সত্য পরানন্দ করিব চিন্তন॥
নারায়ণমুখে ভাগবত উপাদান।
স্থাপিল ব্রহ্মার মুখে প্রভু ভগবান॥

৩

বীরভূম জেলায় কড়িধা গ্রাম, প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামের 'সেন'-উপাধিধারী সুবর্ণবণিক জমিদারবংশ বদান্যতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য বিখ্যাত। এই বংশের নিত্যধামগত ব্রজমোহন সেন মহাশয়ের উৎসাহে ও অর্থসাহায্যে বীরভদ্র গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত বাঙ্গালা কবিতায় অনূদিত হইয়াছিল। ১৭৮০ শকাব্দায় এই গ্রন্থ কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়াছিল। সেই গ্রন্থের অনুবাদ—

পরম পুরুষ সত্য প্রভু নারায়ণ।
তাঁহার চরণ ধ্যান করি সর্ব্বক্ষণ॥
সত্ব রজ তম এই প্রকৃতির গুণ।
দেবতা ইন্দ্রিয় ভূত তাহার সৃজন॥
এই তিনের তিন সৃষ্টি সব মিথ্যাময়।
কিন্তু ঈশ্বরের জন্য সব সত্য হয়॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত মৃগতৃষ্ণা মরীচিকা।
মিথ্যাতে যে বারিবুদ্ধি মৃগের অধিকা॥
অতএব মিথ্যায় সত্য জ্ঞান যেবা করে।
সেই সে পরম সত্য তারে ধ্যান ধরে॥
সকল কুহক যেই নাশে নিজ তেজে।
স্বরূপ লক্ষণ এই পরার্দ্ধে বিরাজে॥
তটস্থ লক্ষণ এবে শুন ভক্তজন।
পূর্ব্বার্দ্ধে বিরাজে তাহা করহ শ্রবণ॥

যাহা হৈতে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয়।
তাহাতে আছয়ে হেতু ব্যতিরেকান্বয় ॥
যদি কহ তাহা হৈতে এই তিন হয়।
কিন্তু প্রকৃতি জড়া বিদ্যামতী নয় ॥
যদি কহ জীবের আছয়ে অভিজ্ঞতা।
তথাপি জীবের নাহি আত্ম-প্রকাশতা ॥
ব্রহ্মা আত্ম-প্রকাশক যদি হেন কহ।
ব্রহ্মাকেও ব্রহ্মবেদ শিক্ষাইল তিঁহ ॥
যেই ব্রহ্মজ্ঞান হৈতে মুক্ত সূরিগণ।
স্বপ্নেতে তাহার জ্ঞান নহে কদাচন ॥
সাক্ষাতে ব্রহ্মাকে যেবা দিল দিব্যজ্ঞান।
সেই নারায়ণ ধ্যেয় প্রভু ভগবান্ ॥

শ্রীধর স্বামীর টীকানুযায়ী ব্যাখ্যা

মঙ্গলাচরণ করা হইতেছে। এই মঙ্গলাচরণের লক্ষণ এই যে, এই শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য যে পরদেবতা, (১) তাঁহার অনুস্মরণ অর্থাৎ স্মরণ ও বর্ণনা আছে। 'পরং' পরমেশ্বরং 'ধীমহি' ধ্যায়েম ; আসুন, আমরা সেই পরমেশ্বরের ধ্যান করি। সেই পরমেশ্বর কেমন ? স্বরূপ ও তটস্থ, (২) এই দুই প্রকার লক্ষণের দ্বারা তাহাই বলিতেছেন। প্রথমে স্বরূপ লক্ষণ। 'সত্যং', তিনি অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর সত্য। তিনি যে সত্য, তাহার হেতু কি ? অর্থাৎ কি প্রকারে চিন্তা করিয়া তাঁহাকে 'সত্য' বলিয়া বুঝিব ? 'যত্র' যাঁহাতে, 'ত্রিসর্গঃ' মায়ার তিনগুণ তমঃ, রজঃ ও সত্ব, ইহাদের 'সর্গ' বা সৃষ্টি যে ভূত ইন্দ্রিয় ও দেবতা, (৩) ইহারা 'অমৃষা' সত্য। অর্থাৎ ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা, প্রকৃত প্রস্তাবে মিথ্যা, কিন্তু সত্যের ন্যায় প্রতীত হয়। তাঁহার অর্থাৎ সেই পরসত্যের সত্যতার জন্যই এই সত্য-প্রতীতি হয়। ইহার দৃষ্টান্ত 'তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো' আলো, জল ও কাচ, ইহাদের একটিতে যেমন অপর একটির ব্যত্যয় বা অবভাস হয় ; অর্থাৎ আলো দেখিয়া মনে হয় উহা জল, কাচ দেখিয়া মনে হয় উহা জল কিম্বা আলো, আবার

পরিবর্ত্তে 'মৃষা' পাঠ ধরিলে, এইরূপ অর্থ হইবে। তাঁহার অর্থাৎ পরমেশ্বরের পরমার্থ-সত্যত্ব প্রতিপাদনের জন্য তিনি ছাড়া অন্য সকলের মিথ্যাত্ব কথিত হইতেছে। 'যত্র' যাঁহাতে, 'মৃষা' মিথ্যা, 'ত্রিসর্গঃ' এই ত্রিসর্গ—সত্য করিয়া নাই—অর্থাৎ তিনি সর্ববিধ উপাধিসম্বন্ধহীন। 'স্বেন' 'ধাম্না' নিজের তেজের দ্বারা 'নিরস্ত-কুহকঃ' সর্ববিধ কুহক বা কপট তাঁহাতে নিরস্ত।

এইবার তটস্থ লক্ষণ। 'জন্মাদি' সৃষ্টি স্থিতি লয়, 'অস্য' এই বিশ্বের, 'যতঃ' যাঁহা হইতে হয়, আসুন তাঁহার ধ্যান করি। তাঁহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও ধ্বংস হইয়া থাকে, তাহার হেতু কি? অর্থাৎ কি প্রকারে চিন্তা করিলে ইহা বুঝিতে পারা যাইবে? উত্তর—'অন্বয়াদিতরতশ্চ অর্থেষু, অর্থেষু অর্থাৎ কার্য্যসমূহে পরমেশ্বরের সৎরূপে অন্বয়, আর আকাশ পুষ্প প্রভৃতি অকার্য্যসমূহে তাঁহার ব্যতিরেক। এই প্রকার অন্বয় ব্যতি-রেকের দ্বারাই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, তাঁহা হইতে হইয়া থাকে।

অন্য অর্থ। অন্বয় শব্দের অর্থ অনুবৃত্তি, ইতর শব্দের অর্থ ব্যাবৃত্তি। অনুবৃত্তত্ব হেতু সদ্রূপ ব্রহ্ম কারণ, মাটি ও সুবর্ণের মত। ব্যাবৃত্তত্ব-হেতু বিশ্ব, কার্য্য, ঘট ও কুণ্ডলা-দির মত।

অন্য অর্থ। অবয়ব-সম্পন্ন বলিয়া অন্বয় ও ব্যতিরেক নিবন্ধন এই বিশ্বের জন্মাদি যাহা হইতে হয়। (৫)

তাহা হইলে জগতের কারণ বলিয়া প্রধান কি ধ্যেয়? উত্তর—না। যিনি ধ্যেয়, তিনি "অভিজ্ঞঃ"। (৬) তাহা হইলে কি জীব? উত্তর—না। যিনি ধ্যেয়, তিনি 'স্বরাট্'—স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান। তাহা হইলে কি ব্রহ্মা? উত্তর—না। 'আদিক-বয়ে' ব্রহ্মাতে, 'ব্রহ্ম' বেদ, 'তেনে' প্রকাশিত বা বিস্তারিত করিলেন। (৭) কি প্রকারে প্রকাশিত করিলেন? 'হৃদা' মনের দ্বারা। ব্রহ্মা বেদ আপনিই পাইয়াছিলেন, এমনও হইতে পারে। উত্তর—না। 'যৎ সূরয়ঃ মুহ্যন্তি'—যে বেদে জ্ঞানিগণও মুগ্ধ হন। অতএব ব্রহ্মাও পরাধীন জ্ঞান বলিয়া স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান পরমেশ্বরই জগৎকারণ। অসতের সত্তা প্রদান করেন বলিয়া যিনি পরমার্থ সত্য, সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া যিনি নিরস্তকুহক, তাঁহার ধ্যান করি।

কয়েকটি কথার আলোচনা

১। **শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য পরদেবতা পরমেশ্বর** ;—আমরা অনেকেই পরমেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি ও তাঁহার উপাসনা করি। কিন্তু পরমেশ্বর-সম্বন্ধে আমাদের সকলের ধারণা ঠিক্ একরূপ নহে। পরমেশ্বর বলিতে আমরা সকলে ঠিক্ একই বস্তু বা একই তত্ত্ব বুঝি না। অথচ সকলে একই নাম অর্থাৎ পরমেশ্বর, ভগবান্ বা ব্রহ্ম ব্যবহার করিয়া থাকি। অনেক শাস্ত্রেই পরমেশ্বরের কথা আছে—কিন্তু সকল শাস্ত্রই কি পরমেশ্বর বলিতে একই বস্তু বা একই তত্ত্ব বুঝিয়াছেন? দু তিন খানি শাস্ত্র লইয়া বেশ ভাল করিয়া তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, সকল শাস্ত্রের মত একরূপ নহে। মানব-জাতি অসংখ্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে বিভক্ত, সকলেই উপাসনা করেন এবং পরমেশ্বরেরই উপাসনা করেন, কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের পরমেশ্বর-বিষয়ক ধারণা একরূপ নহে।

তাহার পর, আমি বাল্যকালে ঈশ্বর বা পরমেশ্বর বলিতে যাহা মনে করিতাম, এখন আর তাহা করি না। যতই জ্ঞানলাভ করিতেছি, যতই চিন্তা করিতেছি, এই ধারণা ততই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহার নাম ক্রমবিকাশ বা ক্রমোন্নতি। অসভ্য জাতীয় লোকেদের ঈশ্বর-বিষয়ক ধারণা, আর সুসভ্য জাতীয় লোকদের ঈশ্বর-বিষয়ক ধারণা ঠিক্ একরূপ নহে। বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনার দ্বারা যাহাদের মনোবৃত্তি মার্জ্জিত ও চিন্তাশক্তি অনুশীলিত হইয়াছে, তাহাদের ধারণা, আর বৈজ্ঞানিকী চিন্তাপদ্ধতিতে অনভ্যস্ত নিতান্ত স্থূলবুদ্ধি লোকের ধারণা ঠিক্ একরূপ নহে। পরমেশ্বর-বিষয়ক ধারণার ক্রমবিকাশ বা ক্রমোন্নতি আছে, এবং সেই ক্রমোন্নতির ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসের সহিত পরিচিত হইলে, অনন্তকাল ধরিয়া ভক্তে ও ভগবানে যে খেলা চলিতেছে, সেই খেলার রহস্য আমরা বুঝিতে পারিব।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে, ভারতবর্ষে অনেক শাস্ত্র এবং অনেক সম্প্রদায়ের অনেক প্রকার মত প্রচারিত হইয়াছে। তাহার পরেও অনেক মত প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বুঝিতে হইলে প্রাচীন, আধুনিক ও সমসাময়িক মতের সহিত তুলনা করিয়া পরমেশ্বর-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের মত কি, The Conception of God, according to the Bhagabata বুঝিতে হইবে।

২। **স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ**—ব্রহ্মের লক্ষণ দুই প্রকার। দুই প্রকারের চিন্তা ও বিচারণা-প্রণালীর সাহায্যে ব্রহ্মতত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। এই দুই লক্ষণের নাম 'স্বরূপ' ও 'তটস্থ' লক্ষণ। বেদান্ত কারিকা-নামক গ্রন্থে আছে—স্বরূপং তটস্থং দ্বিধা লক্ষণং স্যাৎ স্বরূপস্য বোধো যতো লক্ষণাভ্যাম্। স্বরূপে প্রবিষ্টাৎ স্বরূপে-ঽপ্রবিষ্টাৎ যথা কাকবস্তো গৃহাঃ খং বিলক্ষ। স্বরূপ ও তটস্থ, এই দুই লক্ষণ। এই দুই লক্ষণের সাহায্যে স্বরূপের বোধ হইয়া থাকে। যে লক্ষণ স্বরূপে প্রবিষ্ট অর্থাৎ স্বরূপের ভিতর হইতে স্বরূপকে বুঝায়, তাহার নাম স্বরূপ লক্ষণ, আর যে লক্ষণ, স্বরূপে অপ্রবিষ্ট অর্থাৎ বাহির হইতে স্বরূপকে বুঝায়, তাহার নাম তটস্থ লক্ষণ। যেমন কাক বসিয়া রহিয়াছে, ঐ ঘর। কাক দেখাইয়া ঘর চিনাইয়া দেওয়া হইল। ইহার নাম তটস্থ লক্ষণ। আর ঐ শূন্য থাল। থালের ভিতরের শূন্য বা আকাশের দ্বারা থাল দেখাইয়া দেওয়া হইল। ইহার নাম স্বরূপ লক্ষণ। তটস্থ লক্ষণের আর একটি সংজ্ঞা আছে, তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বম্। তাহা হইতে ভিন্ন হইয়াও যাহা তাহার বোধক হয়।

ব্রহ্মের যাহা নিজের রূপ ও বিশেষ বিশেষ ভাব, সেইগুলিই তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ। যেমন—সত্য, জ্ঞান, আনন্দ। আর যে লক্ষণ আগন্তুক, অর্থাৎ চিরস্থায়ী নহে, তাহাই তটস্থ লক্ষণ,—যেমন জগৎ-কর্তৃত্ব প্রভৃতি।

৩। **ত্রিগুণের সৃষ্টি**—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য সম্যক্-রূপে বুঝিতে হইলে, ভারতবর্ষের অন্যান্য দর্শন-শাস্ত্রের সহিত পরিচয় থাকা আবশ্যক। আবার এই দর্শনশাস্ত্রসমূহে সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, সর্ব্বপ্রথম তাহা জানা দরকার। সৃষ্টিতত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন তত্ত্ব, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্তর্মুখী চিন্তায় বিশেষভাবে অভ্যস্ত না হইলে, বুঝিতে পারা যায় না। এই তত্ত্বের প্রথম কথা, প্রকৃতি ও পুরুষ। পুরুষের নাম দ্রষ্টা—Subject, আর প্রকৃতির নাম দৃশ্য—Object। পুরুষের লক্ষণ ও স্বরূপ সম্বন্ধে সাংখ্য ও বেদান্তে মতভেদ আছে। সাংখ্য ও যোগ-দর্শনের মতই প্রথম আলোচ্য। এই মতের ধারণায় চিত্ত অভ্যস্ত হইলে, বেদান্তের আলোচনায় সহজে প্রবেশ করা যায়। সাংখ্যমতে পুরুষ অসঙ্গ, অপরিণামী, নিষ্ক্রিয়, আর দৃশ্য যে প্রকৃতি—তিনি,

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যং ॥

প্রকাশ, ক্রিয়া এবং স্থিতি, প্রকৃতির ধর্ম্ম। ইহারাই প্রকৃতির তিন গুণ, সত্ব, রজঃ ও তমঃ। ভূত, ইন্দ্রিয়, ভোগ, অপবর্গ, সমস্তই প্রকৃতি। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা—সত্বগুণের সৃষ্টি দেবতা, রজোগুণে ইন্দ্রিয়, আর তমোগুণের সৃষ্টি ভূত। সাংখ্যমতের সহিত বেদান্ত-মতের সম্বন্ধ জানিলে শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। উপনিষদের সাহায্যেই বুঝিতে পারা যায়—প্রকৃতিও একদিন পুরুষেই লীন ছিলেন। সৃষ্টি বলিতে যেন আমরা না বুঝি, যাহা কখন ছিল না, তাহাই জন্মিল। সৃষ্টি বলিলে বুঝিবে—নাম ও রূপদ্বারা পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রকাশ। উপনিষদে সৃষ্টিবিষয়ক যে সকল বাণী পাওয়া যায়, তাহাতে "ইদম্" বলিয়া একটি কথা আছে। যেমন—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" ঐতরেয় (ঋগ্বেদ) ছান্দোগ্য (সামবেদ), বৃহদারণ্যক (যজুর্ব্বেদ),—এই তিন উপনিষদের এই তিন বাণী। আত্মা, সৎ ও ব্রহ্ম, একই কথা।

"ইদং" কথার অর্থ পঞ্চদশী গ্রন্থে আছে—

একাদশেন্দ্রিয়ৈর্যুক্ত্যা শাস্ত্রেণাপ্যবগম্যতে।
যাবৎ কিঞ্চিদ্ ভবেদেতদিদং শব্দে দিতং জগৎ॥

পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশ ইন্দ্রিয় এবং শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা যাহা কিছু জানা যায়, তৎসমুদয়ের সমষ্টি "ইদং" শব্দবাচ্য।

'ইদং'এর পূর্ব্বে ব্রহ্ম ছিলেন। 'ইদং' ছিলেন না, তাহা নহে, ব্রহ্মস্বরূপে বা ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে ছিলেন। তাহার পর "স ঈক্ষত" বা "তদৈক্ষত"। ইহাই দ্বিতীয় অবস্থা। তিনি ঈক্ষণ করিলেন। ইহাই সৃষ্টি-বিষয়ে ব্রহ্মের ঈক্ষণ সম্বেদন বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির জাগরণ। তাহার পর ঐতরেয় বলিতেছেন,—"লোকান্ নু সৃজা ইতি" তিনি ভাবিলেন—লোকসকল সৃষ্টি করিব কি? তাহার পর "স ইমাল্লোঁকানসৃজৎ" তিনি এই সমুদয় লোক সৃষ্টি করিলেন। ছান্দোগ্যে আছে—"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" তিনি মনে করিলেন, আমি বহু হইব, বহুরূপে সৃষ্টি হউক।

পূর্ব্বোক্ত বেদবাণী হইতে ব্রহ্মের তিনটি বা চারিটি অবস্থা দেখা যাইতেছে। পরবর্ত্তী সময়ে ইহাই ত্রিবিধ পুরুষাবতার ও চতুর্ব্যূহবাদে পরিণতি লাভ করিয়াছে। কাজেই সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধে অন্তর্মুখী চিন্তায় আলোচনা করা আবশ্যক। পূর্ব্বে যে

ও তটস্থ লক্ষণের কথা বলা হইল, তাহা বুঝিতে হইলে ব্রহ্মের এই অবস্থাগুলি ধ্যান করিতে হইবে।

এক অবস্থায় "নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ" কিছুই ছিল না, কিছুরই স্ফুরণ হয় নাই। তাঁহার পর দৃক্‌শক্তির স্ফুরণ হইল, তাহার পর দৃশ্যশক্তিরই স্ফুরণ হইল। দৃশ্য-শক্তির পরিণাম এই জগৎ—জীব বা পৃথক্ পৃথক্ দৃক্‌শক্তিরূপে তিনি অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। প্রথম অবস্থা "সত্যজ্ঞানমনন্তম্"—ইহা স্বরূপ লক্ষণে জানিতে হইবে, আর দ্বিতীয় অবস্থা—"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"। শ্রীমদ্ভাগবত এই স্বরূপ ও তটস্থ উভয় লক্ষণেরই প্রতিপাদ্য তত্ত্বকে এক অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখিতে বলিয়াছেন।

৪। **অন্বয় ও ব্যতিরেক**—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য পরমেশ্বর-তত্ত্ব ঠিক্‌মত বুঝিতে হইলে যেমন স্বরূপ ও তটস্থ, এই উভয় প্রকারের লক্ষণের সাহায্যে বুঝিতে হইবে, সেই প্রকার ব্যতিরেক ও অন্বয়—এই দুই প্রকারের চিন্তাপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। 'অন্বয়' কথার সাধারণ অর্থ—"পরস্পর সম্বন্ধ" বা "পরস্পর আকাঙ্ক্ষা", আর ব্যতিরেক কথার অর্থ—"ভেদ"। কারণ ও কার্য্য, এই উভয়কে এক করিয়া দেখা যায়, অর্থাৎ কার্য্যের সাহায্যে কারণের উপলব্ধি হয়, ইহার নাম অন্বয়, আর কারণকে কার্য্যের সাহায্য-ব্যতীত ধরা যাইতে পারে। 'অনুবৃত্তি' ও 'ব্যাবৃত্তি' নামক যে দুইটি কথা ব্যবহৃত হইয়াছে (শ্রীধর স্বামীর টীকায়) তাহারও ঐ অর্থ।

এই উভয় প্রকারেরই চিন্তা-প্রণালীতে অভ্যস্ত হওয়া আবশ্যক। 'অন্বয়'কে পরম্পরা-উপাসনা বলা যাইতে পারে—Inferential process; আর 'অন্বয়' বলিতে unity বা synthesis বুঝায়। এই পদ্ধতি সকলের পক্ষে সুবিধাজনক; কিন্তু যদি কেহ মনে করেন ইহা দ্বারাই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিয়া ফেলিব, তাহা হইলে তাঁহার ভুল হইবে। অপর পদ্ধতি অর্থাৎ ব্যতিরেক-পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। আচার্য্য শঙ্করের 'অপরোক্ষানুভূতি'-গ্রন্থে এই পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। ব্যতিরেক—Distinction—Analysis. ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায় ও ষষ্ঠ অধ্যায়, এই দুই অধ্যায়ে প্রধানতঃ এই দুই প্রকারের পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। এই দুই প্রকারের সমন্বয় হইলেই পূর্ণাঙ্গ সত্যের পরিচয় পাইব। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' আর 'সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এই দুই বাণীই একসঙ্গে সত্য, ইহা যিনি বুঝিবেন, প্রথম শ্লোক তিনিই বুঝিবেন।

পরিচ্ছেদে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কি প্রসঙ্গে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইল, তাহার আলোচনা আবশ্যক। শ্রীল রায় রামানন্দের সহিত গোদাবরী-তীরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শাস্ত্রালাপ হইয়াছে। এই আলাপে রায় রামানন্দ বক্তা, আর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রোতা। রায় রামানন্দ সকল কথাই বলিলেন। তাহার পর তিনি বিস্মিত হইলেন ও ভাবিতে লাগিলেন, এ সকল কথা আমি কি প্রকারে বলিলাম? তাই তিনি মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া বলিলেন—

> কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার।
> রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার॥
> এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন।
> ব্রহ্মারে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ॥
> অন্তর্যামি-ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে।
> বাহিরে না কহে—বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে॥

এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। Inspiration যাহাকে বলে, তাহার তত্ত্ব আলোচনা করিলে, বেদদাতৃত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তি-প্রবর্ত্তকত্ব কি, বুঝিতে পারা যাইবে। গুরু-ব্রহ্মবাদের ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য।

উপনিষদে 'অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণ' আছে, তাহার আলোচনা এই প্রসঙ্গে লাভজনক হইবে।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

বলরামের সূতবধ

বলরামের তীর্থযাত্রার কথা মহাভারতের শল্যপর্ব্বে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি যে সব তীর্থে গিয়াছিলেন, সেই সব তীর্থের উৎপত্তি, ইতিহাস ও মাহাত্ম্য মহাভারতে আছে, কিন্তু সূতবধের প্রসঙ্গ মহাভারতে নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের অষ্ট-সপ্ততিতম (৮৭) অধ্যায়ে এই উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। বহু তীর্থ-পর্য্যটনের পর বলরাম আসিয়া নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন। মুনিগণ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা

লেন না। সূত, ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা উচ্চাসনে বসিয়াছিলেন। বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তস্থিত কুশের দ্বারা তাহাকে বধ করিলেন। মুনিগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন।

অতঃপর মুনিগণের কথায় বলরাম প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত হইলেন ও বলিলেন,—বেদে আছে আত্মা পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়, অতএব আমি যোগমায়া-প্রভাবে এই ব্যবস্থা করিলাম, এই সূতের পুত্র উগ্রশ্রবা আপনাদিগের বক্তা হইবেন, আর উগ্রশ্রবা, তাঁহার পিতার আয়ু ইন্দ্রিয়পটুতা ও বল প্রাপ্ত হইবেন। মুনিগণের অনুরোধে বলরাম ইল্বলের পুত্র বল্বলনামক দানবকে বিনাশ করিয়া পুনরায় তীর্থযাত্রা করিলেন।

তৃতীয় পরিশিষ্ট

বাবা প্রেমানন্দ ভারতী

ইংরাজী ১৯১৪ সালের ২৪শে জানুয়ারী, শনিবার, বেলা সাড়ে তিনটার সময় বাবা প্রেমানন্দ ভারতী মর্ত্যলীলা সম্বরণ করেন। ইংরাজী ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়, মৃত্যুকালে ৫৭ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। জীবনের শেষ ২৫ বৎসর তিনি সন্ন্যাসী।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম পাশ্চাত্য দেশে যান। দুইবার ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইয়া কিছুদিন প্যারীতে থাকেন। আমেরিকা হইতে তিনি Light of India নামে এক মাসিক পত্র বাহির করেন। এই কাগজের এক সংখ্যা, টলষ্টয় রুশিয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। Srikrishna—The Lord of Love বাবা ভারতীর সুবিখ্যাত গ্রন্থ। Nineteenth Century নামক বিখ্যাত বিলাতী কাগজে তিনি প্রবন্ধ লেখেন—What King George could do for India. এই প্রবন্ধটি অনেকেই পড়িয়াছিলেন এবং ইহা ভালরূপে সমালোচিত হইয়াছিল।

১৯১৪ সালের February মাসের The Indian Review কাগজে Rose R. Anthon বাবা ভারতী সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন। লেখক, বাবা ভারতীর শিষ্য। আমরা ঐ প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

Baba Bharati had a unique place in America. Many Hindus came to that land and taught their cults there; many have been appreciated and loved for the good they have brought to the west.

But these usually came to step into places made vacant by a Hindu who had gone before or they have taken their Hindu truths to crown a western thought. The Baba came to create his place, to follow none. He came with Hinduism pure and chaste, as when it rolled from the lips of the illuminated ones ; he did not compromise one iota ; he did not swerve a hair's breadth from eternal Hinduism ; he did not fit his thought to a western mind, nor withhold one truth because foreign to the thinking of the west. Like a pillar of fire, he cast forth the sparks that must strike the listner and ignite what spirituality lay dormant in that mind or it must fall at his side to illumine those who would see by its glow ; he gave the fuel that the ancients knew, to keep that spark alive, but it would not approve of the drift-wood taken from the sea of western thought to mar the scent of the sandal-wood of the Eastern Philosophy. What he had, he gave. Those who wanted might take, but they must take it untouched by the new world's material splendour or leave it.

Those who heard him at first, marvelled at the childlike simplicity with which the teacher put before them the unadulterated Hinduism upon which, like a seer, he built the Science of man and God. "Surely", they thought, "he will modify this and enlarge upon that to suit our way of thinking, as others of the East have done and are doing." But, time went on and he neither changed nor wavered one whit from the lore that the sages had writ by the light of their understanding. Those who loved him, tried to reason him out of his almost stubborn adherence to this principle, but to no purpose. "I have come", he would say, "not to make money. I have

come on a mission. I have come to teach Hinduism and not to westernise it. You of the west, have your truth, you do not need us to teach you that, but those who want the wisdom of the East will, have that as it is."

উদ্ধৃত ইংরাজী কথাগুলির ভিতর এমন অনেক গভীর কথা আছে, যে-সম্বন্ধে আমাদের খুব ভাল করিয়া চিন্তা করা উচিত। এইজন্যই এতখানি ইংরাজী লেখা উদ্ধার করা হইল। উদ্ধৃত অংশের সারমর্ম্ম এইরূপ—

'বাবা ভারতীর পূর্ব্বে অনেক হিন্দুপ্রচারক মার্কিন দেশে গিয়াছেন ও নিজের মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের শিক্ষার দ্বারা পশ্চিম দেশের উপকার হইয়াছে এবং তাঁহারা অনেকের প্রশংসা ও ভালবাসা পাইয়াছেন। অনেক প্রচারকই পূর্ব্ববর্ত্তী কোন প্রচারকের অনুবর্ত্তী হইয়া গিয়াছেন, আবার অনেকে হিন্দুর কথা এমনভাবে বলিয়াছেন যে পাশ্চাত্যদেশ সেই কথা, তাহাদের নিজেদেরই চিন্তাধারার শিরোভূষণরূপে তাহা গ্রহণ করিয়াছে। বাবা ভারতী কাহারও অনুবর্ত্তী হইয়া আসেন নাই, তাঁহাকে নিজের চেষ্টায় নিজের স্থান করিয়া লইতে হইয়াছিল। তিনি যে হিন্দুধর্ম্ম আনিয়াছিলেন, তাহা খাঁটি জিনিস, প্রাচীন ঋষিদের নিকট হইতে যেমন জিনিস বাহির হইয়াছিল, তিনি ঠিক্ সেই জিনিসই আমেরিকায় লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি কাহারও সহিত মিল করিবার জন্য তাঁহার খাঁটি জিনিসের এক চুলও পরিবর্ত্তন করেন নাই, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত শিক্ষা হইতে তিনি কণামাত্রও বিচলিত হন নাই। তিনি তাঁহার উপদেশসমূহকে পাশ্চাত্য চিন্তা প্রণালীর উপযোগী করার চেষ্টা করেন নাই, বিদেশী লোকে বুঝিবেনা বলিয়া কোন কথা গোপনও করেন নাই। লোকে প্রথম প্রথম তাঁহার শিশুসুলভ সরলতা দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া যাইত। লোকে ভাবিত, এখন তিনি যাহা বলিতেছেন, ক্রমশঃ তাহার কিছু কিছু বদ্‌লাইয়া এদেশের লোকের উপযোগী করিবেন। অন্যান্য প্রচারকেরা তাহাই করিয়াছেন। বন্ধুগণ তাঁহাকে সেইরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি, কিন্তু, কাহারও কথা শুনিলেন না এবং নিজের কথা বা কথাবলার পদ্ধতি কিছুই বদ্‌লাইলেন না। তিনি বলিতেন—'আমি টাকা রোজগার করিতে আসি নাই, আমি সত্য-প্রচারের জন্য আসিয়াছি। তোমরা পশ্চিমদেশের লোক, তোমরা অনেক ভাল জিনিস

জান, তোমাদের অনেক ভাল জিনিস আছে। তোমরা যাহা জান, তোমাদের যাহা আছে, তাহা তোমাদের শুনাইবার জন্য আমাদের আসিবার প্রয়োজন নাই। আমি তোমাদের হিন্দুত্ব শিখাইবার জন্য আসিয়াছি, হিন্দুধর্ম্মকে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন করিতে আসি নাই'।

বাবা ভারতী সম্বন্ধে আমাদের দেশে ভালরূপ আলোচনা হয় নাই। ইহা দুঃখের কথা।

অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী

৭ পদকর্ত্তা—নন্দ

['মুকুন্দানন্দ'-গ্রন্থে এই অজ্ঞাতনামা পদকর্ত্তার দুইটি পদ সঙ্কলিত হইয়াছে]

(১)

রূপোল্লাস—শ্রীরাধা উক্তি

গান্ধারী

শুন শুন নাগর সকল কহিতে পার কে বুঝিবে বচন তরঙ্গ।
একে তুহু বিদগধ তাহে গিরিধর তাহে কত রসবতী সঙ্গ॥
ওহে মাধব, রসিক রসায়ণ বাণী।
ব্রজবধূ বদন বিমল বর বারিজ তাহে ভ্রমর তুহু জানি॥ ধ্রু॥
আড় নয়ন করি অলক তিলক হেরি মুচকি মুচকি করু হাস।
সো হসনামৃত অধরে মিলায়ত তহি মধু মঞ্জুল ভাষ॥
তাপনী তীর নীর নিতি ধারসি তাহে এত শীতল দেখি।
সুরধুনী সেবী সেবি কিয়ে সুমধুর পুছহ নন্দ এক সাখী॥

(২)

রূপোল্লাস—শ্রীকৃষ্ণস্তোক্তি

রাগ ধানসী

সুন্দরি আন গুণে নহে মোর বচন মধুর।
তুয়া পরসাদে সাধ সব পূর॥
আন সঙ্গ কভু না কহবি মোর।
চান্দ না তেজই কবহু চকোর॥
তুয়া গুণ গায়ন বয়ন হামার।
তুয়া হৃদি শীতল পঙ্কজ হার॥
তুহু দরশন বিনু সব আন্ধিয়ার।
মিছা নহ নন্দ কহয়ে কতবার॥

৮ পদকর্তা—রাধানন্দ দাস

["মুকুন্দানন্দ"-গ্রন্থে এই অজ্ঞাতনামা পদকর্তার একটি পদ সঙ্কলিত হইয়াছে]

যুগল-বিলাস

(১)

নিকুঞ্জ ভবনে দুহু নিকুঞ্জ ভবনে।
সৌদামিনী অঙ্গ কি সোপিল নব ঘনে॥
রাধা কানু দুহু করু অভেদ পীরিতি।
দুন্দুভি সহিতে বিজয় কৈল রতি পতি॥
তরুণিত যমুনা উথলি বহিলা।
সুমেরু কনয়া গিরি তিমিরে ঘুটিলা॥
কনকের নদী ভেদি কালিন্দী বহিলা।
হেমলতা ভুজদণ্ডে বন্দকি বান্ধিলা॥
রতিরস অবসানে দুহুক উল্লাস।
যুগলচরণে সেবে রাধানন্দ দাস॥

শ্রীশিবরতন মিত্র

জয়দেব

গোপবালকসহ নৃত্যাতি কৌতুকে নন্দহৃদয়পুরানন্দ,
মনূপুরশিঞ্জন চরণকমল চল বন্দী করিল তব ছন্দ ;
মথিঞ্জন-খেলন উৎসবে উৎসুক ভীতব্যাকুল বনচারী,
স্বরিতকৃতাঞ্জলি য চে পদমোচন ভবভয়বন্ধনহারী ;
একে করবন্ধন না সহে অলজ্জন ব্রজগৃহনবনীতচোর—
মিনতিকাতরদরবিগলিতলোচন হেরি তব হৃদয় বিভোর !

রাসসুরতরসবহুদিনবঞ্চিত বিচলিতচিতবনমালী,
রভসা সমাগত ধীর সমীর যথা পরশে যামুনতটবালি ;
কলকলকল্লোল না চলে যমুনাজল না গাহে বিহগ তথা কুঞ্জে,
কেলিকদমতল নিপতিত পুষ্পে না বসে ভ্রমর আসি পুঞ্জে ;
বিষাদিত-অন্তর গমননিরন্তর আসিয়া অজয়নদতীরে,
লবঙ্গলতাকৃত তব পরিকল্পিত প্রেবেশিলা কুঞ্জকুটীরে !

কুঞ্জভবনতলগমন বিলম্বনে পরমকুপিতা গোপনারী—
মদনগরলভরবিষমবিড়ম্বিত গোপীজনজীবনবিহারী ;
করি বহুবেদনবচনবিমোচন চরণকমলকৃতদাস,
ধরি পদপল্লব, মানবিভঞ্জনে জনমিল চিতে অভিলাষ ,
লোককলুষভয়বিমলিনমানস জনমতবাদবিশঙ্কী,
স্বকরকমলে তব কলম কলঙ্কিয়া ভকতেরে করিলা কলঙ্কী !

দশরূপে বন্দিয়া জগজনবন্দনে ভবভীতি করিলে বিনাশ,
নিন্দিয়া নবরূপে নীলমোহনরূপ কবিজনহৃদয়বিলাস !
কভু ঘন-নর্ত্তনগমনপরায়ণ গোপবালক হৃদে ভাসে,
পুন শতচুম্বনদৃঢ়পরিরম্ভনে নিষ্কাম-কাম পরকাশে ;
এক ভকতি করে বন্ধন মাধবে ভক্তহৃদয়কারাগেহে,
কতরূপে মাধব বন্দী হইল তব প্রেমভকতিকাম স্নেহে ?

শ্রীভোলানাথ সেন গুপ্ত

বিদ্যাপতি

রসময়, তুঁহু মম পরাণ-সমান,
জীবন ঢুঁড়ি ঢুঁড়ি কহায়সি গান!

জেয়ান-অবধি তব শুনই সুসঙ্গীত
শ্রুতিপথ সুশীতল ভেল,
প্রেম-মুরতি তব মন-মন ঠারই
মরম মধুর ভৈ গেল!
বরখে বরখে কত মরি মরি যাওয়ত
চন্দ্র-তপন দিন-রাতি,
জগজন-মানসে চিরদিন জাগই
তুঁহু প্রেম-স্বয়ং-ভাতি!
কবিজন-গুণ-অনুধাবনে যৈছন
বিদগধ চিতে অনুমান—
বিদ্যাপতি! মম ঐছন বিশোয়াস,
নহি নহি তুঁহারি সমান!

রসকূপ, তুঁহু মম মরম-সমান,
জীবন ঢুঁড়ি ঢুঁড়ি রসায়সি প্রাণ!
এক কবিতা তব বহুভাবসাগর,
অমিয়-কি অতল-সমানা,
ধাওয়ত কবিচিত সুখে অবগাহত
না জানত আদি-অবসানা!
এহি মহাসাগরে পারগমনতরী
মাঙ্গত নহি দীন-হীন,

তুঁহু-সঙ্গম যদি ভাগ্যে মিলয়ল,
হব হাম জলচর মীন;
মজ্জনে মজ্জনে নিত সুখ ভুঞ্জব
সোহি মম হৃদয়-কি যন্ত্র,
যৈছনে সম্ভব—সকরুণ বিহি কব
মিলায়ব পরাণ-কি মন্ত্র!

মনোময়, তুঁহু মম বঁধুয়া-সমানা,
সাধু-মধুর তব মাধব-কি গানা!

অতয় এ দুস্তর মহাভবসাগরে
গীত-তরণী নিরমানি'
এক-মাধব-ধনে বহু করি বণ্টত
কূলে কূলে বিলায়ত দানী!
তব ভাব চিন্তনে তব গুণ কীর্ত্তনে
বিচার রহল মুঝে জানা—
রাস-গহনে যোই মাধব মিলায়ত
সোহি পুন মাধব সমানা!
বহুজন আওয়ত, বহুজন গাওয়ত,
বহুজনে বহুতর ভেক,
রসগীতে অনুপম বিদ্যাপতি-সম
লাখে না পাওয়ব এক!

শ্রীভোলানাথ সেন গুপ্ত

চণ্ডীদাস

কি রসে রসিয়া নানুরে বসিয়া গাহিলে কানুর গান,
শ্রবণেতে পশি মরমে পরশি আকুল করিল প্রাণ;
অন্তরে বঁধু, ছিল কত মধু, যে বুঝে পীরিতি-রীত,
সেই জন জানে, হৃদে বহু মানে অমর তোমার গীত;
হে দ্বিজ চণ্ডীদাস;
শীতল বলিয়া তেঁই ও চরণ, চরণে হইনু দাস!

পীরিতি বলিয়া তিনটি আখর ভুবনে আনিল যেই,
তোমার পীরিতি রসের সায়রে আপনি ডুবিল সেই;
তব হিয়া ছাড়ি যেতে আন বাড়ী পরাণ নাহি যে চায়,
দিয়ে সুরে সুর মুরলী মৃদুর মধুর মধুর গায়;
রসিক চণ্ডীদাসে
মজাতে আসিয়া, মজিয়া মজিল চতুর সে পীতবাসে!

শ্রীমাধব-পদ সাগরে মিলিতে বাসনা হইল ব'লে,
জীবন-তরণী ভাসাইয়া দিলে পীরিতি নদীর জলে!
পীরিতি-নদীর শ্যাম দুটি তীর শ্যামল তাহার জল,
করিতে সিনান, পরশন, পান অমিয়-সমান ফল;
নাবিক চণ্ডীদাস
তীরে উতরিল, কত জনে নিল শ্যাম-নগরীর পাশ।

ধিকং রাজায়, ধিক্ ধনে তার, ধিকং মগধ দেশ,
এমন পীরিতি-সিরিতি রাখিতে না করে যতন-লেশ;

নিলাজ-হৃদয় সব জন যে নিপট-কপট-প্রাণ,
কিছু নাহি দিয়া নিত নিত গিয়া করিছে অমিয়-পান !
অমর চণ্ডীদাস,
গানে তুমি রাজা, চিরদিন তাজা, না কর কিছুর আশ।

তব গীতি গুণ' স্মরি পুনপুন হরষ-সাগরে ভাসি,
সাধনার রীত জানি বিপরীত পরিনু প্রেমের ফাঁসি ;
অতি সুশীতল তব 'পদ'তল, অমের রসের ঠাঁই,
তারি রসফল করি সম্বল, ভাবনা কিছুই নাই !
হে কবি চণ্ডীদাস,
মধুর জানিয়া সঙ্গীত তব হইনু মরমদাস।

শ্রীভোলানাথ সেন গুপ্ত

নাটকে শ্রীরাধা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ছয় গোস্বামীকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনে বসিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত ও শিক্ষা, বিবিধ গ্রন্থের সাহায্যে প্রচার করিলেন।

এই ছয় গোস্বামী যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥

'নিত্যলীলা'—এই কথাটি সর্ব্বদাই মনে রাখা আবশ্যক। রূপক নহে, ইতিহাসও নহে,—'নিত্যলীলা'। নিত্যলীলা কি, তাহা সংজ্ঞার দ্বারা বুঝাইয়া লাভ নাই। হৃদয়ের গঠন সকলের একরূপ নহে ; এক-দল লোক স্বভাবতঃই ভাবুক, তাহারা এই সংসার ও জীবন, যেভাবে দেখে ও আস্বাদন করে, সকলে সেরূপ করে না। ভাবুকদের অনুভূতি মিথ্যা নহে, ভাবুকেরাও মিথ্যাবাদী নহে। জীবনের পথে চলিতে চলিতে যাহারা ভাবুক নহে, তাহাদেরও অনেক সময়ে মনে হয়, ভাবুকেরাই সত্যের পরিচয়

কিন্তু তাই বলিয়া অন্যান্য সকলেই যে চিরদিন ইহাতে বঞ্চিত হইয়া থাকিবে তাহাও নহে। অনুশীলনের পথ আছে, কেহ ভাব, কেহ মন্ত্র, কেহ বা নাম আশ্রয় করিয়া হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন করিতেছেন। এই অনুশীলনে ভাবুক সাধুগণের সঙ্গে নিত্যলীলার গ্রন্থাদি শ্রবণ ও স্মরণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়। এই কারণেই ছয় গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেরণায় নিত্যলীলার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

এই ছয় গোস্বামীর মধ্যে শ্রীরূপ গোস্বামীর দুইখানি নাটকের আমরা যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। এই নাটক দুইখানির নাম—'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধব'। ইহা ছাড়া, শ্রীরূপগোস্বামীকৃত আর একখানি নাটকের কথাও কিছু কিছু আলোচনা করিতে হইবে। সেখানির নাম—'দানকেলিকৌমুদী'।

'বিদগ্ধমাধব' নাটকের রচনাকাল এই নাটকের শেষে একটি শ্লোকে পাওয়া যায়—

নন্দসিন্ধুরবানেন্দুসংখ্যে সম্বৎসরে গতে।
বিদগ্ধমাধবং নাম নাটকং গোকুলে কৃতং॥

নন্দ ৯, সিন্ধুর ৮, বান ৫, ইন্দু ১। অঙ্কের বামাগতি, অতএব ১৫৮৯ সম্বতে গোকুলে 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের রচনা সমাপ্ত হইল।

'ললিতমাধব' নাটকের শেষেও একটি অনুরূপ শ্লোক আছে—

নন্দেষুবেদেন্দুমিতে শকাব্দে শুক্রস্য মাসস্য তিথৌ চতুর্থ্যাং।
দিনে দিনেশস্য হরিং প্রণম্য সমাপয়ং ভদ্রবনে প্রবন্ধং॥

নন্দ ৯, ইষু (বাণ) ৫, বেদ ৪, ইন্দু ১। অঙ্কের বামাগতি। অতএব ১৪৫৯ শকাব্দায়, জ্যৈষ্ঠমাসে চতুর্থী তিথিতে রবিবারে ভদ্রবনে এই নাটকের রচনা সমাপ্ত হইল। পূর্ব্বের শ্লোকটির একটি পাঠান্তর পাওয়া যায়। 'নন্দেষু'র পরিবর্ত্তে পাওয়া যায় 'নন্দাঙ্গ'। অঙ্গ ৫। অতএব পাঠান্তরের জন্য অর্থের বৈষম্য হইবে না।

১৫৮৯ সম্বৎ ১৪৫৪ শকাব্দা। তাহা হইলে আমরা পাইলাম ১৪৫৪ শকাব্দায় 'বিদগ্ধমাধবে'র রচনা সমাপ্ত হয়, আর তাহার পাঁচ বৎসর পরে ১৪৫৯ শকাব্দায় 'ললিতমাধবে'র রচনা সমাপ্ত হয়। 'দানকেলিকৌমুদী' নাটকে এ প্রকারের কোন উক্তি না থাকায়, উহার রচনাকাল সঠিকরূপে বলা যায় না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে এই নাটক দুখানি সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা আছে এবং এই নাটক দুখানির অনেকগুলি শ্লোক সেখানে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যাহা আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

শ্রীরূপ গোস্বামী ও তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা শ্রীসনাতন ও অনুপম,—এই তিনজনেই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন এবং শ্রীবৃন্দাবনে মহাপ্রভুরই কাজ করিতেছিলেন। খুব কঠিন কাজ,—লুপ্ততীর্থ উদ্ধার। রূপসনাতন পূর্ব্বে রাজমন্ত্রী ছিলেন, কাজেই এই কঠিন কাজ করিবার তাঁহারাই উপযুক্ত পাত্র ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে—জগন্নাথধামে। শ্রীবৃন্দাবনে থাকিতে থাকিতেই শ্রীরূপ গোস্বামীর মনে হইল, শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে নাটক রচনা করিতে হইবে। শ্রীবৃন্দাবনেই নাটকের রচনা আরম্ভ হইল, মঙ্গলাচরণ ও নান্দী সেইখানেই লিখিয়া ফেলিলেন। তাহার পর শ্রীরূপ গোস্বামী, তাঁহার ভ্রাতা অনুপমকে সঙ্গে লইয়া বাঙ্গালাদেশে আসিলেন। বাঙ্গালাদেশে আসিবার সময় পথে ঐ নাটকের কথা ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছেন। মনে যাহা উদয় হইতে লাগিল, কড়চা করিয়া তাহা লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন। বাঙ্গালাদেশে আসিয়া তাঁহার ভ্রাতা অনুপম গঙ্গালাভ করিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, নীলাচলে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করার ইচ্ছা। বাঙ্গালা-দেশের ভক্তগণের তখন নীলাচলে যাইবার সময়। রথযাত্রার পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশ হইতে অসংখ্য ভক্ত বৎসর বৎসর নীলাচলে যাইতেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর ইচ্ছা ছিল, ভক্তগণের সঙ্গে যাইবেন। কিন্তু অনুপমের মৃত্যুর জন্য তাহা হইল না, তাঁহার নীলাচল যাইতে বিলম্ব হইয়া গেল। তিনি ভক্তগণের সঙ্গ পাইলেন না। কি করেন, পরিশেষে একাকী নীলাচল যাত্রা করিলেন। তখনও তিনি শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক নাটক রচনার কথাই চিন্তা করিতেছেন।

উড়িষ্যাদেশে একখানি গ্রাম আছে, তাহার নাম সত্যভামাপুর। পথিমধ্যে শ্রীরূপ গোস্বামী একরাত্রি সেই গ্রামে বিশ্রাম করিলেন। রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন—

* * * * এক দিব্যরূপানারী।
সম্মুখে আসি আজ্ঞা দিলা বহু কৃপা করি॥
"আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন।
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ॥"

স্বপ্নযোগে এইরূপ আদেশ পাইয়া শ্রীরূপ গোস্বামী ভাবিলেন, শ্রীকৃষ্ণমহিষী সত্যভামা আসিয়াই আমাকে আদেশ করিয়া গেলেন—পুরলীলার পৃথক্ নাটক রচনা করিতে হইবে। পূর্ব্বে তিনি কল্পনা করিয়াছিলেন, মাত্র একখানি নাটক হইবে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও পুরলীলা উভয়ই থাকিবে। স্বপ্নদর্শনের পর স্থির করিলেন, তাহা হইবে না, দুইখানি পৃথক্ নাটক রচনা করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শ্রীরূপ গোস্বামী নীলাচলে গেলেন। সেখানে তিনি ঠাকুর শ্রীহরিদাসের নিকট থাকিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে যথেষ্ট কৃপা করিলেন। প্রত্যহই মহাপ্রভুর

সহিত সাক্ষাৎ হয়। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সকলেই শ্রীরূপকে কৃপা করিলেন। সেই সময়ে হঠাৎ একদিন মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীকে বলিলেন—

"কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাহাঁতে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আদেশ বা উপদেশ শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত শ্রীলঘুভাগবতামৃতগ্রন্থের নিম্নের শ্লোকে পরিদৃষ্ট হয়—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি॥

শ্রীলঘুভাগবতামৃতগ্রন্থে বলা হইয়াছে, এই বচনটি যামলের অর্থাৎ যামল তন্ত্রের। শ্লোকটির অর্থ—যদুবংশে আবির্ভূত কৃষ্ণ অন্য। যিনি পূর্ণ তিনি তাঁহা হইতে পৃথক্, তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কখনও কোথায়ও যান না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আদেশ শুনিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী বিস্মিত হইলেন। পূর্ব্বে স্বপ্নযোগে সত্যভামাদেবীর আদেশ পাইলেন, এখন আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ পাইলেন। পূর্ব্বে একখানি নাটক হইবে, এইরূপ চিন্তা ছিল, এখন দুখানি পৃথক্ নাটক করিলেন। দুখানি নাটকের পৃথক্ পৃথক্ নান্দী ও প্রস্তাবনা লিখিয়া রাখিলেন। তাহার পর জগন্নাথের রথযাত্রা হইয়া গেল। রথযাত্রার পরের চারিমাসও হইয়া গেল। শ্রীরূপ গোস্বামী নীলাচলে থাকিলেন। সেই সময়ে একদিন শ্রীরূপ গোস্বামী নিজের বাসায় বসিয়া নাটক লিখিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীরূপের লিখিত তালপত্রের উপর মহাপ্রভুর দৃষ্টি পতিত হইল। শ্রীরূপের হস্তাক্ষর বড়ই সুন্দর, মহাপ্রভু প্রথমেই অক্ষরের বন্দনা করিলেন এবং শ্রীরূপের লিখিত এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন।

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে।
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্॥
চেতঃ প্রাঙ্গনসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং।
ন জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥

কৃষ্ণ, এই দুটি বর্ণ কি অমৃত দিয়া গড়া, তাহা জানি না। তুণ্ডে—জিহ্বায়, এই নাম নৃত্যপরা (তাণ্ডবিনী) হইলে, অসংখ্য জিহ্বা (তুণ্ডাবলী) পাইবার জন্য সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়। কর্ণক্রোড়ে এই নাম অঙ্কুরিত হইলে, অর্ব্বুদ কর্ণের জন্য স্পৃহা হয়। চিত্তপ্রাঙ্গনে এই নাম প্রবেশ করিলে, সমুদয় ইন্দ্রিয়ের কার্য্য পরাজিত হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি রসের অন্বেষণে আর বাহিরে ধাবিত হয় না, স্তব্ধ ও অচঞ্চল হইয়া যায়।

প্রাচীন বৈষ্ণব কবি যদুনন্দন দাস এই শ্লোকটির নিম্নরূপ পদ্যানুবাদ করিয়াছেন—

মুখে লইতে কৃষ্ণনাম, নাচে তুণ্ড অবিরাম,
আরতি বাঢ়ায় অতিশয়।
নাম সুমাধুরী পাঞা, ধরিবারে নারে হিয়া,
অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয়॥
কি কহব নামের মাধুরী।
কেমন অমিয়া দিয়া, কে জানি গড়িল ইহা,
কৃষ্ণ এই দু'আঁখর করি॥
আপন মাধুরী গুণে, আনন্দ বাঢ়ায় কাণে,
তাতে কাণে অঙ্কুর জনমে।
বাঞ্ছা [illegible] লক্ষ কাণ, যবে হয় তবে নাম,
মাধুরী করিয়ে আস্বাদনে॥
কৃষ্ণ দু-আঁখর দেখি, জুড়ায় তপত আঁখি,
অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়।
যদি হয় কোটি আঁখি, তবে কৃষ্ণ রূপ দেখি,
নাম আর তনু ভিন্ন নয়॥
চিত্তে কৃষ্ণ নাম যবে, প্রবেশ করয়ে তবে,
বিস্তারিত হৈতে হয় সাধ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ, করে অতি আহ্লাদন,
নামে করে প্রেম উনমাদ॥
যে কানে পরশে নাম, সে তেজয়ে আন্ কাম,
সব ভাব করয়ে উদয়।
সকল মাধুর্য্য স্থান, সব রস কৃষ্ণনাম,
এ যদুনন্দন দাস কয়॥

স্বপ্নাদেশে ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর উপদেশে শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার একখানি নাটকের বস্তু বা বিষয় ভাঙ্গিয় দুইখানি নাটক রচনা করিলেন। সেই দুইখানি নাটকের নাম—'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিত-মাধব'। পূর্ব্বে যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইল, উহা 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের ত্রয়োদশ শ্লোক।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কথিত হইয়াছে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, সার্ব্বভৌম, রায় রামানন্দ, স্বরূপ-

দামোদর প্রভৃতির সহিত একত্রে বসিয়া, শ্রীরূপ গোস্বামীর মুখে তাঁহার নাটক দুইখানির অনেকগুলি শ্লোক শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত-লীলার প্রথম অধ্যায়ে বিদগ্ধ-মাধবের পঁচিশটি শ্লোক এবং ললিতমাধবের তেরটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ১৪০৭ শকাব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আটচল্লিশ বৎসর তাঁহার প্রকট লীলা, অতএব ১৪৫৫ শকাব্দে তিনি অপ্রকট হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি 'বিদগ্ধমাধব' ১৪৫৪ শকাব্দায় অর্থাৎ মহাপ্রভু অপ্রকট হওয়ার এক বৎসর পূর্ব্বে সমাপ্ত হয়; আর 'ললিতমাধব' ১৪৫৯ শকাব্দায় অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু অপ্রকট হওয়ার পাঁচ বৎসর পরে সমাপ্ত হয়। শ্রীরূপ গোস্বামী নীলাচলে আসিয়াছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার শেষ দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে, ইহাও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতেই জানিতে পারা যায়। মহাপ্রভুর লীলার শেষ দ্বাদশ বৎসর অতিশয় অদ্ভুত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার নিম্নরূপে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন—

শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-লীলা প্রভুর অন্তর॥
নিরন্তর রাত্রিদিন বিরহ উন্মাদে।
হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে॥
যে কালে করেন জগন্নাথ দরশন।
মনে ভাবে—কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন॥
রথযাত্রায় আগে যবে করেন নর্ত্তন।
তাঁহা এই পদমাত্র করেন গায়ন॥
    সেই ত পরাণ নাথ পাইনু।
    যাঁহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেনু॥
এই ধুয়া গানে নাচেন দ্বিতীয় প্রহর।
কৃষ্ণ লই ব্রজে যাই—এভাব অন্তর॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর যখন এইরূপ অবস্থা, সেই সময়েই শ্রীরূপ গোস্বামী নীলাচলে আসিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর রথাগ্রে নর্ত্তনের ভাবানুযায়ী একটি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। সেই শ্লোকটি সুবিখ্যাত শ্লোক।

এই সমুদয় ঘটনা হইতে বুঝিতে হইবে, শ্রীরূপ গোস্বামী একেবারেই নাটক রচনা করেন নাই। তিনি বহুবৎসর এই নাটক দুখানির বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে অনেকদিন ধরিয়া শ্লোকগুলি রচনা করিয়াছিলেন। নীলাচলে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যখন শ্রবণ করেন তখন 'বিদগ্ধমাধব'

রচনা প্রায় শেষ হইয়াছিল— নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া কিছুদিনের মধ্যে নাটকের রচনা সমাপ্ত করেন। মহাপ্রভু যখন শ্রবণ করেন তখন 'ললিতমাধবে'র কয়েকটি শ্লোক রচিত হইয়াছিল। শ্রীবৃন্দাবনে বসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটবার্ত্তা শুনিয়া অনেকদিন আর বেশী কিছু রচনা করেন নাই, তাহার পর কিছুকাল পরে 'ললিতমাধব' সমাপ্ত করেন।

'বিদগ্ধমাধব' নাটক সপ্তাঙ্কে বিভক্ত। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই এই নাটকের বর্ণনীয় বিষয়। প্রেমলীলার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা যে-ভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহা অতি ধীরভাবে আস্বাদনীয়।

'ভক্তমাল' গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনের আত্মীয়স্বজনবর্গের নাম আছে। শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত 'শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশ'-নামক গ্রন্থ হইতে সেই তালিকা গৃহীত। বাঙ্গালা 'ভক্তমালগ্রন্থে'র কবি স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সমুদয় নামে মতভেদ আছে, অর্থাৎ নানাগ্রন্থে নানারূপ বর্ণনা আছে। এই মতভেদ সম্বন্ধে বাঙ্গালা 'ভক্তমালে'র মত কি, তাহাও জানা আবশ্যক।

পূর্ব্বকথিত নামে কিছু হয়ে ভেদ।
সকলি সম্ভবে যাহা কহে সাধু বেদ॥

নন্দ মহারাজের কয় ভাই, এ বিষয়ে মতভেদ আছে, সে সম্বন্ধে ভক্তমাল বলিতেছেন,—

কেহ কহে সপ্ত ভাই কেহ পঞ্চ জন।
কল্পভেদে কিংবা কিছু থাকিবে কারণ॥

বর্ত্তমান যুগ অবশ্য এই প্রকারের মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইবে না। অন্য প্রকারের মীমাংসা অন্বেষণ করিবে।

'ভক্তমাল' গ্রন্থে পৌর্ণমাসী দেবী সম্বন্ধে আছে—

পৌর্ণমাসী ভগবতী সান্দীপনীসুতা।
তেজিয়া অবন্তীপুরী ব্রজে অনুগতা॥
শ্রীনারদের শিষ্যা মহাতপস্বিনী।
কৃষ্ণলীলা কুতূহলী সর্ব্ববিধায়িনী॥
যোগমায়া অংশ হন চিৎশক্তিময়ী।
মায়া আচ্ছাদিয়া কৃষ্ণলীলার বিধায়ী॥
ব্রজেশ্বর ব্রজেশ্বরী আদি ব্রজপুরে।
সকলের মান্য পূজ্য সর্ব্বত্র বিহরে॥
নিবিড় বনেতে বাস পত্রের কুটীরে।

পৌর্ণমাসী দেবীর কার্য্য বা সাধনা-সম্বন্ধে 'ভক্তমাল' যাহা বলিলেন, বিদগ্ধমাধবেও তাহাই কথিত হইয়াছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন কি প্রকারে হইবে, ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবী সর্ব্বদাই তাহার উপায় চিন্তা করিতেছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটাইবার জন্ত তাঁহার এত উদ্বেগ কেন, অনন্তকর্ম্মা হইয়া তিনি কি নিমিত্ত সর্ব্বদাই নব নব উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন? ইহার উত্তর, বিদগ্ধমাধবেই আছে। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ, ইঁহারা **শৃঙ্গারমাঙ্গলিক**। সমগ্র বিশ্ব রসের পিপাসু, রসাস্বাদনের আকাঙ্ক্ষায় সমগ্র বিশ্ব আকুল। এই রস নানামূর্ত্তি ধরিয়া স্থুল সূক্ষ্ম, ক্ষুদ্র বৃহৎ, চেতন অচেতন সকলকেই মুগ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিতেছে। স্থূলতম জড়জগতে জলই রস। সন্ধ্যা-উপাসনায় এইজন্ত প্রথমেই জলের উপাসনা, তাহার পর প্রাণই রস। রসের এই বহুমূর্ত্তি বা বিবধপ্রকারের প্রকাশ দেখিতে দেখিতে বেদের ঋষি শৃঙ্গাররসকেই আদিরস বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বিশ্বব্যবস্থার মূলে এক অনন্ত গুণময় নায়ক ও নায়িকা রহিয়াছেন, তাঁহাদের একের জন্ত অপরের যে আকুলতা, তাহাই আদিরস বা শৃঙ্গার রস, অতএব শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনই সমগ্র বিশ্বব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য। দেবী পৌর্ণমাসী সেই চরম লক্ষ্য বুঝিয়াছেন, যিনি যোগমায়ার অংশ, সেই পরমযোগ বা শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-সাধনই তাঁহার তপস্তা।

'ভক্তমাল'গ্রন্থ হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহার একটু টীকা আবশ্যক। ঐ অংশে আছে, সান্দিপনী-সুতা। ভুল হইতে পারে, তিনি বুঝি সান্দিপনী মুনির কন্তা। ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস না করিয়া বহুব্রীহি সমাস করিতে হইবে। তাহা হইলে অর্থ হইবে—সান্দিপনী হইয়াছেন সুত যাঁহার। অর্থাৎ পৌর্ণমাসী, সান্দীপনী মুনির কন্তা নহেন, মাতা।

শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশ গ্রন্থে আছে—

সান্দিপনিং সুতং শ্রেষ্ঠং হিত্বাবন্তিপুরীমপি।
স্বাভীষ্টদৈবতপ্রেম্ণা ব্যাকুলা গোকুলং গতা॥

পৌর্ণমাসী দেবী আপনার শ্রেষ্ঠ পুত্র সান্দীপনিকে পরিত্যাগ করিয়া এবং অবন্তীপুরী পরিত্যাগ করিয়া, আপনার অভীষ্টদেবতার প্রেমে ব্যাকুল হইয়া গোকুলে আসিয়াছিলেন।

"গোপালচম্পূঃ" গ্রন্থে পৌর্ণমাসী সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—

অথ যা খলু সিদ্ধানাং পরিষদি যোগমায়েতি প্রসিদ্ধা ভক্তিসিদ্ধান্তসম্ভাবরতে শ্রীমদ্ভাগবতে॥ "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" ইত্যাদিনা ভগবল্লীলাধিকারিতয়া সিদ্ধা স্বরূপশক্তিঃ স্বাভব্যক্তিমন্তরেণ তাপসীতি ব্যবসীয়তে। যস্তাঃ পৌর্ণমাসীতি নাম-ব্যাহার-ব্যবহার আসীৎ।

অনন্তর, যিনি নিশ্চয়ই সিদ্ধগণের সভায় 'যোগমায়া' এই নামে প্রসিদ্ধা, ভক্তিসিদ্ধান্তসম্ভাবরত শ্রীমদ্ভাগবতে "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" এই কথায় যাঁরা যিনি ভগবানের লীলার অধিকারিনী, সুতরাং

স্বরূপশক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বরূপশক্তির প্রকাশ হয় না বলিয়া তিনি তাপসীরূপে বিখ্যাত, এবং পৌর্ণমাসী এই নামে সর্ব্বত্র পরিচিত।

ইহাই পৌর্ণমাসীর পরিচয়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাসলীলার প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে, যোগমায়াকে সমীপে গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবান্ এই লীলা করিয়াছিলেন। এই যোগমায়া শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি; তিনি ভগবানের লীলায় অধিকারিণী, প্রপঞ্চে তাঁহার প্রকাশ নাই, তিনিই তাপসী পৌর্ণমাসী।

পৌর্ণমাসীর সহিত একটি বালক আছে, তাহার নাম মধুমঙ্গল। এই বালকটির কথা ও শ্রীরূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধবে' বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 'গোপালচম্পূ:' গ্রন্থেও এই বালকটির কথা আছে।

অথ যশ্চ সর্ব্ববিদ্যানিষ্ণাতবক্তাঃ স্নাতকঃ শ্রীকৃষ্ণস্য রহস্য-নর্ম্মণি বদ্ধতৃষ্ণতয়া তদ্বয়স্যতাং বশ্যতাঞ্চলিতে বঞ্চাবিদূষণ-ভাবরহিত এব দেবর্ষিপ্রকৃতিতয়া তস্য কৌতুককৃতে বিদূষকতামপি বিভূষয়তি স্ম, স খলু মধুমঙ্গলনামা নর্ম্মণা মর্ম্মস্পর্শিকুতুকরচনৈরাশীর্ব্বচনৈঃ সর্ব্বানমন্দমানন্দয়ামাস। নিধিমিবহরিসন্নিধিঞ্চানঞ্চ।

যিনি সকল বিদ্যায় পারদর্শী, স্নাতক ব্রাহ্মণ; শ্রীকৃষ্ণের সহিত রহস্যকৌতুক করিতে তাহার অন্তরে সর্ব্বদাই আকাঙ্ক্ষা। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বয়স্য ও সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের অনুগত। তিনি দোষগন্ধরহিত, তাঁহার প্রকৃতি দেবর্ষি নারদের ন্যায়। শ্রীকৃষ্ণের সহিত কৌতুক করিবার জন্য তিনি বিদূষক হইয়াছেন। তিনি বিদূষক-ভাবের ভূষণস্বরূপ। তাঁহার নাম মধুমঙ্গল, রহস্যের দ্বারা মর্ম্মস্পর্শী কৌতুকবচনযুক্ত আশীর্ব্বাদ বাক্য প্রয়োগের দ্বারা তিনি সকলের সাতিশয় আনন্দোৎপাদন করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানকে নিধির ন্যায় বিবেচনা করিয়া, তাহা আশ্রয় করিয়াছেন।

আলোচনা ও সংবাদ

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ—ধর্ম্মবিষয়ক মাসিকপত্র। শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে শ্রীহরিদাস গোস্বামী মহোদয় কর্ত্তৃক পরিচালিত। ৩য় বর্ষ দশম সংখ্যায় দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীকুমুদবান্ধব চট্টোপাধ্যায় এম,এ মহাশয় এক সুচিন্তিত প্রবন্ধে উপযুক্ত প্রমাণের দ্বারা দেখাইতেছেন,— শ্রীধর স্বামীর মতের সহিত বাঙ্গালা দেশের গোস্বামীপাদ-গণের অনেক স্থলেই বেশ গুরুতর প্রভেদ আছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন, আর শ্রীমদ্ভাগবতই সকল প্রমাণের শিরোমণি, সুতরাং এই প্রভেদের হেতু ও স্বরূপ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-কার্য্য যদি দেশমুখী হইত, অথবা রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয় দেশমুখী নহে বলিয়া তাহার ত্রুটি বুঝিয়া, সেই ত্রুটি পূরণের জন্য যদি কোন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজন হইত, তাহা হইলে এই বিষয়টির সম্যক্ আলোচনা সহজেই সম্ভবপর হইতে পারিত। কারণ, বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালাদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের আন্দোলনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল—যদিও ব্যবসায়ী খবরের কাগজ পড়িয়া তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যায় না। বৈষ্ণবধর্ম্মই হিন্দুবঙ্গের জনসাধারণের ধর্ম্ম, আর বর্ত্তমান যুগ জনসাধারণের জাগরণের যুগ।

* * * * *

কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র **শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গ**—৩য় বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যায় পণ্ডিত শ্রীগোপীমোহন গোস্বামী মহাশয় একটি ক্রমশঃ-প্রকাশ্য প্রবন্ধে দেখাইতেছেন যে, গৌড়ীয় মঠ হইতে যে 'ভক্তিসন্দর্ভ' বাহির হইতেছে, তাহার অনুবাদে বড়ই ভুল হইতেছে। আমরা গোস্বামী মহাশয়ের মতের সমর্থন করিতেছি—এবং প্রার্থনা করিতেছি, গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয় মনোযোগী হইয়া অনুবাদের বিশুদ্ধতা সাধন করিবেন। গৌড়ীয়-মঠের গ্রন্থাদিতে লেখা হয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের তাঁহারা অথবা তাঁহাদের আচার্য্য মহোদয়ই একমাত্র রক্ষক। বর্ত্তমানযুগে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে সনাতন ধর্ম্মের নামে, এ প্রকারের দাবী সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য। আমরা সসম্মানে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এই দাবী অচিরে পরিত্যাগ করিবেন।

* * * *

কাউণ্ট গব্‌লেট্ ডি, অ্যাল্‌ভিলা—Count Goblet D' Alviela—বেল্‌জিয়ম্ দেশের একজন দার্শনিক পণ্ডিত। তুলনামূলক ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনার জন্য এবং উদার ও উন্নতিমুখী ধর্ম্মান্দোলনের

সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার জন্য তাঁহার খ্যাতি পৃথিবী-ব্যাপী। সম্প্রতি ৭৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মোটর-গাড়ীর দুর্ঘটনায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি বেল্‌জিয়ম্‌-রাজ্যের পার্লামেন্টের মেম্বর ও মন্ত্রী ছিলেন। যুদ্ধের সময় তিনি ক্যাবিনেটের মেম্বর ছিলেন। তিনি জ্ঞানলাভের জন্য বহু দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। ইউরোপের পণ্ডিতসমাজে সকলেই তাঁহাকে জানিতেন। তিনি ভারত-বর্ষেও আসিয়াছিলেন। তাঁহার একখানি গ্রন্থের নাম—The Contemporary Evolution of Religious Thought in England, America and India—ভারত, মার্কিণ ও ইংলণ্ড দেশে আধ্যাত্মিক চিন্তার সমসাময়িক ক্রমবিকাশ। এই গ্রন্থে, ভারতের নবীন ধর্ম্মমণ্ডলী সমূহের অনেক কথা আছে। তিনি একবার হিবার্ট বক্তা হইয়াছিলেন। তাঁহার হিবার্ট বক্তৃতাগুলির নাম—The Origin and Growth of the Conception of God—ঈশ্বর-বিষয়ক ধারণার উৎপত্তি ও বিকাশ। যাঁহারা তুলনামূলক ধর্ম্মালোচনা করেন ও সমসাময়িক ধর্ম্মচিন্তার সহিত সংশ্লিষ্ট, তাঁহাদের এই গ্রন্থ দুখানি পাঠ করা উচিত।

* * * *

ব্রাহ্মণদায়িত্ব—বৰ্দ্ধমান ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনীতে সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখ-রেশ্বর রায় বাহাদুর কর্তৃক কথিত অভিভাষণ। ৺কাশীধাম হইতে প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা। এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে—১। হিন্দুসমাজ একটি আবর্জ্জনাপূর্ণ ময়লার গাড়ী, আর ব্রাহ্মণ-সমাজরূপী গরু তাহার বাহক। গরুর নাকে দড়ি। এক মাতাল ভাঙ্গি, গাড়ীতে বসিয়া গরুকে পদাঘাত করিতেছে। এই ভাঙ্গি কে, আর এই ভাঙ্গির হাত হইতে পরিত্রাণই বা কি, রূপক ভাঙ্গিয়া রাজা বাহাদুর তাহা বলেন নাই, কিন্তু বলিলে আমরা উপকৃত হইতাম। ২। ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের দ্বারা দেশে কোন কাজ হয় নাই। "লোকবল বা অর্থবলের অভাবে আমরা যে কার্য্য করিতে পারিতেছি না, তাহা নহে; মনোবলের অভাবই উহার একটি প্রবল ও প্রধান কারণ। দায়িত্ববোধ হইতে মনোবল জন্মে ও পরিপুষ্ট হয়। যেখানে দায়িত্ববোধের অভাব, সেখানে মনোবলের ক্ষীণতা, কর্ম্ম-শক্তির হীনতা, উৎসাহের দীনতা এবং সাফল্যের অসদ্ভাব অনিবার্য্য।" ৩। অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন-সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—"এদেশের হাড়ী-মুচি-ডোম-চামার মেথর কেহই আমাদের ঘৃণ্য নহে; বরং তাহাদের মধ্যে যাহারা স্বধর্ম্মে ও স্বকর্ম্মে স্থিত রহিয়াছে, তাহারা আমাদের শ্রদ্ধেয় ও সম্মাননীয়। তাহাদের কাহাকেও স্পর্শ করিলে আমাদের জাতিধর্ম্ম যায় না। তাহারা সকলেই আমাদের এক পরিবারভুক্ত, তাহারা সকলেই আমাদের নিজ-জন। এখন আমাদের পর হইয়াছে তাহারাই, যাহারা আমাদের ঘর পরিত্যাগ করিয়া জাতিধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়া ব্রাহ্মণদায়িত্ব বোধকে হারাইয়া পাশ্চাত্য

প্রস্তাবে 'অস্পৃশ্য' বলিয়া ঘোষণা করা যাইতে পারে। এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম,—ইহাদের সহিত যতদূর সম্ভব, সংশ্রব ও সম্বন্ধযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।" রাজা বাহাদুরের এই উক্তি ব্রাহ্মণোচিত উদারতাপূর্ণ। আমরা বিশ্বাস করি, ব্রাহ্মণগণ দলবদ্ধ হইয়া এইসব অনুন্নত জাতির ভিতর সনাতন ধর্ম্মমূলক শিক্ষা ও সদাচার প্রবর্ত্তিত করার জন্য চেষ্টা করিলে, ব্রাহ্মণের দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠুরূপে প্রতিপালিত হইবে।

এই গ্রন্থের শেষে, স্বধর্মনিষ্ঠ প্রবীণ রাজা বাহাদুর চারিটি প্রস্তাব করিয়াছেন। ১। (ক) কদাচার-কুশিক্ষার প্রভাব হইতে হিন্দুবালক-বালিকাগণকে যতদূর সম্ভব রক্ষা করিবার জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মসমর্থক পাঠ্যগ্রন্থ সকল প্রণয়ন ও প্রকাশের ব্যবস্থা এবং (খ) তাহাদের সদাচারমূলক সুশিক্ষা প্রাপ্তির জন্য স্থানে স্থানে পাঠশালা-সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ২। হিন্দুসমাজের উপরে চারিদিক হইতে অবিরত যে সকল গ্লানিকর ও অযথা আক্রমণ চলিয়াছে, সদ্যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা তাহার বাধা-প্রদান, হিন্দুসদাচার সমর্থন এবং ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণমধ্যে সমাজ-শক্তির উন্মেষণ তথা হিন্দুজাতির স্বাতন্ত্র্য-সংরক্ষণ চেষ্টার জন্য একখানি বৃহদাকার দৈনিক বা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। ৩। দেশের বর্ত্তমান অবস্থাতে স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া কিরূপে ব্রাহ্মণপরিবারের জীবিকা সংস্থান হইতে পারে, তদ্‌বিষয়ে আলোচনা ও উপায় অবধারণ করিতে হইবে। ৪। হিন্দু-সমাজে অধুনা যে ঘোর দুঃসময় উপস্থিত, তাহার প্রতিকারার্থে যেমন পুরুষকার আবশ্যক, তেমনি দৈব অনুষ্ঠানেরও প্রয়োজন ; একারণ সদাচারী বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ দ্বারা পবিত্র তীর্থস্থানাদিতে আপাততঃ বর্ষত্রয়ব্যাপী নিত্য দৈবশান্তি-কর্ম্মাদি-অনুষ্ঠানের সুব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভাগবত পুরাণ—অর্থাৎ দেবীভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতের মহাপুরাণত্ব সম্বন্ধে মতভেদের সমালোচনা এবং কাশী, বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার স্তোত্র (সানুবাদ)—শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি-কৃত। বিশালাক্ষ-পাঠশালা, ৮০ নং মিশিরপোখরা, বেনারাস সিটি হইতে শ্রীব্রজেশ্বর শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য আট আনা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি আকারের ৭০ পৃষ্ঠা গ্রন্থ।

এই গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইলাম। গ্রন্থকার ও প্রকাশককে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার আবশ্যক। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ ও পুরাণ-চক্রবর্ত্তী। সমগ্র ভারতবর্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের সমাদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল্ সাহেব তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—It exercises a more powerful influence in India than any other puranas.

শ্রীমদ্ভাগবতের ৬২ খানি টীকা পাওয়া যায়। প্রথম শ্লোকের একশত প্রকার অর্থ প্রচলিত আছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু, কোন কোন লোক দেবীভাগবতকেই প্রকৃত ভাগবত বলিয়া বিতণ্ডা করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার, বিরুদ্ধবাদিগণের যাবতীয় যুক্তি, নিরপেক্ষভাবে ও সুনিপুণভাবে খণ্ডিত করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এই গ্রন্থ পাঠ করা আবশ্যক, কারণ বিরুদ্ধবাদী সর্ব্বত্রই আছেন।

সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাই এই বিরুদ্ধবাদের হেতু। এই গ্রন্থপাঠে এই সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রভাব দূরীকৃত হইবে এবং সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে ভক্তিমান্, তাঁহারা চেষ্টা করুন, যাহাতে এই গ্রন্থখানির বহুল প্রচার হয়।

শ্রীরামকেলি ও শ্রীশ্রীরূপ সনাতন—শ্রীকৃষ্ণশশী গোস্বামী এম্, এ, বি, এল্ প্রণীত। মালদহ। ডবল ক্রাউন ষোল-পেজি আকারের প্রায় ৭০ পৃষ্ঠা পুস্তক, মূল্য ১৲ এক টাকা। মালদহ জেলার বরই গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ পোদ্দার মহাশয়ের ব্যয়ে গ্রন্থখানি ছাপা হইয়াছে। পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ রামকেলি তীর্থসংস্কার কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

এই গ্রন্থে, শ্রীশ্রীরূপ সনাতন-সম্বন্ধে অনেক উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, লেখাও ভাল। উপকরণগুলির শ্রেণীবিভাগ করিয়া ঐতিহাসিক প্রণালীতে সাজাইয়া লইলে ভাল হইত। যেমন বংশ-পরিচয়-প্রসঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামী ও ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ, তাহার পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রসঙ্গ ও ভক্তিরত্নাকরের প্রসঙ্গ। ভক্তমালগ্রন্থে 'মীরাবাই'এর সহিত যে সাক্ষাৎ হওয়ার কথা আছে, তাহার ঐতিহাসিকতার বিচার প্রয়োজন। স্থানীয় কিম্বদন্তীগুলিরও মূল্য আছে, গ্রন্থকার তাহারও কিছু কিছু দিয়াছেন। মোটকথা গ্রন্থখানি ভাল, গ্রন্থকার সদুদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন ও ছাপাইয়াছেন, তাঁহার শুভ সংকল্প সফল হউক। আমরা আশা করি, শীঘ্রই এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিতে পাইব। বাঙ্গালাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-তীর্থ—শ্রীরামকেলিধাম—প্রাচীন গৌড় নগরের অন্তর্বর্ত্তী, এখন মালদহ জেলার অন্তর্ভুক্ত। এই তীর্থে বড়ই জলের অভাব, যাত্রিগণের বড়ই কষ্ট হয়। রূপ-সাগর নামে একটি বৃহৎ জলাশয় আছে, তাহার সংস্কারের জন্য অর্থ সংগ্রহ হইতেছে। এই গ্রন্থের গ্রন্থকার, সমিতির সম্পাদক। এই গ্রন্থের আয়, তিনি ঐ সংকার্য্যে দান করিয়াছেন।

১৩৩২

শ্রীকৃষ্ণ কথার উদয়
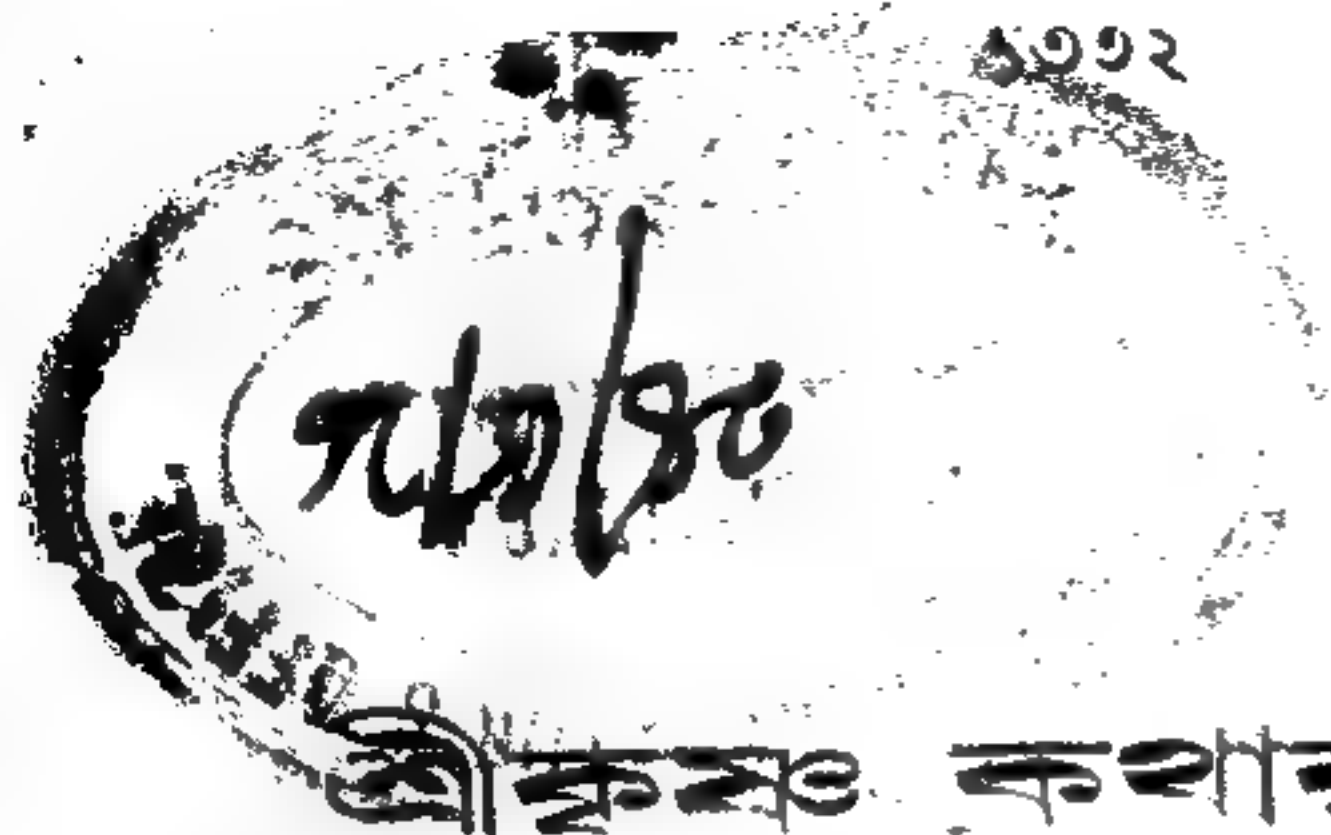
২ চিত্তরঞ্জনের গীতি-কবিতা
৩ বিবিধ প্রসঙ্গ ও গ্রন্থ সংবাদ

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

শ্রীকৃষ্ণকথার উদয়

দুইটি জিনিস আছে। একটির নাম অর্থ, আর একটির নাম পরমার্থ। একটি স্থূল, আর একটি সূক্ষ্ম। একটি অনিত্য, আর একটি নিত্য। দুই রকম বিদ্যা আছে। একটি অপরা, আর একটি পরা। যাহা স্থূল ও অনিত্য, যাহার নাম অর্থ, যে বিদ্যার দ্বারা তাহার জ্ঞান হয়, সেই বিদ্যার নাম অপরাবিদ্যা। আর সূক্ষ্ম ও নিত্য পরমার্থের জ্ঞান যে বিদ্যার দ্বারা হয়, তাহার নাম পরাবিদ্যা। এই পরাবিদ্যার অপর নাম ব্রহ্মবিদ্যা। আর শ্রীমদ্ভাগবত সেই ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যার গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রধান কথা শ্রীকৃষ্ণকথা; অন্যান্য কথা যাহা শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, তাহা এই শ্রীকৃষ্ণকথারই পুষ্টির জন্য। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকথা পরমার্থ-কথা, অর্থ-কথা নহে।

অর্থ-কথা কি? এই সংসারের সুখদুঃখের কথা, লাভক্ষতির কথা, রাজারাজ্‌ড়ার জন্মমৃত্যু যুদ্ধবিগ্রহের কথা, নদী পর্ব্বত সমুদ্রের কথা, দুর্ভিক্ষ মহামারীর কথা, রাজনীতি, সমাজনীতি, কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতির কথা। এই সব কথা শুনিলে ও ভাবিলে বুঝিতে পারা যায়।

পরমার্থ-কথা কি? আত্মার কথা, ঈশ্বরের কথা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূলকথা। একথা শুনিলে ও সাধারণভাবে ভাবিলে বুঝিতে পারা যায় না। আবার, মানুষের হৃদয়ের ও মনের এমন একটা অবস্থা আছে, যখন এই কথা আপনা আপনি হৃদয়ে উদয় হয়, না শুনিয়া ও না ভাবিয়া, আপনা আপনি বুঝিতে পারা যায়। সেইজন্যই বেদ বলিয়াছেন—ইহার শ্রোতাও আশ্চর্য্য, বক্তাও আশ্চর্য্য।

উচ্চাঙ্গের কবিতা কি শুনিলেই বুঝিতে পারা যায়? সকলেই কি সকল সময়ে সকল সৎকবিতার রসাস্বাদন করিতে পারে? ভাল গান কি সকলেই সকল সময়ে

উপভোগ করিতে পারে। একজন লোক এক সময়ে পারে, আবার আর এক সময়ে পারে না। অনেকে কখনই পারে না। অনেক বিদ্বান্ ব্যক্তি পারেন না, আবার অনেক মূর্খলোকেও পারে। ইহার কারণ কি?

হৃদয় একটি বিশেষ রকম অবস্থায় উপস্থিত হইলে, যেমন, সঙ্গীতের ও সৎকবিতার আস্বাদন হয়, সেইরূপ হৃদয়ের ও মনের একটি বিশেষরূপ অবস্থা হইলে, পরমার্থ কথার উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণকথা যখন পরমার্থকথা, তখন এই কথা সকল সময়ে সকলে বুঝিতে পারিবে না। হৃদয়ের একটি বিশেষরূপ অবস্থা হইলে শ্রীকৃষ্ণকথার উদয় হইবে।

প্রত্যেক মানুষের যেমন হৃদয় আছে, মন আছে, তেমনি সমাজেরও হৃদয় আছে, মন আছে। ইংরাজীতে বলে Racial Soul, Social Mind, Social Conciousness। একদিন ভারতবর্ষের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকথার উদয় হইয়াছিল, সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতবর্ষ এই শ্রীকৃষ্ণকথাকে সর্ব্বোত্তম কথা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, মধুরতম কথা বলিয়া উপভোগ করিয়াছেন। এখনও উপভোগ করেন।

মানুষ যেমন তাহার জীবনে নানারূপ ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিতেছে, নানারূপ সুখদুঃখ ও জয়পরাজয়ের মধ্যে প্রতিনিয়ত নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছে, সমাজ বা জাতিও সেইরূপ ঘাত প্রতিঘাত, সুখদুঃখ ও জয়পরাজয়ের মধ্য দিয়া নব নব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি লাভ করিতেছে। প্রত্যেক মানুষের বা ব্যষ্টির যেমন স্মৃতিশক্তি আছে, তেমনি একটি সমাজেরও স্মৃতিশক্তি আছে। ইহাকে ইংরাজীতে বলে Racial Memory। ভারতবর্ষের জ্ঞানে, অনুভূতিতে ও আস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণকথা কি প্রকারে উদিত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধে তাহা বলিয়াছেন। নৈমিষারণ্যে সমবেত শৌণকাদি মহর্ষিগণের প্রশ্নের উত্তরে উগ্রশ্রবা-সূত বলিলেন—

পরীক্ষিতোঽথ রাজর্ষের্জন্মকর্ম্মবিলাপনং।
সংস্থাঞ্চ পাণ্ডুপুত্রাণাং বক্ষ্যে কৃষ্ণকথোদয়ং॥

রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্ম, কর্ম্ম ও মৃত্যুর বিবরণ, আর পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান, বর্ণনা করিতেছি। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকথাসমূহের উদয় হইবে।

এই শ্লোকটি, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোক। এই শ্লোকের পর হইতে প্রথম স্কন্ধের শেষ, অর্থাৎ মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেবের

আগমন পর্য্যন্ত, যাহা কিছু কথিত হইয়াছে, সেগুলিকে শ্রীকৃষ্ণকথার উদয়কারক কথা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এই কথাগুলি কি, সংক্ষেপে তাহাই আলোচনা করা যাউক।

কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশান। যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। দুর্য্যোধনের উরুদণ্ড ভগ্ন, তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন। দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা রাত্রিকালে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিয়া আনিলেন। অশ্বত্থামা ভাবিয়াছিলেন ইহাতে দুর্য্যোধন প্রীত হইবেন; কিন্তু দুর্য্যোধন প্রীত হইলেন না, অপ্রীত হইলেন। সুতরাং দুর্য্যোধনেরও কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এ অবস্থায় পরিবর্ত্তন না হইয়াই পারে না। যুদ্ধের পরিণাম দেখিলেন, তিনি এখন মৃত্যুপথের পথিক, সুতরাং পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী।

দ্রৌপদী কাঁদিতেছেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, আমি অশ্বত্থামার মস্তক ছিন্ন করিয়া আনিতেছি, তুমি সেই মস্তকের উপর দাঁড়াইয়া স্নান করিও, তোমার শোক দূর হইবে। ক্ষত্রিয়দিগের শোক নিবারণের ইহাই সাধারণ ব্যবস্থা।

অশ্বত্থামা পলাইতেছেন, আর অর্জ্জুন তাঁহাকে ধরিবার জন্য পশ্চাতে ছুটিয়াছেন। নিরুপায় অশ্বত্থামার এক ব্রহ্মাস্ত্র ছিল, তিনি তাহার উপসংহার জানিতেন না। প্রাণভয়ে অশ্বত্থামা সেই ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে অর্জ্জুনও ভীত। তিনি সভয়বচনে শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানামভয়ঙ্কর।
ত্বমেকো দহ্যমানানামপবর্গোঽসি সংসৃতেঃ॥
ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥
স এব জীবলোকস্য মায়ামোহিতচেতসঃ।
বিধৎসে স্বেন বীর্য্যেণ শ্রেয়ো ধর্ম্মাদিলক্ষণং॥
তথায়ঞ্চাবতারস্তে ভুবো ভারজিহীর্ষয়া।
স্বানাঞ্চানন্যভাবানামনুধ্যানায় চাসকৃৎ॥
কিমিদং স্বিৎ কুতো বেতি দেবদেব ন বেদ্ম্যহং।
সর্ব্বতো মুখমায়াতি তেজঃ পরমদারুণং॥

একমাত্র তুমিই তাহাদের ক্লেশনাশক। তুমি আদ্যপুরুষ, তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তুমি প্রকৃতির নিয়ন্তা, অথচ নিজের চৈতন্যশক্তির দ্বারা মায়াকে পরাজিত করিয়া স্বরূপের পরমানন্দে সর্ব্বদা বিরাজমান। তুমি স্বয়ং মায়াজয়ী, অথচ নীজের বিক্রমের দ্বারা মায়া-মুগ্ধ জীবসকলের ধর্ম্মাদি বিধান কর। পৃথিবীর ভারহরণের জন্যই তোমার এই অবতার। যাঁহারা তোমার বন্ধু ও ভক্ত, তাঁহারা তোমার কর্ম্মসমূহ পুনঃ পুনঃ স্মরণ ও আলোচনা করিয়া কৃতার্থ হইবে বলিয়াই তুমি লীলায় প্রকট হইয়াছ। হে দেবদেব কৃষ্ণ, এই তেজঃ অতি ভয়ঙ্কর, দশদিক্ ব্যাপ্ত করিয়া ইহা আসিতেছে ; ইহা কোথা হইতে আসিতেছে, কি প্রকারে ইহার জন্ম হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বলুন, ইহা কি ?

শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে এই ব্রহ্মাস্ত্রের তত্ত্ব বলিয়া দিলেন, এবং কি প্রকারে ইহা নিবারিত হইবে, তাহাও বলিয়া দিলেন। অর্জ্জুনের ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র নিবারিত হইল।

এই প্রসঙ্গে চিন্তা করিয়া কতকগুলি বিষয় অনুভব করিতে হইবে। সেই বিষয়-গুলির মধ্যে অর্জ্জুনের অভিজ্ঞতাই প্রধান বিষয়। ঘটনাকে ঘটনারূপে গ্রহণ করিয়া, একটি ঘটনার সহিত অপর ঘটনার তুলনা করা, ও তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করা এক প্রকারের চিন্তাপ্রণালী। কিন্তু ইহাই একমাত্র চিন্তাপ্রণালী নহে। ঘটনার দ্বারা দ্রষ্টা বা অনুভবকর্ত্তার হৃদয়ে ভাবের উদ্ভব হয়। ভাবাভিভূত ও ভাবজাগ্রত হৃদয় আরও কত কি নব সত্য দেখিতে পায়। সাধারণ-দৃষ্টি যেখানে কোন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ দেখেনা, ভাবজাগ্রত হৃদয় সেখানে অতিশয় সুস্পষ্টরূপেই অনুভব করে, যে অতি সুন্দর কার্য্য-কারণশৃঙ্খলা রহিয়াছে। এই যে 'অনুভব', ইহা একটা ক্ষণস্থায়ী খেয়াল নহে, ইহা প্রজ্ঞান (Intuition)। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান অপেক্ষা ইহা উন্নততর, গভীরতর, সূক্ষ্মতর ও অধিক-তর সত্যোপেত। সাধারণ দৃষ্টি যেখানে কেবল বিচ্ছিন্নতা দেখে, শৃঙ্খলাহীন অন্ধ জড়-শক্তির যথেচ্ছাচার দেখে, এই দৃষ্টি অর্থাৎ 'প্রজ্ঞান', সেখানে শৃঙ্খলা, জ্ঞান ও সজ্ঞানভাবে প্রযোজিত ইচ্ছাশক্তির (Self-Conscious will) ক্রিয়া দেখে। অর্জ্জুনের সেই দৃষ্টি বিকশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জীবনের অধিকাংশ সময়, বিশেষতঃ সুকঠোর

সমাকীর্ণ কর্ম্মের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে, প্রলয়ের ঝটিকাবর্ত্তে বিঘূর্ণিত হইতে হইয়াছে, মহাসিন্ধুর তুঙ্গতরঙ্গের মাথায় মাথায় নাচিতে হইয়াছে, মহাশ্মশানের মৃত্যুলীলার ভৈরব সঙ্গীতে ছুটিতে হইয়াছে। কোথায় জীবন কোথায় মরণ, কোনরূপ হিসাব করিবার সময়ও ছিল না, অবসরও ছিল না! সেই অর্জ্জুন, দ্বাপরযুগের মহাবীর,—কুরুক্ষেত্রের বিজয়মুকুটধারী।

পুরাণ বুঝিতে হইলে 'ভাবুক' হওয়া চাই। পূর্ব্বাপর সমুদয় ঘটনা হৃদয়ের মধ্যে ভাবরূপে জাগ্রতভাবে ক্রিয়া না করিলে, পুরাণের রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। পাণ্ডবগণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে কি ভাব জাগিত, আর পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপ চক্ষুতে দেখিতেন ও শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাঁহাদের হৃদয়ে নিরন্তর কি ভাব জাগরিত হইত, তাহার সহিত যাহার পরিচয় নাই, তাহার পক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা একেবারেই নিষ্ফল।

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভা মনে পড়িতেছে। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়া রাজন্য-বৃন্দের মহতী সভায় অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন। কি আপদ, একজন ভিক্ষুক নৃপতি-গণের প্রাপ্য রাজকুমারীকে গ্রহণ করিবে! ইহা হইতেই পারে না। রাজন্যগণ সমবেত-ভাবে অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত। তিনি সেখানে, গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নহেন। তিনি সুপরিচিত মহাবীর। কংস, নরকাসুর কালযবন, বাণাসুর প্রভৃতিকে তিনি বধ করিয়াছেন; সত্যভামা, রুক্মিণী প্রভৃতি রাজনন্দিনীকে তিনি বিবাহ করিয়াছেন, দ্বারকায় রাজধানী করিয়া বিশাল রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, তিনি যদুবংশসম্ভূত, বলরাম প্রভৃতি সুবিখ্যাত বীরগণ তাঁহার সহায়। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করিলে যুদ্ধ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিলেন না। নৃপতিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন —নৃপতিগণ যুদ্ধে ক্ষান্ত হউন, ঐ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণই ধর্ম্মতঃ রাজকুমারীকে পাইয়াছেন।

স্বয়ংবর-সভার যুদ্ধ মিটিল। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গোপনে ভার্গবকর্ম্মশালায় ভিক্ষুক-বেশী পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয়, কিন্তু পূর্ব্বে সাক্ষাৎভাবে পরিচয় ছিল না। এইবার পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

দ্রৌপদী-বিবাহের পর পাণ্ডবগণের ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন ও রাজ্যলাভ। তাহার পর অর্জ্জুনের দ্বাদশ-বর্ষ বনবাস, দ্বারকাগমন ও সুভদ্রা-হরণ। শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনের ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বাড়িতেছে। এইবার খাণ্ডবদাহে কৃষ্ণার্জ্জুনের মিলন। জরাসন্ধ-বধ,

রাজসূয়-যজ্ঞের আয়োজন, শিশুপাল-বধ। ইহার পর পাশাখেলা, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, পাণ্ডবের বনবাস। প্রত্যেক ঘটনা হৃদয় দিয়া বুঝিতে হইবে, পাণ্ডবের হৃদয় ও শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় কি প্রকার ভাবের দ্বারা পরস্পর পরস্পরের অভিমুখী, তাহা বুঝিতে হইবে। অর্জ্জুনের হৃদয়ের পরিচয় না পাইলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যাইবে না। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রধান ও প্রথম শিক্ষা এই যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, আর ভক্তহৃদয় বা ভক্তের অনভূতি The consciousness of the Devotees, তাঁহারা সেই স্বয়ং-ভগবত্তার সাক্ষী (is the testimony thereof)। অর্জ্জুনের অনুভূতির মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিবেন না, শ্রীকৃষ্ণের লীলার একটা দিক্ বুঝিতে পারা যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন—এই দিক্ দিয়া বুঝিতে আরম্ভ কর, হৃদয় মার্জ্জিত হউক, অনুভবশক্তির অনুশীলন হউক, ক্রমশঃ অন্যান্য ভক্তের অনুভূতি হইবে, অন্যান্য ভক্ত যাহা বুঝিয়াছেন ও দেখিয়াছেন, তুমিও তাহা বুঝিবে ও দেখিবে।

পাণ্ডবেরা যখন বনবাসী তখন যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ সন্ধি-স্থাপনের চেষ্টা করিলেন, নিজে দূত হইয়া হস্তিনায় গেলেন। কিছুই হইল না। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হইল, ভারতের ক্ষাত্রশক্তি ধ্বংস হইল। অর্জ্জুনের রথে সারথী হইয়া, নিজে নিরস্ত্র থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণই 'অকর্ম্মা ও সর্ব্বকর্ম্মা'। এই সব ব্যাপারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কে ও শ্রীকৃষ্ণ কি করিলেন—ইহাই প্রশ্ন। রাজসূয়-যজ্ঞের সময় শিশুপাল তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে তিনি নিহত হইলেন, তাঁহার নিধনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মন্তব্যও মিথ্যা হইয়া গেল। দুর্য্যোধনের যাহা বলিবার ছিল, তাহা আজ আর নাই। দুর্য্যোধনও কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন, সেকথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন সাক্ষী কে? কে বলিয়া দিবে, শ্রীকৃষ্ণ কে? উত্তর হইল—অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন। আসুন, আমরা ভক্ত অর্জ্জুনের হৃদয়ভাবের দ্বারা ভাবিত হইয়া তাঁহার কথা শুনি, তাঁহার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার গভীর ও অপূর্ব্ব রাজ্যে প্রবেশ করি। অর্জ্জুনের কথা আমরা দুইবার শুনিতে পাইব। প্রথমবার শুনিলাম। তাহাতে বুঝিলাম, যদিও অর্জ্জুনের তুল্য বীর নাই, যদিও অর্জ্জুন পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়াছেন, বীরত্বের পুরস্কার-স্বরূপে স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন লাভ করিয়াছেন, তথাপি অর্জ্জুন

এই অর্জ্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র, ইনিই অতীতকালের 'নর' নামক 'ঋষি'। ইহাই তাঁহার পরিচয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আত্মীয় ও বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়া সুদীর্ঘকাল তাঁহার সঙ্গ করিয়াছেন, আজ তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভিতরে একজন 'মহামানব' দেখিতেছেন না, দেখিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ আদ্যপুরুষ, শ্রীকৃষ্ণই বিশ্বের রক্ষক ও পালক। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের কার্য্য এই মর্ত্ত্যলোকে অভিনীত হইয়াছে, কিন্তু অর্জ্জুন এখন আর শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যাবলীকে মর্ত্ত্যলোকের সাধারণ ঘটনা বলিয়া ভাবিতেছেন না, শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যাবলীতে তিনি ঈশ্বরের লীলা (God's way to the world of man) দেখিতেছেন। অর্জ্জুনের অভিজ্ঞতাই ইহার প্রমাণ।

দুষ্কৃতকারী অশ্বত্থামা বন্দী হইয়া অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর নিকট আনীত হইলেন। কিন্তু দ্রৌপদীর হৃদয়ও এখন পরিবর্ত্তিত, তাঁহার হৃদয়ে প্রতিহিংসাবৃত্তির স্থান নাই। অশ্বত্থামাকে দেখিয়া দ্রৌপদী তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অশ্বত্থামার বন্ধনদশা দেখিয়া তাঁহার অতিশয় দুঃখ হইল। তিনি সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন—

মুচ্যতাং মুচ্যতামেষ ব্রাহ্মণো নিতরাং গুরুঃ।

ইনি ব্রাহ্মণ, আমাদের গুরু, ইহাকে মোচন করুন, মোচন করুন।

সরহস্যো ধনুর্বেদঃ সবিসর্গোপসংযমঃ।
অস্ত্রগ্রামশ্চ ভবতা শিক্ষিতো যদনুগ্রহাৎ॥
স এষ ভগবান্ দ্রোণঃ প্রজারূপেণ বর্ত্ততে।
তস্যাত্মনোঽর্দ্ধং পত্ন্যাস্তে নান্বগাদ্বীরসূঃ কৃপী॥
তদ্ধর্ম্মজ্ঞ মহাভাগ ভবদ্ভির্গৌরবং কুলং।
বৃজিনং নার্হতি প্রাপ্তুং পূজ্যং বন্দ্যমভীক্ষ্ণশঃ॥
মা রোদীদস্য জননী গৌতমী পতিদেবতা।
যথাহং মৃতবৎসার্ত্তা রোদিম্যশ্রুমুখী মুহুঃ॥
যৈঃ কোপিতং ব্রহ্মকুলং রাজন্যৈরজিতাত্মভিঃ।
তৎকুলং প্রদহত্যাশু সানুবন্ধং শুচার্পিতং॥

দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে বলিলেন,—আপনি দ্রোণাচার্য্যের অনুগ্রহে ধনুর্বেদ ও তাহার গোপনী মন্ত্র, অস্ত্রসমূহ, তাহাদের প্রয়োগ ও উপসংহার শিক্ষা করিয়াছেন। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" এই অশ্বত্থামা দ্রোণাচার্য্যের পুত্র, ইঁহার মধ্যে ভগবান দ্রোণাচার্য্যই প্রজারূপে বর্ত্তমান।

দ্রোণাচার্য্যের দেহার্দ্ধস্বরূপিণী পত্নী কৃপীও জীবিত আছেন। গুরুপত্নী বীরপ্রসবিনী, এই কারণে স্বামীর অনুগমন করেন নাই। হে ধর্ম্মজ্ঞ, হে মহাভাগ, গুরুকুল সর্ব্বদাই পূজ্য ও বন্দনীয়, তাঁহাদের দুঃখিত করা আপনাদের উচিত নহে। আমার পুত্রগুলি নিহত হইয়াছে, আমি পুত্রশোকে কাতর হইয়া সর্ব্বদা কাঁদিতেছি ও চোখের জলে ভাসিতেছি, পতিব্রতা আচার্য্যপত্নী কৃপী যেন সেরূপ রোদন না করেন। তাহার পর, ব্রহ্মহিংসা অতি ভয়ানক, যে সকল অজিতাত্মা (রিপুপরবশ) ক্ষত্রিয় ব্রহ্মকুলের কোপ উৎপাদন করেন, তাঁহাদিগকে শোকাকুল হইয়া সবংশে দগ্ধ হইতে হয়।

দ্রৌপদীর কথা ছয়টি শ্লোকে কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রত্যেক শ্লোকের তাৎপর্য্য গভীররূপে চিন্তা করিয়া আস্বাদন করিতে হইবে। উদ্ধৃত ছয়টি শ্লোকের পর পর ছয়টি লক্ষণ। ধর্ম্ম্য, ন্যায্য, সকরুণ, নির্ব্ব্যলীক, সম ও মহৎ। 'নির্ব্ব্যলীক' কথার অর্থ অহিংস বা অপীড়াদায়ক।

মহাভারতের বনপর্ব্বের সপ্তবিংশতি অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই স্থানের বর্ণনার সহিত মহাভারতের ঐ স্থানটি তুলনা করা আবশ্যক। সেখানে দ্রৌপদী মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে নিজেদের দুর্দ্দশা ও কৌরবগণের দুরাত্মতা স্মরণ করাইয়া তেজঃ প্রকাশের জন্য উপদেশ দিয়াছেন। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—"যে ক্ষত্রিয় সমুচিত সময়ে তেজঃ প্রদর্শন না করে, সে সমুদয় লোকের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হয়; অতএব শত্রুগণের প্রতি ক্ষমা করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে, এক্ষণে তেজঃ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করাই উচিত কর্ম্ম, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সময়বিশেষে ক্ষমাও অবলম্বন করিতে হইবে, কেননা, যে ক্ষত্রিয় ক্ষমাকালে ক্ষমাবলম্বন না করেন, তিনি সর্ব্বভূতের অপ্রিয় হইয়া ইহকালে ও পরকালে বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন।" এই স্থলে দ্রৌপদী ক্ষমাশীলতা ও ক্ষমা-হীনতা উভয়েরই দোষ দেখাইয়া প্রহ্লাদের উপদেশ বলিয়া কোন্ কোন্ স্থলে ক্ষমা করা উচিত, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। "যে ব্যক্তি তোমার বহুবিধ উপকার সাধন করিয়া পরে কোন গুরুতর অপরাধে পতিত হয়, তাহার উপকার করিয়া সেই অপরাধ মার্জ্জনা করা উচিত। যে ব্যক্তি অজ্ঞান-বশতঃ অন্যের নিকট অপরাধী হয়, তাহাকে ক্ষমা করা বিধেয়; কারণ, সকলে শ্রেয়স্করী বুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু, যাহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক অপরাধ

করিয়া তাহার অপলাপে প্রবৃত্ত হয়, অপকার অল্প হইলেও সেই সকল পাপাত্মা কুটিল লোকদিগকে সংহার করিবে। প্রথমাপরাধে সকল প্রাণীকেই ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু দ্বিতীয়াপরাধ অনুমাত্র হইলেও অপরাধীকে বধ্য বলিয়া স্থির করিবে; যদি কেহ অজ্ঞানবশতঃ কোন প্রকার অপরাধ করে, তাহা উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া তাহাকে ক্ষমা করা বিধেয়।"

দ্রৌপদী মহাভারতের এই স্থলে ক্ষমার মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু সেখানে যে নীতি (standard of judgement) দিয়াছেন, তাহাতে অশ্বত্থামাকে ক্ষমা করা যায় কিনা, তাহা বেশ বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। আসল কথা, এই সব ব্যাপারে কোন বাহ্য ধ্রুব নীতি নাই (No absolute outer standard)। এই বিচারণা, হৃদয়ের অবস্থার উপর নির্ভর করে (depends on the condition of the heart)। পণ্ডিতেরা বলিবেন, মানবচৈতন্যের বিকাশের স্তরের উপর নির্ভর করে—varies with stage of the unfolding consciousness।

মোটের উপর বলিতে হইবে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরেই যুগান্তরের সূচনা হইয়াছে। এই যুগ অবশ্য কলিযুগ এবং আমরা সকলেই জানি কলিযুগ অধঃপতনের যুগ। কিন্তু প্রকৃত কথা, অবিমিশ্র অধঃপতনের যুগ নহে। অন্ততঃপক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত তাহা বলেন না। যুগের পরিবর্ত্তন কেবল বাহ্য ব্যাপারের দ্বারা হয় না। যুগপরিবর্ত্তনের প্রথম কথা একটি ভাবের আবির্ভাব, ইহা একটি মানস ব্যাপার; তাহার পর সংগ্রাম ও সংঘর্ষ, ইহা বাহ্য ব্যাপার। তাহার পর ভাবের বিজয়। তাহার পরই যুগপরিবর্ত্তন। কুরুক্ষেত্রের মহা-যুদ্ধের পর একটি নবভাবের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা আমরা দেখিতেছি, শ্রীমদ্ভাগবত ইহাই দেখাইতেছেন The truiumph of a new ideal. দ্রৌপদীর কথাগুলি তুলনামূলক পদ্ধতিতে এইভাবে বুঝিতে হইবে।

ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর কথার অনুমোদন করিলেন। নকুল, সহদেব, সাত্যকি, অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য নরনারী সকলেই ইহার অনুমোদন করিলেন। এক-মাত্র ভীম অনুমোদন করিলেন না। ভীম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—এই দুরাত্মাকে বধ করাই শ্রেয়ঃ। ইহার কারণ, ইহাকে বধ করিলে এ ব্যক্তি নরক হইতে পরিত্রাণ

হইয়াছিল, এস্থলে তাহাও স্মরণীয়। সেখানে দেখিতে পাই, ভীম পরিপূর্ণরূপে ত্রিবর্গের উপাসক। তিনি বলিয়াছিলেন—"যে ব্যক্তি কেবল ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্মোপার্জ্জন করে, সে অশেষ ক্লেশভাগী হয়। * * মোক্ষ, গৃহীর পক্ষে আতুর ব্যক্তির জীবনের ন্যায় নিরন্তর দুঃখদায়ক। * * রাজ্যলাভের জন্য উৎকোচপ্রদান ও ভেদোৎপাদন নিন্দনীয় নহে। দেবতারাও অসুরদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। * * * কৌশলে শত্রুগণের প্রাণসংহার করুন।" এখানে, অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে, ভীম অশ্বত্থামাকে বিনাশ করিতে চাহেন অশ্বত্থামার পারলৌকিক কল্যাণের জন্য। ভীমও অবশ্য কিছু পরিবর্ত্তিত।

এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ কি করিলেন, তাহা বুঝিলেই শ্রীকৃষ্ণ কে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের অর্থবোধ হইবে। প্রাচীন ভারতে দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন ও লীলা করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সমসাময়িক, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বপক্ষীয় বা বিপক্ষীয় ছিলেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িকগণের মধ্যে আজও আমরা যাঁহাদের পরিচয় পাই, তাঁহারা কেহই নিতান্ত সামান্য লোক নহেন, অধিকাংশ লোকই অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন। এই সব লোক শ্রীকৃষ্ণকে জানিয়াছিলেন। প্রত্যেকেই যে ঠিক্ একরূপ ধারণা-সম্পন্ন ছিলেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ঠিক্ একরূপ ধারণা পোষণ করিতেন, তাহা নহে। একদিকে কংস শিশুপাল, জরাসন্ধ বা দুর্য্যোধন অনেকটা একরূপ ধারণা করিয়াছিলেন, আর একদিকে ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, ভীমার্জ্জুন, এক রকমের ধারণা করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ একটি ঘটনা—যুগান্তরকারী অতি-ভয়ানক ঘটনা। এই ঘটনায় বিশ্বস্রষ্টার বিশ্বনাট্যের এক অঙ্কের যবনিকা-পাত হইল, নূতন অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইবে। বিশ্বব্যবস্থার সাধনাস্রোত যে সমুদয় খাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, তাহার অনেক খাত পরিত্যক্ত হইবে, আবার অনেক নূতন খাত আবিষ্কৃত হইবে। জীবনের আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইল, মানবের অনুভূতি ও চিন্তা বদলাইয়া গেল। এই পরিবর্ত্তনের নাম যুগান্তর। এই যুগান্তরের মুখে, এই যুগান্তরে বিভিন্নমুখী শক্তি, চিন্তা ও চেষ্টাধারাকে নিজের জীবনে ও সাধনায় যিনি কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ ; অথবা প্রাচীন ভারতের ঋষি এই সমুদয় শক্তি, চিন্তা

ইংরাজী ভাষায় বলিলে কথাটা এইরূপ দাঁড়ায়। Human history is a confluence of many streams, bringing together conflicting cults and cultures, conflicting national values and ideals ; and those who can find peaceful solutions of these problems of conflict are the true heroes of latter-day Humanity. They are men who blend and fuse diverse lives in their own personal type. Such are the heroes of peace, heroes of synthesis and conciliation. এই সিদ্ধান্তটি মনে রাখিলে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার একদিক বুঝিতে পারা যাইবে।

এইবার অশ্বত্থামার কি হইল দেখা যাউক। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ, দ্রৌপদী ও ভীম, উভয়ের কথা শুনিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ। শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন, 'চতুর্ভুজ' বলার ভাব এই—ভীম অশ্বত্থামাকে বধ করিতে উদ্যত, আর দ্রৌপদী তাহা নিবারণ করিতে উদ্যত, উভয়কে সম্বরণ করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ যেন চতুর্ভুজ ধারণ করিলেন। তাহার পর তিনি হাসিতে হাসিতে অর্জ্জুনের মুখের প্রতি চাহিলেন ও বলিলেন—'সখে, অদ্য তোমার বুদ্ধির সূক্ষ্মতার পরীক্ষা করিব' (বিশ্বনাথ)। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—"ব্রাহ্মণ অধম হইলেও বধ-যোগ্য নহে, এই এক নীতি। আততায়ীকে বধ করিবে, এই আর এক নীতি। তুমি দ্রৌপদীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছ,—'তোমার পুত্র-হন্তার শিরশ্ছেদ করিয়া আনিব', তাহার পর ভীমের আকাঙ্ক্ষা, এই অবস্থায় তুমি কি করিবে কর।"

অর্জ্জুন খড়্গের দ্বারা অশ্বত্থামার মূর্দ্ধজ কেশ-সহিত মস্তকের মণিচ্ছেদন করিলেন। তাহার পর বন্ধন মোচন করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। এই কার্য্যের দ্বারা সকল দিক্ রক্ষিত হইল।

> বপনং দ্রবিণাদানং স্থানান্নির্যাপণং তথা।
> এষ হি ব্রহ্মবন্ধূনাং বধো নান্যোঽস্তি দৈহিকঃ॥

শিরোমুণ্ডন, ধনগ্রহণ, স্বস্থান হইতে নির্ব্বাসন, ইহার দ্বারাই ব্রহ্মবন্ধুগণের দণ্ড হয়, অন্য-রূপ দৈহিক দণ্ড নাই।

[মহাভারতের সৌপ্তিকপর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত ঘটনা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা অতিশয় সংক্ষিপ্ত। উভয় বর্ণনায় অনেক প্রভেদ। ভাবেরও প্রভেদ, ঘটনারও প্রভেদ। স্বর্গীয় মনীষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহাভারতের প্রাচীনতম স্তর নির্দ্ধারণের জন্য যে কয়েকটি পরীক্ষার প্রয়োগ আবশ্যক বলিয়াছেন, তাহার একটিমাত্র প্রয়োগ করিলে, মহাভারতের সৌপ্তিকপর্ব্ব এখন যে আকারে রহিয়াছে, তাহা প্রাচীনতম মূল মহাভারতের অন্তর্গত নহে বলিয়াই মনে হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীমদ্ভাগবতের মতে অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নিধন, মুমূর্ষু দুর্য্যোধন অনুমোদন করেন নাই। মহাভারত বা বর্ত্তমান মহাভারত তাহা বলেন না। দ্রৌপদীর চরিত্রে শ্রীমদ্ভাগবত যে করুণা, কৃতজ্ঞতা ও মহত্ব দেখইয়াছেন, এই প্রসঙ্গে বর্ত্তমান মহাভারতও তাহা দেখান নাই। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতেরই পক্ষপাতী। তবে, মহাভারতের সহিত ও অন্যান্য পুরাণের সহিত তুলনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা আবশ্যক বলিয়াই, এই কথার উল্লেখ করিলাম।]

অশ্বত্থামার দণ্ডের পর পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সহিত মৃত জ্ঞাতিগণের শবদাহনাদি ক্রিয়া করিলেন।

ইহার পর, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক ও তিনটি অশ্বমেধ-যজ্ঞ। এইবার শ্রীকৃষ্ণ বিদায় গ্রহণ করিবেন। সাত্যকি ও উদ্ধবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ, রথে আরোহণ করিতে উদ্যত, এমন সময়ে অভিমন্যুর বিধবা পত্নী উত্তরা ভয়বিহ্বলা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—

পাহি পাহি মহাযোগিন্ দেবদেব জগৎপতে।
নান্যং ত্বদভয়ং পশ্যে যত্র মৃত্যুঃ পরস্পরং॥
অভিদ্রবতি মামীশ শরস্তপ্তায়সো বিভো।
কামং দহতু মাং নাথ মা মে গর্ভো নিপাত্যতাং॥

হে মহাযোগিন্, হে দেবদেব, হে জগৎপতে, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আপনি ব্যতীত আর অভয়ের স্থান নাই, আপনি-ব্যতীত প্রার্থনা করিবারও কেহ নাই। এই সংসার মৃত্যুময়, সংসারে পরস্পর পরস্পরের মৃত্যুর হেতু। উত্তপ্ত শল্যযুক্ত শর সবেগে আমার অভিমুখে আসিতেছে। হে নাথ, এই শর আমাকে দগ্ধ করুক তাহাতে ক্ষতি নাই। আমার এই গর্ভ যেন নিপতিত না হয়।

অর্জ্জুনের অভিজ্ঞতা ও সাক্ষ্যের পরেই উত্তরার অভিজ্ঞতা, নির্ভরতা ও সাক্ষ্য। অর্জ্জুন মহাবীর, জ্ঞানী, ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালনকারী, দুঃখদুর্দ্দশা ও সুকঠোর পরীক্ষা সমূহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সাহচর্য্য পাইয়াছেন, উপদেশ পাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনের সুকঠোর তপস্যা ও সাধনার ধন। কিন্তু উত্তরা, রাজনন্দিনী রাজবধূ, বালবিধবা, স্বামীপ্রেমবঞ্চিতা, শাস্ত্রজ্ঞানহীনা, তবে পাণ্ডবের কুললক্ষ্মী, এই জন্যই সৌভাগ্যবতী। উত্তরা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কি জানেন ? উত্তরা জানেন, অসংশয়িতরূপেই জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া বিপদে রক্ষা করিবার আর কেহই নাই। ভারতবর্ষে সাধুর কুলে যাঁহার জন্ম হইয়াছে, তিনি স্ত্রীলোকই হউন আর পুরুষই হউন, জীবন, জগৎ ও ঈশ্বর-সম্বন্ধে কতকগুলি চিন্তা ও ধারণা (Idea, Conception) তাঁহার ভিতরে থাকে। বিপদের সময় নিরুপায় মানুষ ঈশ্বরের শরণাগত হয়। উত্তরার ঈশ্বর-জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতীত আর কিছু জানেন না। উত্তরা জানেন—শ্রীকৃষ্ণই জগৎপতি। ঈশ্বর নিরাকার কি সাকার, চিদাকার কি স্থূলাকার, সে সব বিচার হয়ত একদিন উত্তরার ছিল। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, প্রাণস্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, সত্যস্বরূপ, তাহাও যে উত্তরা শোনেন নাই তাহা নহে। কিন্তু উত্তরার সরলহৃদয় সেই সর্ব্বস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যানযোগে হৃৎপদ্মে বা কোন সুদূর গোলকবৈকুণ্ঠে দেখিতেছে না, এই প্রত্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণই সেই জগৎপতি, বিপদবারণ, সর্ব্বশক্তিমান্। শ্রীকৃষ্ণ কি, তাহাতো আমরা জানি না, আমরা কেবল উত্তরার এই অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি, এই বিশ্বাস ও নির্ভরভাব, জানি। আমাদের নিকট এই অনুভূতিই প্রথম ও প্রধান সত্য। Not God but the realization of God ; Not God but the Idea of God. প্রথমে ভক্ত-হৃদয়, তাহার পর ভগবান্। ভক্তহৃদয়ের সত্যতার উপরেই ভগবানের সত্তা, জ্ঞান, আনন্দ, আস্বাদন ও লীলা। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রবেশ করিবার ইহাই একমাত্র পথ।

"আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।"

উত্তরার এরূপ অবস্থার কারণ শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন। অশ্বত্থামা ব্রহ্মাণ্ডকে পাণ্ডব-শূন্য করিবার জন্য অস্ত্রত্যাগ করিয়াছে। [বর্ত্তমান মহাভারতের উপখ্যানের সহিত কিঞ্চিৎ বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীমদ্ভাগবত পড়িলে মনে হয়, অশ্বত্থামা দুইবার অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতে পাওয়া যায় সেই প্রথমবারের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রই

উত্তরার গর্ভ আক্রমণ করে। অশ্বত্থামা শ্রীকৃষ্ণকে ভয় দেখাইয়াছিলেন যে, তাঁহার (অশ্বত্থামার) ব্রহ্মশির অস্ত্রের দ্বারা উত্তরার গর্ভ আক্রান্ত হইবে ও বিনষ্ট হইবে। শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামাকে বলিয়া ছিলেন, গর্ভ আক্রান্ত হইবে কিন্তু বিনষ্ট হইবে না। তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) সেই গর্ভ রক্ষা করিবেন, আর সেই গর্ভে কুলতিলক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে।] অশ্বত্থামার অস্ত্র হইতে পাণ্ডবগণকে রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শন চক্র প্রয়োগ করিতে হইল। আর উত্তরার গর্ভরক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে উত্তরার শরীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া, নিজের মায়ার দ্বারা উত্তরার গর্ভ আবৃত করিয়া রাখিলেন।

ইহার পরেই কুন্তীদেবীর স্তব। অর্জ্জুন ও উত্তরার অভিজ্ঞতার পরেই কুন্তীদেবীর অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি। কুন্তীদেবীর স্তব আমরা পূর্ব্বে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিয়াছি। কেবল একটি কথা বলা আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌, সুতরাং তিনি নিজে নিজের জ্ঞাতা। তাঁহাকে সকলেই জানে এবং কেহই জানে না; যে যত জানে, সে তত জানে না। অসংখ্য ভক্ত, ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অবস্থিত। যাঁহার যেমন অধিকার, তিনি তেমন জানেন। সুতরাং ভাল করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, অর্জ্জুন, উত্তরা কুন্তীদেবী প্রভৃতি কে কতখানি জানেন। কুন্তীদেবীর স্তবে দেখা যায়, তিনি শ্রীকৃষ্ণের যশোদাদুলালত্ব পর্য্যন্ত জানিতেন বা পাইয়াছিলেন।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া দেবব্রত ভীষ্মদেব যেখানে শরশয্যায় শায়িত আছেন, সেখানে গমন করিলেন। ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সুবিস্তৃতরূপে মহাভারতে কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা নাই, শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণিতব্য কথা ভীষ্মদেবের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা। দ্বাপর যুগের ভারতবর্ষে ভীষ্মদেবের তুলনা নাই। ভীষ্মদেবের প্রতিজ্ঞা-রক্ষা জগতে অতুলনীয়। শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা চিনিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ভীষ্মদেব একজন প্রধান। রাজসূয়-যজ্ঞের সময় তিনি ভারতের রাজন্যবৃন্দকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন,—তোমরা সকলে একমত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্বীকার কর। এই উপদেশ করার জন্য তিনি শিশুপাল-কর্ত্তৃক কদর্য্যভাবে নিন্দিত হইয়াছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞস্থলে দেবব্রত ভীষ্ম ভারতের বিক্রমশালী রাজন্যবৃন্দকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন,—তোমরা যদি এখনও শ্রীকৃষ্ণকে

স্বীকার না কর, তাহা হইলে তোমাদের সর্ব্বনাশ আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দুর্য্যোধনের দল তখন প্রবল, কাজেই বৃদ্ধের কথা শোনে কি? পরিণাম কি হইবে, তাহা ভীষ্ম জানিতেন। সেই ভীষ্ম—ইচ্ছামৃত্যুর শক্তিসম্পন্ন ভীষ্মদেব মৃত্যুকালে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার যাহা অনুভূতি ও বিশ্বাস, তাহা জগৎকে জানাইয়া গেলেন। ভীষ্মদেবের স্তবও আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি,—পার্থসারথিত্বের বোধ-পর্য্যন্ত ভীষ্মের অধিকার।

ভীষ্মদেবের দেহত্যাগের পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরী যাত্রা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে তিনি যোগী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্ত, সকলেরই। তিনি দান্ত, তেজস্বী, দক্ষ ও অনুগত, সকলেরই। কিন্তু তিনি প্রেমের নিজস্ব ধন। তিনি প্রেমরূপ। স্ত্রীলোকেরা প্রেমরাজ্যে উন্নত, প্রেমরাজ্যে স্ত্রীলোকই উন্নততর অধিকার-সম্পন্না। আমরা পূর্ব্বে উত্তরা ও কুন্তীদেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। এইবার শ্রীমদ্ভাগবত, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পুরস্ত্রীগণের সমবেত অনুভূতি দশটি শ্লোকে বর্ণনা করিলেন। এই রমণীগণ যেন মূর্ত্তিমতী শ্রুতি। শ্রুতি যেভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব অনুভব করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এই রমণীগণও ঠিক সেইভাবে বর্ণনা করিতেছেন। পুরস্ত্রীগণের অধিকার আরও উচ্চ। তাঁহারা ব্রজগোপীদিগেরও ভাবের কথা জানেন। এই শ্লোক দশটি আমরা পরে আলোচনা করিব। পুরস্ত্রীগণের পরস্পর শ্রীকৃষ্ণকথা আলোচনার পর, দ্বারকাবাসী প্রজাগণ শ্রীকৃষ্ণকে কি ভাবে দেখিতেন, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগ-বতের এই অংশের আলোচনায় আমরা নিম্নলিখিত ভক্তগণের সাক্ষাৎকার পাই। ১। অর্জ্জুন ২। উত্তরা ৩। কুন্তীদেবী ৪। ভীষ্মদেব ৫। পাণ্ডবপুররমণীগণ ৬। দ্বারকাবাসী প্রজাগণ। যুধিষ্ঠির ভীম প্রভৃতির বিরহও বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। পরে তাহা উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই সমুদয় ভক্তের হৃদয়ের গূঢ়বস্তু শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, ইহা বাহিরের কথা। তাঁহার ঐতিহাসিকতার উপর তাঁহার ভগবত্তার প্রতিষ্ঠা নহে। ভক্তগণের অনুভূতির উপরেই তাঁহার ভগবত্তার প্রতিষ্ঠা।

ইহার পর শ্রীমদ্ভাগবতে মহারাজ পরীক্ষিতের জন্ম বর্ণিত হইয়াছে। গর্ব্ভের মধ্যে অসহায় শিশু শায়িত। ব্রহ্মাস্ত্রের তেজঃ গর্ব্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়া লেলিহান জিহ্বা

ব্রহ্মাস্ত্রের অনলশিখার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। অকস্মাৎ সেই শিশু দেখে কি! সেই গর্ভেরই ভিতর কোথা হইতে এক অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ, নীল-ইন্দীবরশ্যাম, পীতবসন, চতুর্ভুজধারী মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত। সেই মূর্ত্তি চক্র ঘুরাইয়া সেই অনলশিখা গ্রাস করিতেছে, আর হস্ত তুলিয়া শিশুকে অভয়দান করিতেছে। গর্ভবাসী শিশু মাতৃগর্ভে বসিয়া ইহা দেখিলেন। শাস্ত্রে আছে—জীব মাতৃগর্ভে অনেক ব্যাপারই দেখে, কিন্তু তাহার স্মৃতি যখন থাকে না, তখন দেখা ও না দেখা একই কথ। কিন্তু, এ ঘটনাটি সেরূপ নহে। সেই গর্ভবাসী শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হইলেন, তখন এই দৃশ্যটি ভুলিলেন না। এই শিশুটিই মহারাজ পরীক্ষিত। শিশু বালক হইলেন, বালক যুবক হইলেন, যুবক সংসারী হইলেন, রাজা হইলেন, যশস্বী বীর হইলেন। কিন্তু জননীর জঠরমধ্যে থাকিবার সময় যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা ভুলিলেন না। মাঝে মাঝে কেবলই মনে হইত, কে সে পীতাম্বরধর, নবীনমেঘসুন্দর, কে সে চতুর্ভুজ চক্রধারী! গর্ভবাসী শিশুকে যিনি অনলশিখা হইতে রক্ষা করেন, তিনি কে? এইটুকুই মহারাজ পরীক্ষিতের বৈশিষ্ট্য, এইজন্যই তাঁহার নাম পরীক্ষিত।

যে সকল ঘটনা আলোচনা করিলে শ্রীকৃষ্ণকথার উদয় হইবে, তাহার মধ্যে মহারাজ পরীক্ষিতের জন্মের পর পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত এই উভয় ঘটনার মধ্যে আর একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর পরিণাম। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর কথা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বে কথিত হইয়াছে। সঞ্জয়, বিদুর, বেদব্যাস ও শ্রীকৃষ্ণ, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে নানারূপ উপদেশের দ্বারা সান্ত্বনা করিয়াছেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রকে কি শান্ত করা যায়? তিনি লৌহময় ভীমকেই চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন, আবার ভীমকে মারিয়া ফেলিলাম বলিয়া শোকার্ত্তও হইলেন। মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রের একরূপ উন্মাদ অবস্থাই বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের এই অংশও মূল মহাভারতের বা মহাভারতের আদিম স্তরের অঙ্গীভূত কি না, সন্দেহ।

শ্রীমদ্ভাগবতে বা সূতপ্রোক্ত ভাগবতে অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর পরিণাম কথিত হইয়াছে। বিদুরের কথা শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বলা হইবে। এখানে বক্তব্য এই—বিদুর মনের দুঃখে দীর্ঘকালের জন্য

বিদুর কিছু করিতে পারেন নাই। ইহাই তাঁহার দুঃখের হেতু। বিদুর বুঝিয়াছিলেন, এক ভয়াবহ অনর্থ আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী। এই কারণে বিদুর মনের দুঃখে তীর্থপর্যাটনে গিয়াছিলেন। বিদুর তীর্থযাত্রার পর মৈত্রেয় মুনির নিকট শ্রীকৃষ্ণের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিলেন। বিদুর ফিরিয়া আসায় যুধিষ্ঠির, কুন্তী প্রভৃতি সমুদয় নরনারী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। বিদুর, সকলের আদর ও অভ্যর্থনা গ্রহণ করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গেলেন ও তাঁহাকে নানারূপ উপদেশ করিলেন। বিদুরের উপদেশে ধৃতরাষ্ট্রের চিত্তে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি পতিব্রতা গান্ধারী-দেবীকে সঙ্গে লইয়া হিমালয় পর্ব্বতের অন্তর্গত সিদ্ধাশ্রমে গমন করিলেন। হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে এই আশ্রম। সেই স্থানে সাধনার দ্বারা আত্মশুদ্ধি করিয়া মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র যোগবলে পত্নীর সহিত দেহত্যাগ করিলেন।

ইহার পরের ঘটনা পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থান ও পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক। মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ আনিবার জন্য সাত মাস হইল অর্জ্জুনকে দ্বারকায় পাঠাইয়াছেন, কিন্তু আজও অর্জ্জুন ফিরিয়া আসিলেন না। যুধিষ্ঠির মহারাজের উদ্বেগের সীমা নাই। নারদ তাঁহাকে বলিয়া গিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ আর অধিক দিন মর্ত্ত্যলোকে থাকিবেন না। যুধিষ্ঠির নানারূপ অলক্ষণ দেখিতেছেন। তিনি ভীমকে বলিতেছেন—

সাত মাস হইয়া গেল, আজও অর্জ্জুনের সংবাদ নাই। নারদের কথাই কি সত্য হইল? শ্রীকৃষ্ণ কি তাঁহার মনুষ্য-নাট্য বিসর্জ্জন করিলেন? শ্রীকৃষ্ণই আমাদের পুরুষার্থের হেতু, ইহলোকে ও পরলোকে আমরা যাহা কিছু পাইয়াছি, সমস্তই কৃষ্ণের কৃপায়। শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগ-ব্যতীত আমাদের কোনই অনিষ্ট হইতে পারে না। দেখ ভীম! চারিদিকে নানারূপ উৎপাত দেখিয়া আমার মনে বড়ই আশঙ্কা হইয়াছে। আমার বাম অঙ্গ স্পন্দিত হইতেছে, আমার হৃদয় কাঁপিতেছে। আমি দেখিলাম এক শৃগালী উদয়শীল সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া যেন সূর্য্যের প্রতি আক্রোশ করিয়া অগ্নি বমন করিতেছে। আমি দেখিলাম কুকুর আমাকে ভয় করিতেছে না, আমার প্রতি চাহিয়া চীৎকার করিতেছে। গরুগুলি আমার বামদিক দিয়া চলিয়া যাইতেছে, গর্দ্দভগুলি আমার চারিদিকে ঘুরিতেছে, আর অশ্বগুলি যেন কাঁদিতেছে। ঐ কপোতের প্রতি চাহিয়া দেখ, কেমন বীভৎস মূর্ত্তি, যেন মরণের দূত। পেচক ও কাক ডাকিতেছে,

কেমন তাহাদের বিভীষিকাময় ডাক, তাহারা যেন প্রলয়কে নিমন্ত্রণ করিতেছে, তাহাদের ডাক শুনিয়া আমার হৃদয় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। দিগ্বলয় ধূসরবর্ণ; পৃথিবী যেন পর্ব্বতের সহিত কাঁপিতেছে—মেঘ নাই, তবু যেন বজ্রের গর্জ্জন হইতেছে। বাতাসে কেবলই ধূলি উড়িতেছে, দশদিক্ যেন অন্ধকার, মেঘে যেন রক্তবৃষ্টি হইতেছে। সূর্য্যে প্রভা নাই; গ্রহে গ্রহে যেন যুদ্ধ চলিতেছে, রুদ্রের অনুচরগণ যেন পৃথিবীতে ও অন্তরীক্ষে চুপি চুপি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নদ, নদী, সরোবর কাঁপিতেছে, কোন জীবেরই চিত্তে প্রসন্নতা নাই। ঘৃতের দ্বারা অগ্নি জ্বলিতেছে না, বৎসসকল স্তনপান করিতেছে না, মায়ের স্তনে দুগ্ধ নাই, ধেনুসকল অশ্রুমুখী, রোদন করিতেছে, বৃষগণ উল্লাসহীন। দেব-প্রতিমাসকল যেন রোদন করিতে করিতে মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের দেহ ঘর্ম্মসিক্ত। কোথায়ও শ্রী নাই, আনন্দ নাই। শ্রীকৃষ্ণের চরণের ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ চিহ্নের স্পর্শ হইতে কি ধরণী বঞ্চিতা হইয়াছে।

মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমকে এই সব কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে অর্জ্জুন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অর্জ্জুনের নয়নে অশ্রুধারা, বদন মলিন, দেহে সে লাবণ্য নাই। অর্জ্জুন আসিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের চরণে পড়িয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। মহারাজা ব্যাকুলচিত্তে অর্জ্জুনকে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট সংবাদ নিবেদন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কি তাহা আমরা কি করিয়া বুঝিব? সেই দ্বাপর যুগের সংগ্রাম কি ভয়ঙ্কর! সৃষ্টিচক্র প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতেই দেবতায় ও অসুরে যুদ্ধ, চির সমুদ্র-মন্থন চলিতেছে। আলোকের পুত্রগণের সহিত আঁধারের পুত্রগণ সংগ্রাম করিতেছে। আঁধারের পুত্রগণ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভাবে যখন থাকে, তখন সংসারচক্রের সহিত ধর্ম্ম-চক্রও কতকটা অবাধে চলিতে থাকে, অথবা ধর্ম্মচক্রের আবর্ত্তনের সহিত সংসার-চক্রের আবর্ত্তনের অনেকটা সামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু এই আঁধারের পুত্রগণ যখন একতাবদ্ধ হয়, তখন ধর্ম্মচক্রের আবর্ত্তন বাধাপ্রাপ্ত হয়, আর সংসার-চক্রে বৈষম্য ও বিঘ্ন উপস্থিত হয়। দ্বাপরের শেষে এই দেবাসুরের অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইয়াছিল। পূর্ব্বেও অনেকবার সংগ্রাম হইয়াছে কিন্তু এবারের সংগ্রাম পূর্ব্বের সংগ্রামসমূহ অপেক্ষা ভয়ঙ্কর। তাহার

এবার তাহারা বাহিরের লোক নহে, এবার তাহারাও ঘরের লোক। সুতরাং এবার চিনিয়া লওয়াই কঠিন। এবার কোন কোন সাধুপুরুষও ধর্ম্মবদ্ধ হইয়া অসুরের স্বপক্ষ হইয়াছেন। কাজেই এবারের সংগ্রাম বড়ই কঠিন।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ ঘটনারূপে যে কেবল ভারতবর্ষের ইতিহাসেই একটি বৃহৎ ঘটনা তাহা নহে, পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ইতিহাস আলোচনা করিলে এই ঘটনাকে আরও বড় ঘটনা বলিয়া মনে হইবে। ব্রহ্মাণ্ডের বা সৌরমণ্ডলের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের এখন কোনই জ্ঞান নাই, কিন্তু মানবের জ্ঞান-বিকাশে এমন একদিন আসিবে যে দিন সৌরমণ্ডলের ইতিহাসও আমরা বুঝিতে পারিব। মনে করুন শত বর্ষ পূর্ব্বে পৃথিবীর ইতিহাস সম্বন্ধেই বা মানুষ কতটুকু জানিত? অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমগ্র পৃথিবীব্যাপী প্রভাব, কয়জনে আলোচনা করিত? আজ পৃথিবীর ইতিহাস, ভিতর হইতে না হউক, বাহির হইতে অনেকটা বুঝিতে পারা গিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসের সাহায্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের তত্ত্ব আলোচনা করিলে ঐ ঘটনাকে একটি অতি বৃহৎ ঘটনা বলিয়া মনে হইবে। কেবল ভারতবর্ষের অস্পষ্ট ইতিহাসের কুহেলিকায় ঐ ঘটনা তত বড় দেখা যাইবে না। ভারতের ক্ষাত্রশক্তি কি প্রবলই না হইয়া উঠিয়াছিল! এই শক্তি চূর্ণ না হইলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষ মাথা তুলিতে পারিত না। ভারতবর্ষের দুয়ার উদ্‌ঘাটিত না হইলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকের বিষয়ভোগের বাসনাও তৃপ্ত হইত না, ভারতের সনাতনী বাণী সমগ্র পৃথিবীব্যাপী হইত না, এবং ভারতক্ষেত্রে—এই দেবনির্ম্মিত কর্ম্মভূমিতে মহামানবের মহামিলনেরও সম্ভাবনা হইত না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দ্বারাই ইহা সাধিত হইয়াছে। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের প্রকৃত গভীর মর্ম্ম অবধারিত হইতে এখনও বিলম্ব আছে। এই সৌরমণ্ডলের একটি গ্রহ আমাদের এই পৃথিবী, আমাদের যত লম্ফ, ঝম্ফ ও জ্ঞানগর্ব্ব এই পৃথিবী লইয়া। পৃথিবীর বাহিরে অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের নামমাত্রই আমরা জানি, কিন্তু আর কিছুই জানি না, তাহাদের সহিত আমাদের পৃথিবীর এবং এই পৃথিবীবাসী নরনারীর অদৃষ্টের যে একটা যোগ আছে, ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতে আমরা শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু এই যোগ কি প্রকারের তাহারও প্রকৃত বিবরণ আমরা জানি না।

অতি সুনিশ্চিত—আর একথা সজোরে ঘোষণা করাই আবশ্যক—একথায় অনুমাত্রও সন্দেহ নাই যে মানুষ একদিন অন্যান্য গ্রহের এবং ক্রমশঃ সমগ্র সৌরমণ্ডলের সমগ্র সংবাদ জানিতে পারিবে। আমরা যখন এই ব্রহ্মাণ্ডের বা আমাদের সৌরমণ্ডলের ইতিহাস জানিতে পারিব, তখন এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিব, এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কর্ম্মও তত্ত্বতঃ বুঝিয়া ধন্য হইব।

এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবেরা জয়ী হইয়াছিলেন; প্রকৃত প্রস্তাবে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছিল—অর্জ্জুনের ভুজবলই পাণ্ডবের বিজয়ের প্রত্যক্ষ হেতু। কিন্তু প্রত্যক্ষ যে মানুষকে মারিয়া ফেলে, জীবন দেয় না অমৃত দেয় না। লোকে বলিবে অর্জ্জুনের, ভীমের বীরত্ব। কিন্তু এই সকলের বীরত্বের মূলে শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই যেন বহুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই মহাযুদ্ধ করিয়াছিলেন। এক সূর্য্যমণ্ডলে যেমন এক সূর্য্যেরই আলোক প্রতিফলিত হইয়া অন্যান্য গ্রহকে উজ্জ্বল করে, তেমনি এক শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি ভীম অর্জ্জুন প্রভৃতির মধ্য দিয়া ক্রিয়া করিয়াছিল। পাণ্ডবেরা তাহা জানিতেন, সেই কারণে তাঁহারা ব্যাসের রচনায় চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, সেই কারণেই তাঁহারা মৃত্যুসাগর পার হইয়া কৃষ্ণদাস্য লাভ করিয়াছেন। আমরা ছোট ছোট বিজয়লাভও করি, কিছু কিছু গৌরবান্বিতও হই, কিন্তু কোন্ সূর্য্যের কৃপার আলোক কি প্রকারে আসিয়া আমাদের উজ্জ্বল করে ও সুন্দর করে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা বিবেচনা করি আমরাই বিজয়ী, নিজের বলেই বলবান, নিজের জ্ঞানেই জ্ঞানী। এই প্রত্যক্ষবোধই আমাদিগকে কারারুদ্ধ করে, আমাদিগকে মারিয়া ফেলে, অমৃতের আলোকপথে যাইতে দেয় না। পাণ্ডবেরা যে ইহা বুঝিতেন তাহা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কথা হইতেই আমরা বুঝিয়াছি। অর্জ্জুনও ইহা জানিতেন, আজ শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগে ইহা অতি উত্তমরূপেই বুঝিয়াছেন। সেই জন্য অর্জ্জুন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—

"বঞ্চিতোহহং মহারাজ হরিণা বন্ধুরূপিণা।
যেন মেহপহৃতং তেজো দেববিস্মাপনং মহৎ॥"

হে মহারাজ, বন্ধুরূপী হরি আমাদের বঞ্চনা করিয়াছেন, তাহার ফলে দেবতাদেরও

যৎসংশ্রয়াদ্ দ্রুপদগেহমুপাগতানাং রাজ্ঞাং স্বয়ম্বরমুখে স্মরদুর্ম্মদানাং।
তেজো হৃতং খলু ময়া নিহতশ্চ মৎস্যঃ সজ্জীকৃতেন ধনুষাধিগতাচ কৃষ্ণা॥

যে শ্রীকৃষ্ণের বলে আমি অনায়াসে ধনুক উত্তোলন করিবামাত্র দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে সমাগত কামোন্মত্ত নৃপতিগণের তেজঃ হরণ করি, পরে সেই ধনুকের সাহায্যে যন্ত্রের উপরিস্থিত ভ্রাম্যমাণ মৎস্যকে অবহেলায় বিদ্ধ করি, এবং পরিশেষে যাবতীয় নৃপতিকে পরাস্ত করিয়া দ্রৌপদীকে প্রাপ্ত হই, মহারাজ সেই বন্ধুরূপী হরি আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

অর্জ্জুন তাঁহার জীবনব্যাপী বীরত্ব ও কীর্ত্তিলাভের কথা স্মরণ করিতেছেন, যতই ভাবিতেছেন ততই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছেন, সেই শক্তি তাঁহার নিজের শক্তি নহে। শ্রীকৃষ্ণই যন্ত্রী হইয়া অলক্ষিতরূপে অর্জ্জুনকে শক্তিমান করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই অর্জ্জুনের যাবতীয় বিজয়গৌরব। অর্জ্জুন কি না করিয়াছিলেন! মানবের অসাধ্য কার্য্য তিনি অনায়াসে সাধন করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণকে পরাস্ত করিয়া ইন্দ্রের খাণ্ডববন তিনি অগ্নিকে দান করিয়াছিলেন, সেই খাণ্ডবদাহে রক্ষা পাওয়ায় ময়দানব আসিয়া রাজসূয় যজ্ঞের সভাস্থল নির্ম্মাণ করিয়া অত্যদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্যের দ্বারা সকলকে চমৎকৃত করেন। এ সমস্তই অসম্ভব ব্যাপার, একমাত্র কৃষ্ণের শক্তিতে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছিল। ভীম জরাসন্ধকে বধ করিয়াছিলেন, অসৎ-সভায় দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ হইয়াছিল, দুর্ব্বাসা মুনির অযুত শিষ্য পাণ্ডবগণকে বিপন্ন করিতে আসিয়া নিজেই অপদস্থ হইয়াছিলেন, এ সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের লীলা। অর্জ্জুন স্বকীয় রণনৈপুণ্য দেখাইয়া দেবাদিদেব মহাদেবকে এবং জগজ্জননী মহামায়াকে পরিতুষ্ট করিয়া পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, এবং অন্যান্য লোকপালেরাও নিজ নিজ অস্ত্র দিয়া অর্জ্জুনকে সম্মানিত করেন, অর্জ্জুন সশরীরে ইন্দ্রালয়ে গিয়া ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন লাভ করেন, এবং দেবগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া নিবাত-কবচাদি দানবগণকে বধ করেন, এ সমুদয়ই শ্রীকৃষ্ণের কৃপাশক্তির প্রভাব মাত্র। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ, কত কত মহামহাবীরের একত্র সমাবেশ, বিপক্ষ পক্ষের কি বিপুল আয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ,—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সুশর্ম্মা, জয়দ্রথ, বাহ্লিক প্রভৃতি বীরগণের আয়ুঃ, উৎসাহ-শক্তি, বল ও শস্ত্রাদি-কৌশল হরণ করিয়াছিলেন, ফলে হিরণ্যকশিপু-প্রেরিত

অসুরগণের অস্ত্ররাশি নৃসিংহরক্ষিত প্রহ্লাদের যেমন অঙ্গ স্পর্শ করে নাই, বিপক্ষ-পক্ষীয় ঐ সমুদয় বীরেন্দ্রের অস্ত্ররাশিও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণরক্ষিত অর্জ্জুনের অঙ্গ স্পর্শ করে নাই।

ইহাই শ্রীকৃষ্ণের লীলা, ইহাই তাঁহার অলৌকিকত্ব এবং ইহারই উপর তাঁহার ভগবত্তার প্রথম প্রতিষ্ঠা। আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে, ইহার সাক্ষী কে? আমরা শ্রীকৃষ্ণকে যে আজ উপাস্য ভগবান্‌রূপে আমার দেশের অতীতের সাধনা হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি, কি করিয়া পাইলাম? লীলারহস্য ঠিক মত বুঝিতে হইলে এই কথা বিশেষভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ একক আমার নিকট আসেন নাই। দুর্য্যোধন বা শিশুপালের জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের এই অচিন্ত্য মহিমার সাক্ষ্য নহে—অর্জ্জুনের অনুভূতি ও উপলব্ধির মধ্য দিয়া আমরা এই মহাসত্য পাইতেছি। দ্বাপরের শেষে দেবাসুরের অতি ভীষণ সংগ্রামে সমগ্র দেবশক্তি শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া প্রকট* হইয়াছিল, এবং সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে যাঁহারা সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অধিকারী তাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন যে এই শ্রীকৃষ্ণই সেই আদ্যপুরুষ, আজ মনুষ্যনাট্যের মধ্যে প্রকট হইয়াছেন। অর্জ্জুন, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট নিজের প্রাণের ভিতরের কথা যতই ব্যক্ত করিতেছেন, তিনি ভাবাবেশে ততই অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন। এই যে মহিমা বা শক্তির বিলাস যাহা অর্জ্জুন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ক্রমশঃ অর্জ্জুন সে সকল অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছেন, প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে, শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় মন একেবারে বিহ্বল হইয়া উঠিতেছে। অর্জ্জুন বলিতেছেন—

"আহা, এই শ্রীকৃষ্ণ! শ্রেষ্ঠপুরুষেরা মোক্ষের জন্য তাঁহার পাদপদ্মের ভজনা করেন। এই শ্রীকৃষ্ণই আত্মপ্রদ ঈশ্বর। আমি তাঁহাকে সারথীর কার্য্যে বরণ করিয়াছিলাম।"

সোঽহং নৃপেন্দ্র রহিতঃ পুরুষোত্তমেন সখ্যা প্রিয়েণ সুহৃদা হৃদয়েন শূন্যঃ।
অধ্বন্যুরুক্রমপরিগ্রহমঙ্গ রক্ষন্ গোপৈরসদ্ভিরবলেব বিনির্জ্জিতোঽস্মি॥
তদ্বৈ ধনুস্ত ইষবঃ স রথো হয়াস্তে সোঽহং রথী নৃপতয়ো যত আনমন্তি।

হে মহারাজ! সেই সুহৃৎ, সখা, প্রিয়, পুরুষোত্তমের সহিত আমি বিরহিত হইয়াছি, আমার হৃদয় শূন্য হইয়াছে। আমি পথের মধ্যে তাঁহার ষোড়শ সহস্র স্ত্রীগণকে রক্ষা করিতেছিলাম, আর কতকগুলি নীচ গোপ আসিয়া আমাকে সামান্য স্ত্রীলোকের মত পরাজয় করিয়া গেল। সেই ধনুঃ, সেই বাণ, সেই রথ, সেই অশ্ব সকলই রহিয়াছে, আমিও সেই রথী আছি। পূর্ব্বে যখন শ্রীকৃষ্ণের বলে বলীয়ান্ ছিলাম তখন যাবতীয় নরপতি আসিয়া আমাকে প্রণাম করিত, আর আজ শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়া সকলেই অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। ভস্মে ঘৃতাহুতি যেমন নিস্ফল, মায়াবীর নিকট অর্থলাভ হইলেও তাহা যেমন নিস্ফল, উষর ভূমি কর্ষণ করিয়া তাহাতে বীজ বপন যেমন নিস্ফল, আমিও এখন ঠিক্ সেইরূপ নিস্ফল হইয়া পড়িয়াছি।

অর্জ্জুন আর কথা বলিতে পারিলেন না, অত্যাধিক স্নেহবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তায় আবিষ্ট হইলেন, তাহার ফলে তাহার মতি শোকমুক্ত ও বৈরাগ্যযুক্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণের চরণচিন্তার ফলে তাঁহার ভক্তি অত্যন্ত প্রবলা হইল, কামনাদি একেবারে দূর হইয়া গেল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধস্থলে তাঁহাকে যে জ্ঞানোপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা অর্জ্জুনের তেমন মনে ছিল না, সময়ের প্রভাবে, কর্ম্মের ঝঞ্ঝায় ও ভোগাভিনিবেশ বশতঃ তাহা আবৃত হইয়াছিল, এখন তিনি আবার সেই নির্ম্মল জ্ঞান সুস্পষ্টরূপে প্রাপ্ত হইলেন। কুন্তীদেবী অর্জ্জুনের মুখে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া একান্ত ভক্তি-সহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণে মনোনিবেশ করিয়া সংসার হইতে উপরতা হইলেন অর্থাৎ ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিলেন। ইহার পরেই পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থান, পরীক্ষিৎকে সম্রাট্ পদে অভিষিক্ত করিয়া যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও দ্রৌপদী মহাপ্রস্থানে গমন করিলেন।

এইবার কলির প্রসঙ্গ। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

যদা মুকুন্দো ভগবানিমাং মহীং জহৌ স্বতন্বা শ্রবণীয় সৎকথঃ।
তদাহহরেবা প্রতিবুদ্ধচেতসামভদ্রহেতুঃ কলিরন্ববর্ত্তত॥

যাঁহার সৎকথা সকলে শ্রবণ করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ মুকুন্দ যেদিন নিজমূর্ত্তি-সহ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বধামে গমন করিলেন, সেই দিনই অবিবেকীজনের অভদ্রকারী কলি স্বীয়রূপে অনুবর্ত্তী হইলেন। পূর্ব্বে অংশরূপে প্রবিষ্ট ছিলেন, এখন নির্ব্বিরোধে

আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন এই কলি অবিবেকী জনের অভদ্রকারী, শ্রীধর স্বামী বলিলেন "বিবেকিনাস্তু ন প্রভুঃ" অর্থাৎ যাঁহারা বিবেকী, তাঁহাদের উপর কলির কোনই প্রভাব নাই। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় বলিলেন—চোর নিদ্রিত ব্যক্তিরই ধন অপহরণ করে, কিন্তু জাগ্রত হইলে ভয় পাইয়া পলাইয়া যায়।

যুধিষ্ঠির বুঝিলেন, তাঁহার রাজধানীতে, রাজ্যে, গৃহে, এমন কি তাঁহার নিজের দেহেও কলি প্রসারিত হইয়াছে। লোভ, মিথ্যা, কুটিলতা, হিংসা প্রভৃতি অধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহার উপক্রম দেখা যাইতেছে। তিনি পরীক্ষিতকে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আর অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রকে মথুরার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হইয়া মহাপ্রস্থানে গমন করিলেন।

পরীক্ষিতের বিবাহ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, দিগ্বিজয়, কলিনিগ্রহ ও ব্রহ্মশাপ। 'কলিনিগ্রহ' সম্বন্ধে আমাদের একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে। মহারাজ পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ একটি রহস্য। শ্রীভগবান্ মহারাজ পরীক্ষিতকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের উপযুক্ত অধিকারী করিবার জন্যই এই ঘটনাটি ঘটাইলেন।

এই সমুদয় ঘটনার মধ্য দিয়া, ভক্তগণের অনুভূতি আশ্রয় করিয়া ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণ-কথার উদয় হইয়াছে।

পরিশিষ্ট—"ধারণা ও ধ্যান"

"শ্রীমদ্ভাগবতের ধারণা ও ধ্যান" নামক প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি যে শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা করিবার সময়, প্রথমে সমগ্র গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সাধারণভাবে বা মোটামুটি রকমে জানিয়া লইতে হইবে। তাহার পর সেই সমগ্র বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া উপাখ্যান বিশেষের, প্রসঙ্গ-বিশেষের উপদেশ-বিশেষের এমন কি শ্লোক-বিশেষের তাৎপর্য্য আলোচনা করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক এই ব্যবস্থায় অভ্যস্ত নহে। তাহারা কথকতা শোনে, গল্প শোনে। পুরাণের উপাখ্যান যে সাধারণ গল্প নহে, ইহা তাহারা বোঝে না এবং বুঝিতেও চাহে না। ইহাতে শাস্ত্রের

অমর্য্যাদা হয়, শাস্ত্র-শ্রবণের যাহা সুফল, তাহা হয় না। পরম পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা করিবার প্রণালী বুঝিলেই, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

সমগ্র পৌরাণিক সাহিত্য যদি কেহ শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ের দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারেন, অর্থাৎ সমগ্র পৌরাণিক সাহিত্যে যত ঘটনার বর্ণনা আছে, সেই সমুদায় ঘটনা, চক্ষু মুদ্রিত করিবামাত্র বায়স্কোপের ছবির মত যদি কাহারও মানসনেত্রের সম্মুখ দিয়া পর পর ভাসিয়া যায়। এই প্রকারের কল্পনা-শক্তি ও স্মৃতিশক্তি যদি কাহারও থাকে, তাহা হইলে তিনি একটি অতিশয় প্রয়োজনীয় বিষয় ধরিতে পারিবেন। পুরাণের মধ্যে এই ভারতীয় আর্য্যজাতির আধ্যাত্মিক মণীষা পরিপূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। সেই মণীষার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ঐ প্রকারের সাধকের নিকট ধরা পড়িবে। বিশ্ববিদ্যালয় Indian culture অর্থাৎ ভারতীয় সাধনার ও সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের আলোচনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। খুব ভাল কথা, কিন্তু এই চেষ্টা সুপথে চালিত না হইলে সর্ব্বনাশ হইবে। আমাদের ভিতরে একটি বৃত্তি আছে, তাহার নাম The Analytical critical faculty. কতকগুলি বিষয়ের আলোচনায় এই বৃত্তির বা এই শক্তির প্রয়োগ অত্যন্ত হিতকর ও আবশ্যক। কিন্তু আর কতকগুলি বড় বড় বিষয় আছে, তাহার আলোচনায় প্রথমাবস্থায় এই শক্তির প্রয়োগ অত্যন্ত অহিতকর। Culture-study অর্থাৎ কোনও জাতির মানসিকজীবন ও ভাবজীবনের গূঢ় বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করিবার যে চেষ্টা, আজকাল বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে দেখা যাইতেছে, তাহাতে প্রথমাবস্থায় এই বৃত্তির প্রয়োগ করিলে বিদ্যার অধঃপতন হইবে। Culture studyতে প্রথমে ধারণা, তাহার পর ধ্যান। ভাবের দ্বারা ও কল্পনার দ্বারা প্রথমে সমগ্রের ধারণা, হৃদয়ের রসের দ্বারা, বা অনুভূতির সরসতাময় জাগরণের দ্বারা সমগ্রকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পর ধ্যান বা এক একটি অংশকে পৃথক করিয়া সমগ্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে কবিতা, Art বা শিল্পকলা, ভাস্কর্য্য, চিত্র প্রভৃতির আলোচনাতেও এই পদ্ধতি প্রযোজ্য। পুরাণের আলোচনাতেও এই পদ্ধতি। মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্ণধাররূপে বৈষ্ণব কবিতার যে আলোচনা করিতেছেন, সেই পদ্ধতি অত্যন্ত ভ্রান্ত ও দূষণীয় পদ্ধতি। ভারতীয় ভাস্কর্য্যের আলোচনায় যে পদ্ধতি প্রয়োগ করিতেছেন, তাহা অনেক উন্নত ও হিতকর।

কবিতার আলোচনায় এই পদ্ধতি, অর্থাৎ প্রথমে ধারণা, তাহার পর ধ্যান সর্ব্বদাই প্রযোজ্য। আমাদের বিদ্যালয়ে ইংরাজী কবিতা পড়া হয়, বড় বড় কবিরও কবিতা পড়া হয়। ধরুন একরূপ নিম্নশ্রেণীতে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "কুকুর প্রতি" To The Cuckoo বা 'আমরা সাতজন' "We are seven" কবিতা পড়ানো হয়। এই কবিতাগুলি কবিতারূপে পড়াইতে গেলে, প্রথম কবিকে জানিতে হইবে। কবিতার মধ্য দিয়া ইংরাজ জাতির হৃদয়বৃত্তির যে প্রকাশ হইয়াছে তাহার একটা ইতিহাস আছে। এই ইতিহাসে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের যাহা দান অর্থাৎ তিনি যে অনুভব-বৈশিষ্ট্য দিয়াছেন প্রথমে তাহা বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত কবিতা দুইটির প্রত্যেক চরণে কবির সেই হৃদয় তাহার বৈশিষ্ট্য সহ প্রকাশিত হইয়াছে। এই কথাটি না ধরিলে কবিতা পড়া হইল না। তবে ইংরাজী কতকগুলি কথা শিখিয়া যাহারা মুন্সিবের চাকুরী করিবে, তাহাদের কথা অন্যরূপ।

বাঙ্গালা ১৩০৩ সালে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের খণ্ড-কবিতা ও কয়েকখানি কাব্য ও নাটক গ্রন্থাবলী-রূপে প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই সংস্করণের ভূমিকায় কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এই কথাই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

চিত্তরঞ্জনের গীতি কবিতা

(অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ন এম, এ লিখিত)

চিত্তরঞ্জন নিজে কবিতাকে 'কবির আত্মা' নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকগণ যে কয় প্রকার কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে গীতি কবিতাতেই কবি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আত্মপ্রকাশ করেন বলিয়াই তাঁহাদের অভিমত। গ্রীসের Sapho হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগের Shelly, Browning প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিগণের গীতিকবিতা আলোচনা করিলে আলঙ্কারিকগণের উক্ত মত যথার্থ বলিয়া মনে হয়। আমাদের বাংলা সাহিত্যে অধিকাংশ গীতি-কবিতা রাধাকৃষ্ণের নামের আবরণে লিখিত হইলেও কবি যখনই ভনিতা দিয়াছেন

তখনই নিজের মনের গোপন ভাবটী প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। কবি চিত্তরঞ্জন কেবলমাত্র গীতি-কবিতাই লিখিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার গীতি-কবিতা আলোচনা করিলে আমরা তাঁহার জীবনের মূল রসধারাটীর সন্ধান পাইতে পারি। বাংলার যুগ যুগান্তের সাধনার মূর্ত্ত অভিব্যক্তিরূপে যে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহার জীবনের রস উৎসটীকে আবিষ্কার করিয়া লোকসমাজে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখান বড় সহজ কথা নহে।

আমরা সেই কার্য্যের নিতান্ত অযোগ্য ইহা জানিয়াও তাঁহার ভাবধারা হইতে অনুপ্রাণিত হইবার আশায় প্রলুব্ধ হইয়া ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

সাধারণতঃ দেখা যায় যৌবনের আবির্ভাবে মন যখন দুকূল ছাপাইয়া উঠে—চারিদিকে রূপ রস গন্ধ স্পর্শে অন্তর ভরপুর হইয়া যায়, তখনই কবিরা কবিতা লিখিতে বসেন। তাই জগতের অনেক কবিরই শ্রেষ্ঠ দান যৌবনের রসানুভূতির আশ্রয় পাইয়াছে; কিন্তু চিত্তরঞ্জনের কবিতা এ বিষয়ে অনন্যসাধারণ। যৌবন যে পরিপূর্ণ পাত্রখানি তাঁহার ওষ্ঠের কাছে ধরিয়াছিল, তাহা তিনি নিঃশেষে পান করিয়াছিলেন। জীবনের রূপ নানা বিচিত্রবর্ণে তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল, তিনি জন্ম হইতেই কবি, ভোগের মধ্যে তাঁহার অনুভূতির তীব্রতা ম্লান হইয়া যায় নাই। কিন্তু সেই ভোগোন্মত্ততা, সেই রূপোন্মাদনা হইতে তাঁহার কাব্যের উৎস উৎসারিত হয় নাই। জীবনের ঐ আকর্ষণ যে অন্তরের অন্তঃস্থলে যাইয়া পৌঁছিতে পারে না, তাহাতে মুগ্ধ হইলেও তিনি যে তৃপ্ত হন নাই, ইহা তিনি জানিতেন বলিয়াই সেই ভাবকে অবলম্বন করিয়া কবিতা রচনা করেন নাই। জীবনের বহিরাবরণের মধ্যে যতদিন না তিনি অন্তঃপ্রকৃতির সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, ততদিন তিনি শব্দের ডালি সাজাইয়া জীবনের মোহকেই বড় করিয়া প্রকাশ করিতে প্রয়াস পান নাই।

তিনি বলেন, "আমাদের প্রত্যেক প্রত্যক্ষের, প্রত্যেক ভাবের, প্রত্যেক সম্বন্ধের একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সকল বহিরাবরণের মধ্যে এই অন্তঃপ্রকৃতির অনুসন্ধানই মনুষ্যজীবন। সকলেই সেই একই অনুসন্ধান করিতেছে। কেহ জানে করে, কেহ বা না বুঝিয়া করে। আমরা সকলেই সেই অন্তঃপ্রকৃতির—সেই প্রাণের খোঁজে ব্যস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই। যাহাকে জীবনের অনন্ত মুহূর্ত বলিলাম, সেই অনন্ত মুহূর্তে প্রাণেরই সাক্ষাৎ লাভ হয়। আর সেই মুহূর্তেই আমাদের হৃদয় মন রসোচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া পড়ে। তখনই কবিতার সৃষ্টি হয়।"

তিনি যখন যৌবনসীমা প্রায় অতিক্রম করিয়াছেন, তখন হৃদয়ের মধ্যে এই অন্তঃপ্রকৃতির প্রেরণা অনুভব করিলেন। জীবনে সত্যকে প্রকাশ করিবার জন্য এক অপূর্ব্ব আকুলতা বোধ করিলেন। এই আকুলতা হইতেই তাঁহার কবিতার প্রথম সূত্রপাত।

রহস্যের অনুভূতি কবিচিত্তে আসিয়াছে, কবিকে সৃষ্টি করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছে, কিন্তু

কবি সে রহস্যের স্বরূপ বুঝিতে পারিতেছেন না। তাই কবি জীবনের যাত্রাপথের প্রারম্ভেই "মালঞ্চে" বলিতেছেন—

"কি যেন শুনাতে চাই, কি যেন ফুটাতে চাই
জন্মভরে যেন সখি, ফুটাতে পারি না তাই।"

কেন ফুটাইতে পারিতেছেন না? কোন যবনিকার ঘন কৃষ্ণ অন্তরালে ঈষৎ অনুভূত সেই চির রহস্যালোক ঢাকা পড়িয়াছে? যৌবনের ভোগবাসনা সেই আলোককে ফুটিতে দিতেছে না। কবি তাহা বুঝিতেছেন এবং বুঝিয়া নিজেকে অভিশপ্ত মনে করিতেছেন—

"অপূর্ব্ব বাসনায় গীতভরে পূর্ণপ্রাণ
শত গীত আলোড়য় হৃদয়মন্দির ম্লান
কি যেন গাহিতে চাই, কি যেন গাহিতে যাই
অভিশপ্ত যদি মোর গাহিতে পারি না তাই"

জীবনে এতদিন তিনি যে রস পান করিয়া আসিয়াছেন তাহা আর তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারিতেছে না। এই অতৃপ্তি, পরিচিত জীবনে এই বিতৃষ্ণা ও ক্লান্তি-ভার হইতেই মহাজাগরণের সূত্রপাত হয়।

এতদিন তিনি প্রেমের যে স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা দেহের সম্বন্ধকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই—

"আমার আকাঙ্ক্ষা তবু অসীম অধীর
তোমার স্বপন ছাড়ি তোমারে চাহিছে
মধুদেহে সুখস্পর্শ রহস্য গভীর
অপূর্ব্ব অধরে তব চুম্বন মাগিছে"

এ প্রেমের মধ্যে লালসার বহ্নি ছিল, সে বহ্নিতে কতশত সুন্দরকে আহুতি দেওয়া হইয়াছে—কবি যে তখন বালকের মত পুষ্পকে নিঙড়াইয়া নিঙড়াইয়া তাহার রস পান করিতে চাহিতেন। কিন্তু রহস্যের প্রথম আলোক সেই চোখে আসিয়া লাগিয়াছে, সেই সুন্দরকে তাঁহার বাসনার লেলিহান জিহ্বা হইতে রক্ষা করিবার ইচ্ছা জাগিয়াছে—

"আমার এ যৌবনের প্রমত্ত গরল
বিশ্ব অঙ্গে জ্বালিয়াছে প্রলয় অনল
আর আসিও না কাছে
কি জানি গো পাছে
দগ্ধ হয়ে যাও, তুমি শুভ্র শতদল"

ভোগের মধ্যে সংযম, লালসার মাঝে করুণা কবির মনে জাগিয়াছে এখন, যখন যৌবনের উদ্দাম আবেগ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে, বাসনার পরিতৃপ্তিতে যখন আর সুখ না পাইয়া তিনি জীবনের অন্য বনিয়াদ্ খুঁজিবার জন্য অস্থির হইয়াছেন। যৌবন তাঁহার চোখের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে—তাহাতে আবার তাঁহার ভয়ও হইতেছে। যৌবনের সৌন্দর্য্য মিলাইয়া গেলে পাছে, প্রেমও হারাইয়া ফেলেন এই তাঁহার ভয়। এ জাতীয় প্রেমের অনুভূতি এতদিন তিনি পাইয়াছেন, তাহাতে এরূপ ভয় করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক।

"আমার লাগিয়া আমি করি না রোদন,
তোমার প্রেমের লাগি যত ব্যথা পাই
লাবণ্য হারায় যদি বিপন্ন বদন
ও প্রেমনন্দন তব পাই কি না পাই
প্রিয় এ ক্রন্দন তাই"

যৌবন চলিয়া গেল, কিন্তু সেই সঙ্গে কবিকে প্রেমের বন্ধনের রাজ্য হইতে বিশ্বের মধ্যে জাগাইয়া দিয়া গেল। মর্ম্মলোকে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা কবি অর্জ্জন করিলেন। রহস্যানুভূতির জন্য যে ব্যাকুলতা তাঁহার চিত্তে আসিয়া গীতে প্রকাশিত হইতে চাহিতেছিল, তাহাই এ "জাগরণ"কে সম্ভব করিয়া তুলিল। তাই তিনি বলিলেন—

"আমার এ প্রেম তুমি রেখোনা বাঁধিয়া
হৃদয়-মন্দিরে গন্ধ বন্ধ কুসুমের
সমস্ত গগনভরা পবনে লাগিয়া
সমস্ত ধরণী পাক প্রেম মরমের।"

"মালঞ্চের" কবির চিত্তে এই যে নবজাগরণের একটী আভাস দেখা গেল তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া কবি তাঁহার পূর্ব্বপ্রেমমুগ্ধতার অসারতা বুঝিতে পারিলেন। "মালা"তে কবি বলিতেছেন—এতদিন যাহাকে পাইয়া তিনি

"বিস্তারিত স্বর্গছায়া স্বরগের সুখ
নিতান্তই স্বরগের ভাবিনু সে মুখ"

সেই "যৌবনের স্বপন সঙ্গিনী তাঁহার নিজের অন্তরের বাসনা ছাড়া আর কিছুই নহে—

আজি পাইয়াছি তব সত্য পরিচয়
আছিলে গোপনে মোর মন অন্তঃপুরে
আমারি বাসনা, আমারি পঞ্জর জুড়ে।"

আজ যখন মোহ আবরণ সরিয়া গিয়াছে, সত্যের নগ্নরূপের পরশ তাঁহার চোখে লাগিয়াছে তখন তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন যে এই জাগতিক প্রেমকে তিনি স্বর্গের স্বপন মনে করিয়া নিতান্ত অন্ধের মতনই কাজ করিয়াছেন—

"আমি অন্ধ, দেখেছিনু স্বর্গের স্বপন"।

যৌবন বিগতপ্রায়, যে প্রেমকে কবি জীবনের অবলম্বন বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, তাহাও শুধু তাঁহার বাসনারই রঙে আঁকা একখানি ছবি বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। সত্যের আভাষ পাইয়াই কবি এরূপ ভাবিতে সমর্থ হইয়াছেন; কিন্তু তখনও তাঁহার মধ্যে সত্যের এরূপ পূর্ণ আবির্ভাব হয় নাই, যাহাতে তাঁহার জীবনকে ভরিয়া তুলিতে পারে। কবি প্রাণের আকুলতায় ঘর ছাড়িয়াছেন, কিন্তু পথ তখনও পান নাই। তাই হৃদয়ে একটা আক্ষেপ আসিয়াছে—তাই বলিতেছেন—

"কত স্বর্ণ কত রত্ন পড়িয়া রয়েছে
সাধ নাই সাধ্য নাই তুলিয়া লইতে"।

এই হতাশার মুহূর্ত্তে প্রকৃতিও আর আনন্দ দিতে পারিতেছে না—

"ঐ ত উষার হাসি আকাশে উঠিছে ভাসি
আশার স্বরগ এই আছিল আমার"

জীবনের এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে ব্যর্থতার আক্ষেপেই কবিচিত্ত একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। জীবন তখন শুধু ভ্রমমাত্র মনে হইতেছে, এবং কবি কোনরূপে জীবনকে ভুলিয়া থাকিতে চাহিতেছেন—

"জীবন, জীবন কোথা? ভ্রান্তি স্বপনের
দৃপ্ত সুরা পান করে শুধু ভুলে থাকা"

কিন্তু মন ত এমন করিয়া ভুলিয়া থাকিতে চাহে না, তাহার যে নব নব বাসনা জাগে, কিন্তু বাসনার পরিতৃপ্তিতেও সুখ নাই; তাই কবি উদাসভরে বলিতেছেন—

"কার চোখে আলো জাগে?
কারে তোর ভাল লাগে,
কোন রত্ন কোন হেম
কার যত্ন কার প্রেম
সংসারে সকলই মন দু'দিনের ঘুমা
ওরে মন তুই ঘুমা,
ওরে মন তুই ঘুমা"

পরার্থ চিন্তায় শান্তির অনুসন্ধান

সেই দুঃখময় হতাশার দিনে কবি মনে করিলেন পরের জীবনের ব্যথা জুড়াইবার চেষ্টা করিয়া তিনি জীবনকে পূর্ণ করিয়া তুলিবেন। চিত্তরঞ্জন স্বভাবসিদ্ধ দাতা ছিলেন, শিশু ভোলানাথের মত অগাধ ঐশ্বর্য্য দুই হাতে বিলাইয়া গিয়াছেন। কত ব্যথিত নরনারীর চোখের জল মুছাইয়াছেন। সাধুহৃদয় ব্যক্তির পক্ষে এরূপ করাই স্বাভাবিক; কিন্তু এরূপ দান করিয়াও তাহারই আনন্দে তিনি যে পূর্ণ পরিতৃপ্তি পাইয়াছেন তাহা নহে তাঁহার নিজের জীবন হইতে মোহ আবরণ খসিয়া পড়িয়াছে! জগতের সুখ ও প্রণয় ব্যর্থ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে, জীবন কান্নায় ভরিয়া গিয়াছে, এ অবস্থায় সাধারণ লোক Cynic বা Misanthrope হইয়া থাকে, কিন্তু যেহেতু চিত্তরঞ্জন কোন অবস্থাতেই নিতান্ত সাধারণ মানুষের মত ছিলেন না, সেই হেতুই "মালা"তে "মোছ আঁখি" বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া বলিতেছেন—

> "রাবণের চিতাসম যদিও আমার
> জ্বলিছে জ্বলুক প্রাণ, কেনগো ক্রন্দন
> অপরের দুঃখ জ্বালা হবে মিটাইতে
> হাসি আবরণ ঢালি দুঃখ ভুলি যাও
> জীবনের সর্ব্বস্ব অশ্রু মুছাইতে
> বাসনার স্তর ভাঙ্গি বিশ্বে জেগে দাও।"

কাম ও প্রেমে দ্বন্দ্ব

নবজাগরণের সূচনার দিনে কবি সুন্দরকে লালসা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু রহস্যের পথে কিছু ভ্রমণ করিয়াই তাঁহার মনে সুন্দরকে দেখিয়া এক নূতন ভাবের উদয় হইয়াছে। কিন্তু বহুকাল ধরিয়া তিনি সুন্দরকে সম্ভোগের দৃষ্টিতেই দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন— তাহার একটা সংস্কার মনের উপর পড়িয়া গিয়াছে, তাই কবিচিত্তে কাম ও প্রেমে দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে—

> "আমি নই আমি নই হে পূর্ণ সুন্দরি
> সত্যই আমার তুমি নহ কামনার
> কি শুনিতে কি শুনেছ মরিছে গুমরি
> আমারই পঞ্জর মাঝে গীত বাসনার
> মোহমুগ্ধ লাজ-দীপ্ত গীত বাসনার।"

অন্তর যখন মধুতে ভরিয়া যাইতেছে, ধীরে ধীরে ভাব গ্রামের উচ্চ স্তরে আরোহণ করিতেছে, তখন লালসা আসিয়া বিঘ্ন জন্মায়। সাধনা অর্দ্ধপথে থামিয়া যায়। জীবনের মধ্যে শান্ত শিব সুন্দরের আর অভিব্যক্তি হয় না। এই ব্যথা, কাম ও প্রেমের এই সংঘাত কবিকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে। লালসার সকল পঙ্কিলতা ধুইয়া মুছিয়া কে আজ কবিকে শুভ্র নিষ্পাপ করিয়া তুলিবে? একমাত্র ভগবান কৃপাবলে এই অসাধ্য সাধন করিতে পারেন। তাই কবি দীনভাবে, আর্ত্তস্বরে ব্যথিত হৃদয়ের শত জ্বালা শ্রীভগবানের পদে নিবেদন করিতেছেন। কবির মন দীনতায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তিনি নিজেকে এতই অধন্য মনে করিতেছেন যে ভগবানকে ডাকিতেও সাহস হইতেছে না। কিন্তু করুণাময় অন্তর্যামী তাঁহর মনের গোপন ডাক শুনিলেন—কবির মনে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা আসিল—

"আমি অশ্রুজল লয়ে শুধু চেয়ে থাকি
আমিত জ্বালিনি দীপ কি করিয়া ডাকি
তবু মনে হয় তুমি শুনেছ আমার—
অন্তরের আর্ত্তস্বর অন্তর মাঝারে।"

ভগবৎ-করুণার অনুভূতি

আর্ত্তের আকুল আহ্বানে ভগবান যখন সাড়া দিলেন, তখন কবির মনে হইতে লাগিল যে ভগবান কত করুণাময়। তাঁহাকে ত কবি ভুলিয়াই ছিলেন—ভোগময় জীবনের মাঝে একটিবারও ত তাঁহাকে ডাকেন নাই—তবু তিনি কবিকে কৃপা করিয়াছেন।

সত্যই কি কবি ভুলিয়াছিলেন। সে ভুলও কি ভগবানের লীলা নয়। আমাদের জীবনে যে আমরা সকল কর্ম্মের মধ্যে, বিলাস ও ব্যসনের মধ্যে তাঁহাকেই খুঁজিয়া থাকি, এই কথাটিই কবি বুঝিলেন। চিত্তরঞ্জনের কবিতার মূল সূত্র হইতেছে এই, যে জীব যে নিত্য কৃষ্ণদাস এই স্মৃতি বিমলিন হইলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় না। তিনি "কবিতার কথায়" বলিয়াছেন "যে সমস্তদিন কর্ম্ম করিয়া কাটায় সেও মাঝে মাঝে ভাবিতে ভাবিতে তাহার কর্ম্মের সার্থকতা যেখানে, সেই রাজ্যে গিয়া পৌছায়। যে সমস্ত দিন আলস্যে অতিবাহিত করে, সেও একেবারে অসার না হইলেও মাঝে মাঝে দূরাগত বংশীধ্বনি শুনিতে পায়, আর সেই বংশী রবে সে আর একটা রাজ্যে গিয়া উপনীত হয়।"

ভগবানের এই যে অবিশ্রান্ত আহ্বান যুগ যুগ ধরিয়া ধ্বনিত হইতেছে ও জীব কোন এক অদৃষ্ট সৌভাগ্যবশতঃ তাহা ক্ষণে ক্ষণে শুনিতে পাইতেছে, ইহা কবিকে বিস্মিত করিয়াছে—

"কি জানি কেমন করে জ্বালায়ে রেখেছ ঐ
অপূর্ব্ব প্রদীপখানি"

এই যে উপলব্ধি হইতেছে অথচ তাহার কারণ বুঝা যাইতেছে না, ইহারই নাম Mysticism বা রহস্যানুভূতি—ইহাই তুরীয় চৈতন্যের স্ফুরণ।

আত্মোপলব্ধির প্রচেষ্টা

ভোগে তৃপ্তি আসে নাই, বিরক্তিতেও হৃদয় শান্ত হয় নাই। রাবণের চিতা বুকের মধ্যে পুষিয়া কবি অপরের হৃদয় জ্বালা মিটাইতে গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নিজের অন্তর শান্ত হয় নাই, জীবন সার্থক হয় নাই। হতাশার ব্যর্থ আক্ষেপে কত ক্রন্দনই না তিনি করিয়াছেন, কিন্তু শূন্য হৃদয়ের ক্রন্দনেও জীবনের তাপ ও মলিনতা বিধৌত হয় নাই; তাই কবি আর্ত্ত হইয়া ভগবানের নিকট আত্মনিবেদন করিয়াছেন। তাহারই ফলে রহস্যানুভূতির যে স্বপ্নালোকে তিনি কবিজীবনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন তাহাই ভাস্বর হইয়া উঠিল। কবি সাধনার পথ এতদিনে দেখিতে পাইলেন—বাহিরের খোঁজা বন্ধ হইয়া গেল, অন্তর দুয়ারের নিশানা মিলিল—

ভুবন ভ্রমিয়া এলি
কোথাও কি পেলি ?
মিছে তবে কেন তুই
ঘুরিয়া বেড়াস।
সুখ হীন শান্তি হীন
ঘুরিয়া বেড়াস ;
আপন হৃদয়ে তবু
খুঁজেছিস কভু ?
আপন মরমতলে
পাস কিনা পাস—
সকল ভুবন ঘুরি
যারে তুই চাস।

কিন্তু "মালাতে" কবি আত্মোপলব্ধির যে পথ লইলেন তাহাকে তখন সবলে আঁকড়াইয়া ধরিলেও পরবর্ত্তী কালে অনন্তের নিবিড় পরশ পাইয়া তিনি তাহা ত্যাগ করিয়াছেন। "আত্মানম্ আত্মনা উদ্ধরেৎ" এই বাণীর উপর নির্ভর করিয়া কবি এখনও বলিতেছেন—

"ভয় নাই, ওরে মন কররে নির্ভর
অন্ধ ভারাক্রান্ত এই আপনারই পর"

অনন্তের সম্মুখে

কল্পলোকের দ্যুতি আসিয়া কবির নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে। তিনি সাধনার পথ-খানিকে দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু তখনও তাঁহার মন "অন্ধভারাক্রান্ত"—তাহাকেই আশ্রয় করিয়া কবি আত্মানুসন্ধান করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। তিনি অনন্তের সম্মুখীন হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে সাধকের এ অহঙ্কার-প্রতিষ্ঠ আত্মনির্ভরতা কত ক্ষুদ্র। বিরাটের অনুভূতির আলোকে তাঁহার নিকট গত জীবনের সমস্ত কার্য্য ও চিন্তাই তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র বোধ হইল। তিনি সাগর সঙ্গীতে বলিলেন—

"ছোট ছোট দীপ লয়ে খেলিতেছিলাম
গুণ গুণ গাহি গান ঘরের ভিতরে
ক্ষুদ্র প্রাণে আনমনে আঁকিতেছিলাম
ছোট ছোট স্বপ্ন-ছবি প্রদীপের করে
তোমারে ভুলিয়াছিনু হে সিন্ধু, আমার
আপনার স্বপ্নলব্ধ ক্ষুদ্র খেলাঘরে,
আলস্যে রচিত মোর পুষ্পমালিকায়
তুলিয়া ধরিতেছিনু ক্ষুদ্র দীপকরে।
যেমনি ডাকিলে তুমি গভীর গর্জ্জনে
অনন্ত রাগিণী ভরা ধ্বনিতে তোমার—
হৃদয় মন্থনভরা বিপুল তর্জ্জনে
ভেসে গেল অন্তরের এপার ওপার—
ভাঙ্গিল সে খেলাঘর প্রদীপ নিভিল
আমারে তোমার বক্ষে ডুবাইয়া দিল।

সমুদ্রের রূপ কতশত কবিকে কত বিচিত্রভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। অনন্তের সহোদর বলিয়া কত কবি তাহাকে অভিনন্দন করিয়াছেন. কিন্তু সাধারণ কবিগণ অপেক্ষা চিত্তরঞ্জনের সমুদ্রের অনুভূতি পৃথক। সমুদ্রের মধ্যে অন্যান্য কবির ন্যায় তিনিও অনন্তের রূপই দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু সমুদ্র তাঁহার জীবনকে যেমন করিয়া ফুলাইয়া তুলিয়াছে, এমন অতি অল্প কবিকেই করিয়াছে। ভাব-বিলাসী কবিদের ন্যায় তিনি উপমার বাহুল্য প্রকাশ করিয়া সমুদ্রকে উপলব্ধি করেন নাই। ভগবৎ

সাধনার পথপ্রদর্শক বলিয়া, গুরু ও অগ্রজ বলিয়া স্বীকার করিয়া তিনি সাগর-সঙ্গীত শুনিয়াছেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন—

"আমার পরাণ ছিল কুঁড়ির মতন
তোমার সঙ্গীতে তারে ফুটালে কেমন"

প্রেম একদিন মূর্ত্তিমান হইয়া আসিয়া নীলাচলের অশান্ত কল্লোলের মধ্যে ভাবরাজ্যের অপূর্ব্ব সম্পদগুলি উপলব্ধির ছলে মর্ত্ত্যজনকে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। সুখ দুঃখ যখন তাঁহার নিকট সব এককার হইয়া যাইত, বিশ্বের চিরজাগ্রত বিরহের উন্মাদনায় যখন তিনি আকুল হইয়া উঠিতেন তখন সমুদ্রের অশান্ত বক্ষে ঝাঁপ দিয়া হৃদয়-জ্বালা জুড়াইতেন। সমুদ্রের রূপ দেখিতে দেখিতে জানি না কবি চিত্তরঞ্জনের চিত্তে তাঁহার আরাধ্য দেবতার সেই লীলা ভাসিয়া উঠিয়াছিল কিনা—কিন্তু তিনিও সাগর-সঙ্গীতে এমন এক ভাবলোকে পৌঁছাইয়াছিলেন, যেখানে সুখ ও দুঃখের অনুভূতির তারতম্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না, সাগর-সঙ্গীত আজ তাঁহার মনে এ কোন উপলব্ধি আনিয়া দিল, আর তাহা লইয়াই বা তিনি কি করিবেন কোন্ প্রয়োজন ইহা সাধন করিবে?—

"কোথায় রাখিব আজি এ সুখের ভার
কারে দিব আজি মোর অশ্রু উপহার"

অনন্ত সমুদ্রের বুকে অনন্ত আকাশের ছায়া পড়িয়াছে, কবির চিত্ত অনন্তের ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনিও বুঝিতেছেন—

—"আমারও অন্তরতলে মুক্তচিদাকাশ
অনন্তের ছায়া ভরা আমার পরাণ

যে মন এতদিন "অন্ধ ভারাক্রান্ত" ছিল—যাহা সংশয় হইতে সংশয়ান্তরে তাঁহাকে ঠেলিয়া লইতেছিল, আজ তাহাই মুক্ত চিদাকাশ বলিয়া কবি অনুভব করিলেন।

এই আনন্দে কবি উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন, অনন্তের মধ্যে ডুব দিয়া আরও রত্নাহরণ করিবার আশায় কবি বলিতেছেন—

তবে দাও দাও মোরে আরও ডুবাইয়া
সঘন তিমির তুলি দাও বুলাইয়া।"

ক্ষণে ক্ষণে সমুদ্রের রূপের পরিবর্ত্তন হইতেছে। তাহার শান্ত, মধুর ও রুদ্র সকল অবস্থাই কবি সস্পৃহ নয়নে চাহিয়া দেখিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মনে একইভাব ঘুরিয়া আসিতেছে। তাহার রুদ্ররূপ দেখিয়া কবি ভীত হয়েন নাই। কিন্তু রুদ্রের সাধন তাঁহার অন্তরের ধন নহে।

সাগর-সঙ্গীতে চিত্তরঞ্জন আর একটি নূতন অনুভূতি পাইয়াছেন, সেটি হইতেছে প্রকৃতির সহিত মানবাত্মার নিবিড় সম্বন্ধ।

"অনাদি অনন্ত নিত্য মহাপ্রাণ হতে
দুজনে এসেছি যেন দুটি প্রাণ স্রোতে।
তারপর কতবার জনমে জনমে
আমরা মিলেছি দোঁহে মরমে মরমে।
কতবার ছাড়াছাড়ি মিলেছি আবার
তুমি আর আমি আজ ওগো পারাবার"

কবির নিকট সমুদ্রের সঙ্গীত বিরাটের নিরন্তর আহ্বান বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। সমুদ্র ভাবগম্ভীর মহাসাধক, তাই কবি তাহাকে বলিতেছেন—

দীক্ষা দাও ওগো গুরু,
মন্ত্র দাও মোরে
পূজার সঙ্গীতে তব
প্রাণ দাও ভরে।

কি মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহাও কবির অনুভূতি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়—

"হরিবোল হরিবোল করতাল বাজে যেন
হৃদয়ে বাজেনি কভু গভীর মৃদঙ্গ হেন।"

এই অভিনব মন্ত্রেদীক্ষিত হইয়া কবি বৈষ্ণবীয় ভাব-সাধনায় নিমগ্ন হইলেন।

অন্তর্যামী

গুরু হৃদয়-অন্ধকার দূর করিয়া অন্তরের আলোক দেখাইয়াছেন। অনন্তের প্রতিমূর্তি সমুদ্রের সংস্পর্শে আসিয়া কবির অন্তর নির্মল হইয়াছে, ভাব ঘনীভূত হইয়াছে। এইবার তিনি অন্তর্যামীর অনুসন্ধানে বৈষ্ণবের আর্তি ও ব্যাকুলতা লইয়া বাহির হইয়াছেন। অন্তর্যামীতেই চিত্তরঞ্জনের কবি-জীবনের পূর্ণ পরিণতি। শব্দে পদে ও ছন্দমাধুর্যে সাগর-সঙ্গীত অধিকতর প্রীতিকর হইলেও অন্তর্যামীতে চিত্তরঞ্জনের আত্মানুসন্ধানের সাধনার মূল রহস্য নিহিত রহিয়াছে। মালঞ্চ, মালা ও সাগর-সঙ্গীত যাহার উপোদ্‌ঘাত মাত্র, অন্তর্যামী সেই রহস্যানুভূতির পরিপূর্ণ বিকাশ। কবিজীবনের গুহ্যতম রহস্য এই গ্রন্থেই প্রকাশ পাইয়াছে।

এখন আর কবিকে সান্ত বা অনন্তের প্রতীক-স্বরূপ বাহিরের কোন বস্তুকে অবলম্বন করিয়া

ভাবকে প্রকাশ করিতে হয় না। এখন এমন এক স্তরে তিনি উপনীত হইয়াছেন যেখানে আত্মিক অনুভূতি তাঁহার নিকট স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

"কেমনে লাগিয়া গেছ মনতটে
কেমনে ছড়ায়ে গেছ আঁখিপটে
সকল দরশ মাঝে তুমি উঠ ভেসে।"

হৃদয়ভরা ব্যাকুলতা লইয়া কবি এবার অন্তরের মাঝে অন্তর্যামীকে খুঁজিতেছেন। ভগবানের বাণী তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেছে, হতাশার মাঝে আবার আশার আলোক আঁকিয়া দিতেছে। কোন দুঃখ কোন কষ্ট এবার আর তাঁহাকে সাধনপথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। তিনি এবারে জোর করিয়া বলিতেছেন—

"চরণে বিঁধুক কাটা তাহে ক্ষতি নাই"

পাগলিনী রাধার মত সময়ে সময়ে বিরহের দুঃসহ জ্বালায় তাঁহার অন্তর গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে। সে বিরহের দুঃখ ভাষায় প্রকাশ করিবার নহে, শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ও "যাহা প্রাণনাথ মোর মুরলীবদন কাঁহা পাও কাঁহা পাও মুরলীবদন" মাত্র বলিয়া সেই বিরহকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভাব যখন ঘন হইয়া আসে, ভাষা তখন স্তব্ধ হইয়া যায়, এক বিরাট হাহাকারে কবির হৃদয় কেমন করিয়া ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহাই তিনি বলিতেছেন—

এত করি চাপি বুক তবু হাহাকার
ছিঁড়িয়া হৃদয় মোর উঠে বার বার
সে শুধু তোমারি তরে তোমাপানে ধায়—
তোমারে না পেয়ে মোর বুক গরজায়।

একমাত্র বৈষ্ণব কবিতা ছাড়া এ দুঃখ-প্রকাশের ভাষার আর তুলনা হয় না। ইহা সেই চণ্ডীদাসের—

"এই হিয়া দগ দগি পরাণ পোড়ান
কি দিলে হইবে ভাল"

ইহার মধ্যে কোন উপমা, কোন অলঙ্কারের প্রকাশের অবসর নাই। মরমী কবি অনুভবী পাঠকদের নিকট কেবল এই ভাবেই নিজেকে প্রকাশ করিতে পারেন। মরমী কবিদের হাতে পড়িয়া কবিতা এখানে এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

এই বিরহের জ্বালায় কবি সময় সময় পাগল হইয়া যাইতেছেন। ইহার ভার আর তিনি সহ্য

"তোমার প্রেমে এত জ্বালা আগে নাহি জানি
চোখের জলে ভেসে ভেসে আজি হার মানি"

এই জ্বালার ভিতরেও আনন্দের রেশ আছে, তাই কবি ইহাকে ছাড়িতেও পারিতেছেন না। এই দুঃখ জ্বালার স্বরূপ কি তাহা কবি নিজেই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন "সুখ যখন রূপান্তর হইয়া ভাগবত সত্যে ফুটিয়া উঠে তখন তাহা সুখ নয় এবং দুঃখ যখন ভাগবত সত্যে গিয়া পৌঁছায় তখন তাহা দুঃখ নয় সুখ।" এইরূপ আকুলতার ফলে তিনি অন্তরের ছায়ালোক ও তথায় নিভৃত মন্দির দর্শন করিলেন। সেই মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিলেই গুহাহিতং পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। জীবন কৃতার্থ হয়। অন্তরের মধ্যে তিনি চিরবিরাজমান থাকিলেও কবি যে সধনপথ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা অনুসরণ না করিলে তাঁহার দেখা পাওয়া যায় না—তাই কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

এষু সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ

সেই মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে কেবলমাত্র নিজের সাধনের অহঙ্কারে প্রবেশ করা যায় না। সাধক ও ভক্তগণের চরণাশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তাই কবি বলিতেছেন—

"সে পথের হইতাম ধূলিকণা যদি
আঁকড়িয়া থাকিতাম তারে নিরবধি।"

ধূলা হওয়ায় সার্থকতা কোথায়? ভক্ত মহাজন যখন সেই পথে যাইতেন তখন তাঁহাদের চরণ-তলায় আশ্রয় পাইতেন। তারপর—

একদিন অকস্মাৎ কম্পিত পরাণে
তারি পায় উঠিতাম মন্দির সোপানে
কি গান যে গাহিতাম
হাঁসিতাম কাঁদিতাম
চরণের ধূলা হয়ে মন্দির-সোপানে।

কিন্তু সাধনপথে অগ্রসর হইয়া তিনি দেখিলেন যে তাঁহার গত জীবনের সংস্কাররাশি প্রাপ্তির পথে বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইতেছে। মালঞ্চে যে লালসাময় ভালবাসার কথা কবি বলিয়াছেন, তাহাই আজ প্রেমেরস্বরূপ বুঝিতে দিতেছে না।

"ওই ওই ওই সেই ব্যর্থ ভালবাসা
দীর্ণ হৃদয়ের সেই প্রমত্ত পিপাসা

ওই ওই আসে মোর পানে চেয়ে—
ভীষণ ভৈরবদল ওই আসে ধেয়ে

এই ভয় হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তিনি একান্ত মনে ভয়হারীকে ডাকিতেছেন। তাঁহার সে ডাকে ভগবান সাড়া দিলেন।

কবির পূর্ণ উপলব্ধি হইল, তিনি বলিলেন—

"নাইক আঁধার কোন আমার আঁখির পরে।"

Pilgrim's Progress ও বৃহদ্ভাগবতামৃতে সাধকের ভগবৎ-প্রাপ্তির নানা স্তর রূপকাকারে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু চিত্তরঞ্জন রূপকের সমস্ত আবরণ খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া বিরাটের দিকে নগ্ন আত্মার অভিসার বর্ণনা করিয়াছেন। বিশ্বসাহিত্যে ইহা অতুলনীয়।

কিশোর কিশোরী

অন্তরের দুয়ার যখন খুলিয়া গিয়াছে, প্রেম তখন কবির ললাটে জয়টীকা পরাইয়া আপনার দীপ্তমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইল। লালসার স্রোতে ভাসমান যে কবি একদিন বলিয়াছিলেন—

আমার এ প্রেম শুধু রক্তের লালসা

বহুবর্ষ পরে তিনিই আবার বলিলেন—

"কোন মহাদেবতার
মহামিলনের তরে
মিলেছি আমরা"

প্রেম এখন আর তাঁহার নিকট আকস্মিক পুলক চঞ্চলতা মাত্র নহে, এখন তিনি বুঝিয়াছেন যে সত্য প্রেমের ঐ যে একটি মুগ্ধ দৃষ্টিপাত, তাহা শুধু ক্ষণিকের ঘটনা নহে, যুগযুগান্তের আয়োজন তাহার পিছনে রহিয়াছে—

অনিত্য কালের মাঝে একটি নিমেষ
থমকি থমকি যেন আনন্দে অশেষ
ফুটল গৌরবভরে চির নিত্য হয়ে॥

কীর্ত্তন

প্রেমের এই স্বরূপ যখন তাহার নিকট প্রকাশ পাইল, তখন অন্তর তাঁহার শুধু কীর্ত্তনে ভরিয়া গেল। ভজন গাহিতে গাহিতে তিনি এমন এক ভাবরাজ্যে উপনীত হইলেন যে কোন আবরণ আর

তাঁহার সহ্য হইল না, তিনি আপনার নগ্ন স্বপ্রকাশরূপে শ্রীহরির নিকট উপস্থিত হইবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন—এইখানেই তাঁহার গীতি কবিতার অবসান ।

চিত্তরঞ্জনের গীতি-কবিতা আকাশরঞ্জিনী নহে ইহা তাঁহার সাধনার প্রত্যক্ষ ইতিহাস। সেই ইতিহাসের কয়েকটি অধ্যায় আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি, কিন্তু মরমী না হইলে এ মরমের কবিতা বুঝা যায় না—

"পর কি জানয়ে পরের বেদন
সে রত আপন কাজে
চণ্ডীদাস বলে মনের ভিতরে
কভু কি রোদন সাজে"

বাংলার মন আজ বহির্মুখী তাই চিত্তরঞ্জনের অন্তরের এ ক্রন্দন যেন অরণ্যে রোদন হইয়াছে তাঁহার গীতি কবিতার যথার্থ সমাদর হয় নাই ।*

স্থায়িত্ববাদ

[টেনিসনের "Nothlng wll die" এর অনুবাদ ।]

কবে, পাহাড় হইতে নামিতে নামিতে
থামিবে তটিনী-জল-ধারা ?
কবে, আকাশের পথে ছুটিতে ছুটিতে
পবন হইবে গতি-হারা ?
কবে মেঘ থেমে যাবে ভাসিতে ভাসিতে,
হৃদয়-স্পন্দ শ্বসিতে শ্বসিতে,

[illegible]

লুপ্ত হইবে বিশ্ব-ভুবন,
খসিয়া পড়িবে গ্রহ-তারা ?
তা নয়, তা নয়—মরিবে না কেহ,
হবে না, হবে না, কিছুই হারা।
তটিনী ছুটে যাবে, র'বে প্রভঞ্জন,
ভাসিবে মেঘ-মালা, হৃদয়ে স্পন্দন,—
হবে না, হবে না কিছুই হারা।

শীত যাবে চলি,' বসন্ত আসি'
ফোটাবে মুকুল ডালে ডালে ;
সৃষ্ট হয়নি কোন দিন ধরা,
ধ্বংস হবে না, কোন কালে।
সন্ধ্যা-সকাল শীত-গ্রীষ্মের মত
পরিবর্ত্তন হবে তার অবিরত,
অনন্ত-কাল-প্রবাহে ভাসিয়া
ভাঙিয়া চুরিয়া গঠিত হইয়া
ছুটিবে বিশ্ব নাচিয়া নাচিয়া
উর্ম্মির মত তালে তালে।
জন্ম হয়নি কোন দিন কারো,
মৃত্যু হবে না কোন কালে।

শ্রীপ্রসাদদাস রায় বি-এ,

অস্থায়িত্ববাদ

[টেনিসনের "All things will die" এর অনুবাদ।]

পাহাড় হইতে কুলু কুলু করি'
বহিছে তটিনী-জলধারা।
ছুটে সুগন্ধ মলয় পবন
করি' দশ দিক মাতোয়ারা।
একে একে ওই সাদা মেঘগুলি
ভাসিয়া চলেছে গগন 'পরে।
বসন্ত বায়ে সকল হৃদয়
স্পন্দিছে আজ হর্ষ ভরে।
তবু, ধ্বংস হইবে চরাচর!
তটিনী থামিবে বহিতে বহিতে,
পবন থামিবে ছুটিতে ছুটিতে,
মেঘ থেমে যাবে আকাশের পথে,
হৃৎ-স্পন্দন বক্ষোপর।
ধ্বংস হইবে চরাচর!

গর্ব্বিত নর! মৃত্যু দাঁড়ায়ে তব দ্বারে।
বসন্ত আর সাজিবে না ফুল-সম্ভারে।
হের ঐ সব আত্মীয়গণ
যেতেছে ছাড়িয়া প্রমোদ-ভবন।
পড়িয়াছে ডাক, হইবে যাইতে—
চির আঁধিয়ারে হইবে ডুবিতে।
পাখীর কাকলি থামিয়া গিয়াছে,
আনন্দ-রোল স্তব্ধ হ'য়েছে,
মলয় পবন বহিবে না আর কান্তারে
গর্ব্বিত নর! মৃত্যু দাঁড়ায়ে তব দ্বারে।

মৃত্যুর ডাক ওই শুন আসে,
প্রতি-মুহূর্ত্তে মৃত্যুর ত্রাসে
দন্ত পড়িছে খসিয়া খসিয়া,
গণ্ড যেতেছে মলিন হইয়া,
সবল অঙ্গ যায় শিথিলিয়া,
চক্ষু ঢুকিছে কোঠর গ্রাসে।
বিদায়—বিদায় প্রিয়-জনগণ!
বিদায় নিতেছি সবার পাশে।

সৃষ্ট হ'য়েছে এ প্রাচীন ধরা,
ধ্বংস হইবে একদিন।
অনন্ত-কাল-গর্ভে তখন
সন্ধ্যা-সকাল হইবে লীন।
সৃষ্ট হ'য়েছে সমুদয়,
সকলেই তার হবে লয়,
মৃত্যু তোমার সুনিশ্চয়,
তুমি, ফিরিবে না আর কোন দিন।
সৃষ্ট হ'য়েছে এ প্রাচীন ধরা,
ধ্বংস হইবে এক দিন।

বিবিধ প্রসঙ্গ ও গ্রন্থ সংবাদ

ইংলণ্ডে দর্শন-চর্চ্চা—

গত দুই বৎসরে ইংলণ্ডের দুইজন খুব বড় দার্শনিক পরলোক গমন করিলেন। এফ্, এইচ্, ব্র্যাড্লে (F. H. Bradley) আর বার্ণার্ড বোসাংকোয়েট্ (Bernard Bosanquet)। ইংরাজ জাতির তত্ত্বচিন্তা (Metaphysical Thought) এই দুইজন পণ্ডিতের দ্বারা খুব উচ্চস্তরে আসিয়া

পড়িয়াছে। একশত বৎসর পূর্ব্বে, আমাদের রাজা রামমোহন ভারতের ও ইংলণ্ডের দার্শনিক চিন্তার তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের দর্শন শাস্ত্র খুবই অগভীর। তাহার পর গত একশত বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের দর্শন শাস্ত্র এতই উন্নতিলাভ করিয়াছে, যে, ভারতীয় চিন্তার কাছাকাছি আসিয়া পৌছিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য সাধনের দিক্ হইতে দেখিলে ভারতের দর্শন এখনও এত উচ্চ যে তাহার সহিত কাহারও তুলনা হয় না। কিন্তু ইংলণ্ডের নব্য-দার্শনিকগণ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এমন পরিস্কারভাবে ও সঠিকভাবে ব্যক্ত করিতেছেন, বিচারণা এমন নিপুণ ভাবে চালাইতেছেন যে তাঁহারা এখন আমাদের গুরুস্থানীয় হইয়া পড়িয়াছেন। ব্র্যাড্‌লি ও বোসাংকোয়েট্ উভয়েই অদ্বৈতবাদী Monist. উভয়েরই মত আমাদের শঙ্করাচার্য্যের অনুরূপ। ব্র্যাড্‌লিকে শঙ্করাচার্য্যের অংশাবতার বলিলেও হয়। শঙ্করেরই মত, আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে তিনি পরিব্যক্ত করিয়াছেন। শঙ্করের সিদ্ধান্ত আর ব্র্যাড্‌লির সিদ্ধান্ত একইরূপ। দেশ, কাল, দ্রব্য (Substance), গুণ, ব্যক্তিত্ব (Personality) প্রভৃতি কেবল প্রতীতিমাত্র (Mere Appearances) একমাত্র সত্য Reality, পরব্রহ্ম The Absolute,এই পরব্রহ্ম চিদানন্দ Experience and Happiness। ব্র্যাড্‌লি তাঁহার রচনায় কোনও স্থানে শঙ্করাচার্য্যের নামোল্লেখ করেন নাই। হয়ত তিনি প্রত্যক্ষভাবে শঙ্করের নিকট ঋণী নহেন; প্রাচীন গ্রীস্ ও নব্য জার্ম্মাণীর অদ্বৈত বাদীগণের মতের অনুবর্ত্তন করিয়াই হয়ত তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ব্র্যাড্‌লি যেমন শঙ্করাচার্য্যের অনুরূপ, বোসাংকোয়েট্ সেইরূপ পঞ্চদশী রচয়িতা বিদ্যারণ্যের সহিত তুলনীয়। ব্র্যাড্‌লির শেষ গ্রন্থের নাম Essays on Truth and Reality (সত্য ও নিত্যবিষয়ক প্রবন্ধাবলী)। এই গ্রন্থে তিনি প্রকারান্তরে পুরুষবাদের সত্যতা (The truth of Divine Personality) ও মানবাত্মার অমরত্ব (Human Immortality) স্বীকার করিয়াছেন। বোসাংকোয়েট্ বলেন মানবীয় ব্যক্তিত্ব (Human Personality) দেহের উপর নির্ভর করিতেছে। কাজেই ইহার নিত্যতা কোথায়? দেহ ধ্বংস হইলে মানুষ পরমাত্মায় (The Absolute) মিশিয়া যাইবে এবং সেই অবস্থায় নিত্য-জীবন লাভ করিবে।

ব্র্যাড্‌লি ও বোসাংকোয়েট্ উভয়েই ধর্ম্মবিশ্বাসী দার্শনিক, তাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের দার্শনিক সাধনার প্রভাবে নাস্তিকতা দূরীভূত হইবে এবং মানুষ ধর্ম্মবিশ্বাসী হইবে। কিন্তু ক্রমশঃ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বুঝিতেছেন, তাহা হইবে না, ফল ঠিক্ বিপরীত হইবে। তাঁহাদের দার্শনিক চিন্তার ফলে ধর্ম্ম ধ্বংস হইয়া যাইবে। প্রকৃত ধর্ম্ম বা উপাসনা, জীব ও ঈশ্বরের, সসীম ও অসীমের, ভক্ত ও ভগবানের চিরন্তন প্রভেদের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই দুইজন দার্শনিকের মতে জীব ও ঈশ্বরে সত্য করিয়া প্রভেদ নাই, যে প্রভেদ আছে তাহা প্রতীতি মাত্র (Mere Appearance)।

কাজেই যে ধর্ম্ম ও যে দার্শনিক চিন্তা এই পরমাত্মার প্রতিষ্ঠা করে, তাহাও নিত্য নহে প্রতীতিমাত্র। ব্র্যাড্‌লির বিখ্যাত গ্রন্থ Reality and Apperance (সত্য ও প্রতীতি) ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই সময় হইতেই চিন্তা-জগতে এক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। ব্র্যাড্‌লির এই নব্যদর্শনের প্রতিবাদ বিভিন্ন প্রকারের অধিষ্ঠান ভূমি (Standpoints) হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে। এই সব প্রতিবাদ-আন্দোলনের ফলে নূতন নূতন দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সব মতবাদের আলোচনা করিলে স্বভাবতঃই আমাদের ভারতের কথা মনে পড়িয়া যায়। ভারতবর্ষে শঙ্করাচার্য্যের মত প্রচারিত হওয়ার পরে, তাঁহার নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদের প্রতিবাদকল্পে যে সকল মতবাদ জাগিয়া উঠিয়াছিল, বর্ত্তমান ইংলণ্ডেও ঠিক্ সেইরূপ হইয়াছে। শঙ্করের মতের প্রতিবাদরূপে আমাদের দেশে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও শ্রীজীব গোস্বামীর অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের উদ্ভব হইয়াছিল। সেইরূপ ইংলণ্ডে পূর্ব্বোক্ত দুইজন দার্শনিকের অদ্বৈতবাদ নিরসন করিবার জন্য খৃষ্টীয় ভাবুকতা (Christain Idealism) নানা মূর্ত্তিতে জাগিয়া উঠিয়াছে। লর্ড হাল্‌ডেন্, অধ্যাপক প্রিংগ্‌ল্ প্যাটিসন্, আর হেন্‌রি জোন্‌স্ ইঁহারা ইংরাজ। আর অধ্যাপক জোসিয়া রইস্ মার্কিন। ইঁহারা পূর্ব্বোক্ত মতের প্রতিবাদী। ইঁহাদের ভাববাদ বা Idealism অদ্বৈতবাদের খুবই কাছাকাছি। আর একজন প্রতিবাদী এডিন্‌বরার অধ্যাপক ফ্রেজার। ঈশ্বরবাদের দার্শনিকত্ব (Philosophy of Theism) সম্বন্ধে তাঁহার গিফোর্ড বক্তৃতাগুলি পড়িলে খুব ভাল করিয়াই বুঝিতে পারা যায়, ইংলণ্ডে ব্র্যাড্‌লি ও বোসাংকোয়েটের মতের প্রতিবাদ ঠিক্ কি প্রকারে হইতেছে। ফ্রেজারের গ্রন্থ পাঠ করিলে মধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদের কথাই মনে হয়।

বহুত্ববাদ (Pauralism) বর্ত্তমান সময়ের একটি সুপ্রসিদ্ধ মতবাদ। ইহাও পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈত মতের সুপ্রবল প্রতিবাদ। ইংলণ্ডে অধ্যাপক ওয়ার্ড আর মার্কিনে অধ্যাপক জেমস্ (অধুনা মৃত) এই মতের প্রচারক। তাঁহারা বলেন অসংখ্য অমর জীব (Eternal Selves) আছে। আর একজন আছেন, তিনি তাঁহাদের নেতা, পরিচালক ও আদর্শ। কোন কোন বহুত্ববাদী বলেন, এই এক নিত্য পুরুষের সহিত অন্যান্য অপূর্ণ পুরুষের সম্বন্ধ আছে। এই মত আমাদের সেশ্বর সাংখ্য বা পাতঞ্জল দর্শনের অনুরূপ। পাশ্চাত্য বহুত্ববাদীগণ পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

আর একটি মত আছে তাহা পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতবাদ বা Monistic Absolutism হইতে খুবই পৃথক্। এই মতের নাম 'নব্য বাস্তববাদ' Neo-Realism। বার্‌ট্রাণ্ড রাসেল্ ইংলণ্ডে এই মতের প্রতিনিধি। তাঁহারা 'বাস্তববাদী', কারণ তাঁহারা বলেন যাহা কিছু আছে সমস্তই একটি সাধারণ পদার্থ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, আর এই পদার্থটি স্বরূপতঃ জ্ঞানময় (essentially conscious) নহে।

এই 'বাস্তববাদ' প্রাচীন জড়বাদ হইতে পৃথক্। প্রাচীন জড়বাদ এখন আর নাই। নব্যবাস্তববাদীরা স্বীকার করেন মূল জড়ের বা ভূতের মধ্যে মন বা চৈতন্য বীজরূপে (in a germinal condition) আছে।

ভারতের ও ইংলণ্ডের অদ্বৈতবাদের ভিতর একটা বিষয়ে খুব বড় রকমের পার্থক্য আছে। ভারতের অদ্বৈতবাদীগণ জন্মান্তরে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহারা জানিতেন বহু বহু জন্মের পর সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি হইলে জীব ব্রহ্মে লীন হইবে বা মুক্ত হইবে। কিন্তু ইংলণ্ডের অদ্বৈতবাদীগণ বলেন মৃত্যুর পরেই জীব পরব্রহ্মে মিশিয়া যাইবে। কাজেই ইংলণ্ডের অদ্বৈতবাদের ধর্ম্মের দিক্ হইতে কোনই মূল্য নাই, আর ভারতের অদ্বৈতবাদের মূল্য খুব বেশী।

ব্র্যাড্লি ও বোসাংকোয়েট্ ধর্ম্মপ্রাণ লোক ছিলেন, কারণ তাঁহারা খৃষ্টীয় প্রভাবের মধ্যে জন্ম-গ্রহণ করিয়া লালিতপালিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মতের অনুবর্ত্তী অনেকেও এই কারণে স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রাণ। ইঁহারা মনে করেন এই অদ্বৈতমতের দ্বারা ধর্ম্মভাবের বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা হইবে না। এই মত সত্য হইলে মানুষ ধর্ম্মজীবন বা নৈতিক জীবনের জন্য চেষ্টান্বিত কেন হইবে? আমাদের পবিত্রতম আকাঙ্ক্ষা ও জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য যাবতীয় সাধু চেষ্টা যখন কিছুই নহে, এক নিস্তব্ধতার মধ্যে যখন সকলেরই অবসান, তখন এই মতে ধর্ম্ম বা নীতির স্থান কোথায়, উপাসনা বা আরাধনারই বা স্থান কোথায়।

জন্মান্তরবাদ ও অধিকারভেদ ছিল বলিয়াই ভারতীয় অদ্বৈতবাদ কিছুকাল ধর্ম্মের ভিত্তিরূপে কাজ করিতে পারিয়াছিল। পরে এই অদ্বৈতবাদেরও প্রতিবাদ হয়, ইংলণ্ডেও ঠিক্ তাহাই হইবে এবং তাহার সূচনাও দেখা যাইতেছে।

১। গোলাপকুমারী—[সামাজিক দৃশ্য কাব্য। শ্রীসুরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষাল বি, এল্, প্রণীত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি আকারের ২২২ পৃষ্ঠা গ্রন্থ। কলিকাতা, কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট্, শিশির পাবলিশিং হাউস্ হইতে প্রকাশিত।] গ্রন্থকার কেন এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা প্রারম্ভেই নিবেদন করিয়াছেন। বৈবাহিক ব্যাপারে দিন দিন ভীষণ কাণ্ড ঘটিতেছে। "এই অত্যাচারে কত কত সুকুমারমতি অনূঢ়া বালিকা অকালে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া পরলোক গমন করিয়াছে, আর কত শত হিন্দু পিতামাতা অসমর্থ উৎপীড়িত হইয়া ভীষণ ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িতেছে, ও কেহ কেহ বা একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। এই নিদারুণ অত্যাচার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও সমাজ এখনও ঔদাস্যভাব অবলম্বন করিয়া বসিয়া আছে, কাহারও উপর কাহারও সহানুভূতি একেবারে নাই। এরূপ সমাজকে কি বলিয়া বর্ণনা করা যায়? স্বার্থত্যাগী না স্বার্থপর? স্বচক্ষে এই নিদারুণ

হইবে, এরূপ আশা করাই অন্যায়; তবে অন্তরের আবেগে যে সব কথা বাহির হইয়াছে, তাহাই আপনাদিগকে জানাইবার জন্য পুস্তকখানি মুদ্রাঙ্কিত করিলাম।" নাটকখানি বিয়োগান্ত, সামাজিক অধঃপতনের যেথাকারস্তম্ভে অনূঢ়া বালিকার আত্মবলিদান। সমাজের বাস্তব চিত্র প্রতি অঙ্কে ও প্রতি দৃশ্যে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাশ করা পাত্র, পাত্রের বাপ, পাত্রের মা, গ্রাম্য মুরুব্বি, প্রত্যেক চিত্রই নিখুঁত। নাটকখানি পড়িবেন, কাঁদিবেন, হাসিতে হাসিতে কাঁদিবেন; শেষ হইলে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিবেন, "উপায় কি?"

২। বিধবা-বিবাহ—শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন ধর্ম্মভূষণ বি, এল্. প্রণীত, গৌহাটি সনাতন ধর্ম্মসভা হইতে গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। গৌহাটি সনাতন ধর্ম্মসভা হইতে "সমাজ-সেবক" গ্রন্থমালা নাম দিয়া পূর্ব্বে আরও ছয়খানি গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। সেগুলির নাম বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তিনিরাস, হিন্দুর উপাসনাতত্ত্ব, হিন্দুর বিবাহসংস্কার, হিন্দুর উপাসনাতত্ত্ব ২য় ভাগ, ভট্টদেবের কথাগীতা, সঞ্জয়ের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের একটি প্রশ্ন। শেষের গ্রন্থ দুখানি প্রাচীন আসামী গ্রন্থ। আলোচ্য গ্রন্থখানি সপ্তম। কটন কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বেদ ও বেদান্তশাস্ত্রী এম্, এ, মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে একদল লোক, আর কোন কাজ নাই বলিয়াই হউক, অথবা আসর শীঘ্র শীঘ্র ভালরূপ জমিয়া উঠে বলিয়াই হউক, বিধবা-বিবাহের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। লাহোরে 'বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সমিতি' বলিয়া একটি সমিতি আছে, সেই সমিতির অনেক টাকা আছে। টাকা যখন আছে, তখন তাহাদের এজেন্টও আছে। সেই সমিতিতে বিধবা পাঠাইবার জন্য বাঙ্গালাদেশে নির্য্যাতন পর্য্যন্ত হইয়াছে বলিয়া খবরের কাগজে সংবাদ বাহির হইয়াছে। সমাজ-সংস্কার একটি সুবিধাজনক পেশা হইয়া পড়িয়াছে।

এই প্রকারের দুর্দ্দিনে গৌহাটি ধর্ম্মসভা এই সারগর্ভ, সুযুক্তি ও শাস্ত্রীয় সুসিদ্ধান্ত-পূর্ণ এই সদ্গ্রন্থখানি প্রচার করিয়া হিন্দুসমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, গ্রন্থকার ও ভূমিকা-লেখক বিধবা-বিবাহের বিরোধী। যাঁহারা বাজার-চল্তি হুজুগে না মাতিয়া সত্য-নির্দ্ধারণে আগ্রহান্বিত তাঁহারা সকলেই এই গ্রন্থখানি পাঠ করুন।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের তিনটি মন্ত্র বিধবা-বিবাহের পরিপোষকরূপে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। বেদশাস্ত্রী মহাশয় ভূমিকায় খুব ভাল করিয়াই দেখাইয়াছেন যে ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই তিনটি মন্ত্রের প্রথমটির ভুল অনুবাদ করিয়া এই অনর্থ ঘটাইয়াছেন। মহভারতের নীলকণ্ঠের টীকার এক অংশ যাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, ভূমিকায় তাহাও সুনিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। পরাশরের বচনেরও প্রকৃত অর্থ মূল গ্রন্থের মধ্যে আছে। যাঁহারা শাস্ত্রীয় মীমাংসা

জানিতে চাহেন, এই গ্রন্থখানিকে তাঁহারা চূড়ান্ত (Final) গ্রন্থ বলিয়া নির্ভয়ে গ্রহণ করিতে পারেন। এই বুদ্ধিভেদ-সংঘটনের যুগে, প্রত্যেক শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দু এই সদ্‌গ্রন্থ একখানি করিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখুন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

গৌহাটি সনাতন ধর্ম্মসভা আমাদের দেশের একটি গৌরবের বস্তু। এ প্রকারের সভা বাঙ্গালা, উড়িষ্যা ও আসামের ভিতর আর নাই। আর ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন বি, এল, সরকারী উকীল মহাশয়ই এই সভার প্রাণ। আর পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ বেদশাস্ত্রী এম, এ, মহাশয় তাঁহার দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ—তাঁহারা সমগ্র হিন্দুসমাজের অশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র, মা জগদম্বা তাঁহাদের কল্যাণ করুন, আর তাঁহাদের আদর্শ দেশের সর্ব্বত্র অবলম্বিত হউক।

সম্পাদকের নিবেদন

আমার কাগজের শুভানুধ্যায়ী গ্রাহকগণকে একটি সুসংবাদ নিবেদন করিতেছি। এই পুস্তকখানি সপ্তম খণ্ডের নবম সংখ্যা। আর তিনখানি পুস্তক বাহির হইলে এই খণ্ড পূর্ণ হইবে। এই তিন খণ্ডে একখানি অতি উপাদেয় ও মূল্যবান প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থ গ্রাহকগণকে দেওয়া হইবে। গ্রন্থখানির নাম "উজ্জ্বল চন্দ্রিকা।" সুপ্রসিদ্ধ রস-গ্রন্থ শ্রীউজ্জ্বল নীলমণির ইহা বঙ্গানুবাদ। এই অনুবাদ কখনও ছাপা হয় নাই। শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় পুরাতন হাতের লেখা পুঁথি হইতে গ্রন্থখানি বাহির করিয়া অতি যত্নে সম্পাদন করিতেছেন। পাদটীকায় মূল শব্দের অর্থ দেওয়া হইবে, শব্দ সূচী প্রভৃতি থাকিবে, ভূমিকাও থাকিবে। গ্রন্থখানি উপাদেয় ও মূল্যবান। বাহির হইতে সামান্য বিলম্ব হইবে, গ্রাহকগণ বিচলিত হইবেন না।

যাঁহারা কীর্ত্তন-গান ও বৈষ্ণব কবিতা বুঝিতে চাহেন, এই গ্রন্থখানি তাঁহাদের একান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের পুস্তক প্রতিমাসে ৪৮ পৃষ্ঠা করিয়া বাহির হয়। ঐ গ্রন্থখানি অনুমান ১৪৪ পৃষ্ঠা হইবে। ঐ গ্রন্থখানি বীরভূমির ৭ম খণ্ডের ১০ম, ১১শ ও ১২শ সংখ্যারূপে বিবেচিত হইবে।

বীরভূমি | মাসিক পত্রিকা | ৭ম খণ্ড
১০—১২ সংখ্যা

উজ্জ্বল-চন্দ্রিকা

(অপ্রকাশিতপূর্ব্ব প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থ)

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

সম্পাদিত

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

উজ্জ্বল-চন্দ্রিকা

প্রাচীন কবি শচীনন্দন বিদ্যানিধিকৃত 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থের

পদ্যানুবাদ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক লিখিত

ভূমিকা সম্বলিত

শ্রীশিবরতন মিত্র

কর্ত্তৃক টীকাসহ সঙ্কলিত

সিউড়ী—বীরভূম হইতে

শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি-এল্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

ভূমিকা

যিনি প্রকৃত কবি, তিনিই প্রকৃত ভক্ত। এই চরম সিদ্ধান্ত, একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কাব্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ রস, রীতি, ধ্বনি ও অলঙ্কার,—এই চারি প্রকারের বিভিন্ন অধিষ্ঠান-ভূমি হইতে কাব্যের তত্ত্বালোচনা করিয়া পরিশেষে, রসকেই কাব্যের আত্মা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ভগবত্তত্ত্বান্বেষী সাধুগণও কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তির পথে দীর্ঘকাল পর্য্যটন করিয়া ভক্তিকে 'রস' বলিয়াই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বেদবাণী —"রসো বৈ সঃ," এই প্রকারে মানবের সাধনায় সফল হইয়াছেন।

কবি ও ভক্ত একই আনন্দের বা আনন্দময়ের প্রেরণায় একই লক্ষ্যের অভিমুখে ছুটিতেছিলেন, ভারতীয় বৈদিক-সাধনার এই চরম সিদ্ধান্তের উপরেই বাঙ্গালাদেশের বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ; এই চরম সিদ্ধান্তের উপরেই শ্রীরাধাগোবিন্দ উপাসনার প্রতিষ্ঠা।

বৈদিক পুরুষবাদ, পুরুষপ্রকৃতিবাদ, পৌরাণিক লীলাবাদ ভক্ত-কবির হৃদয়ের দিব্য আস্বাদন ও প্রত্যক্ষানুভূতির সাহায্যে এই মহা সত্যই আজ জগৎকে জানাইতেছেন যে—এক অনন্ত-গুণময় নায়ক, আর এক অনন্তগুণময়ী নায়িকা, ইঁহাদের প্রেমলীলাই একমাত্র সত্য। শৃঙ্গাররসই আদিরস। রসের আস্বাদনের জন্যই বিশ্ব ব্যাকুল। কিন্তু, কেই বা জানে—রস কি ? কেই বা জানে—রসের আস্বাদন কি ? কত হাজার হাজার জন্ম ধরিয়া মানুষ রসের আভাস লইয়া, রসের ছায়া লইয়া, রসের ছল লইয়া বঞ্চিত হইয়া, মায়া-প্রপঞ্চে বিঘূর্ণিত হইতেছে! কোথায় রস ? সাধনা চাই, তপস্যা চাই, সংযম চাই, সাধুসঙ্গ চাই। রস আছে, রসের সন্ধান আছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাশক্তিতে উদ্বুদ্ধ শ্রীল রূপগোস্বামী মহোদয় "শ্রীশ্রীউজ্জ্বল নীলমণি" গ্রন্থে, এই রসের কথাই বলিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি পরম পবিত্র সাধন-গ্রন্থ, ভক্তগণের আস্বাদনের বস্তু।

বাঙ্গালাদেশের ভক্ত-হৃদয়ের পূর্ণ প্রকাশ—কীর্ত্তনের গান। সুখের বিষয়, ইদানীং এই কীর্ত্তন-গানের আদর বাড়িতেছে। ইহা সুখের বিষয় হইলেও, ইহাতে দুঃখের কারণও আছে। ভক্তের হৃদয় লইয়া কীর্ত্তন গান শুনিতে হয়,—ইহা সাধনের সামগ্রী। সদ্গুরুর

কৃপাভাজন হইয়া কীর্ত্তন গাহিতে হয়। রসাভাস হইলে গায়ক ও শ্রোতা, উভয়েরই অপরাধ হয়। কিন্তু অনেক স্থলেই রসাভাস হইতেছে। 'শ্রীশ্রীউজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থের উত্তমরূপ আলোচনা থাকিলে, রসাভাসের সংশোধন হইতে পারে। ঐ শ্রীগ্রন্থ, সংস্কৃত-ভাষায় রচিত ; দুরূহ গ্রন্থ,—মুদ্রিত হইলেও প্রচার খুব কম।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা একটি অপূর্ব্ব রত্ন পাইয়াছি, যাহার সংবাদ অনেকেই জানেন না। এই গ্রন্থখানিই সেই রত্ন। ইহা, "শ্রীশ্রীউজ্জ্বল-নীলমণির" প্রাচীন বঙ্গানুবাদ। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চাণক-গ্রাম নিবাসী ভক্ত-পণ্ডিত শ্রীমৎ শচীনন্দন বিদ্যানিধি মহাশয়, ১৭০৭ শকে অর্থাৎ ইংরাজী ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের পৌষ মাসের ১০ই তারিখে এই অনুবাদ সমাধা করেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজশ্চন্দ্রের একজন সভাসদ ছিলেন—নবকিশোর দত্ত ; উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। চাণকের নিকটবর্ত্তী নাথুড়িয়া গ্রামে তাঁহার বাস। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম—হরি দত্ত। এই হরি দত্তের পৃষ্ঠপোষকতায়, এই অনুবাদ কার্য্য সাধিত হয়।

হরি দত্তের পৌত্রের নাম মাধবেন্দু দত্ত। তাঁহার ভাগিনেয়, বীরভূম জেলার বাতিকার গ্রামের জমিদার—৺মুকুন্দলাল সিংহ। এই মুকুন্দলাল সিংহ মহাশয়ের নিকট, "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক" রচয়িতা শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়, প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি পাইয়া, তাহা যত্নপূর্ব্বক নকল করিয়াছিলেন।

তাহা হইলে, গ্রন্থখানি একশত একচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের রচনা। বাঙ্গালা ১৩১৭ সালের পৌষ মাসের 'বীরভূমি' পত্রিকায়, শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত এই গ্রন্থ-সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকে, এই গ্রন্থের প্রথম দুই অধ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাও শিবরতন বাবুর নিকট হইতে গৃহীত।

এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হওয়া, ও সুপ্রচারিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই কীর্ত্তন গান শুনিতেছেন, শ্রীরাধাগোবিন্দের কথায় অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন,—ইহা পরম আনন্দের কথা। এখন, রসাভাসাদি দোষ হইতে মুক্ত হইয়া জীবনকে ধন্য করার জন্য, তাঁহারা এই গ্রন্থখানি ধীরভাবে আস্বাদন করুন ও আলোচনা

এই গ্রন্থের সম্পাদন-কার্য্য সমস্তই শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় করিয়াছেন। মূল সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত মিল করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রতিলিপি করা, সূচী করা, প্রুফ দেখা, টীকা রচনা—সমস্তই তিনি করিয়াছেন। তিনিই ইহার সম্পাদক। কেবল 'বীরভূমি'র অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, আমার নাম সম্পাদকরূপে মুদ্রিত হইল। পনর বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার এই গ্রন্থখানি ছাপাইবার চেষ্টা করিয়া কিছু অর্থনাশ করিয়া নিরস্ত হইয়াছিলাম। বোধ হয়, তখনও এই গ্রন্থ-প্রকাশের সময় হয় নাই। সম্প্রতি ভগবান, এই গ্রন্থ-মুদ্রণের ব্যয়ভার বহনে আমাকে সক্ষম করিয়া ধন্য করিলেন।

এই প্রকারের অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব অথচ অতি মূল্যবান আরও অনেকগুলি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি, আমাদের নিকট রহিয়াছে। আশা করি শ্রীভগবানের কৃপায়, আমরা সেগুলিও মুদ্রিত আকারে সাধুভক্তগণের আস্বাদনীয় করিতে পারিব। ভক্তগণের শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া, এই সদ্‌গ্রন্থ আমরা উভয়ে (অর্থাৎ আমি ও শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ শ্রীশিবরতন মিত্র) সজ্জন-সভায় উপস্থাপিত করিলাম। তাঁহারা আমাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন ও আশীর্ব্বাদ করিবেন। ইতি—

সিউড়ী-বীরভূম
২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

বিনীত
শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

নিবেদন

ভাষা যাহাতে অসংযতভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া বিপথগামী না হয়, তজ্জন্য যেমন ব্যাকরণের কঠোর অনুশাসন আছে, তদ্রূপ, বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের রচয়িতা, সঙ্কলয়িতা বা আস্বাদনকারিগণ যাহাতে ভ্রমে পতিত না হন, বা উহার অপব্যবহার না করেন, তজ্জন্য বৈষ্ণব অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিবিধ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ও কঠোর বিধান আছে। সুতরাং, বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য সম্যক্‌রূপে আলোচনা বা প্রকৃষ্ট রূপ আস্বাদন করিতে হইলে, বৈষ্ণব অলঙ্কার-শাস্ত্রের আলোচনা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। নাট্য-শাস্ত্রের রচয়িতা ভরতমুনি, এই আলঙ্কারিকগণের মধ্যে আদি কবি বলিয়া সর্ব্বত্র স্বীকৃত। পরবর্ত্তীকালে, বৈষ্ণব গোস্বামীপাদগণ এই অলঙ্কার-শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল অলঙ্কার-গ্রন্থের মধ্যে, বহু বৈষ্ণবগ্রন্থ রচয়িতা পরম ভাগবত শ্রীল রূপগোস্বামী কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' ও 'উজ্জ্বল নীলমণি'—এই দুইখানি গ্রন্থই প্রধান।

'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থখানি, মূলতঃ চারিভাগে বিভক্ত। প্রথম বা পূর্ব্ব-বিভাগে—ভক্তি, সাধন, ভাব ও প্রেম প্রভৃতি নির্ণয়; দ্বিতীয় বা দক্ষিণ-বিভাগে—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব, ব্যভিচারীভাব ও স্থায়িভাব প্রভৃতি নির্ণয়; তৃতীয় বা পশ্চিম বিভাগে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসাদির ভাব নির্ণয় ও তাহার উপভোগ; এবং চতুর্থ বা উত্তর-বিভাগে—গৌণ ও মুখ্যরস বিচার, মৈত্রী, বৈরী, সংযোগ প্রভৃতি ভাব ও রস, রসভোগাদির নির্ণয়, এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য রসভাবাদির বিচার বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থে শান্তাদি মুখ্যরসের বর্ণনকালে, অতিশয় গূঢ়প্রযুক্ত মধুররস অতি সংক্ষিপ্তরূপে উক্ত হইয়াছে। এই নিমিত্ত শ্রীল রূপগোস্বামী মহোদয়, "উজ্জ্বল নীলমণি" নামক একখানি স্বতন্ত্র সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়া, বিস্তারিতভাবে মধুরাখ্য ভক্তিরসরাজ বর্ণন করিয়াছেন। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থে তিনি, শ্রীকৃষ্ণলীলাবর্ণনচ্ছলে সাঙ্গোপাঙ্গ শৃঙ্গাররস-নির্ণয়, ভক্তি প্রভৃতি স্থায়িভাব নির্ণয়, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-বিবৃতি প্রভৃতি বিষয় বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন। আলোচ্য বিষয়ের সূত্র এবং তৎসমুদয় পরিস্ফুট করিবার জন্য, বৈষ্ণব

গোস্বামীদিগের গ্রন্থ হইতে শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক প্রত্যেক শ্লোকের পরিপোষক সংস্কৃত পদ্যাবলী উদ্ধৃত করিয়া পূজ্যপাদ গোস্বামী মহোদয়, গ্রন্থখানিকে অপূর্ব্ব মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীল জীবগোস্বামী মহোদয়, এই গ্রন্থের—'লোচন রোচনী' এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়—'আনন্দ চন্দ্রিকা' নাম্নী সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়াছেন। স্বর্গীয় শচীনন্দন বিদ্যানিধি মহাশয়, মূল 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থ ও পূর্ব্বোক্ত টীকাদ্বয়ের সমন্বয় সাধন পূর্ব্বক, ভাষা-কবিতায় তাহা "স্পষ্টীকৃত' বা 'প্রকট' করিয়া, এই "উজ্জ্বল চন্দ্রিকা" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ সম্পাদন কালে, ভাষা পদ্যানুবাদের প্রত্যেক ছত্রের সহিত মূল সংস্কৃত গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোক এবং টীকার সহিত মিল করিয়া আমরা এরূপ উক্তি করিতে সাহসী হইলাম। বিদ্যানিধি মহাশয়, মূল সংস্কৃত গ্রন্থের সূত্র-শ্লোকগুলির পয়ার ছন্দে এবং সূত্র-পরিপোষক উদ্ধৃত শ্লোকগুলির প্রায় সর্ব্বত্রই ত্রিপদী, —কচিৎ তোটকাদি ছন্দে, যথাযথ অনুবাদ করিয়াছেন।

মূল 'উজ্জ্বল নীলমণি' জগৎপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ—সুতরাং, এই গ্রন্থ বা ইহার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। বিশেষতঃ, বৈষ্ণব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত অদ্বিতীয় বক্তা শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন মহাশয় ভূমিকায় সংক্ষেপে বক্তব্য বিষয় প্রায়ই নিঃশেষে বর্ণন করিয়াছেন। আমরা আজ প্রায় ত্রিশবৎসর যাবৎ প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আসিতেছি—আমাদের সংগৃহীত প্রায় চারি পাঁচ সহস্র প্রাচীন পুঁথি মধ্যে এই উজ্জ্বলরসতত্ত্বমূলক এ-যাবৎ অপ্রকাশিত ক্ষুদ্র বৃহৎ গদ্য-পদ্য বহু খণ্ড-সন্দর্ভ; এবং সংস্কৃত ভাষায় ইহার সংক্ষিপ্তসার 'উজ্জ্বল নীলমণি কিরণ' ও 'উজ্জ্বল নীলমণি কিরণলেশ' প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিতেছি। মুদ্রিত গ্রন্থ মধ্যে—ভারতচন্দ্র, পীতাম্বর দাস, ভানুদত্ত প্রভৃতি রচিত গ্রন্থে আংশিকভাবে এবং 'ভক্তমাল' ও 'চৈতন্য-চরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থ মধ্যে, রসতত্ত্বের প্রসঙ্গ-বিশেষের আলোচনা আছে। কিন্তু এই বৈষ্ণব-সঙ্কীর্ত্তন প্লাবিত দেশে—যেখানে 'বিন্দু', 'কিরণ' 'কণা' না জানিলে, বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেওয়া চলে না—সেই দেশে, 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থের ন্যায় বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি দ্বারা সুপরিপুষ্ট গ্রন্থের, জনসাধারণের সহজবোধ্য ভাষানুবাদ দেখিতে না পাইয়া, বড়ই বিস্মিত হইয়াছিলাম। রসরাজের কৃপায়, এখন আমাদের সে অভাব পূরণ হইল। এই

অপূর্ব্ব গ্রন্থ, রসিক ভক্তগণের করকমলে উপহার দিতে পারিয়া, আমরা ধন্য ও চরিতার্থ হইলাম।

এই 'উজ্জ্বল চন্দ্রিকা' গ্রন্থের পুঁথি, বাতিকার গ্রামের অন্যতম জমাদার এবং আমাদের সিউড়ীর প্রতিবেশী স্বর্গীয় মুকুন্দলাল সিংহ মহাশয়ের (মাখন বাবু) নিকট প্রাপ্ত হই। এ সকল কথা, ভূমিকায় বলা হইয়াছে। স্বর্গীয় মাখন বাবু, পদাবলী সাহিত্যের জাহাজ ছিলেন—সমগ্র পদাবলী-সাহিত্য, পদাবলীর পাঠান্তর, বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা ইত্যাদি তাঁহার ওষ্ঠাগ্রে ছিল। তিনি কতই না আগ্রহে আমায় এই পুঁথিখানির প্রতিলিপি করিতে দিয়াছিলেন! তাঁহার ইচ্ছা ছিল—আমি এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিলে, তিনি ইহার মুদ্রণ ব্যয়ভার বহন করিবেন। কিন্তু তিনি ইতিমধ্যে পরলোক গমন করেন। এখন এই গ্রন্থ সম্পাদন ও মুদ্রণ কালে, তাঁহার সুশিক্ষিত বংশধরগণের নিকট হইতে, দুই একটি সন্দেহ স্থলে পাঠ মিলাইবার জন্য, সেই পুঁথিখানি কয়েকদিনের জন্য চাহিয়াছিলাম। ক্রমিক দুই তিন বৎসর ধরিয়া চাহিয়াছি; কিন্তু তাঁহারা এই সামান্য উপকারটুকু পর্য্যন্ত করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন!

এই গ্রন্থখানি আজ প্রায় চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছি—অর্থাভাবে প্রেসে দিতে পারি নাই। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের তদানীন্তন লাইব্রেরিয়ান, স্বর্গীয় রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এবং শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত রায় দীনেশচন্দ্র সেন ডি-লিট্ বাহাদুর, এই গ্রন্থ মুদ্রণ জন্য ধনীসন্তানগণের সহায়তা লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু, অনভ্যস্ততা-প্রযুক্ত আমরা ধনীসন্তানের কৃপা লাভের জন্য তাঁহাদের দ্বারস্থ হইতে পারি নাই। সুতরাং, এই গ্রন্থও, অন্যান্য বহু অপ্রকাশিত গ্রন্থের ন্যায় অমুদ্রিত অবস্থায় পড়িয়াছিল। মধ্যে, সাহিত্য-পরিষৎ হইতেও, এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া দিবার প্রস্তাব আসিয়াছিল। এখন আমার প্রতিবেশী, আমারই মত অবস্থাপন্ন সাধারণ গৃহস্থ অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন মহাশয়ের সম্পূর্ণ অর্থানুকুল্যে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। তাঁহাকে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া চলে না—নিজকে, নিজে ধন্যবাদ দিব কেমন করিয়া? রসিক ভক্তগণ তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবেন—রসরাজ তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিবেন। মা বীণাপাণি, লক্ষ্মীর দ্বারস্থ হইতে না দিয়া, আমাদের মনের মতই ব্যবস্থা করিয়াছেন—

ইহাতে আমাদের প্রতি তাঁহার অপার করুণা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা পাঁচ ছয় সহস্র প্রাচীন পুঁথি লইয়া যক্ষের ন্যায় আঁকড়িয়া রহিয়াছি—এই পুঁথিগুলি লইয়াই আমাদের দরিদ্র-জীবন—জগন্নাথ-দর্শনে গিয়া পুরীর শ্রীমন্দির মধ্যেও, জগন্নাথদেবের সমক্ষে আমরা প্রাচীন পুঁথিই দেখিয়া আসিয়াছি! জীবনের শেষ-পাদে এই পুঁথি-প্রীতির সার্থকতা দেখিয়া, আমাদের আনন্দের আর অবধি নাই! কৃপাময়ের করুণায় হয় ত, আমরা অপর যে সকল অপ্রকাশিতপূর্ব্ব গ্রন্থ সম্পাদন ও মুদ্রণযোগ্য করিয়া রাখিয়াছি, তৎসমুদয় অচিরেই প্রকাশিত হইবে।

প্রাচীনপুঁথি-সম্পাদকের চিরনির্দ্দিষ্ট আলোচ্য বিষয়—পুঁথির পাণ্ডুলিপির বর্ণ ও বানান সম্বন্ধে আলোচনা। আমরা কিন্তু, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এবিষয়ে একেবারে নীরব রহিব। এই গ্রন্থখানি, সুবিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থের, প্রায় দেড় শত বর্ষ পূর্ব্বে রচিত ভাষানুবাদ। সুতরাং এই অনুবাদের ভাষা, বানান ও বর্ণবিন্যাস-প্রণালী যে একেবারে সংস্কৃতানুযায়ী হইবে, তৎসম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ নাই। ভাগ্যক্রমে, আমাদের পাণ্ডু-লিপির বর্ণাশুদ্ধি অধিক ছিল না যৎসামান্য ছিল, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। সুতরাং এই গ্রন্থে সাধারণ বর্ণবিন্যাস-প্রণালীই অনুসৃত হইয়াছে। এখন, এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়, যাহাতে সকলে সহজে আয়ত্ত ও অধিগম্য করিয়া লইতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া আমরা গ্রন্থমধ্যে ও সূচীপত্রে উপবিভাগগুলি নির্দ্দেশ করিয়া, অল্পায়াসে স্মরণযোগ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, উজ্জ্বল রসানুরক্ত রসিক মহানুভবগণ তাহার বিচার করিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মূল সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত, এই অনূদিত গ্রন্থের প্রতি ছত্রের পাঠ মিল করিয়াছি। যে দুই এক স্থলে কোন কোন উদাহরণের অনুবাদ প্রদত্ত হয় নাই, পাদটীকায় সেই সকল স্থানে গদ্যানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। দুরূহ শব্দাদির অর্থ এবং বিষয়বোধ সৌকর্য্যার্থ বিস্তৃত টীকা দিয়া, প্রায় সর্ব্বত্রেই সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ফলতঃ এই বৃহৎ গ্রন্থ, যাহাতে সহজেই আয়ত্ত করা যায়, তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য সর্ব্ববিধ চেষ্টার ত্রুটী করি নাই।

'উজ্জ্বল চন্দ্রিকার' গ্রন্থকার স্বর্গীয় শচীনন্দন বিদ্যানিধি মহাশয় সম্বন্ধে ভূমিকায়

স্বগ্রামবাসী আমাদের নিকটাত্মীয় পূজনীয় শ্রীযুক্ত রায় রসময় মিত্র বাহাদুর মহাশয়কে, বিদ্যানিধি মহাশয়ের বংশধরগণের নিকট হইতে, তাঁহার পরিচয় ও তাঁহার রচিত ও সংগৃহীত পুঁথিগুলি সংগ্রহ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি এই অনুরোধ আংশিকভাবে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু, বিদ্যানিধি রচিত বা সংগৃহীত অনেকগুলি পুঁথি তাঁহার বাটী হইতে আনিবার পূর্ব্বেই, প্রবল বৃষ্টিপাতে একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। তবে, মিত্র-মহাশয় বলেন যে, এ পুঁথিগুলি মধ্যে বিদ্যানিধি-রচিত আরও অনেক গ্রন্থ ছিল। হায় বিদ্যানিধি! হায় আমরা! চিরজীবন কঠোর সাধনা ও প্রাণান্তকর পরিশ্রমের ফলে, মায়ের জন্য বিদ্যানিধি মহাশয় যে অঙ্গাভরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, আমরা তাহা হেলায় হারাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম!

'রতন'-লাইব্রেরী
সিউড়ী-বীরভূম
২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

শ্রীশিবরতন মিত্র

সূচী

প্রথম অধ্যায়—নায়কভেদ প্রকরণ

বিষয়	পৃষ্ঠা
মঙ্গলাচরণ	১
মধুর ভক্তিরসরাজ লক্ষণ	২
বিভাব—	৩
আলম্বন	
উদ্দীপন—কৃষ্ণবিষয়ক	
ও ভক্তবিষয়ক	
শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী—	৩
নায়ক দ্বিবিধ—১ পতি	৪
২ উপপতি	৫
পুনঃ চতুর্ব্বিধ	৬
১ অনুকূল—	
(ক) ধীরোদাত্তানুকূল	৬
(খ) ধীর ললিতানুকূল	৭
(গ) ধীর শান্তানুকূল	৭
(ঘ) ধীরোদ্ধতানুকূল	৮
২ দক্ষিণ	৮
৩ শঠ	৯
৪ ধৃষ্ঠ	৯
৯৬ প্রকার নায়ক—	১০

ধীরোদাত্ত + ধীরললিত + ধীরশান্ত + ধীরোদ্ধত = ৪ ; ৪ × ৩ (পূর্ণ + পূর্ণতর + পূর্ণতম) = ১২ ; ১২ × ২ (পতি + উপপতি) = ২৪ ; ২৪ × ৪ (অনুকূল + দক্ষিণ + শঠ + ধৃষ্ঠ) = ৯৬ প্রকার নায়ক

দ্বিতীয় অধ্যায়—নায়ক-সহায় প্রকরণ

বিষয়	পৃষ্ঠা
সখা—	
(ক) চেট্	১১
(খ) বিট্	১২
(গ) বিদূষক	১২
(ঘ) পীঠমর্দ্দ	১৩
(ঙ) প্রিয় নর্ম্ম-সখা	১৩
দূতী—	
(ক) স্বয়ংদূতী—কটাক্ষ, বংশীধ্বনি	১৫
(খ) আপ্তদূতী—প্রগলভা, বিনয়ী	১৫

তৃতীয় অধ্যায়—হরিপ্রিয়া বা কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণ

স্বকীয়া ও পরকীয়া ১৬

১ স্বকীয়া— ১৬

দ্বারকা বিহার (১৬১০৮ স্ত্রী)

অষ্টমুখ্যা মহিষী ১৭

সর্ব্বোত্তমা মহিষী

স্বকীয়া মহিষী, সখী ও দাসী-সংখ্যা

গান্ধর্ব্ব ও অব্যক্ত বিবাহ

২ পরকীয়া— ১৮

কন্যা ও পরোঢ়া ১৮

(ক) কন্যকা ১৯

(খ) পরোঢ়া ২০

পরকীয়া ত্রিবিধ—

১ সাধনপরা

(ক) যৌথিকী ২১

(খ) অযৌথিকী—

প্রাচীনা ও নবীনা

২ দেবী ২২

৩ নিত্য-প্রিয়া ২২

যূথাধিপা— চারি ২৩

১ রাধা, ২ চন্দ্রাবলী, ৩ কঙ্কুমা

ও ৪ ভদ্রা

অষ্ট মুখ্যা সখী ২৩

চতুর্থ অধ্যায়—বৃন্দাবনেশ্বরী বা রাধা-প্রকরণ

রাধিকা— ২৪

১ সুষ্ঠুকান্ত স্বরূপা

২ ধৃত ষোড়শ শৃঙ্গার ২৫

৩ দ্বাদশ আভরণ

৪ রাধার পঞ্চবিংশতি প্রধান গুণাবলী

রাধারগুণ চতুর্ব্বিধ ২৬

গুণাবলীর ব্যাখ্যা

মধুরা ২৭

গন্ধোন্মাদিত মাধব ২৭

শ্রীরাধার যূথ—পঞ্চবিধ সখী ২৭

(১) সখী

(২) নিত্য সখী

(৩) প্রাণ সখী

(৪) প্রিয় সখী

(৫) পরম প্রেষ্ঠ সখী

পঞ্চম অধ্যায়—নায়িকাভেদ প্রকরণ

সামান্যা নায়িকা ৩০

স্বকীয়া ও পরকীয়া নায়িকা ঐ

(ক) নূতন বয়স, (খ) নবকামা, ৩১

(গ) রতিবামা ৩২

(চ) রোষকৃতবাষ্পমৌনা ৩৩
(ছ) মানে বিমুখী—১ মৃদ্বি ও
২ অক্ষমা

২ মধ্যা— ৩৩
(ক) সমানলজ্জামদনা, (খ) উদ্যত্তারুণ্যা
(গ) কিঞ্চিৎ প্রগল্ভবচনা, (ঘ) মোহান্ত
সুরতক্ষমা, (ঙ) মানে কোমলা ৩৪
(চ) মানে কর্কশা ৩৫
১ ধীরমধ্যা, ২ অধীর মধ্যা, ৩ ধীরাধীর মধ্যা

৩ প্রগল্ভা— ৩৬
(ক) পূর্ণতারুণ্যা, (খ) মদান্ধা, ৩৭
(গ) উরুরতোৎসুকা
(ঘ) ভূরিভাবোদ্গমাভিজ্ঞা,
(ঙ) রসাক্রান্তবল্লভা
(চ) অতি প্রৌঢ়োক্তি ৩৮
(ছ) অতি প্রৌঢ় চেষ্টা
(জ) মানে অত্যন্ত কর্কশা—
১ ধীর প্রগল্ভা, ২ অধীর প্রগল্ভা
৩ ধীরাধীর প্রগল্ভা ৩৯

জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা— ৩৯
মধ্যার জ্যেষ্ঠাকনিষ্ঠাত্ব
প্রগল্ভার জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাত্ব ৪০
পঞ্চদশবিধ নায়িকা— ৪০
নায়িকার অষ্টবস্থা— ৪১

১ অভিসারিকা—
(ক) জ্যোৎস্নায় স্বয়ং অভিসারিকা
(খ) তমোভিসারিকা ৪২
২ বাসক সজ্জা ঐ
৩ উৎকন্ঠিতা ৪৩
৪ খণ্ডিতা ৪৩
৫ বিপ্রলব্ধা ৪৪
৬ কলহান্তরিতা ৪৪
৭ প্রোষিত-ভর্তৃকা ৪৫
৮ স্বাধীন-ভর্তৃকা ৪৬
'মাধবী'
হৃষ্টা ও খিন্না নায়িকা ৪৭
উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা নায়িকা ঐ
৩৬০-বিধ নায়িকা ৪৮
শ্রীরাধিকা ঐ

ষষ্ঠ অধ্যায়—যূথেশ্বরীভেদ প্রকরণ

যূথেশ্বরী—ত্রিবিধ ৪৯
১ অধিকা, ২ সমা ও ৩ লঘ্বী
পুনঃ ত্রিবিধ—১ প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী

১ অধিকা ৫০
(ক) আত্যন্তিকী অধিকা
(খ) আপেক্ষিকী অধিকা
(গ) অধিক প্রখরা
(ঘ) অধিক মধ্যা ৫১
(ঙ) অধিক মৃদ্বী

২ সমা ৫১
৩ লঘ্বী ঐ
দ্বাদশবিধা যূথেশ্বরী ৫২

সপ্তম অধ্যায়—দূতীভেদ প্রকরণ

দূতী বা নায়িকা-সহায়া ৫৩

১ স্বয়ং দূতী—

(ক) বাচিক—কৃষ্ণ ও পুরস্থ

(১) কৃষ্ণবিষয়—সাক্ষাৎ ও ছল ৫৪

ক-সাক্ষাৎ—১ গর্ব্ব হেতু, ৫৫

২ আক্ষেপহেতু ৫৫

৩ যাচঞা (স্বার্থ ও পরার্থ) ৫৫

খ—ছল—অর্থোৎপন্নব্যঙ্গ ৫৬

(২) পুরস্থ বিষয় ঐ

(খ) আঙ্গিক ৫৭

(গ) চাক্ষুষ বা কটাক্ষ ঐ

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দূতী

স্বাভিযোগ ও অনুভাব

২ আপ্ত দূতী—ত্রিবিধ ৫৮

(ক) অমিতার্থা, (খ) নিসৃষ্টার্থা,

(গ) পত্রহারী, আপ্তদূতী পুনঃ ৫৯

(ঘ) শিল্পকারী, (ঙ) দৈবজ্ঞা,

(চ) লিঙ্গিণী ৫৯

(ছ) পরিচারিকা, (জ) ধাত্রেয়ী,

(ঝ) বনদেবী ৬০

৩ সখী— ৬০

সখী-দূত্য—দ্বিবিধ

১ বাচ্য ৬১

২ ব্যঙ্গ—সাক্ষাৎ ও ব্যপদেশ

দূতী নিয়োগ— ৬২

(ক) ক্রিয়াসাধ্য

(খ) বাচিক—

১ বাচ্য ও

২ ব্যঙ্গ—শব্দমূল ও অর্থমূল ৬৩

অর্থমূল—স্বপত্যাদি নিন্দা, ও

গোবিন্দাদির প্রশংসা

দেশাদি বৈশিষ্ট্য ৬৪

অষ্টম অধ্যায়—সখী প্রকরণ

দ্বাদশবিধ সখী ৬৫

দূত্য— ৬৬

নায়িকা প্রায়া,—সখী প্রায়া—নিত্য-সখী

(ক) নিত্য-নায়িকা

গৌণ-দূত্য— ৬৭

১ সাক্ষাৎ বা সমক্ষ

(ক) সাঙ্কেতিক ও (খ) বাচিক দূত্য

২ পরোক্ষ দূত্য— ৬৮

(ক) সখীদ্বারা, (খ) ব্যপদেশ বা ছল ৬৯

(লেখা, উপায়ন, নিজ প্রয়োজন ও

আশ্চর্য্য দর্শন)

(খ) নায়িকা-প্রায়া— ৭০

অধিক প্রখরা—অধিক মধ্যা—অধিক মৃদ্বী ৭১

(গ) দ্বিসমাত্রিক— ৭১

সম প্রখরা—সমমধ্যা—সমমৃদ্বী

(ঘ) সখী প্রায়াত্রিক ৭২

লঘুপ্রখরা—লঘুমধ্যা—লঘুমৃদ্বী
(আদ্যা ও দ্বিতীয়া)
(৬) নিত্য সখী ৭৩
প্রাখর্য্যের বিপর্য্যয়—মার্দ্দবের বিপর্য্যয় ৭৪
দূতী বা সখী-ব্যবহার ৭৪
সখীগণের সপ্তদশবিধ কার্য্য ৭৫
সখীবিশেষ বিবৃতি— ৭৫
(১) অসমস্নেহা—(ক) হরিস্নেহাধিকা ৭৬
(খ) সখী স্নেহাধিকা
(২) সমস্নেহা—(ক) পরমপ্রেষ্ঠ সখী
(খ) প্রিয়সখী ৭৭

নবম অধ্যায়—হরিবল্লভা প্রকরণ

ব্রজ সুন্দরী চতুর্ব্বিধ ৭৮
১ সপক্ষ, ২ বিপক্ষ, ৩ সুহৃৎপক্ষ (ইষ্ট-সাধক ও অনিষ্ট বাধক), ৪ তটস্থ
বিপক্ষ—(ক) ইষ্টনাশকারী ৭৯
(খ) অনিষ্টকারীত্ব
বিপক্ষ-চেষ্টা ৮০
(ক) ছল বা ছদ্ম, (খ) ঈর্ষ্যা,
(গ) চাপল, (ঘ) অসূয়া,
(ঙ) মৎসর, (চ) অমর্ষ বা ক্রোধ, (ছ) গর্ব্ব, (ষড়বিধ)—
১ অহঙ্কার, ২ অভিমান, ৩ দর্প, ৪ উদ্ধসিত, ৫ মদ, ৬ ঔদ্ধত্য)
শ্লেষ উক্তি ৮৩
যূথেশ্বরীর ভাব ৮৩
স্বপক্ষাদি ভেদের হেতু ৮৪
রাধাপ্রেম ৮৫

দশম অধ্যায়—উদ্দীপন বিভাব প্রকরণ

উদ্দীপন— ৮৬
(অ) **গুণ**—
(ক) মানস, (খ) বাচিক ও
(গ) কায়িক ৮৭
১ বয়ঃ (চতুর্ব্বিধ)
(অ) বয়ঃ সন্ধি, (আ) নব্যবয়ঃ
(ই) ব্যক্তবয়ঃ, (ঈ) পূর্ণ বয়ঃ
সম্পূর্ণ যৌবন
২ রূপ, ৮৯
৩ লাবণ্য, ৪ সৌন্দর্য্য, ৫ অভিরূপতা ৯০
৬ মাধুর্য্য, ৭ মার্দ্দব (উত্তম, মধ্য ও কনিষ্ঠ) ৯১
(আ) **নাম**— ৯১
(ই) **চরিত**—অনুভাব ও ৯২
লীলা—১ চারু ক্রীড়া, ২ তাণ্ডব,
৩ বেণুবাদন, ৪ গো-দোহন, ৫ পর্ব্বতোদ্ধার
৬ গো-আহ্বান, ৭ গমন
(ঈ) **মণ্ডন বা অলংকার** ৯৩

১ বস্ত্র, ২ ভূষা, ৩-৪ মাল্য ও অনুলেপন

(উ) **সম্বন্ধী**— ৯৪

(ক) লগ্ন—

১ বংশীরব, ২ শৃঙ্গীরব, ৩ গীত,

৪ সৌরভ, ৫ ভূষাধ্বনি, ৬ পদাঙ্ক,

৭ বিপঞ্চী নিক্কণ, বা বীণানাদ

৮ শিল্পকৌশলাদি ৯৬

(খ) সন্নিহিতা— ৯৬

১ নির্ম্মাল্যাদি, ২-৩ বর্হ ও গুঞ্জা,

৪ পর্ব্বতধাতু, ৫ নৈচিকী বা ধেনুগণ,

৬ লগুড়ী, ৭ তদাশ্রিতা ৯৭

(উ) **তটস্থা** ৯৭

একাদশ অধ্যায়—অনুভাব প্রকরণ

অনুভাব ত্রিবিধ— ৯৮

১ অলঙ্কার—(২০ প্রকার)

(ক) অঙ্গজ—(ত্রিবিধ)—১ ভাব,

২ হাব, ৩ হেলা ৯৯

(খ) অযত্নজ (সপ্তবিধ)—১ শোভা ১০০

২ কান্তি, ৩ দীপ্তি, ৪ মাধুর্য্য,

৫ প্রগল্‌ভতা, ৬ ঔদার্য্য, ৭ ধৈর্য্য,

(গ) স্বভাবজ (দশবিধ)—১ লীলা, ১০১

২ বিলাস, ৩ বিচ্ছিত্তি, ৪ বিভ্রম,

৫ কিলকিঞ্চিত, ৬ মোট্টায়িত,

৭ কুট্টমিত, ৮ বিব্বোক,

৯ ললিত ও ১০ বিকৃত—

(লজ্জাহেতু, মানহেতু ও ঈর্ষ্যাহেতু)

(ঘ) মৌগ্ধ— ১০৬

(ঙ) চকিত ঐ

২ উদ্ভাস্বর— ১০৬

উদ্ভাস্বরের ক্রিয়া— ১০৭

(ক) নীবী সংস্রণ, (খ) উত্তরীয় স্রংসন,

(গ) ধম্মিল্ল স্রংসন, (ঘ) গাত্র মোটন,

(ঙ) জৃম্ভা, (চ) ঘ্রাণের প্রফুল্লতা

৩ বাচিক— ১০৮

দ্বাদশবিধ—১ আলাপ, ২ বিলাপ,

৩ সংলাপ, ৪ প্রলাপ, ৫ অনুলাপ,

৬ অপলাপ, ৭ সন্দেশ, ৮ অতিদেশ,

৯ অপদেশ, ১০ উপদেশ, ১১ নির্দ্দেশ,

১২ ব্যপদেশ

দ্বাদশ অধ্যায়—সাত্ত্বিকভাব প্রকরণ

১ স্তম্ভ— ১১২

(ক) হর্ষহেতু, (খ) ভয়হেতু,

(গ) আশ্চর্য্যহেতু, (ঘ) বিষাদহেতু,

২ স্বেদ— ১১৩

(ক) হর্ষহেতু, (খ) ভয়হেতু,

(গ) ক্রোধহেতু

(ক) আশ্চর্য্য দর্শন হেতু, (খ) হর্ষহেতু,
(গ) ভয়হেতু
৪ স্বরভেদ— ১১৪
(ক) বিষাদহেতু, (খ) বিস্ময়হেতু,
(গ-ঙ) অমর্ষ, হর্ষ ও ভয়হেতু
৫ বেপথু— ঐ
ত্রাসহেতু
৬ বৈবর্ণ্য— ঐ
বিষাদ হেতু
৭ অশ্রু— ১১৫
হর্ষহেতু
৮ প্রলয় বা নিশ্চেষ্টতা ১১৫
সুখনিমিত্ত প্রলয়
৯ ধূমায়িতা ঐ
১০ জ্বলিতা ১১৬
১১ দীপ্ত ১১৬
১২ উদ্দীপ্তা ঐ
১৩ সূদ্দীপ্তা ঐ

ত্রয়োদশ অধ্যায়—ব্যাভিচারিভাব প্রকরণ

(ক) ত্রয়োত্রিংশ ব্যভিচারীভাব— ১১৮
১ নির্ব্বেদ বা আত্মধিক্কার
২ বিষাদ বা পশ্চাত্তাপ, ১১৯
৩ দৈন্য, ৪ গ্লানি, ৫ শ্রম, ১১৯
৬ মদ, ৭ গর্ব্ব, ৮ শঙ্কা (চৌর্য্যহেতু) ১২০
৯ ত্রাস, ১০ আবেগ, ১১ উন্মাদ, ১২১
১২ অপস্মার, ১২১
১৩ ব্যাধি, ১৪ মোহ, ১৫ মৃতি বা প্রাণত্যাগ ১২২
১৬ আলস্য, ১৭ জাড্য, ১৮ ব্রীড়া, ১২৩
১৯ অবহিত্থা ১২৩
২০ স্মৃতি, ২১ বিতর্ক, ২২ চিন্তা, ১২৪
২৩ মতি, ২৪ ধৃতি, ১২৫
২৫ হর্ষ, ২৬ উৎসুক্য, ২৭ উগ্র, ১২৬
২৮ অমর্ষ, ২৯ অসূয়া, ৩০ চাপল, ১২৭
৩১ নিদ্রা, ৩২ সুপ্তি, ১২৭
৩৩ বোধ বা নিদ্রানিবৃত্তি ১২৮
(খ) দশা চতুষ্টয়— ১২৮
১ উৎপত্তি বা ভাব-সম্ভব
২ সন্ধি (সমানরূপদ্বয়ে ও ভিন্নভাবদ্বয়ে)
৩ শাবল্য ১২৯
৪ শান্তি বা ভাবের লয় ঐ

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—স্থায়িভাব প্রকরণ

স্থায়িভাব বা মধুরা রতি ১৩০
(ক) রতি আবির্ভাবের হেতু বা রতিভেদ
১ অভিযোগ (স্বাভিযোগ ও পরকর্তৃক) ১৩০
২ বিষয় (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধহেতু) ১৩১
৩ সম্বন্ধ, ৪ অভিমান, ১৩২
৫ তদীয় বিশেষ (পদচিহ্ন ও গোষ্ঠ) ১৩৩
৬ উপমা ঐ

৭ স্বভাব (নিসর্গ ও গুণ-শ্রবণ নিমিত্ত) ১৩৪
স্বরূপভাব (অ) কৃষ্ণনিষ্ঠ স্বরূপ ঐ
(আ) ললনানিষ্ঠ স্বরূপ ১৩৫
(ই) উভয়নিষ্ঠ স্বরূপ

(খ) রতির তারতম্য

ত্রিবিধ রতি ১৩৫
১ সাধারণী (কুব্জাদি, 'প্রেম' পর্য্যন্ত) ১৩৬
২ সমঞ্জসা (রুক্মিণ্যাদি, 'অনুরাগ' পর্য্যন্ত) "
৩ সমর্থা (ব্রজদেবীগণ, মহাভাব পর্য্যন্ত) "
মহাভাব ১৩৭
১ প্রেম—(কৃষ্ণ বিষয়ক ও প্রেয়সী বিষয়ক)
(অ) প্রৌঢ়, (আ) মধ্য, ও (ই) মন্দ) ১৩৮
২ স্নেহ—(১ অঙ্গ সঙ্গ, ২ অবলোকন ১৪০
৩ শ্রবণ, ৪ স্মরণ) ১৪১
ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ ১৪১
৩ মান— ১৪২
১ উদাত্তমান (দাক্ষিণ্যোদাত্ত ও বাম্য
গন্ধোদাত্ত) ১৪৩
২ ললিত (কৌটিল্য ললিত ও নর্ম্মললিত)
৪ প্রণয়— ১৪৪
বিশ্বাস (অ—মৈত্র ও আ—সখ্য, সুসখ্য ও
সুমৈত্র) ১৪৫
৫ রাগ— ১৪৬
১ নীলিমারাগ (ক—নীলি ও খ—শ্যামা),
২ মঞ্জিষ্ঠা (ক—কুসুম্ভ, খ—মঞ্জিষ্ঠা) ১৪৭
৬ অনুরাগ— ১৪৮
অনুরাগের ক্রিয়া—(১ পরস্পর বশীভাব,
২ প্রেম বৈচিত্ত্য, ৩ অপ্রাণীতে জন্মলালসা,
৪ বিপ্রলম্ভে বিশিষ্ট স্ফূর্ত্তি ১৪৯
৭ ভাব—(মহাভাব)— ১৫০
১ রূঢ় (নিমেষের অসহিষ্ণুতা)
২ অধিরূঢ়—(ক) মোদন— ১৫১
(অ) মোহন— ১৫২
(আ) দিব্যোন্মাদ—১ উদ্‌ঘূর্ণা,
ও ২ চিত্রজল্প—(১ প্রজল্প, ২ পরিজল্প,
৩ বিজল্প, ৪ উজ্জল্প, ৫ সংজল্প,
৬ অবজল্প, ৭ অভিজল্প, ৮ আজল্প,
৯ প্রতিজল্প, সুজল্প ১৫৩
(খ) মাদন— ১৫৮
স্থায়িভাব—উপসংহার ১৫৯
ভাব ভেদ—রতির বিপর্যায়—রতির সীমা ১৬০

পঞ্চদশ অধ্যায়—বিপ্রলম্ভ প্রকরণ

শৃঙ্গার ভেদ ১৬১

বিপ্রলম্ভ—

১ পূর্ব্বরাগ—

অ—দর্শন (সাক্ষাৎ, চিত্রপট ও স্বপ্ন)
আ—শ্রবণ (বন্দী, দূতী, সখী ও শুকমুখ,
গীতাদি) ১৬২
পূর্ব্বরাগের হেতু—ঐ পারম্পর্য্য—
ঐ সঞ্চারিভাব ১৬৩
পূর্ব্বরাগ—পুনঃ ত্রিবিধ—(ক) প্রৌঢ়
(দশদশা—লালসাদি) ১৬৪
(খ) সমঞ্জস—(অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি
গুণকীর্ত্তন,) ১৬৮

(গ) সাধারণ—(অভিলাষাদি) ১৭০
কামলেখ—(নিরক্ষর ও সাক্ষর)
ও মাল্যার্পণ ঐ
কামের দশ দশা ১৭১
২ মান—
সঞ্চারিভাব ১৭২
মান দ্বিবিধ—(ক) সহেতু—
(বিপক্ষ বৈশিষ্ট্য)— ১৭৩
(অ) শ্রবণ (আ) অনুমিত—
(রতিচিহ্ন—বিপক্ষ ও প্রিয়গাত্রে,
প্রলাপ স্বপ্ন দর্শন ও দর্শন)
(খ) নির্হেতু— ১৭৬
(কারণে ও কারণ আভাসে)
মানের উপশম— ১৭৭
১ সাম, ২ ভেদ ক্রিয়া, ৩ দান,
৪ নতি, ৫ উপেক্ষা ১৭৮
রসান্তর— ১৭৯
১ যাদৃচ্ছিক ও ২ বুদ্ধিপূর্ব্বক
মানোপশমন— ১৮০
নির্হেতু মান—ত্রিবিধ— ১৮১
লঘু, মধ্য ও মহিষ্ঠ
মানিনীগণের শ্রীকৃষ্ণ সম্বোধন ঐ
(৩) প্রেম বৈচিত্ত্য— ১৮১
(৪) প্রবাস— ১৮২
ব্যভিচারীভাব
প্রবাস—দ্বিবিধ
(ক) বুদ্ধিপূর্ব্ব—(কিঞ্চিদ্দূর ও
সুদূর—ভাবী, ভবন্ ও ভূত)
(খ) অবুদ্ধিপূর্ব্ব ১৮৪
দশদশা ১৮৪
দশমদশা ১৮৬

ষোড়শ অধ্যায়—সম্ভোগ প্রকরণ

সংযোগ-বিয়োগ-
স্থিতি ১৮৭
সম্ভোগ—
(১) মুখ্য সম্ভোগ—
(ক) সংক্ষিপ্ত-
সম্ভোগ ১৮৮
(খ) সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ
(গ) সম্পূর্ণ সম্ভোগ ১৮৯
(আগতি ও প্রাদুর্ভাব)
(ঘ) সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ
(২) গৌণ সম্ভোগ— ১৯০
স্বপ্ন সম্ভোগ —

১ সামান্ত ও ২ বিশেষ,
সামান্য নিদ্রা সম্ভোগ ১৯১

সম্ভোগ-বিশেষ-
নিরূপণ ১৯২

দর্শন, জল্প, স্পর্শ, বর্ত্মরোধ, রাস,
বৃন্দাবন-ক্রীড়া, যমুনাকেলী,
নৌকা-খেলা, ১৯৩

বংশী চৌর্য্য, বস্ত্র চৌর্য্য, পুষ্প চৌর্য্য, ঘট্ট,
কুঞ্জলীলা, মধুপান, বধূবেশ, ১৯৪
কপট শয়ন, পাশকক্রীড়া, বস্ত্রাকর্ষণ,
চুম্বন, আলিঙ্গন, নখরেখা, অধর
সুধাপান, সংপ্রয়োগ ১৯৫
গ্রন্থশেষে মঙ্গলাচরণ ১৯৬
অনুবাদক ১৯৭
পরিশিষ্ট—
চতুঃষষ্টিরস ১৯৯

উজ্জ্বল চন্দ্রিকা

প্রথম অধ্যায়

নায়কভেদ প্রকরণ

———:※:———

নামাকৃষ্টরসজ্ঞঃ শীলেনোদ্দীপয়ন্ সদানন্দং।
নিজরূপোৎসবদায়ী সনাতনাত্মা প্রভুর্জয়তি॥

এই শ্লোক হয় গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ।
তিন প্রকার ব্যাখ্যা তাহে করেন মহাজন॥
নামে রসজ্ঞেরগণ কৈল আকর্ষণ।
'রসজ্ঞ'-শব্দে কহে ইঁহ ব্রজদেবীগণ॥
সামান্যেত স্থ-পর্য্যন্ত রসিক আকর্ষিলা।
অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্ট হরি এই ধ্বনি হৈলা॥
নিজ পিতা নন্দের ভাবের উদ্দীপন।
নিজরূপে সবাকার আনন্দ কারণ॥
'সনাতন'-শব্দে কহে সচ্চিৎ আনন্দ।
সেই আত্মা যার সেই হয়েন গোবিন্দ॥
এই ত প্রথম অর্থ করিল প্রচার।
সনাতন-পক্ষ আছে, গৌর-পক্ষ আর॥

সেই সব ব্যাখ্যাতে গ্রন্থ হয়ত বিস্তার ।
সেই ভয়ে এই অর্থ না করি প্রচার ॥

মধুর ভক্তিরসরাজ লক্ষণ

পূর্ব্ব গ্রন্থে বর্ণিয়াছেন মুখ্যরসগণ । *
বিস্তারি মধুররস না কৈল বর্ণন ॥
বড়ই রহস্য তাহা, ইঁহ বিস্তারিলা ।
কেহ কেহ পাণ্ডিত্যের শক্তিতে বুঝিলা ॥
এবে যেই মতে বুঝে সম্প্রদায়গণ ।
সেই লাগি ভাষা করি করিল বর্ণন ॥
ইহা যদি মোহান্তের কৃপালেশ হয় ।
তবে ত হইবে গ্রন্থ জানিহ নিশ্চয় ॥
পরে যেই বিভাবাদি † করিব বর্ণন ।
তাহাতে মধুরারতি হয় আস্বাদন ॥
আস্বাদিত হৈলে তারে কহি ভক্তিরস ।
নামেতে মধুর হয় কৃষ্ণ যার বস ॥

---

* পূর্ব্বগ্রন্থ—মূল "উজ্জ্বলনীলমণি"-গ্রন্থকার বিরচিত "ভক্তিরসামৃত সিন্ধু" নামক গ্রন্থ। 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' গ্রন্থখানি মূলতঃ চারিভাগে বিভক্ত, প্রথম বা পূর্ব্ববিভাগে—ভক্তি, সাধন, ভাব ও প্রেম প্রভৃতি নির্ণয়; দ্বিতীয় বা দক্ষিণবিভাগে—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব, ব্যভিচারীভাব ও স্থায়ীভাব প্রভৃতি নির্ণয়; তৃতীয় বা পশ্চিমবিভাগে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসাদির ভাব নির্ণয়; এবং চতুর্থ বা উত্তরবিভাগে—গৌণরস ও মুখ্যরস বিচার; মৈত্রী, বৈর, সংযোগ প্রভৃতি ভাব ও রস; রসাভাসাদির নির্ণয় এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য রসভাবাদির বিচার বর্ণিত আছে। সুতরাং, 'উজ্জ্বলনীলমণি'-গ্রন্থখানি, 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু'-গ্রন্থের উপসংহার বা উত্তরবিভাগ। মুখ্যরস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররস।

† 'বিভাব,' 'অনুভাব,' 'সাত্ত্বিক' এবং 'সঞ্চারি' বা 'ব্যভিচারী' প্রভৃতি কার্য্যকারণ সহকারি ভাব নিচয়। 'বিভাব'—দ্বিবিধ—'আলম্বন' ও 'উদ্দীপন'। 'আলম্বন'—বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রথম হইতে নবম অধ্যায়ে, 'উদ্দীপন'—দশম অধ্যায়ে, 'অনুভাব'—১১শ অধ্যায়ে, 'সাত্ত্বিক'—১২শ অধ্যায়ে এবং 'ব্যভিচারী' বা 'সঞ্চারি'—১৩শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

বিভাব

(আলম্বন ও উদ্দীপন)

বিভাবের * নাম হয় দুই ত প্রকার
'আলম্বন' একনাম, 'উদ্দীপন' আর ॥
উজ্জ্বলের † আলম্বন ব্রজেন্দ্র নন্দন।
আর কৃষ্ণ-প্রিয়াগণ § হয় আলম্বন ॥

কৃষ্ণ বিষয়ক উদ্দীপন

যথা, ‡

যাকর পদদ্যুতি দরশনে নিগরব কোটি কোটি মনমথ ভেল।
কুটিল দৃগঞ্চল বিদগধি বিহরলি ত্রিভুবন মন হরি নেল ॥
অভিনব জলধর সুন্দর আকৃতি করতহি পরম বিহার।
ত্রিজগত যুবতীক ভাগিবর সাধন মূরতি সিদ্ধি অবতার ॥
সো অব নন্দকি নন্দন নাগর তোহে করু আনন্দ ভোর।
শ্রীশচীনন্দন ও নব মাধুরী বরণি না পাওল ওর ॥

শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী

সুধী, সপ্রতিভ, ধীর, বিদগ্ধ, চতুর
সুখবান, কৃতজ্ঞ, দক্ষিণ, প্রেম-প্রচুর ॥
গাম্ভীর্য্য-সমুদ্র, বরীয়ান, কীর্ত্তিমান।
নারীর মোহন, নিত্য নূতন বরধাম ॥
অতুল্য কেলি-সৌন্দর্য্য আর প্রেয়সীরগণ।
এ সব চিহ্নিত কৃষ্ণ আর বংশীকণ ॥

---

* রতি বিষয়ক আস্বাদনের হেতুকে 'বিভাব' বলে।

† উজ্জ্বল—মধুরাখ্য ভক্তিরস। § কৃষ্ণভক্তগণও বিবেচ্য।

‡ পূর্ব্বরাগবতী শ্রীমতী রাধিকা, পৌর্ণমাসীকে প্রণাম করিলে, তাহার আশীর্ব্বচন।

ইত্যাদি শৃঙ্গারী গোবিন্দের গুণগণ।
উদাকৃতি ইঁহ কিছু নাহি বিবরণ ॥†

চতুর্ব্বিধ নায়ক

পূর্ব্বেতে § কহিল যেই 'ধীরললিত' ††।
'ধীরশান্ত', 'ধীরোদাত্ত', আর 'ধীরোদ্ধত' ॥

পতি ও উপপতি

এই চারিভেদে আছে 'পতি' 'উপপতি'।
এবে কিছু কহি তাহে পতির বিবৃতি ॥

পতি

শাস্ত্রমতে কান্তার যেই করে পাণিগ্রহে।
সেই ভর্ত্তা হয়, তারে 'পতি'-শব্দে কহে ॥
রুক্মি জয় করি হরি রুক্মিনী হরিল।
দ্বারকা লইয়া তাহে বিবাহ করিল ॥
এই ব্রত কৈল যেই কুমারিকাগণ।
তাথে কারু কারু পতি ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥
রুক্মি বিবাহের পূর্ব্বে গোপী পরিণয়।
'মূল মাধব-মাহাত্ম্যেতে' এই বাক্য কয় ॥

---

† "ভক্তিরসামৃত সিন্ধু"-গ্রন্থের দক্ষিণবিভাগের প্রথমালহরীতে, শ্রীকৃষ্ণের এই সকল চতুঃষষ্টি গুণাবলীর বিস্তৃত উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

§ "ভক্তিরসামৃত সিন্ধু"-গ্রন্থের দক্ষিণবিভাগের প্রথমালহরী দ্রষ্টব্য।

†† 'ধীরললিত'—বিদগ্ধ, নবযুবা, পরিহাস-বিশারদ ও নিশ্চিন্তকে 'ধীরললিত' কহে। ইনি প্রায়ই প্রেয়সীর প্রেমানুসারে বশবর্ত্তী হন। যথা—কন্দর্প। 'ধীরশান্ত'—শান্ত-স্বভাব, ক্লেশসহিষ্ণু, বিবেচক এবং বিনয়াদি গুণযুক্তকে 'ধীর শান্ত' কহে। যথা—যুধিষ্ঠিরাদি। 'ধীরোদ্ধত'—মৎসরী বা অন্যশুভদ্বেষী, অহঙ্কারী, মায়াবী, রোষণ, চঞ্চল এবং আত্মশ্লাঘাকারীকে 'ধীরোদ্ধত' কহে। যথা—ভীমসেন আদি। "ধীরোদাত্ত"—গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, দয়ালু, সুদৃঢ়ব্রত, শ্লাঘারহিত, গূঢ়গর্ব্ব এবং সুসত্ত্বভৃৎ বা বলবিশেষ সম্পন্নকে "ধীরোদাত্ত" কহে। যথা—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরঘুনাথ।

উপপতি

ইহলোক পরলোক না করি গণন।
নিজ রাগে করে যেই ধর্ম্মের লঙ্ঘন॥
পরকীয়া নারী সঙ্গে করয়ে বিহার।
সদা প্রেমবশ, 'উপপতি' নাম তার॥

যথা,, (পৌর্ণমাসী প্রতি বৃন্দার উক্তি)—

রাইক মন্দির আসি করু নাগর সঙ্কেত কোকিল বোল।
শুনি ধনি উঠত দ্বার যব খোলই হোয়ল কঙ্কণ রোল॥
দেখ দেখ, নাগর আনন্দ ভোর।
কঙ্কণ ধ্বনি শুনি মনে অনুমানই রাই মিলব মঝু কোর॥
জটিলা জাগরি তৈখনে বোলত— কোঁ করু কঙ্কণ নাদ।
শুনি ধনি চমকিত মন্দিরে সুতল নাগর গণল প্রমাদ॥
পুনঃ ধনি আসি মিলব মঝু সঙ্গতি ঐছন মনোরথ ভেল।
রাধা মন্দির কোন বদরি তলে জাগরি যামিনী গেল॥

শৃঙ্গারের মাধুর্য্য অধিক ইহাতে।
উপপতি-রস শ্রেষ্ঠ ভরতের মতে॥

পরমা রতি

লোক-শাস্ত্রে করে যাহা অনেক বারণ।
প্রচ্ছন্নকামুক যাথে দুর্ল্লভ মিলন॥
তাঁহাতে 'পরমারতি' মন্মথের হয়।
মহামুনি নিজ শাস্ত্রে এই মত কয়॥
ইহাতে লঘুতা যেই কবিগণ কয়।
প্রাকৃত নায়কে সেহ, কৃষ্ণ প্রতি নয়॥
রসের পরমাকাষ্ঠা রতি আস্বাদন।
অবতার কৈল হরি ব্রজেন্দ্র নন্দন॥

পতি ও উপপতি—চতুর্বিবধ

'অনুকূল', 'দক্ষিণ', 'শঠ' আর হয় 'ধৃষ্ট'।
পতি উপপতি দোহার চারিভেদ ইষ্ট ॥
শাঠ্য ধৃষ্ট উপপতি নাট্যশাস্ত্রে কয়।
কৃষ্ণেতে সম্ভবে সব, অযুক্ত কিছু নয় ॥

১। অনুকূল

এক নারী রত হয় অন্য নারী ছাড়ি।
সীতার প্রতি রাম 'অনুকূল' নামধারী ॥
রাধায় 'অনুকূল' হয় ব্রজেন্দ্র নন্দন।
অন্য নারী ছাড়ি হৈল রাধার স্মরণ ॥

যথা (শ্রীমতীর প্রতি বৃন্দার উক্তি)—

গোকুল নগরে চতুরা নাগরী কতনা যুবতী নারী।
তা সনে বিহরে কখন কখন নন্দের নন্দন হরি ॥
রাই, তুহু সে জানসি রস।
সকলের কাছে যেমন তেমন হরি সে তোমারি বশ ॥
যখন তোমারে না দেখে নাগর কাতর হইয়া রহে।
কতনা যুবতী লালসা করয়ে ফিরিয়া নাহিক চাহে ॥
যত গুণবতী আছয়ে যুবতী তুহু তার শিরোমণি।
তোমারে ছাড়িতে না পারে যেমন ফণি না ছাড়য়ে মণি ॥

(ক) ধীরোদাত্তানুকূল *

যথা (রাধাভাবে তন্ময় শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া চিত্রার প্রতি ললিতার আশ্বাসবাণী)—

কুবলয়-নয়নি সঙ্কেত করি রহতহি, কত কত কুঞ্জ কুটীরে।

---

* গম্ভীর-প্রকৃতি, করুণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আত্মশ্লাঘাশূন্য, বিনয়ান্বিত, ক্ষমাগুণশালী এবং উদার-চরিত্র নায়ককে 'ধীরোদাত্তানুকূল' কহে।

কুটীল দৃগঞ্চলে	মনসিজ বিদগধি	বিতরই গোকুল বীরে ॥
দেখ দেখ রাইক	প্রেম তরঙ্গ।	
যাকর দরশ	পরশ রস লালসে	ছোড়ল সোসব সঙ্গ ॥
নাগর রাজে	বান্ধি নিজ প্রেমহি	রাই সাধই নিজ কামা।
কত কত যুবতী	কতহি রস বিতরই	তবহি শিথিল নহে প্রেমা ॥

(খ) ধীরললিতানুকূল *

যথা (নান্দীমুখী প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি)—

নন্দ যশোমতি করে যত গৃহ ভার।	কেবল করেন হরি বিপিন বিহার ॥
অনুদিন বিহরই রাইক সঙ্গ।	মানস নিমগন মননিজ রঙ্গ ॥
যমুনা তীরহি সদত বিহারী	গুণবতী হোওল ভানু-কুমারী ॥
উপবন তরু সব করল বিভারিত।	শ্যাম জলদ তাহে রাই তড়িত ॥

(গ) ধীরশান্তানুকূল †

যথা (জটিলার পার্শ্বে অবস্থিতা শ্রীমতীর প্রতি বিশাখা)—

রবির পূজন	করিতে গহনে	তোমারি প্রেমের বশে।
দেখ দেখ রাই	নাগর আইল	ধরিএ ব্রাহ্মণ বেশে ॥
চাতুরী করিয়া	জটিলা নিকটে	লুকালো আপন সাজ।
জটিলা জানিলে	বিপদ ঘটিত	ভাল না হইত কাজ ॥
দ্বিজবর গুণ	সকলি আছয়ে	বদনে বিনয় বাণী।
সরল অন্তর	সরল চাহনি	দেখিতে যেমন মুনী ॥
উদার চরিত	বচন মধুর	সুন্দর ও তনুখানি।
রবির পূজন	করিল এখন	দ্বিজবেশে ব্রজমণি ॥

---

* রসিক, নবযুবা, পরিহাসপটু, নিশ্চিন্ত, প্রেয়সীর বশীভূত এবং প্রেয়সীর প্রতি অনুকূল নায়ককে "ধীরললিতা-নুকূল' কহে।

† 'ধীরশান্ত'—৪ পৃঃ টীকা দ্রষ্টব্য

(খ) ধীরোদ্ধতানুকূল §

যথা (ললিতার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

বলিতে, শুন মধু সত্য এক বাণী।
রাইক পরিহরি আন যুবতী সহ স্বপনহি প্রেম না জানি ॥
কেবল রাইক প্রেম নাম জানত রাই প্রাণধন মোর।
কো কহু সদগুণ সাগর নাগর আন যুবতী রসভোর ॥
তুহু বর চতুরী সবহু মরু জানসি সম্বরু কোপ তরঙ্গ।
মনমথ বিশিখে সতত তনু দাহই তুরিত দেহ রাইক সঙ্গ ॥

২। দক্ষিণ

যে নায়ক পূর্ব্ব রমণীতে করে ভয়।
গৌরব দাক্ষিণ্য প্রেম সতত করয় ॥
অন্য-চিত্ত হয়া তাহা না পারে ছাড়িতে।
তাহারে 'দক্ষিণ' কহি রস-শাস্ত্র মতে ॥

যথা (চন্দ্রাবলীর প্রতি নান্দীমুখী)—

চন্দ্রাবলী শুন বচন তুহু মোর। মিছই বচন না হোয়ব তোর ॥
স্বপনে না ছাড়ই হরি তুয়া সাথে। তুয়া প্রেমে বান্ধল গোকুলনাথে ॥
খল-জন কহই কানু আন সঙ্গ। খল-বাদে নাহি করবি প্রেম ভঙ্গ ॥
নান্দীমুখী মুখে শুনি এত বোল। চন্দ্রাবলী ভেল আনন্দ ভোল ॥

কিম্বা যাকে প্রেয়সীর প্রেমেতে সমান।
'দক্ষিণ' শব্দের হয় তাহাতে আখ্যান ॥

যথা (নান্দীমুখী প্রতি কুন্দলতা)—

দ্বারকাতে হরি সিংহাসনে বসে ছিলা। হেনকালে এক দূত কহিতে লাগিলা ॥
পদ্মা* করতহি নয়ন তরঙ্গ। কমলা জুড়ই যোড়ই অঙ্গ ।

§ 'ধীরোদ্ধত'—৪ পৃঃ টীকা দ্রষ্টব্য

* পদ্মা, কমলা, তারা, সুকেশী, শৈব্যা—ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পরোঢ়া নিত্য-প্রেয়সী; অপর নিত্যপ্রেয়সীগণ যথা—ললিতা, শ্যামা, ভদ্রা, চিত্রা, পোয়ালী, ধনিষ্ঠা, পালিকা প্রভৃতি।

তারা দরশই ভুজ পরকাশি। শ্রুতিমূল কণ্ডুন করল সুকেশী ॥
শৈব্যা নীবি উপর ধরু কর। বহুতর নারী করই রস ভর ॥
একই নাগর বহুতর নারী। কুন্ঠিত মানস হোয়ল মুরারী ॥

৩। শঠ

প্রেয়সীর অগ্রে যেই পরপ্রিয় বাণী কয়।
পরোক্ষে বিপ্রিয় তার বহুত করয় ॥
তারে লুকাইয়া বহু অপরাধ করে।
'শঠ'-শব্দের শক্তি সেই ত নাগরে ॥

যথা (নান্দীমুখী প্রতি শ্যামার কোন এক সখীর উক্তি)—

জাগরে বোলল তুহু মঝু প্রাণ। সপনহি তাকর বদনে শুনি আন ॥
'পালী' 'পালী' বলি কহই কতবার। বুঝল তা সঞে করই বিহার ॥
শ্যামা সখী শুনল সপনকি ভাষ। ঘন ঘন ছোড়ই দীঘল নিশাস ॥
এ মধু রাতি তিন যাম পরিমাণ। জাগরি হোয়ল যুগসম জ্ঞান ॥

৪। ধৃষ্ট

অন্য নারীর রতিচিহ্ন প্রতি অঙ্গে রয়।
তথাপি প্রিয়ার আগে কহয়ে নির্ভয় ॥
মিথ্যাবাক্য প্রিয়া আগে কহে অনুক্ষণ।
তারে 'ধৃষ্ট' বলি কহে রসিকের গণ ॥

যথা (খণ্ডিতা শ্যামার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ) *—

কাঁহা নখচিহ্ন চিহ্নলি তুহু সুন্দরী— এ নব কুসুম রেহ।
কাজর ভরমে মরমে কাহে গঞ্জসি— মৃগমদ পঙ্ক পুর এহ ॥
সুন্দরি, মঝু মনে আগল ধন্দ।
অপরূপ রোখ দোখ বিনু মানসি দিনহি তরুণ দিঠি মন্দ ॥

---

* গোবিন্দ কবিরাজ কৃত মূল পদের অনুবাদ।

গৈরিক হেরি কিয়ে করি মানসি উরুপর যাবক ভানে ॥
যাগুক বিন্দু ইন্দুমুখী নিন্দসি সিন্দূর করি অনুমানে ॥
তোহারি সম্বাদে জাগি হায় সব নিশি অরুণিম ভেল নয়ান ।
তুহু পুন পালটি মুখে পরিবাদসি গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

নায়ক ভেদ—৯৬ প্রকার

'ধীরোদাত্ত' আদি যেই চারি প্রকার ।
তাহে পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম আর ॥
চারি তিনে পুরিতে দ্বাদশবিধ হ'ল ।
'পতি' 'উপপতি' তায় দুই ভেদ দিল ॥
দ্বাদশ দ্বিগুণ করি চব্বিশবিধ হয় ।
দক্ষিণাদি চারি ভেদে ছেয়ানইবিধ কয় ॥
ধৃষ্ট আদি ভেদ যেই রস-শাস্ত্রে কয় ।
না কহিল তাহা. ভরতের মত নয় ॥ ‡

---

‡ 'নাট্য-শাস্ত্র' নামক অলঙ্কার-গ্রন্থ রচয়িতা প্রাচীন কবি । সংস্কৃত অলঙ্কার-গ্রন্থ রচয়িতাগণের মধ্যে ভরতমুনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নায়ক-সহায় প্রকরণ ।

১। সখা

নায়ক-সহায় হয় পঞ্চ প্রকার।
'চেট্,' 'বিট্,' 'বিদূষক,' 'পীঠমর্দ্দ' আর॥
আর 'প্রিয়নর্ম্ম সখা' রস-শাস্ত্র মতে।
সব সহায়ের গুণ কৃষ্ণ আহ্লাদিতে॥
পরিহাস করে সদা অনুরাগ গাঢ়।
দেশকাল পাত্র জানিতে বুদ্ধি বড়॥
মানিনী প্রিয়ার করে মান ভঞ্জন।
নিগূঢ় মন্ত্রণা সহায়ের গুণগণ॥

(ক) চেট্

সন্ধান-চতুর যেই গূঢ় কর্ম্ম করে।
বুদ্ধির প্রগল্‌ভ যুক্ত 'চেট্'-নাম ধরে॥
ভঙ্গুর, ভৃঙ্গার আদি আছয়ে গোকুলে।
কৃষ্ণের 'চেট্' হয় তারা, রস-শাস্ত্রে বলে॥

যথা (কৃষ্ণ প্রতি চেট্-সখা ভৃঙ্গারক উক্তি)—

রাইক বচন কহলুঁ বহু চাতুরী শুন শুন সুন্দরী রাই।
এ হেন অপরূপ কভু নাহি হেরল পেখহ বাহিরে যাই॥
উপনীত শরত সময় ইহ সুন্দর শারদ তরু বিকশিত।
অপরূপ অসময়ে কুসুমিত মাধবী কুঞ্জ কুহর বিভূষিত॥

এ মঝু চাতুরী- বচন শুনি সুন্দরী অওিল কুঞ্জকি পাশ।
অব তুহু যাই রাই সহ মিলহ পূরব মনসিজ আশ॥

(খ) বিট্

বেশ ভূষা উপচার যাহার বিদিত।
ধূর্ত্তের প্রধান, কামতন্ত্রের পণ্ডিত॥
রসশাস্ত্রে 'বিট্' বলি তাহার আখ্যান।
কড়ার, ভারতীবন্ধ ব্রজে তার নাম॥

যথা (মানিনী শ্যামার প্রতি বিট্-সখা কড়ারের উক্তি)—

এ ব্রজমণ্ডলে যত রহু নাগরী নিকর হাম সব জান।
সো বর নাগরী ইহ নাহি পেখতু যা মঝু বাত করে আন॥
গোকুল ভূপতি নন্দন নাগর তা কর হাম বর সঙ্গী।
সবিনয় বাতে সোহ ইহ যাচই ছোড়হ কোপকি ভঙ্গী॥
যাকর মুরলী সকল ব্রজনারীক লাজ ধৈরজ হরি নেল।
সো হরি, মান- ভরমে তুহু তেজলি ভাল যুকতি নাহি ভেল॥

(গ) বিদূষক

ভোজনে চঞ্চলবর কলহে পণ্ডিত।
নানারঙ্গ বাক্যবেশে হাস্যকারী রীত॥
তারে 'বিদূষক' বলি, জানে নানা ছল।
'বিদগ্ধ মাধবে' † খ্যাত শ্রীমধুমঙ্গল॥

যথা (মানিনী শ্রীমতীর প্রতি বিদূষক বসন্তের উক্তি)—

তুহু যারে আদরে নিতি নিতি পূজসি দেওসি কত উপচার।
সো অব দিনকর আদরে দেওল মুখে পঙ্কজ উপহার॥

---

† 'উজ্জ্বল নীলমণি'-গ্রন্থ রচয়িতা শ্রীল রূপগোস্বামী বিরচিত 'বিদগ্ধমাধব' নামক নাটক। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই গ্রন্থের সংস্কৃত টীকা এবং যদুনন্দন দাস—"রাধাকৃষ্ণ লীলা রসকদম্ব" নামক পদ্যানুবাদ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে সুমধুর ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণিত আছে।

মানিনি, পঙ্কজে হাম নাহি নেল।
না করি সিনান আনি মুখে দেওল ইথে লাগি দূরে ফেলি দেল ॥
সো পরিচারণ তাহে ঘুচায়নু রোখে ভরল তনু জোর।
সো অব হাম তোহে কত সাধই, বচন না মানসি মোর ॥

(ঘ) পীঠমর্দ্দ

গুণেতে নায়ক সম অনুবর্ত্তী প্রেমা।
'পীঠমর্দ্দ' হয় ব্রজমণ্ডলে শ্রীদামা ॥

যথা (চন্দ্রাবলীর পতি গোবর্দ্ধনমল্ল প্রতি শ্রীদাম)—

সুন্দর কালিন্দী তীরে মুকুন্দ বিহার করে শুনি সব ব্রজনারীগণ।
বিশ্বাস করিয়া তায় সে লীলা দেখিতে যায় হরি লীলা বড় বিস্মাপন ॥
গোবর্দ্ধন, তুমি না করিহ অন্যমন।
সকলেই যায় তাহে— একা চন্দ্রাবলী নহে— সত্য জান আমার বচন ॥
তার প্রিয় সখা মোরা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধি তোরা তেঞি কহি এ হিত-বচন।
গোবর্দ্ধন গিরি ধরি রক্ষা কৈল ব্রজপুরী তুমি না ঘটাও হেন জন ॥

যথা বা (শ্রীদাম প্রতি গোবর্দ্ধনমল্ল-জননী ভারুণ্ডার উক্তি)—

তোমার বচন শুনিয়া এখন মনেতে বিশ্বাস হয়।
নন্দের নন্দন সে বড় সুজন তাহাতে নাহিক ভয় ॥
শ্রীদাম, আমি বড় মনে দুখী।
কি করি ভবানী তুষিব অমনি উপায় নাহিক দেখি ॥
কুঙ্কুম চন্দন বনফুল মালা লইয়া আপন করে।
মোর বধূ আদি গহনে চলয়ে মহামায়া পূজিবারে ॥
খল-জন দেখি, কতেক বলয়ে কলঙ্ক করয়ে কুলে।
বধূ যেয়া করু ভবানী পূজন কি করিতে পারে খলে ॥

(ঙ) প্রিয়নর্ম্ম সখা

অত্যন্ত রহস্য জানে সখীর সমান।
সকল সখার শ্রেষ্ঠ 'প্রিয়-নর্ম্ম' নামে ॥

গোকুলে সুবল, আর অর্জ্জুন মহাশয়।
সর্ব্বরস জ্ঞাত—'প্রিয়-নর্ম্ম' সখা হয়॥

যথা (সখী সম্বোধনচ্ছলে সুবলের প্রতি রূপমঞ্জুরী)—

যো বর নাগরী কেলি-কলহ করি মানিনী হোই চলি যায়।
তাকর চরণ যুগল ধরি সাধই নাগর নিকটে মিলায়॥
সখি, সুবল বড় পুণ্যবান।
কুঞ্জ কি মাঝে শেজ বর করতহি মনসিজ কেলি বিথান॥
হরি যব রাইক হৃদয় পরি সুতই অলস বলিত সব অঙ্গ।
রতি রণ ছোড়ি থির নাহি পাওত ঢর ঢর ঘরম তরঙ্গ॥
তৈখনে যাই সুবল নব-পল্লবে বিজই নাগর রাজে।
ঐছন সেবন নিতি নিতি করতহি সুবল নিকুঞ্জ কি মাঝে॥

অথবা (সুবলের প্রতি উজ্জ্বল-সখার সাভিলাষ উক্তি)—

যো ব্রজ নাগরী কুটীল দৃগঞ্চলে হরিমাধুরী করু পান।
ভুজ যুগে বেঢ়ি হৃদয়ে কুচ ধারই করই আলিঙ্গন দান॥
আপহি আসি গরবে হরি মুখবিধু অধরসুধা করে পান।
মাধব আদরে সাধ করি তোষএ বিনয় বচন বহুমান॥
ঐছন ভাগী অব গোপীক হোয়ল বুঝইতে সংশয় ভেল।
কাহে এত ধন্য পুণ্য করি হোয়ল কোন গহনে তপ কেল॥

চতুর্ব্বিধ সখা হয়, চেট্ হয় দাস।
পীঠমর্দ্দের বীররসে সাহায্য প্রকাশ॥

২। দূতী

দূতিকা বলিব 'হরিপ্রিয়া প্রকরণে'।
তাথে যথাযোগ্য করি জানিহ সেখানে॥

(ক) স্বয়ং দূতী (কটাক্ষ ও বংশীধ্বনি)

যথা, (কটাক্ষ) শ্রীমতীর প্রতি বিশাখা—

শুন সখি মাধব নয়ন তরঙ্গ আপহি করতহি দূতিক রঙ্গ ॥
যাকর উপর আসি পহু মিলে তবহি বজর পড়ে তাকর কুলে ॥
আন রহু দূর, তুহু ধীর বরনারী চঞ্চল হোয়ল চরিত তোহারি ॥

(বংশী—'ললিত মাধবে'†)—

(খ) আপ্ত-দূতী

বীরা, বৃন্দা আদি কৃষ্ণের আপ্ত-দূতী হয়।
বীরার প্রগল্ভ বাক্য, বৃন্দার বিনয় ॥

যথা, (শ্রীমতীর প্রতি বীরা দূতির উক্তি)—

না করু গরব সুন্দরী মঝু বচনে। হরি সনে কলহ কয়লি ধিক জীবনে ॥
গিরি ধরি রাখল এ ব্রজভুবনে। তুরিতহি মিলহ তাকর চরণে ॥

যথা (বৃন্দা বচন)—

বৃন্দা নাম হাম বিনয় করই কত পুণ পুণ প্রণমহি চরণে।
এ মঝু বচনে বচন দেহ সুন্দরী ফিরি চাহ খঞ্জন-নয়নে ॥
রাই তুয়া ভুরু- ভুজঙ্গিনী ভ্রমণে।
অতিশয় মান বিষম বিষ দাহনে জারল কালীয় দমনে ॥
নাগর চিত ভীত অতি আকুল ব্রজ ছাড়ি ফিরই গহনে।
ছোড়ই দোখ রোখ সব সম্বর শীতল জল দেহ দহনে ॥

বীরা, বৃন্দা কেবল কৃষ্ণের দৌত্য করয়।
কহিব যে আর দূতি, দোহাকার হয় ॥

---

† 'উজ্জ্বল নীলমণি'র গ্রন্থকার শ্রীল রূপগোস্বামী বিরচিত পুরলীলা বর্ণনাত্মক নাটক। মূল গ্রন্থে উদ্ধৃত উদাহরণ—'গার্গী কহিলেন, অহো সদ্বংশজাত বংশীধ্বনিরূপ দূতীর কি চমৎকার শক্তি! সে কুলকামিনীগণের লজ্জা নাশ করে এবং তাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে বলে আকর্ষণ করিবার জন্য ভার প্রাপ্ত হইয়াছে—এই বংশীধ্বনির

তৃতীয় অধ্যায়

হরিপ্রিয়া বা কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণ

হরির সাধারণ গুণ* যাহাতে আছয়।
বড় প্রেম সুমাধুর্য্য সম্পদ আশ্রয়॥
কৃষ্ণ-প্রিয়াগণের চরণে নমস্কার।
অপূর্ব্ব মাধুরী যার সৌন্দর্য্যের সার॥

স্বকীয়া ও পরকীয়া

'স্বকীয়া' 'পরকীয়া' তার দুই ভেদ হয়
'পরকীয়া' রসশ্রেষ্ঠ রসশাস্ত্রে কয়॥

১। স্বকীয়া

বিবাহিতা নারী যে পতির আজ্ঞাকারী।
অচঞ্চল পতিব্রতা 'স্বকীয়া' নাম তারি॥

যথা (রুক্মিণী প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

তুহু সম গৃহিণী নাহিক মঝু গৃহে। দূত পাঠাই তুহু কয়লি বিবাহে॥
আয়ল কত শত রাজকুমার। সো সব ছোড়ি হোয়লি মঝু দার॥
মঝু গুণ শুনি তুহু আওলি পাশ। তুহু সহ গৃহে রহি পূরল আশ॥

দ্বারকা-বিহার

স্বকীয়া নারীতে কৃষ্ণের দ্বারকা বিহার।
অষ্টোত্তর শত স্ত্রীয়া যোড়শ হাজার॥

সখী ও দাসী

তাঁহাদের সখী দাসী অসংখ্য রূপসী।
তুল্য রূপ গুণ 'সখী', ন্যূন হল 'দাসী'॥

---

* প্রথম অধ্যায় "শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী"——৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অষ্ট মুখ্যা মহিষী

তাহাতে রুক্মিণী, সত্যা, আর জাম্ববতী।
কালিন্দী, কৌশল্যা, ভদ্রা, শৈব্যা রূপবতী ॥
মাদ্রী, এই প্রেয়সীর মুখ্য অষ্টজন।

সর্ব্বোত্তমা মহিষী

রুক্মিণী, সত্যভামা দোহে হয় সর্ব্বোত্তম ॥
ঐশ্বর্য্যে রুক্মিণী দেবী হয় ত প্রধান।
সৌভাগ্যে সত্যভামা জগতে বাখান ॥

স্বকীয়া মহিষী, সখী ও দাসীর সংখ্যা।

এ দোহার সখী দাসী লক্ষশঃ আছয়।
কৃষ্ণের স্বকীয়া নারী কোটী কোটী হয় ॥
গোকুলে কৃষ্ণেতে যারা পতি-বিভাবিতা।
অযোগ্য না হয় তাহাদের স্বকীয়তা ॥

যথা (ব্রজকুমারীর উক্তি)—

যশোমতী রাণী পরাণ সমান করিয়া আমারে জানে।
সখিগণ যত মোরে অনুগত প্রাণের অধিক মানে ॥
বৈকুণ্ঠ জিনিয়া এ নব কানন মুনীর মানস হরে।
এ রূপ যৌবন দেখিতে সুন্দর এ সবে কি কাজ করে ॥
সকলি বিফল হইত কেবল কি হত আমার গতি।
উমাব্রত ফলে যদি না হইত নন্দের নন্দন পতি ॥

গান্ধর্ব্ব ও অব্যক্ত বিবাহ

গান্ধর্ব্ব বিবাহ হেতু স্বকীয়া কহিল।
অব্যক্ত বিবাহে ছন্ন-কামতা রহিল ॥

২। পরকীয়া

রাগে আত্মা সমর্পয়ে দুই লোক ছাড়ি। *
ধর্ম্মেতে গৃহীতা নহে† পরকীয়া নারী॥

যথা (শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য-কর্ম্মে প্রথম প্রবর্ত্তমানা নান্দীমুখী ও গার্গী প্রতি পৌর্ণমাসী)—

প্রথমহি ছোড়ল ধরমকি মত। তবহু সতীগণ‡ বন্দিত পথ।
বনচারিণী বন কুঞ্জ-বিহার নিন্দই তভু কমলা রূপসার॥
রমণী শিরোমণি ব্রজ-কুলনারী। মঙ্গল বিতরই সতত তোহারি॥

কন্যা ও পরোঢ়া

'কন্যা', 'পরোঢ়া' দুই পরকীয়া হয়।
নন্দের ব্রজে প্রায় বাস সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
ইহাতে প্রচ্ছন্ন ক্রীড়া করয়ে গোবিন্দ।
পরকীয়া সঙ্গে কৃষ্ণের অধিক আনন্দ॥
আর কি কহিব, যাথে শুক মহামুণি।
ভাগবতে 'পরকীয়া' বর্ণিলা আপনি॥
ইহা শুনি মঙ্গল ইচ্ছিবা যেইজন।
ভক্তাচার করুন, নতু কৃষ্ণের আচরণ॥
এই ত জানিহ ভক্তি-শাস্ত্রের নির্ণয়।
রামাদি আচার মুক্তি-ধর্ম্ম মতে হয়॥

তথাচ তত্রৈব—নৈতৎ সমাচরেৎ ইত্যাদি §

সকলের শ্রেষ্ঠা হয় পরকীয়া নারী।
আপনি শ্রীমুখেতে মহিমা কহেন করি॥

---

* রাগ—একান্ত অনুরাগ বা আসক্তি; দুইলোক—ইহলোক ও পরলোক।

† ধর্ম্মেতে—বিবাহ-বিধি অনুযায়ী স্বীকৃত বা গৃহীত নহে।

‡ অরুন্ধতী প্রভৃতি সতীবৃন্দ।

§ রাজা পরীক্ষিত রাসলীলা শ্রবণ করিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত হইলে, মুনিবর শুকদেব সন্দেহ ভঞ্জন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন! যে সকল ব্যক্তি অনীশ্বর অর্থাৎ দেহাদি পরতন্ত্র, তাহাদের কদাপি মনের দ্বারাও ঐরূপ আচরণ কর্ত্তব্য নহে।

উদ্ধব ধরণীতলে শ্রেষ্ঠ হরিদাস।
তিঁহো যার পদরেণু কৈল অভিলাষ ॥
মায়াতে ছায়ার নারী পেয়ে গোপগণ।
কৃষ্ণ প্রতি নহে তারা কোপযুক্ত মন ॥
ব্রজদেবী সঙ্গে খেলে নন্দের নন্দন।
নিজ পতি সঙ্গে রতি নাহিক কথন ॥

তথাহি শ্রীদশমে—নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় ইত্যাদি †

(ক) কন্যকা

বিবাহ নাহিক হয় অতি লজ্জাবতী।
জনক পালিতা, খেলে সখীর সংহতি ॥
সখীতে বিশ্বাস বড় মুগ্ধা মাত্র গুণে।
'কন্যা' বলি তাহারে কহয়ে কবিগণে ॥
ধন্যা আদি কন্যা ব্রজে করে দুর্গার্চ্চন।
তাহাদের কৈল হরি অভীষ্ট পূরণ ॥

যথা, (কন্যকার প্রতি লব্ধকৃষ্ণসঙ্গ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার সপরিহাস উক্তি)—

সখীর সহিত ধূলির উপরে খেলহ যমুনা কূলে।
হৃদয়ে বসন না দিলে কথন অলপ বয়স বলে ॥

যেমন, রুদ্র ব্যতিরিক্ত ব্যক্তি বিষ ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ মূঢ়তা প্রযুক্ত ঐরূপ ঈশ্বরের আচরিত কার্য্য আচরণ করিলে অচিরে বিনষ্ট হইবে। মহারাজ! যদিও ভগবান আপ্তকাম, তথাপি ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ নিমিত্ত মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়া তাদৃশ ক্রীড়া করিয়াছেন, যাহা শুনিয়া লোক তৎপর হয়; অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তির চিত্ত শৃঙ্গার রসাকৃষ্ট অথচ বিমুখ, তাহাদিগকেও আত্মপরায়ণ করিবার নিমিত্ত ঐরূপ ক্রীড়া করিয়াছেন। (৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-কৃত অনুবাদ)—শ্রীমদ্ভাগবত দশম ৩৩শ অঃ ২৯—৩০, ৩৬ শ্লোক।

† শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে কহিলেন, হে রাজন! ব্রজবাসী জনগণ ভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়াছিল। অতএব তাহারা এরূপ আচরণেও তাঁহার প্রতি অসূয়া করে নাই। ফলতঃ, ভগবন্মায়ায় তাহারা স্ব-স্ব দারদিগকে আপনাদের পার্শ্বেই (শয্যাদিতে নহে) অবস্থিত বোধ করিত। (৺মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ কৃত অনুবাদ)—শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম—৩৩শ অ—৩৭ শ্লোক।

অলপ বয়েস জানিয়া জনক না খুজে তোমার বর
বিষম চরিত দেখিয়া এখন মনেতে লাগিল ডর ॥
কানু বনমাঝে মুরলী পূরই মধুর মধুর তানে।
তুহুসে কাঁপিয়া চঞ্চল নয়নে চাহিছ গহন পানে ॥

(খ) পরোঢ়া

সদাকৃষ্ণ সঙ্গে রঙ্গে গোপের বিবাহিতা।
কৃষ্ণের পরোঢ়া প্রিয়াগণ অপ্রসূতা ॥

যথা, (চন্দ্রাবলীর প্রতি পদ্মা)—

গৌরী পূজন লাগি বনফুল চয়নে। কাহে তুহু একলি জায়লি গহনে ॥
রহু কণ্টক তরু কুঞ্জক নিলয়ে। কণ্টকচিহ্ন রহুল তুহু হৃদয়ে ॥
ননদিনী দেখব যত নিজ নয়নে। রতিদাগ বলি তব দগধব বচনে ॥
সই, জই ননদিনী কুবচন বলই। ইহ যব পেখব, উঠব জ্বলই ॥

বড়ই সুন্দরী এই নায়িকার গণ।
লক্ষ্মী হতে বড় প্রেম মাধুর্য্য গুণগণ ॥

তথাহি—নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ ইত্যাদি *

পরকীয়া—ত্রিবিধ

'সাধনপরা', 'দেবী', 'নিত্যপ্রিয়া' আর।
সেই পরকীয়া হয় তিন প্রকার।

(১) সাধনপরা (যৌথিকী ও অযৌথিকী)

তাহাতে 'যৌথিকী' কেহ 'অযৌথিকী রয়।
অতএব সাধনপরা দুই মত হয় ॥

---

* অহো! রাসোৎসবে ভুজদণ্ড দ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিত হওয়াতে যাহারা কল্যাণ লাভ করিয়াছিল, সেই সকল গোপীর প্রতি ভগবানের যে অনুগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে, বক্ষঃস্থলস্থিতা একান্তরত কমলার প্রতিও তদ্রূপ অনুগ্রহ হয় না। যে সকল স্বর্গোষিতার পদ্মবৎ সৌরভ এবং মনোহর কান্তি, তাহাদের প্রতিও নাই ইহাতে অন্যাঙ্গনাদের কথা কি ?—

(ক) যৌথিকী

একত্র মিলিয়া কৈল পরম সাধন।
তাহে দুই ভেদ, মুনি আর শ্রুতিগণ ণ॥

মুনি, যথা—

পূর্ব্বে গোপালোপাসনা কৈল মুনিগণ।
বহুকালে না হইল অভীষ্ট পুরণ॥
রামের সৌন্দর্য্য দেখি লুব্ধ হইল মন।
নিজাভীষ্ট সম্পাদনে করিল যতন॥
ব্রজে গোপী হঞা তারা গোবিন্দ পাইল।
শ্রীপদ্মপুরাণে ইহা বিস্তার কহিল॥
বৃহদ্বামণ নামে গ্রন্থ মহাশূর।
তাহাতে এসব অর্থ কহিল প্রচুর॥
কৃষ্ণ বৃন্দাবনে যবে রাসলীলা কৈল।
কেহ বলে কেহ তাথে গোবিন্দ পাইল॥

শ্রুতি, যথা—

গোপী ভাগ্য দেখি সূক্ষ্মবুদ্ধি শ্রুতিগণ।
তপস্যা করিল কৃষ্ণ প্রাপ্তির কারণ॥
তপ করি শ্রুতি সব ব্রজে জন্ম নৈল।
গোপীকা হইয়া ব্রজে কৃষ্ণ-প্রিয়া হৈল॥

(খ) অযৌথিকী (প্রাচীনা ও নবীনা)

গোপীভাবে শ্রদ্ধা করি সাধকের গণ।
ভাবযোগ্য অনুরাগে করিল সাধন॥
কেহু একে একে কেহু দুই তিন মিলে।
বৃন্দাবনে জন্ম নৈল আসি কালে কালে॥

দুই মত অযৌথিকী—'প্রাচীন', 'নবীন' ।*
নিত্য-প্রিয়া সম তাহা হইলা প্রাচীন ॥

২। দেবী

সাধনে নবীনার হৈল বৃন্দাবনে যোনি ।
কেহ বা মানুষ যোনি কেহ দেব যোনি ॥
দেব মধ্যে হৈল কৃষ্ণের যত অবতার ।
তাহা নিত্য-প্রিয়ার অংশ হৈল বারবার ॥
বৃন্দাবনে আইলা কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন ।
নিত্য-প্রিয়ার হৈল প্রাণ সখীগণ ॥

৩। নিত্য-প্রিয়া

রাধা চন্দ্রাবলী আদি নিত্য-প্রিয়া নাম ।
সৌন্দর্য্যে বৈদগ্ধ্যে তারা কৃষ্ণের সমান ॥
তাথে শাস্ত্রে প্রসিদ্ধা হয় রাধা, চন্দ্রাবলী ।
বিশাখা, ললিতা, শ্যামা, ধনিষ্ঠা, গোপালী ॥
পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রা, তারা, চিত্রা, আর পালী ।
'সোমাভা' দ্বিতীয়া নাম হয় চন্দ্রাবলী ॥
'গান্ধর্বী' দ্বিতীয়া নাম রাধিকার হয় ।
'অনুরাধা' নামে পুনঃ ললিতাকে কয় ॥
অতএব পৃথক্ করি না কৈল বর্ণন ।
লোক প্রসিদ্ধ নাম করিএ গণন ॥
খঞ্জনাক্ষী, মনোরমা, বিমলা, মঙ্গলা ।
কৃষ্ণা, শারী, বিশারদা, তারাবলী, লীলা ॥
চকোরাক্ষী, শঙ্করী, কুঙ্কুমা, আদি করি ।
ইহাদের শত শত যূথ ব্রজনারী ॥

---

* প্রাচীনা অযৌথিকী, সুদীর্ঘকালে নিত্যপ্রিয়াদের সালোক্য প্রাপ্ত হন, এবং নবীনাগণ দেব, মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বাদি জন্মান্তর ব্রজে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন—('উজ্জ্বল নীলমণি')

যূথাধিপা

লক্ষ সংখ্যা বরাঙ্গনা এক যূথে রয়।
রাধা আদি কুঙ্কুমান্তি 'যূথাধিপা' হয় ॥
বিশাখা, ললিতা, পদ্মা, শৈব্যা নাম আর।
চার গোপী যূথাধিপা না হয় তাহার ॥*

অষ্ট মুখ্যা সখী

রাধা, চন্দ্রাবলী, শ্যামা, ললিতা, বিশাখা।
পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রা এই অষ্ট সখী মুখ্যা ॥
ললিতাদি গোপী যূথাধিপা হৈতে পারে।
রাধাদির সখ্য লোভে তাহা নাহি করে ॥

---

* পূর্ব্ব বর্ণিত 'নিত্য-প্রিয়াগণ' মধ্যে, রাধা হইতে কুঙ্কুমা পর্য্যন্ত সকলেই যূথেশ্বরী—কেবল, ইহাদের মধ্যে বিশাখা, ললিতা, পদ্মা ও শৈব্যা এই চারিজন যূথেশ্বরী নন।

চতুর্থ অধ্যায়

বৃন্দাবনেশ্বরী বা রাধা-প্রকরণ

তার মধ্যে রাধা, চন্দ্রাবলী সর্ব্বোপার।
যার যূথে কোটী কোটী আছয়ে সুন্দরী॥
শত কোটী গোপী সঙ্গে কৃষ্ণ কৈল রাস।
এই বাক্য আগম নিগমে পরকাশ॥

শ্রীরাধিকা

তার মধ্যে শ্রেষ্ঠা হয় রাধিকা রূপসী।
মহাভাবরূপা তিঁহো গুণে বরীয়সী॥
'গোপাল তাপনী'তে§ যারে গান্ধর্ব্বী কহিল।
তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রীনারদ বর্ণিল॥*

যথা,—†

হ্লাদিনী যে মহাশক্তি সর্ব্বশক্তি শ্রেষ্ঠা।
তার সাররূপা রাধা সর্ব্বতে প্রতিষ্ঠা॥
সুষ্ঠুকান্ত স্বরূপা, রাধা অসংখ্যা গুণগণ
ষোড়শ শৃঙ্গার, অঙ্গে দ্বাদশ আভরণ॥

(১) সুষ্ঠুকান্ত স্বরূপা, যথা—

কুন্তল কুঞ্চিত দিঘল নয়ান। ও মুখ সুন্দর চাঁদ সমান॥

---

§ 'গোপাল তাপনী' উপনিষৎ—অথর্ব্ব বেদান্তর্গত বৈষ্ণবশ্রুতি গ্রন্থ।

* তৃতীয় অধ্যায়—১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। পদ্মপুরাণে রাধামাহাত্ম্য কীর্ত্তন-ব্যপদেশে দেবর্ষি নারদ বাক্য।

† বৃহদ্গৌতমীয় প্রভৃতি তন্ত্র-সিদ্ধ মত।

স্তনযুগ কঠিন মাঝা অতি ক্ষীণ। নত কন্ধর তুহু বয়স নবীন॥
নখ-বিধুরাজিত ও দুই পাণি। তুয়া রূপ ত্রিজগত গুণই জানি॥

(২) ধৃত ষোড়শ শৃঙ্গার

করই সিনান পরই নীল অম্বর নাসাগ্রে রতন ঘন, দোলনীরে।
বান্ধই নীবী শিরোমণি ভূষণ পীঠ উপরে বেণী, দোলনীরে॥
চর্চ্চিত অঙ্গ কুসুমযুত কুন্তল সুন্দর বনফুল, মাল গলে।
নিজ করে কমল বদনে রুহু তাম্বুল চিবুক বিভূষিত, বিন্দু কুলে॥
কাজর নয়নে সুচিত্রিত ও তনু চরণহি যাবক, রঙ্গভরে।
তিলক বিকসর ও মুখ সুন্দর ষোড়শ ভূষণ, রাই ধরে॥

(৩) দ্বাদশ আভরণ

অভিনব চূড়ামণি দ্যুতি মণিকো। কনক বিরচিত কুন্তলশ্রুতি ঝলকো॥
কাঞ্চী কলাপ পদক বর বউলি। কর্ণহি শোভত ভূষণ বিজলী॥
কণ্ঠহি হার বর তারক জিনিয়া। ভুজযুগ কঙ্কণ তাহে কত মণিয়া॥
নুপুর রুণু ঝণু বিরচিত রতনে। অঙ্গুরী জাল বিরাজিত চরণে॥
দ্বাদশ আভরণ জিনি রবি নিকরে। রাই বিভূষিত হরিসহ বিহরে॥

(৪) রাধার পঞ্চবিংশতি প্রধান গুণাবলী

অতঃপর রাধিকার কহি গুণ গণ।
মধুর নূতন বয়ঃ চঞ্চল-নয়ন॥
উজ্জ্বল স্মিত, চারু-সৌভাগ্য-রেখাবিন্দু।
যার গন্ধে উন্মাদিত হয়েন গোবিন্দ॥
সঙ্গীত-পণ্ডিত রাধা, রমণীয় বাণী।
পরিহাস-পণ্ডিত রাধা, বিনয়ের খনি॥
করুণা-সমুদ্র রাধা, হয়েন বিদগ্ধা।
পটু, লজ্জাশীলা পুনঃ, হয়েন সুমর্য্যাদা॥

ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য-নিধি, আর সুবিলাস।
মহাভাব উৎকর্ষেতে বর অভিলাষ॥
গোকুলের প্রেমপাত্র, জগভরি যশ।
গুরুজনের স্নেহপাত্র, সখীগণের বশ॥
কৃষ্ণপ্রিয়াগণের রাধিকা মুখ্যতম।
যাহার কথার বশ ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
আর কি কহিব রাধিকার গুণগণ।
কৃষ্ণগুণ* সম ইহার নাহিক গণন॥

রাধাগুণ চতুর্ব্বিধ

অঙ্গে, বাক্যে, মনে, পর-সম্বন্ধেতে রয়।
অতএব রাধাগুণ চতুর্ব্বিধ হয়§॥

গুণাবলীর ব্যাখ্যা

অঙ্গের চারুতা বড় 'মাধুর্য্য' বলি জানি।
কৈশোর মধ্যম "নববয়স" বাখানি॥
'সৌভাগ্য রেখা' পাদস্থিত চন্দ্রকলা।
"মর্য্যাদা" কহিয়ে সাধু পথে অচঞ্চলা॥
"লজ্জা" আভিজাত্য, শীল, দুঃখ সহন।
তাহে 'ধৈর্য্য' কহি কহে রসিকের গণ॥
আর সব ব্যক্ত-অর্থ না কৈল লক্ষণ।
দিক্‌মাত্র কহি উদাকৃতি বিবরণ॥

---

* কৃষ্ণগুণ—প্রথম অধ্যায় ৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

§ 'মধুর' হইতে 'যার গন্ধে উন্মাদিত হয়েন গোবিন্দ' (গন্ধোন্মাদিত মাধবা) এই ছয়টি গুণ "অঙ্গ" বা দেহ-সম্বন্ধীয়; সঙ্গীত-পণ্ডিত, রম্যবাক, পরিহাস বা নর্ম্ম-পণ্ডিত এই তিনটি গুণ "বাক্য"-সম্বন্ধীয়; 'বিনীতা' হইতে 'বর-অভিলাষ' পর্য্যন্ত দশটি "মনঃ"-সম্বন্ধীয়, এবং 'গোকুলের প্রেমপাত্র' অবধি শেষ ছয়টি "পর"-সম্বন্ধীয়। সাকল্যে এই (চতুর্ব্বিধা) গুণ-সংখ্যা পঞ্চবিংশতি।

মধুরা

যথা—('বিদগ্ধ মাধব'-গ্রন্থে পৌর্ণমাসীর উক্তি)—

নব নব কুবলয় কবলিত হোয়ল রাইক নয়ন তরঙ্গে।
ও মুখ মাধুরী দরশনে বিচরই পঙ্কজ গরব বিভঙ্গে॥
দেখ দেখ, রাইক রূপবিলাস।
যাকর নব নব তনুরুচি দরশনে কাঞ্চন হোয়ল নিরাশ॥

গন্ধোন্মাদিত মাধব

যথা—(শ্রীমতীর প্রতি তুঙ্গবিদ্যার উক্তি)—

পেখনু তোহারি অপরূপ রঙ্গ। কাহে তরুপল্লবে ঝাপসি অঙ্গ॥
অতিদুর চলই তোহারি তনু-গন্ধ। আসি ধরব ভুজে গোকুল চন্দ॥

গুণের উদাহরণ মূলগ্রন্থে পরচার।
ইহা উদাহৃতি হলে হয়েত বিস্তার॥
অল্পমাত্র দিল তাথে দিগ্‌দরশন।
এই মত জানিবে রাধার গুণগণ॥

শ্রীরাধার যূথ—পঞ্চবিধ সখী

রাধিকার যূথে আছে অনেক নাগরী।
কৃষ্ণে আকর্ষণ করে যাহার মাধুরী॥
তার মধ্যে সখী হয় পঞ্চ প্রকার।
'সখী', 'নিত্যসখী' কেহ, 'প্রাণসখী' আর॥
'প্রিয়সখী', 'পরম প্রেষ্ঠ সখী' নাম।
কুসুমা, বিন্ধ্যা, ধনিষ্ঠিকা—'সখী'র আখ্যান॥
'নিত্যসখী'—কস্তুরিকা, মণি মঞ্জরিকা।
'প্রাণসখী'—শশীমুখী, বাসন্তী, লাসিকা॥
'প্রিয়সখী'—কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মাধুরী।

মঞ্জুকেশী, মালতী, মাধবী, শশীকলা।
'প্রিয়সখী' কামলতা, আর যে কমলা॥
'পরম প্রেষ্ঠ সখী'—ললিতা, বিশাখা।
চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা॥
রঙ্গদেবী, সুদেবিকা—এই অষ্টজন।
গণের প্রধান ইহাদের গুণগণ॥
সখী আদি মুখ্য মুখ্য কহিল অভিধান।
সখী আন্তের হয় তাথে বহুত আখ্যান॥
শেষে যে কহিল ললিতাদি অষ্টজন।
রাধায় প্রেমাধিকা কভু, কৃষ্ণেতে কখন॥

পঞ্চম অধ্যায়

নায়িকাভেদ প্রকরণ

যূথ* মধ্যে তাথে আবান্তর 'গণ' হয়।
কেহ তিন, কেহ চারি, কেহ পাঁচ ছয় ॥
পরোঢ়া নায়িকা দুষ্ট, কবিগণ কয়।
প্রাকৃত নারীতে তাহা, গোপী প্রতি নয়† ॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন গত তাহাদের প্রেমা।
বহুবিধ ভক্তের যেই হয়ে সুদুর্গমা ॥

যথা,—§

গোপীর অদ্ভুত প্রেমা যাহার নাহিক সীমা, যার পাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তাহা বুঝে হেন জন, নাহি দেখি ত্রিভুবন যাহে বুদ্ধির নাহিক গমন ॥
চতুর্ভুজ রূপ ধরি যবে দেখা দেন হরি তবে সব গোপিকারগণ।
ঈশ্বর-বুদ্ধি করি তায় কেহ না নিকটে যায় অনুরাগের হইল কুঞ্চন ॥

পরিহাস করি কভু চতুর্ভুজ হয়।
রাধিকার প্রেমে তারে দ্বিভুজ করয় ॥

যথা,—*

রাসের আরম্ভ করি অদর্শন হল্য হরি গোপীগণ বহু অন্বেষিল।
এককুঞ্জে আছে হরি চতুর্ভুজ রূপ ধরি তাহা আসি দেখিতে পাইল ॥

---

* যূথ—তৃতীয় অধ্যায় ২১-২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। † তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য। § শ্রীল রূপগোস্বামী-বিরচিত 'ললিত মাধব' নামক গ্রন্থে, বিরহিনী শ্রীরাধিকাকে, দিবাকর-পত্নী সংজ্ঞা ভ্রমে সূর্য্যপুত্রী যমুনার উক্তি।

* গৌতমীয় তন্ত্রে বর্ণিত আছে—গোবর্দ্ধনগিরি উপত্যকার মধ্যে পরাসৌলী নামক রাসস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে, 'বিপ্রলম্ভ' (পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস) ব্যতীত 'সম্ভোগের' পুষ্টি বা উন্নতি হয়

চতুর্ভুজ রূপ দেখি মনেতে হইল দুঃখী প্রাণনাথে না পাঞা দেখিতে।
রাধা-প্রেম সর্ব্বোপরি তাহার নিকটে হরি, সেই রূপ নারিল রাখিতে ॥

সামান্যা-নায়িকা—রসাভাস

সামান্যা-নায়িকা-রতি হয় 'রসাভাস'।
তথাপি কুব্জাতে আছে ভাবের প্রকাশ ॥
পরকীয়া মধ্যে তার করিএ গণন।
অন্য নায়কের ভাব নাহিক কখন ॥
সামান্য নায়িকা যেই বেশ্যামাত্র হয়।
ধনপ্রাপ্তি ইচ্ছা গুণাগুণ নাহি রয় ॥
তাহতে শৃঙ্গারাভাস, নহে যে শৃঙ্গার।
ভাব হেতু কুব্জা নহে, বেশ্যার প্রকার ॥

স্বকীয়া ও পরকীয়া নায়িকা

(মুগ্ধা, মধ্যা, ও প্রগল্‌ভা)

স্বকীয়া, পরোঢ়া যেই রস-শাস্ত্রে কয়।
'মুগ্ধা,' 'মধ্যা,' 'প্রগল্‌ভা'—তার তিন ভেদ হয় ॥
এই তিন ভেদ কেহ কহে স্বকীয়ার।
কবিবর্ণনেতে তাহা কৈল তিরস্কার ॥

তত্রাচ প্রাচীনৈশ্চোক্তং—‡

না—এই নিমিত্ত 'পেঠ'-নামক কুঞ্জে আত্ম-গোপন করিলেন। গোপাঙ্গনাগণ সকলেই তাঁহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে—তিনি অনন্যোপায় হইয়া চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন—গোপাঙ্গনাগণ নারায়ণ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক, শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে স্থানান্তরে গমন করিল। তৎপরে শ্রীমতী আসিলে তিনি চতুর্ভুজমূর্ত্তি রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া' দ্বিভুজমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। ৩

‡ কোন কোন কবি, স্বকীয়া বা পরকীয়া—সর্ব্ববিধ নায়িকারই প্রায় সর্ব্বস্থলে ঐরূপ ব্যবহার দর্শন জন্য—'মুগ্ধা, 'মধ্যা' ও 'প্রগল্‌ভা'—এই ত্রিবিধ ভেদ স্বীকার করেন।

১। মুগ্ধা

মুগ্ধার নূতন বয়স, আর নব কামা।
রতিক্রিয়ারম্ভে তিঁহো সদা হয়ে বামা॥
রতিচেষ্টায় লজ্জাশীলা, গূঢ় যত্ন করে।
সাপরাধ পতি দেখি অশ্রু নেত্রে ভরে॥
প্রিয়াপ্রিয় কথা কিছু কহিতে না পারে।
মানেতে বিমুখী যেই, 'মুগ্ধা'-নাম ধরে॥

(ক) 'নূতন বয়স'

যথা—(অভিসারিকা বিশাখা দর্শনান্তে শ্রীকৃষ্ণ উক্তি)—

বাল্য-শিশির যব দূরে চলি গেল। যৌবন মধু তব উপনীত ভেল॥
লোচন পঙ্কজ অধিক বিলাস। বদন সুধাকর রুচি পরকাশ॥

অথবা, (পরিহাসচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে শ্যামলার রাধার রূপ বর্ণন)—

দূরহি চলহ শৈশব আন্ধিয়ার। টুটল রাই শরীরে অধিকার॥
যৌবন ভানু উদয় করি দেল। তারক অতিশয় তরলিত ভেল॥
রাইক হৃদয় পূরব গিরিরাজ। তাহে পুনঃ অভিনব কুসুম বিরাজ॥
ও মুখ-কমল করই লহু হাস। রাইক ইহরূপ অতি পরকাশ॥

(খ) 'নব কামা'

যথা—(ধন্যা প্রতি নান্দীমুখী)—

সখীগণ মিলে রসের পদবী কহিছে গোকুল নারী।
মুখ নামাইয়া তুমি সে রহিছ শ্রুতিতে দুহাত ধরি॥
সখি, না বুঝি তোমার কলা।
কি মনে করিয়া হরষিত হঞা গাঁথিছ ফুলের মালা॥
তোমার হৃদয় কিছু না বুঝিল কি আছে তোমার মনে।
লোকের নিকটে ছাপাঞা রাখিছ বান্ধা আছ কানু গুণে॥

(গ) 'রতি-বামা'

যথা,—(নর্ম্ম শুল্কগ্রাহি শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ধন্যা)—

ছাড়হে কুটিল, যমুনার পথ ছাড় পরিহাস আর।
যমুনার তটে সতত ফিরয়ে ব্রজনারী পরিবার॥

অথবা—(সুবল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

যমুনার তটে আমার নিকটে আসি রাধাবিনোদিনী।
বিমুখী হইয়া ফিরিয়া চলিল মনে কিছু অনুমানি॥
সখী জেঞা করে ধরিঞা তাহারে ফিরিয়া আনিতে চায়।
কিবা কর সখী ছাড় মোর কর পুন পুন কহে তায়॥
সুবল, ধনীর স্বভাব বামা।
তহার বচনে আমার হৃদয়ে অধিক রচিল প্রেমা॥

(ঘ) 'সখী বশা'*

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ললিতা)—

অতিশয় কর্কশ হৃদয় তোহারি। কাহে তুঝে দেওব রাই কিশোরী॥
করি করে পঙ্কজ যদি কেহ দেই। তব তুহু পাওবি মৃদু তনু রাই॥

অথবা (মানশিক্ষাকারিণী প্রগল্‌ভা সখী প্রতি মানবিমুক্তা ধন্যার উক্তি)—

কেন কেন সখি, আমারে কুপিছ দেখিয়া কুন্দের মালা।
কত শতবার আমারে সাধিল না নিমু করিঞা হেলা॥
সখি, বৃন্দা মোরে বড় দুঃখ দিল।
নিকটে আসিয়া ভূষণ-পেটিতে মালা রাখি চলি গেল॥

(ঙ) ব্রীড়ায়তপ্রযত্না

যথা—(সুবল প্রতি শ্রীকৃষ্ণের শ্যামলা বিষয়ক উক্তি)—

কুঞ্জকি নিকটে আসি পদ দুই চারি নাগর মিলন আসে।
কম্পিত অঙ্গ রঙ্গ করি ফিরল ধৈরজ লাজ-বিলাসে॥
সখিগণ সাধি সেজপর নেওল নাগর আসি করু কোর।

(চ) রোষকৃতবাষ্পমৌনা

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি খণ্ডিতা ধন্যা-সখির উক্তি)—

মাধব মানস চঞ্চল তোর। তোহে নাহি বাত কহব সখি মোর॥
না কর বিড়ম্বন ছাড় অভিলাষে। রোদন করু ধনী মুখ ঝাঁপি বাসে॥

(ছ) মানে বিমুখী—(১) মৃদ্বি ও (২) অক্ষমা

মানেতে বিমুখ হয় দুইত প্রকার।
কেহ নাহি সহে মান, কেহ মৃদ্বি আর॥

(১) মৃদ্বি

যথা—('রসসুধাকর'-গ্রন্থে সখিগণ প্রতি ধন্যা)—

সখি, মোরে কি কহিছ তায়।
নাগরে দেখিয়া চরণ যুগল আপনি উঠিতে চায়॥
আঁখি বাঁকাইতে যেই চাহি চিতে তাহারে দেখিতে যায়।
কুকথা কহিতে না পারে রসনা বিনয় করিতে চায়॥
তোদের কথাতে নাগরের কাছে যেই আমি করি মান।
আপনার গণ বিপক্ষ হইয়া দগধে আমার প্রাণ॥

(২) অক্ষমা

যথা—(মানিনীগণের প্রতি কোনহরিপ্রিয়ার উক্তি)—

গোকুল নাগরী এ বড় সাহস নাগরে করএ মান।
'মান' দু' আখর শুনিয়া আমার কাপিএঃ উঠিছে প্রাণ॥

২। মধ্যা

সমান লজ্জা কাম যেই, উদ্ভত তরুণতা।
কিঞ্চিৎ প্রগল্ভ বাক্য, মোহান্ত সুরতা॥
তারে 'মধ্যা' কহি মানে,—তারে দ্বিধা কয়।
কখন কোমলা মানে, কর্কশা কভু কয়॥

(ক) সমানলজ্জামদনা

যথা—(পৌর্ণমাসী প্রতি নান্দী)—

হরি যব রাই উপর ধরু নয়না। তবহু রহই ধনী অবনত বয়না ॥
সো যব নিজ দিঠি দেওব গহনে। তব হরি মাধুরী হেরই নয়নে ॥
ঐছন করি ধনী কুঞ্জক ভবনে আনন্দে ভোর করল মধু মথনে।

(খ) উদ্যত্তারুণ্য †

যথা—(রাধা প্রতি কৃষ্ণ)—

তুয়া ভুরু জিতল কামকি ধনুয়া। রম্ভাতরু জিনি উরুযুগ গুরুয়া
রথপদপাখীঙ্ক জিনিয়া কুচ বিলসে। রমণী শিরোমণি নাগর তুহু সে ॥

(গ) কিঞ্চিৎ প্রগল্ভ-বচনা, অর্থাৎ প্রত্যুতপন্নমতিত্ব হেতুক উক্তি

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ-দূতীর প্রতি গুরুজন সন্নিহিতা শ্রীমতীর সঙ্কেতোক্তি)—

তুহু মধু বদন কমলবর পরিমলে তুরিতে আওলি মঝু পাশ।
ইহ পতি কেবল পতিবরতা ধন কাহে তু কয়সি র্নরাশ ॥
শুন কালীয় মধুসূদন রাজ।
যদি মধু পানে তরল ভেল অন্তর চলু নব কুঞ্জ কি মাঝ ॥

(ঘ) মোহান্ত সুরতক্ষমা

যথা—(সুবল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

শ্রমজল নিবিড় পুরল সব অঙ্গ। তৈখন বিরমল নয়ন তরঙ্গ ॥
গলিত চিকুর, বাহু নহে বস। রতি শয়নে ধনি হোয়ল অলস ॥

(ঙ) মানে কোমলা

যথা—(ললিতার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

তোরে লুকাইতে কিছু নাহি মোর তুমি সে আমার প্রাণ।
নাগরের সনে অনেক যতনে রাখিতে নারিব মান ॥

---

† উদ্যত্তারুণ্য—নবযৌবন।

এস এস জাঞা কালিন্দীর কুলে কুঞ্জ গহন মাঝে।
কুসুম আনিতে ছলেতে জাইঞা ভেটিগা নাগররাজে॥

(চ) মানে কর্কশা

যথা—('বিদগ্ধ মাধব'-গ্রন্থে শ্রীমতীর প্রতি বিশাখা)—
মিছই মান করি অঙ্গ মলিন ভেল কাহে কোপহ মঝু বচনে।
নাগর কাতর পতিত অব অকুলে ফিরি চাহ চঞ্চল নয়নে॥

মধ্যা গৌণ করি হয় তিন প্রকার।
'ধীরা', 'অধীরা' হয়, 'ধীরাধীরা' আর॥

(১) ধীরমধ্যা

'ধীরা' পতির অপরাধ করি দরশন।
বক্র বাক্য কহে কত সোল্লুণ্ঠ বচন॥

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি খণ্ডিতা রাধা)—
লাগল অঞ্জন যাবক রঙ্গ। অব তুহু নীল-লোহিত ভেল অঙ্গ॥
সমুচিত চন্দক ধারনি দেহে। ইহ এক অনুচিত লাগল মোহে॥
শিরে নিজ প্রেয়সী রাখই দেহে। প্রেয়সি ছোড়ি আওলি তুহু কাহে॥

(২) অধীরমধ্যা

'অধীর মধ্যা' নাগরী যবে মানযুক্তা হয়।
কঠিন বচন তবে স্বামী প্রতি কয়॥

যথা—
কুচতট সহচর হার তুয়া কণ্ঠহি করতহি দোলন রঙ্গ।
সোই কহই ইহ বর নাগরী সহ রজনীক মদন তরঙ্গ॥
সো বর নাগরী লেওল মন হরি কাহে আওলি মঝু ঠাম।
মঝু সহ ছোড়ি চলহ তুহু চঞ্চল সত্বর তাকর ধাম॥

(৩) ধীরাধীরমধ্যা

'ধীরাধীরা' মানে কহে বক্র বচন।

যথা—শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্রীমতী—

তুহু বর নাগর করহ পয়ান। সো বর নাগরী করব তুজে মান॥
বুঝি মঝু রোদন দরশন আশে। নিশি পরভাতে আওলি মঝুপাশে॥
তাকর চরণকি যাবক রঙ্গ। তব শির দাম করল সব ভঙ্গ॥
পুন তুহু যাই যাবক দেহ তাহে। নহি চন্দ্রাবলী ছোড়ব তোহে॥

যথা বা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্রীমতী)—

অনেক যতনে পাঞাছ নাগর কামের বরদ দেবি।
পরম প্রসাদ যেখানে পাইলে পরম আদরে সেবি॥
পায়ের আলতা শিরেতে পরেছ বদনে তাম্বুল-শেষ।
কুচ সহচর হার রতন হৃদয়ে সেজেছে বেশ॥

পরম উৎকৃষ্ট রস হয়ত 'মধ্যা'তে।
'মৌগ্ধ্য', 'প্রগল্‌ভা' দুই আছয়ে যাহাতে॥ *

৩। প্রগল্‌ভা

'প্রগল্‌ভা'—পূর্ণ তারুণ্য, মদান্ধা, বররতি।
বহুভাব জানে বেশ বশ করে পতি॥
পতি আগে যেই অতি প্রৌঢ় বাক্য কয়।
মানেতে প্রগল্‌ভা কর্কশা নারী হয়॥

---

* শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থের আনন্দ চন্দ্রিকা' টীকার ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত অনুবাদ যথা—'শ্রীরাধার 'মধ্যাত্ব' ও 'ধীরাধীরাত্ব' স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কেহ কেহ কহেন, ধীরাদি তিনটিই শ্রীরাধার স্বাভাবিক ধর্ম্ম—মানের তারতম্য বশতঃ সময়ে সময়ে উদয় হইয়া থাকে। যথা, 'গীত গোবিন্দে'-খণ্ডিতা-প্রকরণে—

যাহি মাধব যাহি কেশব

মা বদ কৈতববাদং

(ক) পূর্ণ তারুণ্য

যথা—(চন্দ্রাবলী প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

স্তনযুগ জিতল করিবর কুম্ভা। গুরুতর উরুযুগ জিতল রম্ভা ॥
কটিতট জিতল নদীতট শোভা। লোচন করই সফরী জয় লোভা ॥
এ চন্দ্রাবলী তরুণিম রঙ্গে। আভরণ বিনহি ঝলক সব অঙ্গে ॥

(খ) মদান্ধা

যথা—(ভদ্রা প্রতি চন্দ্রাবলী)—

যেখানে কুঞ্জ-	ভবনে মঝু সখীগণে	মন্দির বাহির ভেল।
তৈখনে নাগর	আসি ধরল কর	শেজ উপর তহি নেল ॥
নাগর পরশে	জ্ঞান মঝু খণ্ডল	হোয়ল প্রেম বিথার।
কিছুই না জানলু	কি করল নাগর	পুন কিয়ে হোয়ল আর ॥

(গ) উরুরতোৎসুকা বা রতি বিষয়ে অতি উৎসুকা

যথা—(স্বীয় প্রাণসখী প্রতি মঙ্গলা)—

কবহু নাগর সই	রতিরণে ভুলব	নখপদ দেয়ব অঙ্গে।
টুটব হার	বলয় সব ভঙ্গিম	ঢর ঢর মদন তরঙ্গে ॥

(ঘ) ভূরিভাবোদ্গমাভিজ্ঞা (এককালীন বিবিধ ভাবোদ্গমাভিজ্ঞতা)

যথা—(অভিসারকারী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বাসকসজ্জা শ্যামলার প্রতি প্রিয়তমা সখী বকুলমালার স্বগত পরিহাসোক্তি)—

কুটিল দৃগঞ্চল	কোণ বিথারসি	ভ্রূ-ধনু কয়সি বিকার।
লহু লহু হাসি	চলসি মদ মন্থর	অঙ্গহি পুলক বিথার ॥
ইহ বর কুঞ্জে	ভ্রমর কত গুঞ্জরু	বীণা জিনি তোর গান।
বুঝনু কৃষ্ণ	হরিণ তুহু বান্ধবি	তহি লাগি সুমধুর তান ॥

(ঙ) রসাক্রান্তবল্লভা

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি মঙ্গলা)—

মাধব তুহু যদি মানসি বচনে। আনি কুসুম কুরু ভূষণ রচনে ॥
শ্যাম তুয়া প্রেয়সী গোকুল নগরে। ইহ যশ ঘোষিবে কামিনী নিকরে ॥

(চ) অতিপ্রৌঢ়োক্তি

যথা—(রূপগোস্বামী কৃত 'পদ্যাবলী'-গ্রন্থে গোপালভাবে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্যামলা)—

ধীরে ধীরে আসি গৃহ কোণে বসি অঙ্গ ঢাকিয়া তৃণে।
বিনয় করিয়া কি আর বলিছ কে তোমার কথা শুনে ॥
কোথা গেল আজি সে সব চাতুরী সে দিন যমুনা তীরে।
ভাঙ্গা তরি পাঞা গোপীগণ লঞা যে দুঃখ দিয়াছ মোরে ॥

(ছ) অতিপ্রৌঢ় চেষ্টা

যথা—(চন্দ্রাবলী সম্ভোগানন্তর পদ্মার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

তুয়া সখি রতিরণে অতিশয় ভাতি। কুচযুগে নাচই মুকুতাক পাঁতি।
তারক নায়ক চঞ্চল হোই। পুনপুন মঝু কৌস্তুভ হরি লেই ॥

(জ) মানে অত্যন্ত কর্কশা

যথা ('উদ্ধব-সন্দেশে' শ্যামলার প্রতি বকুলমালা)—

তুয়াপ্রিয় মালতী, ধরণীপর লুটই, দ্বারহি নাগর কান।
সখীগণ কোই কোই নিশি বঞ্চল তভু নহি ছোড়ালি মান ॥

মান হৈতে প্রগল্‌ভা হয় তিন প্রকার।
পূর্ব্ব মত জানিবে ধীরাদি ভেদ তার ॥

(১) ধীর প্রগল্‌ভা

ধীর প্রগল্‌ভা করে সুরতে উদাস।
সাবহিত্থা বাক্যে করে মানের বিকাশ ॥

যথা, (শ্রীকৃষ্ণ প্রতি পালী)—

এ বনমাল কণ্ঠে নাহি ধারব বরত-নিয়ম হয় নাশ।

গুরুজন পুন পুন মুখে কত ডাকই তুহু লাগি কয়লু পয়াণ
ঐছন চাতুরী বচন শুনি মাধব বুঝল তাকর মান ॥

যথা বা—(চন্দ্রাবলী প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

যব হাম কুচতটে দেয়নু হাত। করে নাহি ঠেললি, না কহলি বাত ॥
পুন পুন চুম্বনে মুখ রহু ধীর। নিবিড় আলিঙ্গনে তনু রহু থির ॥
কিয়ে চন্দ্রাবলী, মান তরঙ্গ। ঐছন নাহি দেখি মানকি রঙ্গ ॥

(২) অধীর প্রগল্‌ভা

অধীরা পতির প্রতি করয়ে তর্জ্জন।
মহাকোপযুক্ত হয়ে করয়ে তাড়ন ॥

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি গৌরী)—

আমরা মুগুধা নারী উচিত করিতে নারি শ্যামাপদে করি যে বন্দন।
বান্ধিয়া মল্লিকামালে কত কুবচন বলে কর্ণোৎপলে করয়ে তাড়ন ॥

(৩) ধীরাধীরপ্রগল্‌ভা

ধীরা অধীরার গুণ রহয়ে যাহাতে।
ধীরাধীরা কহি তারে রসশাস্ত্র মতে ॥

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি মঙ্গলা)—

তোমাতে নাহিক ক্রোধ ব্রতে কৈল অনুরোধ মৌন মোরে দিল দ্বিজগণ।
তুরিতে চলহ তুমি, হিতবাণী কহি আমি মালায় বান্ধিবে সখীগণ ॥

যথা বা—(সখীযুগলের মধ্যে মঙ্গলা বিষয়ক উক্তি)—

করি অপরাধ হরি আগে রহে স্তব করি তার প্রতি করিতে তাড়ন।
কর্ণোৎপল হাতে নৈল তাথে নাহি তাড়িল যাহ বলি ফিরাল বদন ॥

জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা

আকৃতি প্রকৃতি যার প্রগল্‌ভতা রয়।
কিশোরী হলেও তারে প্রগলভা শব্দে কয় ॥

মধ্যা প্রগল্‌ভা দুহু দুইত প্রকার।
কেহ কৃষ্ণ প্রেমে জ্যেষ্ঠা, কনিষ্ঠা কেহ আর ॥

মধ্যার জ্যেষ্ঠাকনিষ্ঠাত্ব

যথা—(নান্দীমুখী প্রতি লতাকুঞ্জে গুপ্তভাবে অবস্থিত বৃন্দার উক্তি)—

একাসনে দুই নারী আছয়ে শয়ন করি তাঁহা গেল ব্রজেন্দ্র নন্দন।
পুষ্পধূলি আনিল লীলার নয়নে দিল তবে তার কৈল জাগরণ ॥
চামর আনিয়া তায় তারার অঙ্গে করে বায়, তাহার নিশ্চেষ্ট নিদ্রা হৈল।
তারায় প্রেম দেখায়া ক্রীড়া করে লীলা লঞা লীলা জ্যেষ্ঠা তাথে জানাইল ॥

প্রগল্‌ভার জ্যেষ্ঠাকনিষ্ঠাত্ব

যথা—(পৌর্ণমাসী প্রতি বৃন্দা)—

শ্যামের প্রেয়সী দুইজনে বসি তারা খেলে পাশা সারি।
যে জন জিনিবে আপন ভবনে তিন দিন পাবে হরি ॥
গৌরীর হইয়া গুটিকা চালিয়া নাগর মধুর কয়।
সঙ্কেত করিয়া চতুর নাগর শ্যামার করিল জয় ॥

কোন গোপী উপেক্ষিয়া কেহ জ্যেষ্ঠা হয়।
অতএব এই ভেদ অন্য গণনাতে নয় ॥

পঞ্চদশবিধ নায়িকা

কন্যা মুগ্ধামাত্র, স্বীয়া অন্য-ঊঢ়া আর।
মুগ্ধামধ্যাদি ভেদে তায় ছয় প্রকার ॥
ধীরা আদি ভেদে দ্বাদশ প্রৌঢ় মধ্যা।
কন্যা, স্বীয়া, পরোঢ়া এই তিনমত মুগ্ধা ॥
এই ত নায়িকা পঞ্চদশবিধ হয়। §
ইহাদের অষ্টাবস্থা কবিগণ কয় ॥

---

§ পঞ্চদশবিধ নায়িকা—(১ স্বীয়া+২ পরোঢ়া) * (১ মুগ্ধা ২ ধীরমধ্যা, ৩ অধীরমধ্যা, ৪ ধীরাধীরমধ্যা

নায়িকার অষ্টাবস্থা

'অভিসারিকা', 'বাসকসজ্জা', আর 'উৎকণ্ঠিতা'।
'খণ্ডিতা', 'বিপ্রলব্ধা', হয় 'কলহান্তরিতা' ॥
'প্রোষিত-ভর্তৃকা', আর 'স্বাধীন-ভর্তৃকা'।
এই অষ্ট অবস্থাতে রহয়ে নায়িকা ॥

(১) অভিসারিকা*

অভিসার করায় কান্তে, নিজে অভিসরে।
জ্যোৎস্না তমোযোগ্য বেশ অভিসারে ধরে ॥
লজ্জাতে সম্বরি অঙ্গ নিঃশব্দ ভূষণ।
অঙ্গ ঝাপি চলে সঙ্গে সখী একজন ॥

অভিসারয়িত্রী

যথা—(বিশাখার প্রতি শ্রীমতী)—

হরি মঝু নাহি জানে মদন বিকার। তুরিতহু তৈছে করবি অভিসার ॥
এ সখি, মঝু গৌরব রহে যাহে। ঐছন চাতুরী করবি তুহু তাহে ॥
সে জেন পুন পুন যাচই হামে। ঐছন চাতুরী বোলবি শ্যামে ॥
যবহি গগনে নহে বিধু পরকাশ। তবহি মিলায়বি আনি মঝু পাশ ॥

(ক) জ্যোৎস্নায় স্বয়ং অভিসারিকা

যথা—(শ্রীমতী প্রতি বিশাখা)—

পেখহ অম্বরে উদিত বিধু মণ্ডল কিরণ কলাপ বিরাজ।
বৃন্দাবন মাঝ তুয়াপথ হেরই সোবর নাগর রাজ ॥

---

* 'রসমঞ্জরী' (পীতাম্বর দাস) গ্রন্থে অষ্টপ্রকার অভিসারের কথা বর্ণিত আছে ; যথা :—

সেই অভিসার হয় পুন অষ্ট প্রকার। 'জ্যোৎস্নী', 'তামসী', 'বর্ষা', 'দিবা-অভিসার' ॥
'কুজ্ঝটিকা', 'তীর্থযাত্রা', 'উন্মত্তা', 'সঞ্চরা',। গীতপত্ররসশাস্ত্রে সর্ব্বজনোৎকরা ॥

কর্পূর সহিত চন্দনে তনু ঝাপই শ্বেত বসন করু অঙ্গে।
বিকশিত কমল বিনিন্দিত ও পদ চলু অভিসারক রঙ্গে॥

(খ) তমোভিসারিকা

যথা—(শ্রীমতীর প্রতি ললিতা)—

ঘন আন্ধিয়ারে ঝাঁপি নিজ অঙ্গহি কত কত পুণবতী নারী।
করি অভিসার কতহু রস বিতল পাওল রসিক মুরারী॥
রাই, তোহার অঙ্গ রিপু ভেল।
বিদ্যুৎ কান্তি জিনিয়া ঘন বিকশিত সব আন্ধিয়ার হরি নেল॥

(২) বাসকসজ্জা *

কান্ত আসিব বলি সজ্জা করে ঘরে।
নিজ অঙ্গে কত কত অলঙ্কার ধরে॥
ইহার চেষ্টা, স্মর-ক্রীড়া করে মনে মন।
সখীর কৌতুকবার্ত্তা দূতী দরশন॥

যথা—(দূরে শ্রীমতীকে দেখিয়া স্বীয় সখীর প্রতি শ্রীরূপমঞ্জরী)—

মদন কুঞ্জ পর বৈঠল সুন্দরী নাগর মিলব আসে।
নব নব কিসলয়ে শেজ বিছাওল কুসুম নিকর চারু পাশে॥
সুন্দরী সাজল বাসক সাজ।
প্রেম জলধিজল নিমগন ভাবই আওব নাগর রাজ॥
কত কত আভরণ নেওল অঙ্গহি বদনে সুধাসম হাস।
দেখ দূতী, নাগর কতদূর আয়ত ঘন কহে ঐছন ভাস॥

---

* সেই ত 'বাসকসজ্জা' হয় অষ্টভেদ। অল্পই সম্ভেদে কহএ বিভেদ॥
মোহিনী, জাগ্রতী, আর হয়ত রোদিতা। মধোক্তিকা, সুপ্তিকা, প্রগল্ভা, বিনীতা॥
সুরসা উদ্দেশা—এই অষ্ট প্রকার। শ্লোক পদগীতে হয় ইহার বিস্তার॥

(৩) উৎকণ্ঠিতা *

প্রিয়ার বিলম্ব দেখি বিরহে পীড়িতা।
ভাবজ্ঞের গণ তারে কহে 'উৎকণ্ঠিতা'॥
তার চেষ্টা হৃত্তাপ, অঙ্গের কম্পন।
বসি চিন্তা করে অনাগতির কারণ॥
বহু দুঃখ অশ্রু কত বহএ নয়নে।
আপনার দুঃখাবস্থা কহে সখীগণে॥

যথা—(পদ্মার প্রতি চন্দ্রাবলী)—

নাগর গমনে পড়ল বুঝি বাধা। নিজগুণে বান্ধি রাখল বুঝি রাধা॥
কিএ ব্রজমণ্ডলে আওল সুনারী। তা সনে সঙ্গম করই মুরারি॥
দেখ শশী হোওল এ আধ রাতি। গহনক ঘেরল হিমকর কাঁতি॥
বিরহ বেদনে অব মঝু প্রাণ যায়। অবহি না আওল নাগর রায়॥

বসাকসজ্জার শেষে নাহি হয় মান।
দোহার পারতন্ত্র্যে হয় 'উৎকণ্ঠা' নির্ম্মাণ॥

(৪) খণ্ডিতা

সময়ে না মিলে পতি রহে অন্য সনে।
রতিচিহ্ন সহ প্রাতে দেয় দরশনে॥
তা দেখি নায়িকার হয় রোষ নিশ্বাস।
কেহ মৌন ধরি রহে, কেহ বহু ভাষ॥

---

* বাসকসজ্জা দশার শেষে মানের বিরতিতে অর্থাৎ কলহান্তরিতা অবস্থায় এবং নায়ক নায়িকার পরাধীনত্ব প্রযুক্ত সঙ্গমের অভাব—এই ত্রিবিধ অবস্থায় 'উৎকণ্ঠা' হয়। উন্মত্তা, বিকলা, স্তব্ধা, চকিতা, অচেতনা, সুখোৎকণ্ঠিতা, প্রগল্ভা ও নির্ব্বিণ্ণা—এই অষ্টবিধ উৎকণ্ঠিতা।

যথা—(বকুলমালার প্রতি শ্যামলা)—§

যাবক রঙ্গে রঙ্গায়লি নিজ শির ভুজে রহু কঙ্কণ চিণ।
কুচতট কুঙ্কুম রঞ্জিত হৃদিতট বনফুল মাল মলিন ॥
ঘূর্ণিত লোচন ব্রজপতি নন্দন আওল নিশি পরভাতে।
শ্যামলার বদনে রহল তব মুনিগুণ * রহল রুদ্রগুণ ‡ চিতে ॥

(৫) বিপ্রলব্ধা §§

সঙ্কেত করিয়া যার পতি নাহি মিলে।
দুঃখিত হৃদয়া, তারে বিপ্রলব্ধা বলে ॥
মূর্চ্ছা, নিশ্বাস বহে, করে বহু খেদ।
দুনয়নে অশ্রু বহে, অধিক নির্ব্বেদ **

যথা—(বিশাখা প্রতি শ্রীমতী)—

চান্দ উদয় ভেল অম্বর মাঝ। অবহু না আওল নাগর রাজ ॥
সো বর নাগর বঞ্চল মোহে। কোন যুবতী রসে বান্ধল তাহে ॥
বিরহ দহনে অব মঝু প্রাণ যায়। কি করব সখী অব কহনা উপায় ॥

(৬) কলহান্তরিতা †

খণ্ডিতা হইয়া করে পতির তাড়ন।
পশ্চাত হৃদয়ে তাপ পায় অনুক্ষণ ॥

---

§ সেই 'খণ্ডিতা' হয় আট প্রকার। ধীরা, অধীরা, সমা, বিদগ্ধিকা আর ॥
নিন্দয়া, ক্রোধা ভয়ানকা, প্রগল্ভা আর। মধ্যা, মুগ্ধা, লজ্জা, বিবিধ প্রকার ॥
রোদিতা, প্রেমমত্তা, এই হয় অষ্ট। নাম ভেদে বিভেদ হয়ত বৈশিষ্ট ॥ ('রসমঞ্জরী'—পীতাম্বর)

* মুনিগুণ—মৌন। ‡ রুদ্রগুণ—ক্রোধ।

§§ এই বিপ্রলব্ধা হয় অষ্টমতা। নির্ব্বন্ধা, প্রেমমত্তা, ক্লেশা, বিনীতা ॥
নিন্দয়া, প্রখরা, আর দূত্যাদরী। চর্চ্চিতা—অষ্টবিধা করি যারে বলি ॥ ('রসমঞ্জরী'—পীতাম্বর)

** নির্ব্বেদ—বৈরাগ্য।

† 'সেই 'কলহান্তরিতা' হয় অষ্ট বিবরণ। আগতা, বিকলা, ধীরা, অধীরা বচন ॥

প্রলাপ, নিশ্বাস, গ্লানি, সন্তাপিত মন।
'কলহান্তরিতা' তারে কহে কবিগণ॥

যথা—(সখীগণ প্রতি শ্রীমতী)—

করিয়া আদর　　সে বর নাগর　　আনি দিল মোরে মালা।
মানের ভরমে　　দূরেতে ফেলিনু　　করিয়া পরম হেলা॥
সরস বচন　　কতনা কহিল　　আমি না শুনিনু কানে।
চরণের পাশে　　পড়িয়া রহিল　　না চাহিনু তার পানে॥
সে সব সোঙরি　　গুমরি গুমরি　　পুড়িছে আমার প্রাণ।
আপনার দোষে　　আপনি মরেছি　　কে জানে এমন মান॥

(৭) প্রোষিতভর্তৃকা *

দূরদেশে পতি গেলে নারীর দুঃখ হয়।
"প্রোষিতভর্তৃকা"-পদে তাহাকে কহয়॥
প্রিয় সঙ্কীর্ত্তন, জাড্য, অঙ্গের মালিন্য।
ক্ষীণ অঙ্গ, চিন্তা, অস্থির, জাগরণ, দৈন্য॥
প্রলাপাদি চেষ্টা 'প্রোষিতভর্তৃকা'র।
প্রিয়ার আগতি চিন্তা করে বার বার॥

---

*　সেই 'প্রোষিতভর্তৃকা' হয় তিন মত।　ভাবী, ভবন, আর ভূত ক্রিয়াযুত॥
এই তিন মত হয় বহু মত ভেদ।　অষ্ট প্রকার সংজ্ঞা ইহার বিভেদ॥
ভাবী, ভবন, আর দিব্যোন্মাদ।　দশ অবস্থা হয়, দূতের সম্বাদ॥
নিজ বিলাপ আর সখ্যুক্তিকা হয়।　ভাবোল্লাস আদি ভাব বহুত আছয়॥('রসমঞ্জরী' – পীতাম্বর দাস)

ভানুদত্ত বিরচিত 'রসমঞ্জরী গ্রন্থে 'প্রোস্যৎপতিকা' নাম্নী নবম নায়িকার উল্লেখ আছে। যাহার স্বামী অচিরে প্রবাস যাইবে, সেই নায়িকার নাম 'প্রোস্যৎপতিকা'। মিনতি, কাতরদৃষ্টি, কান্ত নিবারণ, খেদ, শ্বাস, মূর্চ্ছা ইত্যাদি তাহার লক্ষণ। ইহা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ভাবী বিরহের অন্তর্গত। 'ভাবী' বিরহের লক্ষণ যথা—

নায়ক বিদেশ যাবে শুনিয়া সুন্দরী।
সহচরী সঙ্গে নানা বিলাপ সে করি॥　('রসমঞ্জরী'—পীতাম্বর)

যথা—(ললিতা প্রতি শ্রীমতী)—

বিলসই মাধব মধুপুর মাঝ। মঝু তনু দাহই এ ঋতুরাজ ॥
আয়ব বলি মঝু হোয়ত আশ। তহি লাগি নাহি করি জীবনিরাশ ॥
কতহি অবধি দিন বহি বহি যায়। কহ সখি, অব কিএ করব উপায়

(৮) স্বাধীন ভর্ত্তৃকা*

যার বশ নায়ক নিকটে সদা রয়।
"স্বাধীন ভর্ত্তৃকা" পদে তাহাকেই কয় ॥
পতি করে নানা রস কুসুম চয়ন।
বশ হৈয়া করে প্রিয়ার অঙ্গের ভূষণ ॥

যথা—(শ্রী গীতগোবিন্দে শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্রীমতী)—

নাথ হে, তুমি সে নাগর বর।
কপালে তিলক করি দেহ মোরে অঙ্গের ভূষণ কর ॥
বলয় কঙ্কণ মোর করে দেহ নুপুর পরাহ পায়।
রাইর মধুর বচন শুনিয়া হরিশ নাগর রায় ॥
কুঙ্কুম চন্দন কুচতটে দিল শ্রুতি যুগে ফুল দিয়া।
কমল কুসুমে কবরি বান্ধিয়া বিহরে হরিষ হয়্যা ॥

স্বাধীন ভর্ত্তৃকা—'মাধবী'

বশ হয়্যা পতি কভু নাহি ছাড়ে যারে।
পরম উৎকৃষ্ট সে "মাধবী" নাম ধরে ॥

---

* 'স্বাধীন ভর্ত্তৃকা' কথা শুন দিয়া মন। কোপনা, মানিনী, মুগ্ধা, মধ্যা বিচক্ষণ ॥
উত্তুকা, উল্লাসা, অনুকূলা, অভিষেকা। 'স্বাধীন ভর্ত্তৃকা, এই অষ্ট করি লেখা ॥

হৃষ্টা ও খিন্না নায়িকা

তিনজন হৃষ্টা হয়—স্বাধীন ভর্ত্তৃকা।
অভিসারিকা, আর বাসকসজ্জিকা ॥
খণ্ডিতাদি পঞ্চ হয় মহা দুঃখী মন।
বসি চিন্তা করে অঙ্গের ঘুচাঞা ভূষণ ॥

উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা নায়িকা

উত্তম, মধ্যম কেহ হয়ত কনিষ্ঠ।
কৃষ্ণপ্রেম তারতম্যে নিজ ভেদ ইষ্ট ॥
যাহার যেমন ভাব ব্রজেন্দ্র নন্দনে।
কৃষ্ণের তেমন ভাব সে নায়িকা সনে ॥

(১) উত্তমা

যথা—(সুবল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

এক মুখে কি কহব　　রাইক গুণগণ　　তা সম নাহি ব্রজ মাঝ।
মঝু সুখ লাগি　　কতই রস বিতরই　　ছোড়ল সব গৃহ কাজ ॥
বহু অপরাধে　　কোপ নাহি অন্তরে　　বচনে সুধা করু দান।
যব মঝু দুঃখ নব　　শ্রুতিযুগে শুনই　　তৈখনে হরই গেয়ান ॥

(২) মধ্যমা

যথা—(রঙ্গ নাম্নী যুথেশ্বরীর প্রতি তদীয়া সখী)—

সুন্দরি, মান　　পরম ধন তোর।
সবিনয় বচনে　　চরণে ধরি সাধনু　　বাত না মানসি মোর ॥
নাগর কাতর　　জর জর অন্তর　　[illegible]

(৩) কনিষ্ঠা

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ সমীপে অভিসারকারিণী গোপীর প্রতি ত্বরিদ্গমনার্থ বৃন্দার উক্তি)—

যবহি বরিষ নহে তবহি কহলি তুঁহু বরিষে উচিত অভিসার।
ঘন বরিষণে জল বাহির না হোয়ই অব তাহে ঘন আন্ধিয়ার
অবহি জলদ ঘন আন্ধিয়ার যামিনী বরিষণ দরশন দেল।
দ্রুত অভিসার ছোড়ি ধনী কুতুকিনী কাহে তুহু মন্থর ভেল॥

৩৬০-বিধ নায়িকা

পূর্ব্বে কহিল পঞ্চদশ ভেদ যার। †
পুনঃ তাথে হৈল অষ্ট অবস্থা আবার।
পঞ্চদশে অষ্ট দিয়া করিলে পূরণ।
তাতে এক শত আর বিংশতি গণন॥
তাহাতে উত্তম আদি তিন ভেদ দিল।
তিনশত ষাটি সংখ্যা নায়িকা হইল॥ ‡

শ্রীরাধিকা

যেমন নায়কের গুণ কৃষ্ণে সব রয়।
তেমতি সর্ব্ব নারীর গুণ রাধিকাতে হয়॥ *

---

† ৪০ পৃঃ টীকা দ্রষ্টব্য।

‡ ১৫ × ৮ (অভিসারিকা ইত্যাদি অষ্টবিধ অবস্থাবিশিষ্টা নায়িকা) = ১২০ ; ১২০ × ৩ (উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা) = ৩৬০ প্রকার নায়িকা।

* যেরূপ শ্রীকৃষ্ণে নিখিল নায়কের অনুকূল ইত্যাদি অবস্থা বিদ্যমান, তদ্রূপ শ্রীমতীতেও মধ্যা ও কনিষ্ঠা

ষষ্ঠ অধ্যায়

যূথেশ্বরী-ভেদ প্রকরণ

—:*:—

বিশেষ কহিল যূথেশ্বরী নায়িকার।
সুহৃদ্ব্যবহার লাগি কহি পুনর্ব্বার॥ *

যূথেশ্বরী ত্রিবিধ—অধিকা, সমা ও লঘ্বী

সৌভাগ্য অধিক হৈলে 'অধিকা' হয় নাম।
'সমা' নাম হয় যার সৌভাগ্য সমান॥
যাহার লঘুতা আছে 'লঘ্বী' নাম তার।
গোকুল-নায়িকা হয় এ তিন প্রকার॥

পুনঃ ত্রিবিধ—প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী

পুনশ্চ প্রত্যেকে হয় তিন প্রকার।
'প্রখরা' কেহ, 'মধ্যা' কেহ, কেহ 'মৃদ্বী' আর॥
প্রগল্ভ বচন যার না হয় লঙ্ঘন।
'প্রখরা' বলিয়া তারে কহে কবিগণ॥
তাথে ন্যূন হলে হয় 'মৃদ্বী' তার নাম।
'মধ্যা' নাম ধরে যেই তাহাতে সমান॥

৯। অধিকা

আত্যন্তিকী ও আপেক্ষিকী

তাহাতে অধিকা হয় দুই ত প্রকার।
"আত্যন্তিকী" কেহ হয়, "আপেক্ষিকী" আর ॥

(ক) আত্যন্তিকী অধিকা

নারী মধ্যে নাহি যার উর্দ্ধে সমান।
সেই নারী ধরে "আত্যন্তিকাধিকা" নাম ॥
'আত্যন্তিকাধিকা' বৃন্দাবনে হয় রাধা।
যাহার সদৃশ নাহি, গুণে তিহো 'মধ্যা' ॥

যথা,—(ব্রজে সমবেতা যূথেশ্বরীগণ প্রতি শ্যামলা)—

ভদ্রা তদবধি　　হরি সনে কহতহি　　চাতুরী চঞ্চল বাত।
পালী তদবধি　　কত রস বিতরই　　বিমলা দোলই হাত ॥
শ্যামা তদবধি　　গরব করি চলতহি　　চন্দ্রাবলী করু সাধা।
যদবধি কেশব　　শ্রুতি নাহি পৈঠল　　অমৃত আখর—'রাধা' ॥

(খ) আপেক্ষিকী অধিকা

যূথমধ্যে অন্যাপেক্ষা অধিকা যে হয়।
'আপেক্ষিকাধিকা' বলি তাহারে কহয় ॥

(গ) অধিক প্রখরা

যথা,—(কোন যূথেশ্বরী প্রতি অন্য যূথেশ্বরী)—

ধনি ধনি,　　পেখই অপরূপ রঙ্গ।
গোবর্দ্ধন গিরি　　ছোড়ি ইহ আওত　　দারুণ কৃষ্ণ ভুজঙ্গ ॥
অতিশয় ভীত　　রমণীগণ সঙ্গতি　　কাহে চললি বনমাঝ।

(তদুত্তর)

গুরু করি মানই মুঝে বহু আদরে ভোগিনী রমণীক বৃন্দ।
তদবধি মঝু বশ সো ফণি হোয়ল কাহে করব অব দ্বন্দ্ব ॥

(ঘ) অধিক মধ্যা—

যথা,—(কোন যূথেশ্বরীর উক্তি)—

পুণমিক সাঁঝ সময়ে কাঁহা চলসি। সখীগণ জানল রোষে কাহে জ্বলসি ॥
কাহে লুকায়সি অঙ্গকি পুলকে। অতিশয় ভাব ভবহি অতি ঝলকে ॥
তোহে অব রোধি রাখব মঝু সদনে। জাগর করু হরি কুঞ্জ কি ভবনে ॥
তুয়া পথ চাহি রহুক বহু যতনে। তোহ বঞ্চই সখী সহ মঝু ভবনে ॥

(ঙ) অধিক মৃদ্বী—যথা§

২। সমা

মৃদ্বী আদি না করি উদাকৃতির প্রচার।
'সম প্রখরা', 'সমমধ্যা', 'সমমৃদ্বী' আর ॥

৩। লঘ্বী

হয়ত নায়িকা 'লঘু' দুই ত প্রকার।
কেহ 'আত্যন্তিকী' লঘু, 'আপেক্ষিক' আর ॥
'লঘু প্রখরা' 'লঘু মধ্যা,' 'লঘু মৃদ্বী' নাম।
এই ত কহিল নারী ভেদের আখ্যান ॥

---

§ অনুবাদে ইহার উদাহরণ প্রদত্ত হয় নাই। মূল 'উজ্জ্বলনীলমণি'-গ্রন্থের উদাহরণ যথা—কোন যূথেশ্বরী কহিলেন, সখি! দূর হইতে আমাকে অবলোকন করিয়া পরিজন সহ অবনত বদনে পলাইতেছ কেন? হে প্রিয়তমে! তুমি ত আমার প্রণয়পাত্রী, আর গোপনভাবে গমন করিও না। তুমি আপনার চূড়ায় ঐ যে পুষ্পমালা বিন্যস্ত করিয়াছ, উহা আমারই গ্রথিতা; আমি দনুজদমনের সহিত দ্যূতক্রীড়ায় ঐ মালা পণ রাখিয়াছিলাম; তিনি আমাকে জয়পূর্ব্বক তোমাকে অর্পণ করিয়াছেন। [illegible]

'সমা লঘু' নাহি হয় ইহার আদিমা।
অন্যা ত্রিবিধ হয় অধিক লঘু সমা॥

দ্বাদশবিধা যূথেশ্বরী

'আত্যন্তিকাধিকা' ভিন্ন সবে লঘু হয়।
'আত্যন্তিকা লঘু ভিন্ন অধিকতা রয়॥
'আত্যন্তিকাধিকা' মাত্র এক আখ্যান।
'আত্যন্তিকী লঘু,' 'সমা লঘু' দুই নাম॥
মধ্যাস্থ 'অধিকা,' 'সমা,' 'লঘু' নাম আর।
প্রখরাদি তিন ভেদে নয় ভেদ তার॥
এই যূথেশ্বরী হয় দ্বাদশ প্রকার।*
এবে কিছু লেখি তার সহায় বিচার॥

---

১ আত্যন্তিকাধিকা, ২ আত্যন্তিকী লঘু, ৩ সমা লঘু, ৪ অধিক মধ্যা, ৫ সম মধ্যা,

সপ্তম অধ্যায়

দূতিভেদ প্রকরণ

—ঃ*ঃ—

দূতি বা নায়িকা-সহায়া*

পূর্ব্বরাগ আদি ভাবে যৈছে দূতী হয়।
সে সব দূতীর এবে করিব নির্ণয়॥
তাথে দুই মত হয় দূতীর আখ্যান।
'স্বয়ং দূতী' হয় কভু 'আপ্ত দূতি' নাম॥

১। স্বয়ং দূতী

অত্যন্ত ঔৎসুক্যে যেই ছাড়ে লাজ ভয়।
পতি আগে স্বাভিযোগ আপনি সে কয়॥
তাহে 'স্বাভিযোগ' হয়, তিন আখ্যান।
'বাচিক', 'আঙ্গিক' আর 'চাক্ষুষ' হয় নাম॥

(ক) বাচিক—কৃষ্ণ ও পুরস্থ

'বাচিক' ব্যঙ্গ মাত্র দ্বিধা—'শব্দে', 'অর্থে' হয়।
সেই দুই মত—'কৃষ্ণ', 'পুরস্থ' বিষয়॥

---

* নায়ক-ভেদ (প্রথম অধ্যায়) বর্ণনান্তর, নায়কের দ্যুতাদি নিমিত্ত, নায়ক-সহায়গণের—(দ্বিতীয় অধ্যায়) যেরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে; তদ্রূপ নায়িকা-ভেদ (পঞ্চম অধ্যায়) বর্ণনান্তর, নায়িকাবর্গের সহায়াগণের বিবরণ

(১) কৃষ্ণ-বিষয়

'সাক্ষাৎ' ও 'ছল'

'কৃষ্ণ-বিষয়' হয় দুই ত প্রকার।
'সাক্ষাৎকারে' হয় এক, 'ছল' করি আর ॥

(ক) "সাক্ষাৎ"—(১) গর্ব্ব, (২) আক্ষেপ ও (৩) যাচন

'সাক্ষাৎ' বহুবিধ হয়—'গর্ব্বিত বচন'
'আক্ষেপ' করয়ে কেহ, কেহ বা 'যাচন'

(১) 'গর্ব্ব'-হেতু অর্থোথ ব্যঙ্গ, যথা—

হেদে হে কালীয়া কানু এঘোর গহনে। বারে বারে চাও কেন কুটিল নয়নে ॥
আমি শ্যামানামে নারী সতীর প্রধান। বনমাঝে না করিহ মোর অপমান ॥
মোর দুঃখ দেখে যদি হরিপ্রীর গণ। সকলে মিলিয়া তোমায় করিবে তাড়ন ॥*

(২) 'আক্ষেপ'-হেতু অর্থোথ ব্যঙ্গ, যথা—

আমার আঁচলে মল্লিকার ফুল কেমনে দেখিলে তুমি।
নিকটে আসিয়া কাড়িয়া লইলে কি করিতে পারি আমি ॥
যে দেখি তোমার বিপরীত রীত কাছে আসি কোন ছলে।
আমার গলার মুকুতার হার কাড়িয়া লইবে বলে ॥
গহন কাননে নাহি কোন জন অতি দূরে মোর ঘর।
কাহার শরণ লইব এখন হৃদয়ে লাগিছে ডর ॥†

(৩) 'যাচ্ঞা,—স্বার্থ ও পরার্থ

তাহাতে 'যাচ্ঞা' হয় দুইত প্রকার।
'স্বার্থে' যাচ্ঞা হয়, 'পরলাগি' আর ॥

---

* অর্থাৎ, আমায় একাকিনী পাইয়া এখন যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পার। (শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্যামাবাক্য)।

'স্বার্থ-যাচ্ঞা'—অর্থোথ ব্যঙ্গ, যথা—

বৃন্দাবন গহন তাথে ভুজঙ্গের গণ দেখি মনে লাগে বড় ভয়।
ভয়ে কাঁপি থরহরি বনফুল তুলিতে নারি কাত্যায়নী পূজা নাহি হয় ॥
বড় ভয় পাঞা মনে আইলাম তোমার স্থানে তুমি বট বড় উপকারী।
বিষহর মন্ত্র দাও বিনি মূলে কিনে লও তবে ফুল তুলিবারে পারি ॥ †

অথবা,

সর্ব্বজন রক্ষা করি গহনে বেড়াও হরি তোমার কীর্ত্তি জগতে বেড়ায়
তুমি করুণার সিন্ধু অনাথ জনার বন্ধু শরণ লইলা তুয়া পায় ॥
ফুল তুলিবার লাগে আইলাম বনভাগে ভ্রমে পথ হৈল বিস্মরণ।
তুহু অনাথের নাথ দেখাইয়া দেহ পথ নিজ ঘরে করি যে গমন ॥ §

'পরার্থ-যাচ্ঞা'—অর্থোথ ব্যঙ্গ, যথা—*

ঘরের বাহির না হই কখন আমি কুলবতী নারী।
সখীর কথায় এখানে আইনু দূতীর চরিত করি ॥
আমার বচন, তুরিতে শুনহ তুরিতে যাইব ঘরে।
সুন্দরী যুবতী হইয়া কে কোথা কানন ভিতরে ফিরে ॥
আর এক দেখ চকোর আইল বলিয়া চান্দের কলা।
আমার বদন নিকটে আসিয়া কতনা করিবে জ্বালা ॥

---

† অর্থাৎ, এই নির্জ্জন বনে আমি কন্দপসর্প কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়াছি—তুমি বিষহর মন্ত্রদানে রক্ষা কর। টীকাকার শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—শ্রীমতীর এই সঙ্কেত-বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রদানচ্ছলে তাঁহার বদন চুম্বন করিলেন এবং দক্ষিণা-স্বরূপ কঞ্চুলিকা গ্রহণ করিলেন।

§ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—শ্রীমতির প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন—কিন্তু বক্রপথ দিয়া গমন করতঃ ধূর্ত্তরাজ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দুর্গম স্থানে লইয়া বলিলেন—এই কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম স্থলে পদব্রজে যাইতে সক্ষম হইবে না, অতএব ক্রোড়ে আরোহণ কর—এই বলিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে বক্ষোপরি লইয়া বহন করিতে লাগিলেন।

* শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোন যূথেশ্বরীর উক্তি। নিজ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য প্রকাশ করতঃ নিজকে শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগযোগ্যা বলিয়া প্রকাশিত করিতেছেন।

(খ) ছল

অন্য উপদেশ করি কহে অভিপ্রায়।
চাতুরী প্রবন্ধ 'ছল'-শব্দে কহে তায়॥

অর্থোৎপন্ন ব্যঙ্গ ছল, যথা—†

লুবুধ মধুপ যার নাহি পায় গন্ধ। ফল ফুল বিকসিত সেই ত মাকন্দ।
হেদে হে কোকিলবর ইহ রস ছাড়ি। কেন বা ফিরিছ তুহু এ কানন বেড়ি॥

(২) পুরস্থ বিষয়

নায়িকা কহয়ে কথা হরি তাহা শুনে।
ছল করি গোবিন্দের অশ্রুত করি মানে॥
কৃষ্ণেরে শুনায়া অন্য বস্তু সনে কয়।
কবিগণ বলে তারে 'পুরস্থ বিষয়'॥

অর্থোত্থ, যথা—

(শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে কোন যূথেশ্বরীর ছলপূর্ব্বক গোবর্দ্ধন গিরির প্রতি উক্তি)

শুন গোবর্দ্ধন গিরি তোমার লতা সারি সারি তাথে পুষ্প আছে বিকশিত।
ইহ আছে পক্ষীগণে শঙ্কা নাহি কোন জনে নিজকার্য্যে বড়ই পণ্ডিত॥
পুষ্প তুলিবার জন্যে এলাম তোমার স্থানে তুয়া গুণে জগত প্রকাশ।
কহ ইহার উপায় তুমি বহু পুষ্প দাও পুরাহ মনের অভিলাষ॥

অথবা, (সখী প্রতি যূথেশ্বরী)—

ব্রজরাজ নন্দন বড়ই চঞ্চল মন নারীগণের সতীব্রত হরে।
তোমার মৃদু স্বভাব নাহি জান দুষ্ট ভাব কথাতেও বারিতে নার তারে॥
আমি ত মুগুধা নারী কেন বা গহনে ফিরি গহনে কণ্টক বহুতর।
ছাড়ি কুলবতী লাজ বনমাঝে কিবা কাজ এখন ত্বরিতে যাব ঘর॥

---

† কোন যূথেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—এমন সুরূপা ও লজ্জাশীলা পরিত্যাগ করিয়া কেন বৃন্দাবন

(খ) আঙ্গিক

অঙ্গুলি স্ফোটন, ছলে অঙ্গ সম্বরণ।
চরণে পৃথিবী লেখে, কর্ণ কণ্ডূয়ন ॥
নাসায় তিলক করে বেশ বিভূষণ।
ভুরুর নর্ত্তন, আর সখী আলিঙ্গন ॥
সখীর তাড়ন করে, অধর দংশন।
হারাদি গাঁথয়ে, আর ভূষণের স্বন ॥
কৃষ্ণ আগে ভুজমূল প্রকাশিয়া রাখে।
চিন্তামগ্না হইয়া কৃষ্ণের নাম লেখে ॥
তরুর অঙ্গে লতা দিয়া করায় মিলন।
"আঙ্গিক" বলিয়া তাহে কহে কবিগণ ॥
ইহার উদাহরণ পদ হয় বহুতর।
সে সব লিখিতে গ্রন্থ হয় ত বিস্তর ॥

(গ) চাক্ষুষ বা কটাক্ষ*

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দূতী

অসংখ্য আঙ্গিকাদি দিগদরশন।
যথোচিত কৃষ্ণ প্রতি জানিহ বর্ণন ॥

'স্বাভিযোগ' ও 'অনুভাব'

'স্বাভিযোগ' বলি তাহে বুদ্ধিপূর্ব্ব হলে।
স্বাভাবিক হৈলে তবে 'অনুভাব' বলে ॥

* নেত্রতারকার যে গতাগতি বিশ্রান্তি অর্থাৎ লক্ষ্য পর্য্যন্ত গমন, তথা হইতে পুনরাগমন এবং গতাগতি মধ্যে লক্ষ্য সহ যে অল্পকাল স্থিতি ইত্যাদির চমৎকারিত্বরূপে যে বিবর্ত্তন অর্থাৎ অভ্যাস, রসজ্ঞেরা তাহাকেই 'কটাক্ষ' বলিয়া কীর্ত্তন করেন—(৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত অনুবাদ)।

২। আপ্ত দূতী

প্রাণ অন্তে নাহি করে বিশ্বাস ভঞ্জন।
বহু স্নেহ দূতীর হয়, মধুর বচন॥

আপ্ত-দূতী—ত্রিবিধ

সেই দূতী হয় ইহ তিন প্রকার।
'অমিতার্থা', 'নিসৃষ্টার্থা', 'পত্রহারী' আর॥

(ক) অমিতার্থা

দোহা সঙ্গ একজনার বুঝিয়া ইঙ্গিত।
উপায় করিয়া দোহায় করায় মিলিত॥

যথা,

সো তুয়া নয়ন শরাসন দহনে। জর জর অন্তর হোয়ল মদনে॥
তোহে দেখি হোয়ল উথলিত মদনা। লাজে রহই তবু অবনত বয়না॥
মোহে করল দূতী না কহল বচনে। হাম সব বুঝায়নু ইঙ্গিত রচনে॥

(খ) নিসৃষ্টার্থা

নায়ক নায়িকা কার্য্যভার দেয় যারে।
'নিসৃষ্টা' যুক্তি করি মিলায় দোহারে॥

যথা,

মাধব ইহ বৃন্দাবনবাসী। গুণবতী এক আছয়ে মণিরাশী॥
তুহু সে কঠিন মণি কি বলিব তোয়। ইহ সব আওলু ধিক রহু মোয়॥

(গ) পত্রহারী

সম্বাদ বহয়ে মাত্র কার্য্য নাহি জানে।

যথা—

শুন শুন ওহে	রসিক নাগর	বড়ই রসিক তুমি।
তোমার নিকটে	রাধার সন্দেশ	কহিতে আইলাম আমি ॥
রাই অচেতনে	ঘুমাঞা সদনে	হরিষ হইয়া মনে।
কপট করিয়া	তুমি সেথা যেয়া	তারে দুঃখ দেও কেনে ॥

আপ্ত-দূতী—'শিল্পকারী', 'দৈবজ্ঞা' প্রভৃতি

কেহ 'শিল্পকারী', কেহ 'দৈবজ্ঞা' নাম ধরে।
কেহ ত 'লিঙ্গিনী', কেহ 'পরিচার' করে॥
'ধাত্রেয়ী', 'বনদেবী', কারু 'সখী' নাম।
এই মত হয় বহু দূতীর আখ্যান॥

(ঘ) 'শিল্পকারী'

যথা (শ্রীকৃষ্ণ প্রতি চিত্রা-দূতীর উক্তি)—

আমারে কহিল	অনেক যতনে	কত করি পরিহার।
সেই রূপ লেখ	ত্রিভুবন মাঝে	সমান নাহিক যার॥
তাহার বচনে	পটের উপরে	তোমারে লেখিল আমি।
সে রূপ দেখিয়া	অথির হইল	আসি দেখসিয়া তুমি॥

(ঙ) 'দৈবজ্ঞা', যথা

তোমার তারা রোহিণী	তাথে বৃষরাশি জানি	বহু যত্নে গণিলাম আমি।
গণিয়া করিলাম সার	কোন দুঃখ নাহি আর	আজ বড় সুখ পাবে তুমি॥
তুমি আসি মোর সঙ্গে	মেঘ তুল্য তুয়া অঙ্গে	শোভে ইন্দ্রধনু শিখি পাখা।
তোমার শুভরাশি ফলে	আমার সঙ্গতি গেলে	পাবে আজি বিদ্যুতের দেখা॥

(চ) 'লিঙ্গিনী,'

বেশ করে "লিঙ্গিনী" যেন, হয়েন তাপসী।

যথা—(শ্রীরাধার প্রতি পৌর্ণমাসী)—

চিন্তা না করিহ মনে মিলাইব তোর সনে আজি আনি ব্রজেন্দ্র নন্দন।
আমি এই তপস্বিনী কোন্ মন্ত্র নাহি জানি ? দূত হঞা করিলাম গমন ॥

(ছ) 'পরিচারিকা'

লবঙ্গমঞ্জরী ভানুমতী আদি করি।
রাধার নিকটে রহে 'দাসী' নাম ধরি ॥

যথা—(শ্রীমতীর প্রতি লবঙ্গমঞ্জরী)—

সহচর নঞা বিনোদ নাগর গহনে করিছে খেলা।
সেখান হইতে তাহারে আনিনু গলে দিনু বনমালা ॥
তোমার নয়ন গোচর করিয়া দিলাম নাগর করে।
এবে আজ্ঞা দেহ এ তুয়া কিঙ্করী এখন কি কাজ করে ॥

(জ) 'ধাত্রেয়ী', যথা

রাধার ধাত্রেয়ী আমি শুন বনমালি। আমার নিকটে আইস কিছু বাক্য বলি ॥
যদবধি রাধা মোর কৃষ্ণে রুচি কৈল। সেই হৈতে সোনার বর্ণ মলিন হইল ॥

(ঝ) 'বনদেবী,' যথা—

বনদেবী খ্যাতি মোর কখন ভগিনী তোর কখন বা মায়ের জননী।
শুন শুন বিধুমুখী কভু তোর প্রিয় সখী কখন বা হই ননদিনী ॥
আমার বচন ধর নয়নে ইঙ্গিত কর দাঁড়াইয়া ব্রজেন্দ্র নন্দন।
আপন করিয়া লও ফিরাঞা নয়ন চাও আসি কর দৃঢ় আলিঙ্গন ॥

৩। 'সখী' *

আপনার অধিক প্রেম ছল নাহি করে।
বিশ্বাস, বয়ঃ, বেশ—তুলা, "সখী" নাম ধরে ॥

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বিশাখা)—

তোহারি নয়ন- বাণ বড় পাবন তাহে যদি রাই মরি যায়।
অনুপম গতি তব পাওব সুন্দরী সো নহি শোচয়ি তায় ॥
মাধব, এক রহব বড় শেল।
সোরূপ নাহি হেরি এ সব জগজন নয়ন অনর্থক ভেল ॥

'সখী-দূত্য' দ্বিবিধ—'বাচ্য' ও 'ব্যঙ্গ'

দোঁহাকার ‡ দূত হয় দুই ত প্রকার।
এক 'বাচ্য' নাম হয়, 'ব্যঙ্গ' নাম আর ॥

(ক) 'বাচ্য' যথা §

কোপহ অন্তরে করহ প্রহার। তর্জ্জন গর্জ্জন কর কতবার।
পুন পুন কর তুহু কুটীল দিঠিপাত। তবহি না ছোড়ব আপন বাত ॥
কহ তুহু সুন্দর নাগর রাজে। আনি মিলায়ব তুয়া গৃহ মাঝে ॥
তুয়া কাছে তাকর বচন হয় ভঙ্গ। যো তুয়া নাহি দেখে নব রতিরঙ্গ ॥

যথা বা (শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বিশাখার বাচ্য-দূত্য উক্তি)—

যাহে নিরমাওল বিধি করু সাধা। অতিশয় রূপবতী হোয়ল রাধা ॥
পুনঃ দেখি চিত চমকিত ভেল তার। সে মঝু ভেজল নিকটে তোহার ॥

(খ) 'ব্যঙ্গ'—'সাক্ষাৎ' ও 'ব্যপদেশ'

কৃষ্ণ প্রতি 'ব্যঙ্গ' অর্থ দুই মত হয়।
প্রিয়ার অগ্রেতে, নিভৃতে কেহ রয় ॥
তাথে 'সাক্ষাৎ', 'ছলে' হয় দুই প্রকার।
উদাকৃতি দিলে গ্রন্থ হয় ত বিস্তার ॥ *

---

‡ দোঁহাকার - সখীদূত্য নায়ক ও নায়িকা উভয়নিষ্ঠ বলিয়া, সখী, উভয়ের বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

§ শ্রীরাধার প্রতি তুঙ্গবিদ্যার উক্তি (ইহা কৃষ্ণপ্রিয়ার 'বাচ্যদূত্য')

* 'ব্যঙ্গ' চতুর্বিধ—(১) কৃষ্ণপ্রিয়ার অগ্রে কৃষ্ণ প্রতি 'সাক্ষাৎ' ব্যঙ্গ (২) ঐ, কৃষ্ণ প্রতি 'ব্যপদেশ' ব্যঙ্গ (৩) কৃষ্ণপ্রিয়ার অসাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণে 'সাক্ষাৎ' ব্যঙ্গ ও (৪) কৃষ্ণপ্রিয়ার পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণে 'ব্যপদেশে' ব্যঙ্গ। ব্যপদেশ = ছলপূর্ব্বক অন্যবস্তু লক্ষ্য করিয়া স্বগতভাব প্রকাশ।

দূতী নিয়োগ

যেমনে নায়িকা করে দূতী নিয়োজন।
এবে কিছু করি তার প্রকার বর্ণন ।।

দূতী নিয়োগ—(ক) ক্রিয়াসাধ্যা ও (খ) বাচিক

দূতী নিয়োজন হয় দুই ত প্রকার।
'ক্রিয়াসাধ্য' নিয়োজন, 'বাচিক' নাম আর ॥

(ক) 'ক্রিয়াসাধ্য', যথা *—

অম্বর মাঝে দেখি নব ঘন সারি। করল আলিঙ্গন বাহু পসারি ।।
দূতী প্রতি নাহি কহল কিছু বাণী। আগে চলল সেহ ইঙ্গিতে জানি ।।

যথা বা—

মাধব বেণু শুনল যব রাধা। হৃদয়ে বিথারিল মনসিজ বাধা ॥
কিছু নাহি বোলল দূতীক পাশ। তনুমাঝে হোয়ল পুলক বিকাশ ॥
ঐছন দেখি দূতী করি অনুমান। নাগর আনিতে কয়ল পয়ান ॥

(খ) 'বাচিক'—'বাচ্য' ও 'ব্যঙ্গ'

তাহাতে বাচিক হয় দুইত প্রকার।
পূর্ব্ববৎ 'বাচ্য', 'ব্যঙ্গ' ভেদ হয় তার ॥

'বাচ্য', যথা (বিশাখা প্রতি শ্রীমতী)—

তুহু মঝু বাহিরে দ্বিতীয় পরাণি। অতি পটুতা তোর সুমধুর বাণী ॥
কিছু লঘুতা যেন না হয় আমায়। ঐছে চাতুরী করি আনবি তায় ॥

'ব্যঙ্গ'—(১) 'শব্দমূল' ও (২) 'অর্থমূল'

'বাচিক ব্যঙ্গ' হয় তাথে দুইত প্রকার।
শব্দমূল', 'অর্থমূল' এই ভেদ তার

---

* উৎকণ্ঠাদি ক্রিয়া অবলোকন করিয়া দূতী স্বয়ং গমন করিলে তাহাকে 'ক্রিয়াসাধ্যা দূতী কহে। 'ক্রিয়াসাধ্যা দূতী' দ্বিবিধ,—(১) 'অনুভব' ও (২) 'সাত্ত্বিক'। বর্ত্তমান উদাহরণে 'অনুভব' এবং পরবর্ত্তী উদাহরণে 'সাত্ত্বিক'

(১) 'শব্দমূল' যথা—(বৃন্দা প্রতি শ্রীমতী)—

না শিখিব বহুতর বৈদগ্ধ্য বচনে। কিবা কাজ আছে বহুতর গুণগণে॥
একবস্তু আকাঙ্খা করয়ে মোর মন। দোষবিন্দু ছাড়া যেই কেশ বন্ধন॥

(২) খ 'অর্থমূল'—(ক) স্বপত্যাদি নিন্দা, (খ) গোবিন্দ প্রশংসা ও (গ) দেশাদি বৈশিষ্ট্য

স্বপত্যাদি নিন্দা করে, গোবিন্দে প্রশংসে।
বহু অর্থ মূল হয় দেশাদি বিশেষে॥

'স্বপতি নিন্দা,' যথা—*

দেখ দেখ সখি, বিধাতা করেছে বিষম চরিত পতি।
তাহাতে কখন না হইল মন কি মোর হইল মতি॥
এরূপ মাধুরী নিতি নিতি বাড়ে নিকটে যমুনা বন।
তাহা দেখি মোর অন্তর পুড়িছে ধৈরজ না ধরে মন॥
আমি বড় দুঃখী হেদে প্রাণ সখি উপায় বলহ তুমি।
কুলবতী সতী এ নব যুবতী কি করি বাঁচিব আমি॥

'গোবিন্দাদির প্রশংসা', যথা—†

কুলবতী হ'য়া পর পুরুষের স্তুতি করা নহে ভালি
তুহু প্রাণ সখি পরাণ সমান তেঞিও সে তোমারে বলি॥
কতনা মাধুরী আছে তার গায়ে যার এক কণ দেখি।
অমিয়া সিনান হইল আমার ফিরিয়া না আসে আঁখি॥

যথা বা—§

দূতীর চরিতে তুহু সে চতুর নাগর সুন্দর বড়।
আমার শিশুতা ছাড়িয়া চলিল প্রমাদ নাহিক পাড়॥

---

* বিশাখার প্রতি পূর্ব্বরাগবতী শ্রীমতী রাধিকার উক্তি। মর্ম্মার্থ—যদি আমার প্রাণ রক্ষা করিবার সাধ থাকে, তবে কুলধর্ম্ম, লজ্জা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শীঘ্র আনয়ন কর, নচেৎ উপায়ান্তর নাই।

† বিশাখার প্রতি শ্রীরাধা বাক্য। § গোবিন্দাদি প্রশংসায় গোবিন্দ ব্যতীত কোন কোন স্থলে দূতীরও প্রশংসা দৃষ্ট হয়। তদৃষ্টান্ত—কোন এক যুথেশ্বরী, কৃষ্ণ প্রশংসাকারিণী কোন সখীকে সক্রোধবচনে বলিতেছেন।—ইহাতে সখীর দৌত্য-কার্য্যের নিপুণতা প্রদর্শন বা প্রশংসা করা হইল।

'দেশাদি বৈশিষ্ট্য' যথা—*

মনোরম বৃন্দাবনে বল্লীলতা তরুগণে পুষ্প লাগি করিল ভ্রমণ।
অঙ্গ মোর ভাঙ্গে শ্রমে আমি রহি এই স্থানে শ্রমদূর করি কতক্ষণ॥
একাকী রহিব আমি দ্রুত চলি যাও তুমি কালিন্দীর তীরে চলি যাও।
তাহা করে ঝলমল বহুবিধ সুকমল তাহা মোর হাতে আনি দাও॥

অথবা—

এই যমুনার বন তাহে দক্ষিণ পবন তাহে পুন চাঁদ প্রকাশিত।
প্রিয় সখী আছে সঙ্গে ভ্রমণ করিলাম রঙ্গে কর এখন যা হয় উচিত॥

---

* শ্রীমতী রাধিকা ছলপূর্ব্বক সখীর নিকট এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন—কালিন্দীকূল প্রসূনচয়ে রমণীয়তা

অষ্টম অধ্যায়

সখী প্রকরণ

প্রেমলীলা বিহারের করয়ে বিস্তার।
বিশ্বাসের স্থান 'সখী', ভাবাঙ্গের সার ॥
এক যূথ মধ্যে যত যত সখী রয়।
'অধিকাদি', 'প্রখরাদি' পূর্ব্ববৎ হয় ॥*
প্রেম সৌভাগ্যাধিকা 'অধিকা' আখ্যান।
সমে 'সমা হয়, লঘুতা যে 'লঘু' নাম ॥
অলঙ্ঘ্য বাক্য-গৌরব 'প্রখরা'তে রয়।
উন হলে 'মৃদ্বি' কহি, সাম্যে 'মধ্যা' হয়
পূর্ব্ববৎ আত্যান্তিকাধিকাদি ভেদ রয়।
যূথে যূথেশ্বরী আত্যান্তিকাধিকা হয় ॥
তিঁহত 'প্রখরা' কেহ 'মৃদ্বী' হয়ে রয়।
পূর্ব্ববৎ 'মধ্যা' তিঁহো কেহু কেহু হয় ॥
ইহা উদাকৃতি মূল গ্রন্থে পরচার।
সে সব লিখিতে গ্রন্থ হয়ত বিস্তার ॥
পূর্ব্ববৎ হয় ইহা দ্বাদশ প্রকার।
পূর্ব্ব কথা লঞা তাহা করিহ বিচার ॥ †

---

* ষষ্ঠ অধ্যায় ৪৯—৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

† ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ-টীকা দ্রষ্টব্য। দ্বাদশ প্রকার সখী যথা—(১) আত্যান্তিকাধিকা প্রখরা (২) আত্যান্তিকাধিকা মধ্যা, (৩) আত্যান্তিকাধিকা মৃদ্বী (৪) আপেক্ষিকাধিকা অধিক প্রখরা (৫) আপেক্ষিকাধিকা অধিক মধ্যা, (৬) ঐ, অধিক মৃদ্বী, (৭) সমপ্রখরা (৮) সম মধ্যা, (৯) সম মৃদ্বী, (১০) (আপেক্ষিকী ও আত্যান্তিকী) লঘু প্রখরা, (১১) লঘু-মধ্যা ও (১২) লঘু মৃদ্বী।

দূত্য

পুনঃ দূত্য লাগি করি বিশেষ বর্ণন।
দূত্য দোহার অভিসারে করায় মিলন ॥

নিত্য-নায়িকা

নিত্যনায়িকা হয় অত্যন্তিকাধিকা।
মধ্যস্থিতা তিন সখী কখন নায়িকা ॥§

নায়িকা-প্রায়া—সখী-প্রায়া—নিত্য-সখী

তাহাতে 'নায়িকা-প্রায়া' হয় অধিক নামা।
সমাতে অধিক সমা আর লঘু সমা ॥
আপেক্ষিক লঘু পুনঃ 'সখী-প্রায়া' লেখি।
আত্যন্তিকী লঘু তিহ হয় 'নিত্য-সখী' ॥
আত্মাতে আর সভে সখী কেহ বা দূতিকা।
অত্যাপিত আর কেহ না হয় নায়িকা ॥
আত্যন্তিকী লঘু প্রতি সকলে নায়িকা।
তার কভু কেহ না হয় সখী দূতিকা ॥ *

(ক) নিত্য-নায়িকা

'নিত্য-নায়িকা' যূথেশ্বরী প্রতি কহি।
সকলের শ্রেষ্ঠ তেঁহ মূখ্য-দূত্য নাহি ॥

---

§ যূথমধ্যে যিনি অত্যন্তিকাধিকা বা প্রথমা তিনিই নিত্য-নায়িকা। মধ্যস্থা তিনটি অর্থাৎ আপেক্ষিকাধিকা, সমা ও আপেক্ষিকী লঘু এই তিনের নায়িকাত্ব ও সখীত্ব—উভয়ই সম্ভবপর হয়।

* আদ্যার অর্থাৎ আত্যন্তিকাধিকা, আপেক্ষিকাধিকা প্রভৃতি সকল সখীই দূতী হন—কখন তাহাদের নায়িকাত্ব হয় না। কিন্তু পঞ্চমীর অর্থাৎ 'আত্যন্তিকী লঘুর' পূর্ববর্ণিত সকল সখীই নায়িকা হন—কিন্তু তাঁহাদের দূতীত্ব হয় না।

স্বযূথের মধ্যে যেই প্রিয় সহচরী।
তারে দূতি সর্ব্বদা করয়ে যূথেশ্বরী॥
তবু সখী-প্রীতে বশ কদাচিত হয়।
যূথেশ্বরী হয়া সখীর দূত্য করয়॥
দূরে গতাগতি নাহি, 'গৌণ' দুতী হয়া।
কৃষ্ণ সঙ্গে নিজ সখী দেয় মিলাইয়া॥

গৌণ-দূত্য—(১) 'সমক্ষ' ও (২) 'পরোক্ষ'

গৌণ-দূত্য হয় তাহে দুই প্রকার।
হরির 'সাক্ষাতে', 'পরোক্ষেতে' হয় আর।

(১) 'সাক্ষাৎ' বা 'সমক্ষ' দূত্য

তাহাতে 'সাক্ষাত' যেই দুই ভেদ তার।
'সাঙ্কেতিক' এক নাম, 'বাচিক' হয় আর॥

(ক) 'সাঙ্কেতিক' দূত্য

চক্ষুর কটাক্ষে কৃষ্ণে সখীরে দেখায়।
সখী সমর্পিয়া কৃষ্ণে আপনি লুকায়॥

যথা*—

সুন্দরী জানলু তোহার চরিত। কানু সঞে নয়নকি কয়লি ইঙ্গিত॥
তুহুঁ সে লুকাওলি কুঞ্জ কি মাঝ। মুঝে দুঃখ দেওল নাগররাজ॥
যদি ইহ না রহিত লতা তরু আলি। কি করি মঝু গতি শঠ বনমালি॥

(খ) 'বাচিক'-দূত্য †

পরস্পর বাক্যে করে সখী সমর্পণ।
কৃষ্ণের পশ্চাতে সখী সমর্পে কখন॥

---

* কোন এক সখীর, স্বীয় যূথেশ্বরীর প্রতি ছদ্ম আক্ষেপোক্তি। এই উদাহরণে 'অধিক মৃদ্বির' দূত্য প্রমাণিত হইল। 'প্রখরা'রও এইরূপ দূত্য আছে।

† 'বাচিক দূত্য' ত্রিবিধ—(১) শ্রীকৃষ্ণও সখীর অগ্রে শ্রীকৃষ্ণেতে, (২) শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে সখীতে এবং (৩) সখীর পশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণেতে।

বাচিক-দূত্য (সখী ও শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে) যথা—

আমি গোপনারী আর কি করিব উপকার এক উপকার এবে করি।
এই মোর সহচরী বনফুল করে চুরি তারে আমি আনি দিল ধরি ॥
এই ধরি দিল চোর আর দোষ নাহি মোর আমি গৃহে করিএ গমন।
যে ইচ্ছা হয় তোমার কর সেই প্রতিকার তুমি ব্রজরাজের নন্দন ॥ §

বাচিক-দূত্য (শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে সখীতে) যথা—

আমার মুকুতা ঝুরি ভূমিতে পড়িল ছিঁড়ি তুমি তাহা লহ অন্বেষিয়া।
মালা গাঁথে ফুল লএঞা তাহে ব্যগ্র-চিত্ত হয়া হরি আছে আনমন হয়া ॥
বিস্মিত হয়াছে কানু পড়েছে মোহন বেণু গড়ি যায় ধূলির উপরে।
কপটে নিকটে জায়া বেণু রাখি লুকাইয়া বড় দুঃখ দিয়াছে আমারে ॥ ‡

বাচিক-দূত্য (সখীর পশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণ) যথা—

গহন কাননে কুসুম আনিতে গেছে মোর সহচরী।
নির্জ্জন গহনে একাকী পাঠাঞা ভাবি আমি মুরহরি ॥
নাগর, তুমি যাচ সেই পথে।
তোমার চরণ ধরিএ সাধিলে চঞ্চল না হয়া চিতে ॥
সেই সহচরি কিছুই না জানে যুবতী কুলের বালা।
তারে একাকিনী পথ মাঝে পাঞা তুমি না করিহ জ্বালা ॥

(২) পরোক্ষ-দূত্য

সখী দ্বারা করে কৃষ্ণে সখি সমর্পণ।
কিম্বা ছল করি সখী করে নিয়োজন ॥

---

§ শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্যামলা-বাক্য—'এই উদাহরণে শ্যামলা অধিক প্রখরা এই নিমিত্ত সখীর সমক্ষে সখীর নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণে বাচিক দূত্য করিলেন'।

‡ শ্রীমতী ছলপূর্ব্বক চিত্রার দৌত্য করিলেন—এই উদাহরণে 'অধিক মধ্যার' দূত্য লক্ষণ প্রমাণিত হইল।

(ক) সখী দ্বারা

যথা—

শশীকলা রোধ হোয়ল গুরু বচনে। রাই কহল তুয়া কুঞ্জকি গমনে॥
রাইত বাঞ্ছিল এ তুয়া প্রণয়ে। তুয়া লাগি মুঝে কত বোলল বিনয়ে॥
মধুকর নিকর তুয়া পথ দরশে। তুয়া লাগি মাধব বনমাঝে বিলসে॥
না করু বিলম্বন খঞ্জন-নয়নে। তুরিতে চলহ অব কুঞ্জকি ভবনে॥ *

(খ) ব্যপদেশ বা ছল দ্বারা

ছল করি হরি প্রতি পাঠায় 'লিখন'।
সখী দ্বারা দেয় পুনঃ নানা 'উপায়ন'॥
আর ছল হয় তাপে 'নিজ প্রয়োজনে'।
অথবা পাঠায় তাপে 'আশ্চর্য্য দর্শনে'॥

'লেখ্য'-ব্যপদেশ

যথা—

ছোড়হ দূতী- চরিত শব সুন্দরী, কাহে চাহ কুঞ্চিত-নয়নে।
রাইক লেখ আনলি তুহু কাননে পড় তুহু আপন বদনে॥
ইহ দেখ সুখময় কুঞ্জ ভবন মাঝে বনফুল সেজকি উপরে।
রহি রহি গুণ গুণ শবদ করি ডাকই তোহে মোহে মধুকর নিকরে॥ †

উপায়ন-ব্যপদেশ, যথা—

ছাড় ছাড় নাথ বসন আঁচল নিছনি লইয়া মরি।
গহন কাননে একলা পাইয়া হট্ না করিহ হরি॥
নিরজন বন বড়ই গহন হইল সাঁজের বেলা।
রাধার বচনে এখানে আইলাম তোমায় দিতে বনমালা॥

---

* রঙ্গদেবীর প্রতি কলাবতী বাক্য। শশীকলা—রঙ্গদেবীর সখী বা দ্বিতীয়া মূর্ত্তি 'স্বীয় যূথসম্বন্ধীয় সখী মধ্যে যে যাহাতে অনুরক্তা, যূথেশ্বরী তাহাকেই তাহার দূতার্থ নিয়োগ করেন—রঙ্গদেবীর প্রতি কলাবতী আতিশয় অনুরাগিনী এই নিমিত্ত যূথমধ্যা শ্রীরাধা রঙ্গদেবীর দূত্যে কলাবতীকে নিযুক্ত করিলেন।

† শ্রীরাধার পত্রহারী দূতী রসালমঞ্জরী প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্য।

তুয়া গুণগণ জানিছে সকল কারে বা করিব রোষ।
এখানে আসিয়া ভাল না করিল নাহিক তোমার দোষ ॥ *

'নিজ প্রয়োজন'-ব্যপদেশ, যথা—

কালি সে সাঁজের বেলা রাই কুঞ্জ-গৃহে গেলা
পাশরি আইলা মুক্তাহারে।
আজি অতি নিশি ভোরে রাই পাঠাইলা তোরে
সেই মুক্তামালা আনিবারে ॥
অতি দ্রুত চলে গেলে অনেক বিলম্বে এলে
বুঝিতে নারিল তোর কলা।
কণ্টক লেগেছে স্তনে নিশ্বাস ছাড়হ কেনে
কেন না আনিলে মুক্তামালা ॥ †

'আশ্চর্য্য দর্শন' ব্যপদেশ, যথা—

মুখে আছে ভুজঙ্গিনী কণ্ঠেতে অম্বর মণি শিরে আছে সুধাকরগণ
মুখেতে মাণিক খসে কেন শ্যামবর্ণ হংসে দেখিবারে করিল গমন।
আমার বচনে গেলে আশ্চর্য্য দেখিয়া আইলে বিলম্ব হইল কতক্ষণ।
আশ্চর্য্য দেখেছ তুমি সত্য করেছিলাম আমি কোপ কর কিসের কারণ ॥

(খ) নায়িকা প্রায়া

'নায়িকা প্রায়া'

আপেক্ষিকাধিকা ‡ কভু লঘু নারী প্রতি।
'নায়িকাপ্রায়া' হয়্যা তার হয় দূতী ॥

---

* শ্রীরাধিকার দূতী রতিমঞ্জরীর শ্রীকৃষ্ণ প্রতি উক্তি।

† শশীকলার প্রতি ললিতার উক্তি। 'এই উদাহরণে নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর আনয়ন ছলে সখীর দূত্য করত শ্রীরাধিকা তাহাকে কুঞ্জ মধ্যে প্রেরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন করাইলেন'।

‡ অর্থাৎ 'অধিকপ্রখরা,' 'অধিকমধ্যা' ও 'অধিকমৃদ্বী'।

'অধিক প্রখরা'-দূত্য, যথা—

আজু মঝু হাতে পড়লি তুহু শস্তুলি কি করব সবিনয় বচনে।
তোহারি বিনয় বিফল অব হোয়ল আনলু এ বড় গহনে॥
বহুতর ভাগি তোহে বন আনলু ইহ নব কুঞ্জে রহ বসিয়া।
তুয়া কুচ-কুম্ভ নিহিত মুকুতা ফল সিংহী পতি নিব কাড়িয়া॥ §

'অধিক মধ্যা-দূত্য, যথা—

নিতি নিতি কানু সনে ইঙ্গিত করিঞা। তাকর নিকটে দেয়াল মঝু ধরিঞা॥
আজু পাওলু তুজে কুঞ্জক নিলয়ে। হরি কাছে দেওলু কি করব বিনয়ে॥

'অধিক মৃদ্বী'-দূত্য, যথা—

কত কত দিন গহন কাননে কানু মিলাইলে তুমি।
অনেক যতনে তোমার সে ধার শুধিতে নারিলাম আমি॥
এবে উপকার কি করিব আর আনিলাম নিকুঞ্জ বনে।
মনের কৌতুকে এ নব কাননে বিহর হরির সনে॥ *

(গ)—'দ্বিসমাত্রিক'

'সম প্রখরা', 'সম মধ্যা', সম মৃদ্বী' তথি।
পরস্পর নায়িকা হয় পরস্পর দূতী॥

সম প্রখরা'-দূত্য, যথা—

তোমাতে আমাতে মনের পীরিতে সুখে থাকি নিতি নিতি।
তুমি একদিন আমি একদিন পরস্পর হই দূতী॥
সে লেখা করিতে আজিও আমাতে দূতীর করণ নয়।
সে লেখা ছাড়িঞা মোরে দূতী হঞা যাইতে উচিত হয়॥
তোমার নয়ন কহে পুন পুন আনিতে নাগর বরে।
ভঙ্গি ছাড় তুমি এই যাই আমি কানু আনিবার তরে।

---

§ লঘীয়সী সখী শস্তলী প্রতি ললিতার উক্তি।

* কোন এক বিনীতা সখীর প্রতি চিত্রার উক্তি।

'সম মধ্যা'-দূত্য, যথা—

আজু হরি করতলে তোহে হাম দেয়লু হাম হোয়লু তুয়া দূতী।
মিছই কাহে কহসি বাত চঞ্চল সহজ আভিরিণী জাতি॥
এই যুকতি যব দুই সখী করতহি তৈখনে নাগর গেল।
দুহুক হৃদয় ধরিণা মনমথে মাতল নিবিড় আলিঙ্গন দেল॥

সম মধ্যায় সৌহার্দ্দ অভেদ বড় হয়।
বিশেষ ভাবুক ইহা বিশেষ বুঝয়॥

'সম মৃদ্বী'-দূত্য, যথা—(শ্রীরাধা সখী মন্দরাক্ষী প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

তুয়া সখী তোমারে দেখায়ে দিল মোরে। তুমি দ্রুত এস এই কুঞ্জের ভিতরে॥
দুই সখী মধ্যে আমি শুইব বন মাঝে। দুই তারা মধ্যে যেন সুধাকর সাজে॥

(ঘ)—'সখী প্রায়াত্রিক'

লঘুগণ নায়িকার সদা দূত্য রয়।
অতএব কবিগণ 'সখীপ্রায়া' কয়॥*

'লঘু প্রখরা'-দূত্য, যথা—('গীতগোবিন্দে'—শ্রীমতী প্রতি তুঙ্গবিদ্যা)—

তুয়া গুণ মনে করি কাতর নাগর জর জর মনমথ বাণে
কত অভিলাষ করই হরি তোহারি অধর সুধারস পানে॥
বাত শুনহ মোর চল তুহু সত্বর বৈঠহ নাগর কোর।
তোহারি কুটিল দৃগঞ্চল শরাঘাতে দাস হয়াছি হরি তোর॥

'লঘু মধ্যা'-দূত্য, যথা—

কেন কেন রাই কুটিল নয়নে চাহিছ আমার পানে॥
কুসুম লাগিয়া তুমি সে এসেছ যমুনা গহন বনে॥
কুটিল নাগর সে সব জানিয়া কখন এসেছ বনে।
আমি কুলবতী সরল অন্তর কেমনে জানিব মনে॥

---

† রঙ্গদেবীর সখীদ্বয়—কমলা ও শশিকলা।

* 'লঘু প্রখরা', 'লঘু মধ্যা', ও 'লঘু মৃদ্বি'।

'লঘু মৃদ্বী'-দূত্য, যথা—(চন্দ্রাবলী প্রতি শৈব্যা)—

নিকুঞ্জ ভবনে নাগর ঘুমায় চামর ঢুলাহ তুমি।
কালিন্দীর তীরে কমল ফুটেছে তুলিয়া আনিগা আমি॥

ইহার কেহ নায়িকা হইতে করে মনে।
কেহ সখী হয় মাত্র যূথেশ্বরী সনে।*

'আদ্যা' (বা 'ঈষৎ-নায়িকাত্বের ঔৎসুক্য'), যথা—(শশীকলা প্রতি শ্রীরাধা)—

তোহে শিখি-চন্দ্রক লাগি পাঠালু নীপ কুঞ্জবর মাঝ।
হাসি হাসি মানস কৌতুকে আওলি ছোড়লি সো মঝু কাজ॥
শশীকলে, আজি দেখলু বিপরীত।
শত শত চন্দ্রক কুচতটে ঝাপসি ইহ তোর কৈছন রীত॥

'দ্বিতীয়া' (বা 'সখীর সুখেই অভিরুচি'), যথা—

তোমার চরণে বাজিবে বলিয়া নিতি বনে যাই আমি।
কুসুম তুলিতে মোরে বারে বারে আর না পাঠাও তুমি॥
হয়া তুয়া সখী আমি মনে সুখী কখন না জানি দুঃখ।
তুয়া সেবা হতে নাগর সহিতে রতি নহে বড় সুখ॥

(ঙ)—নিত্য সখী

সখ্যেতে সদাই প্রীত, না হয় নায়িকা।
সেই 'নিত্য সখী' ও তিঁহো লঘু আত্যন্তিকা॥
আপেক্ষিকী লঘু মাঝে কেহ হয় সখী।
যূথেশ্বরী রতিতে চিত্তে মহা সুখী॥
যদ্যপী প্রাখর্য্যাদি অপেক্ষা করিঞা।
তাহা না বর্ণিল বিস্তার ভয় পাঞা॥

---

* আপেক্ষিকাধিকাত্রর মধ্যে কেহ কেহ ঈষৎ নায়িকাত্বে ঔৎসুক্যবতী হন এবং কাহার কাহারও বা তদ্বিষয়ে অনাগ্রহ হেতু সখীর সুখেই অভিলাষ হয়।

প্রাখর্য্যাদি ভেদ এই যথাযোগ্য হয়।
দেশকাল পাত্র ভেদে হয় বিপর্য্যয় ॥

'প্রাখর্য্যের বিপর্য্যয়' যথা—

ঘন আধিয়ার এ ঘোর রজনী দেবতা বরিষ হয়।
বিকট অনিল বন গরজন দেখিয়া লাগয়ে ভয় ॥
এমন সময়ে নাগর আইল দুয়ারে দাঁড়ায়ে রয়।
আমি ললিতা প্রাণ-সখী তোর চরণে ধরিঞা কয় ॥
বিনয় করিঞা কতনা কহিছে ছাড়ি দেহ তুমি মান।
আসিঞা নাগর করুক সত্বর তোর মুখ-সুধা পান *

'মৃদুতা বা মার্দ্দব্যের বিপর্য্যয়', যথা—

শুন শুন সুন্দরী তুয়া গুণ গান ছলে পদ্মা করে উপহাস।
তুহু বর মুগধিনী তবহি আদর করি তাহে আনসি নিজ পাশ ॥
কিঞ্চিত রোষ নয়ন করু সুন্দরী চিত্রা পূরব সাধ।
পদ্ম 'পরি যেন অতি মৃদু হিমকণ বিতরই দারুণ প্রমাদ ॥§

দূতী বা সখী-ব্যবহার

যূথেশ্বরীর দূত্য লাগি যেই যায়।
আগ্রহ করিয়া হরি যদি রতি চায় ॥
তথাপি তাহাতে দূতির সম্মতি না হয়।
দূতী-ব্যবহার এই রস শাস্ত্রে কয় ॥

যথা—

আমি সখী রাধিকার আছে মোর দূত্য-ভার
তেই আইলাম তোমার নিকট।

---

* ললিতা প্রতি শ্রীরাধা-বাক্য। ললিতা প্রখরা হইলেও এই স্থলে তাহার মৃদুতা প্রকাশ পাইতেছে।

§ চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মার সহিত শ্রীমতীর কথোপকথন শ্রবণান্তর, শ্রীমতীর প্রতি চিত্রার উক্তি। এই উদাহরণে, মৃদ্বীর প্রখরতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

তোমায় দেখি চঞ্চল মন করে টলমল
তুমি না করিহ মোরে হট্ ।
চঞ্চল না হয়্য হরি বরং প্রাণ দিতে পারি
না কহিও সঙ্গম বচন ।
যাহা বল তাই করি দেহ তোমায় দিতে নারি
না করিয়া দৃত্য সমাপন ॥

সখীগণের সপ্তদশবিধ কার্য্য

নায়িকার কাছে গায় কৃষ্ণগুণ গণ ।
কৃষ্ণের নিকটে করে নায়িকা বর্ণন ॥১
দোঁহার আসক্তি করে, আর অভিসার ।২-৩
কৃষ্ণের নিকটে করে সমর্পণ তার ॥৪
পরিহাস, আশ্বাস করে, বেশ ভূষণ ।৫-৭
দোহার হৃদয়-কথা করে উদঘাটন ॥৮
ছিদ্র সম্বরণ করে, পত্যাদি বঞ্চন ৯-১০
শিক্ষা, কালে, সঙ্গম সেবন বীজন ।১১-১৩
নায়ক নায়িকা প্রতি করেন ভর্ৎসন ।১৪-১৫
দোঁহাকে কহয়ে গিয়া সন্দেশ বচন ॥১৬
নায়িকায় প্রাণ রক্ষায় করএ যতন ।১৭
এই মত সখীর হয় বহু গুণগণ ॥*

সখী বিশেষ বিবৃতি

সখী দ্বিবিধা—

তাহাতে সখীর হয় দুই ত আখ্যান ।
কেহ 'অসমা-স্নেহা' কেহ 'সম-স্নেহা' নাম ॥

---

* অনুবাদক বিদ্যানিধি মহাশয়, সখীগণের এই সপ্তদশবিধ কার্য্যাবলী বিষয়ক উদাহরণগুলির অনুবাদ করেন নাই।

(১) 'অসমস্নেহা' দ্বিবিধা—

নারী হইতে অধিক স্নেহ নায়কে করয় ।
আর বিপর্য্যয়ে দ্বিধা সমস্নেহা হয় ॥

(ক) হরি স্নেহাধিকা

নিতান্ত কৃষ্ণের আমি এই মনে করে ।
'হরিতে অধিক স্নেহা' সেই নাম ধরে ॥

যথা—(শ্রীমতী প্রতি ধনিষ্ঠা)—

বচনে কতই কহি মনে নাহি আন । মঝু মনে নাহি লাগে ঐছন মান ॥
ফিরি দেখ কাতর নাগর তোর । ইহ দেখি অন্তর বিদরয়ে মোর ॥
তুয়া মান হোয়ল দিনকর চণ্ড । মলিন হোঅল দেখ নাগর চন্দ ।

পূর্ব্বে যারে সখী বলি করিল বর্ণন ।
'হরি স্নেহাধিকা' তারে কহে কবিগণ ॥

(খ) সখীস্নেহাধিকা

'নায়িকার আমি' বলি অভিমান করে ।
হরি হ'তে বড় স্নেহ করে নায়িকারে ॥

যথা—(বৃন্দা প্রতি শ্রীমতীর কোন প্রখরা প্রাণসখী)—

বৃন্দে দূর কর দূতীক কাজে । নেওটি কহ তুহু নাগর রাজে ॥
ইহ দেখ বরিষ আঁধিয়ার রাতি । পথমাঝে কত কত ভুজগিনী পাঁতি ॥
নাহি সহই ভয় রাই আমার । আজ নিশি নাহি করাব অভিসার ॥

সেই হয় 'প্রাণ সখী', 'নিত্য সখী' আর ।
'সখী-স্নেহাধিকা' বলি নাম তাহার ॥

(২) সমস্নেহা

প্রিয়সখী, কৃষ্ণে, যেই সমান স্নেহ করে ।
'সমস্নেহা' নাম, সখী হয় বহুতরে ॥

যথা—(শ্যামার সখী চম্পকলতা প্রতি বকুলমালা)—

নাগরে না দেখি রাধিকা সুন্দরী কাতর হইয়া রহে।
রাধারে না দেখি নাগর কাতর আমার পরাণ দহে॥
তপস্যা করিঞা জনম লইব কামনা করিব তাই।
নাগর নাগরী একাসনে যেন সতত দেখিতে পাই॥

(ক) 'পরমপ্রেষ্ঠ সখী' ও (খ) 'প্রিয়সখী'

যদ্যপি সমান স্নেহ রাধাকৃষ্ণে হয়।
রাধারে আমার বলি তাদের আশয়॥
'পরমপ্রেষ্ঠ সখী' যেই 'প্রিয় সখী'।
'সমস্নেহা' নাম ধরে, দোহার সুখে সুখী॥

—o—

নবম অধ্যায়

হরিবল্লভা প্রকরণ

—※—

ব্রজসুন্দরী চতুর্ব্বিধ

গোকুল-সুন্দরী হয় চারি প্রকার।
'স্বপক্ষ' একনাম, 'সুহৃৎপক্ষ' আর ॥
'তটস্থ', 'প্রতিপক্ষ'—এই ভেদ জানাইল।
'সুহৃৎপক্ষ', 'তটস্থ' দুই প্রসঙ্গে কহিল ॥

১, ২—স্বপক্ষ ও বিপক্ষ

'স্বপক্ষ', 'বিপক্ষ' এই দুই ভেদ ইষ্ট।
এই দুই মতে রস পরম উৎকৃষ্ট ॥
'স্বপক্ষের' ভেদ পূর্ব্বে করেছি বর্ণন।
'সুহৃৎপক্ষাদি'র করি দিগ্‌দরশন ॥

৩—সুহৃৎপক্ষ

সুহৃদ্‌পক্ষ হয় ইহ 'ইষ্ট সাধক'।
সর্ব্বদা সখীর হয় 'অনিষ্ট বাধক' ॥

(ক)—'ইষ্ট সাধক', যথা (শ্যামলা প্রতি কুন্দবল্লী)—

শ্যামা সখি, শুন বচন এক মোর। জানলু রাই সনে বড় প্রেম তোর ॥
হরি লাগি চন্দন রাই আনায়। তুয়া নামে আদরে অধিক পাঠায় ॥

(খ)—'অনিষ্ট বাধক', যথা—

খলের বচন শুনে বৃথা কূট করি মনে না যাইব ভাণ্ডীরের তটে
শ্যামার বদনে শুনে প্রত্যয় হইল মনে খল জনে মিছা কথা বটে ॥

মোর বধূর বেশধারী　সুবল সখা সঙ্গে করি　পরম আনন্দে হরি খেলে।
খলে কহে নানা কথা　মোর মনে দেয় ব্যথা　সুবলেরে মোর বধূ বলে ॥§

৪—তটস্থ

যেই নারী বিপক্ষের সুহৃদ্‌পক্ষ হয়।
'তটস্থ' বলিয়া তারে কবিগণ কয় ॥

যথা—

চন্দ্রাবলীর দুঃখ দেখি　শ্যামা নাহি হয় দুঃখী　সুখ দেখি সুখ নাহি পায়।
দোষে দোষ নাহি ধরে　গুণ শুনি মৌন করে　শ্যামার মন বুঝন না যায় ॥†

বিপক্ষ

পরস্পর দ্বেষ করে, ইষ্ট করে নষ্ট।
বিপক্ষ পক্ষের সদা করএ অনিষ্ট ॥

(ক) 'ইষ্টনাশকারী', যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বৃন্দা)—

তুমি রাধা করি মনে　এসেছিলে কুঞ্জ বনে　শুনি রাধা করিল সাজন।
হেনকালে পদ্মা যেঞা　চন্দ্রাবলী সঙ্গে লঞা　তোমার সঙ্গে করালে মিলন ॥
সেকথা সুবল মুখে　শুনি হলো মহা দুঃখে　দুঃখে রাধার রাত্রি জাগরণ।
প্রভাতে জটিলা জেঞা　সেই সাজ দেখিঞা　রাধারে যেন করিল তর্জ্জন ॥

(খ) 'অনিষ্টকারীত্ব', যথা—(জটিলা ও পদ্মার উক্তি-প্রত্যুক্তি)—

এসো এসো পদ্মা, এস মঝু ভবনে।　আওলু যাই গো প্রণাম চরণে।
আওলি কোন পথে কোন ঘর হৈতে।　গোবর্দ্ধন হইতে আয়লু তুরিতে ॥
মোর বধূ দেখলি তুহু নিজ নয়নে।　তাহে দেখলু হাম দিনকর ভবনে ॥

---

§ চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মার বাক্যে রাধার প্রতি ক্রোধান্বিতা জটিলার, শ্যামলা প্রদত্ত প্রবোধ-বাক্যের প্রত্যুত্তর।

† শ্যামাকে লক্ষ্য করিয়া পদ্মার নিন্দাগর্ভ স্তুতিবাক্য। এই উদাহরণে—পদ্মা চন্দ্রাবলীর পক্ষ এবং শ্যামা শ্রীরাধার পক্ষ। চন্দ্রাবলী ও শ্রীরাধা পরস্পর বিপক্ষ। এখানে চন্দ্রাবলী সম্বন্ধে শ্যামা বিপক্ষের সুহৃদপক্ষ—সুতরাং, শ্যামা—'তটস্থা'।

চিরকাল হল্যো কেন না আইল সদনে। তাহে হরি ঘেরল দারুণ গহনে ॥
হরি বড় চঞ্চল সেহ বর যুবতী। শুনি এহ জটিলা ধাওল ঝটিতি ॥

বিপক্ষ-চেষ্টা

'ছল' করে, 'ঈর্ষ্যা' করে, আর 'চপলতা'।
'অসূয়া', 'মাৎসর্য্য', আর 'অমর্ষ', 'গর্ব্বিতা' ॥
বিপক্ষ নায়িকা সদা এই চেষ্টা করে।
অতএব তারা প্রতিপক্ষ নাম ধরে ॥

(ক) 'ছল' বা 'ছদ্ম', যথা—(মণিমঞ্জরী প্রতি ভানুমতী)—

গিরিধর উপরি বাঁশ বিটপী সব ধ্বনি করু গুরুতর বায়।
সহজহি বরিষ সময় নব জলধর আসি উদয় ভেল তায় ॥
তাহা দেখি মুগধ ধেনু সব ধাওয়ি কানু ভরম বিপরীত।
ধিক্ ধিক্ চাতুরী নারী তুহু ধাওলি জ্ঞান রহিত তুয়া চিত ॥
ঐছন চাতুরী বচন রচন করি পদ্মা গোপীরে শুনায়।
ললিতা সত্বর নিজ গৃহে পৈঠল তুরিতহি রাই সাজায়।

(খ) 'ঈর্ষ্যা', যথা—(পদ্মা প্রতি ললিতা)—

কুন্তল বসন ঘুচায়সি বালা। কি এ দরশায়লি এ বনমালা ॥
নীল লগুড় মঝু অঙ্গন মাঝ। দেখহ বনমালি নাগর রাজ ॥

('অসূয়াগর্ভ ঈর্ষ্যা', যথা)—(কোন রাধা-সখীর প্রতি পদ্মা)—

যো বরহার-নায়কে রহু দোষ। হাম নাহি নেওলু মনে করি রোষ ॥
তুহু কাঁহা পাওলি সো লঘু হার। ছোড়হ সখী পুনঃ না পরিহ আর ॥

(গ) 'চাপল', যথা—(খদ্যোতিকা প্রতি, চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা-বাক্য)—

গহন নিকুঞ্জ মাঝে ভেটিল নাগর রাজে তুমি কেন আছহ বসিয়া।

(ঘ) 'অসূয়া', যথা—

ভাণ্ডীর তরুতলে তুয়া সখী নৃত্য করে সেই নৃত্য বড় বিস্মাপন।
যদি হতো শিক্ষা তার লাগাইত চমৎকার ঈক্ষণে মোহিত ত্রিভুবন ॥*

(ঙ) 'মৎসর', বা 'অন্যশুভদ্বেষ্টা', যথা— (চন্দ্রাবলীর প্রতি পদ্মা)—

রাধার হৃদয়-হার হরি দিল অলঙ্কার তুয়া কেশে দিল' মন্দ মালা।
দেখি দুঃখ হয় মোর তভু ক্রোধ নাহি তোর তুহু বড় মুগুধা অবলা ॥

(চ) 'অমর্ষ', বা 'ক্রোধ', যথা—(পদ্মা প্রতি চন্দ্রাবলী)—

অল্প স্ফুট কুট্মলে তাথে গাঁথি গুঞ্জা ফুলে কুন্তল নাগরে দিলাম আমি।
সে কুণ্ডল রাধার কানে দেখি ক্রোধ করি মনে বিবাদ করিলে কেন তুমি ॥

(ছ) 'গর্ব্ব'—ষড়বিধ

'অহঙ্কার', 'অভিমান', 'দর্প', 'উদ্ধসিত'।
'মদ', 'ঔদ্ধত্য',—এই গর্ব্ব ছয় মত ॥

(১)—'অহঙ্কার'

আক্ষেপ করয়ে যেই বিপক্ষের গণে।
অহঙ্কারে নিজ পক্ষের গুণের বর্ণনে ॥

'অহঙ্কার', যথা—(ললিতা প্রতি পদ্মা)—

কৃষ্ণে চন্দ্রাবলী যে তাবত শোভা করে। যাবত রাধিকা তার নাহি রহে ক্রোড়ে ॥

(২)—'অভিমান'

ভঙ্গি করি করে নিজ 'প্রেমের আখ্যান।'
কবিগণ তাহাকেই কহে 'অভিমান' ॥

(ক)—কৃষ্ণের প্রতি স্বপক্ষের 'প্রেমাখ্যান', যথা—

কালীয়-দমন-কথা শুনিয়া না পাও ব্যথা তোমার নেত্রে নহে অশ্রুপাত।
মোর সখী কমলিনী কদম্বের নাম শুনি বক্ষস্থলে করয়ে আঘাত ॥ §

---

* এই উদাহরণে—শ্রীরাধার পক্ষপাতিনী রঙ্গদেবী, পদ্মাসখী শৈব্যার নৃত্যে অতৃপ্ত হইয়া গূঢ়রূপে অসূয়া প্রকাশ করিতেছেন।

§ ইহাতে, চন্দ্রাবলীর শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের ন্যুনতা এবং শ্রীরাধিকার কৃষ্ণপ্রেমের আতিশয্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

(খ)—'স্বপক্ষে কৃষ্ণপ্রেমাখ্যান', যথা—

এ সখি, ব্রজমাঝে তুহু বরা ধনিয়া। তুয়া মুখে তিলক দেওল হরি বসিয়া॥
মোর তুখ সুন্দর মঝু সখী অলকে। হরিকৃত তিলক সুন্দর নাহি ঝলকে॥
তাকর ভালে তিলক যব রচই। স্তম্ভিত নাগর কব নাহি চলই॥ §

(৩)—'দর্প'

যাহাতে সূচিত হয় উৎকর্ষ বিহার।
গর্ব্বের বিশেষ হয়, 'দর্প' নাম তার॥

যথা— (পদ্মা প্রতি ললিতা)—

তুমি বড় পুণ্যবতী জানি কুলবতী সতী সদা থাক প্রাসাদ উপরে।
শারদ চান্দিনী রাতি তাথে দিব্য শয্যা পাতি নিদ্রা যাও হরিষ অন্তরে॥
যবে মোরা সজ্জা করে শয়ন করি কন্দরে তবে হয় দৈব বিড়ম্বন।
এক শ্যাম হস্তি আসি জাগায় সকল নিশি সভাকারে করে উন্মাদন॥ ❈

(৪)—'উদ্ধসিত'

অহঙ্কারে বিপক্ষেরে করে উপহাস।
উদ্ধসিত বলি রস-শাস্ত্রের প্রকাশ॥

যথা—(পদ্মা প্রতি বিশাখা)—

বিষাদ না কর মনে নিশ্বাস ছাড়হ কেনে কৃষ্ণ প্রতি ছাড়হ আগ্রহ।
তোমারে মলিন দেখি মনে আমি বড় তুখী বিনয় বচন কেন কহ॥
ললিতার প্রেম-ডোরে বেঁধেছে নাগর বরে হইয়াছে আত্ম-বিস্মরণ।
তিলেক ছাড়িতে নারে কি করে শুনাবে তারে ফিরি যাহ আপন ভবন॥

(৫)—'মদ'

সেবাদির উৎকৃষ্টতা সূচয়ে যাহার।
গর্ব্বের বিশেষ হয়, 'মদ' নাম তার॥

---

§ পদ্মার প্রতি ললিতা-সখী রত্নাবলীর উক্তি। ইহাতে ললিতার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে।

যথা—

তোরা পুণ্যবতী ধনী নানা পুষ্প তুলে আনি গৌরীপূজা করহ কাননে
মোরা যত পুষ্প পেঞা বনমালায় সব দিঞা নাহি আঁটে গৌরীর পূজনে ॥*

(৬)—'ঔদ্ধত্য'

স্পষ্ট করি নিজোৎকর্ষ করয়ে আখ্যান।
গর্ব্বের বিশেষ হয়, 'ঔদ্ধত্য' তার নাম ॥

যথা,—(পদ্মা প্রতি ললিতা)—

এ ব্রজমণ্ডল মাঝে হেন গোপী কেবা আছে যেই হয় রাধার সমান।
রাধা সভে কৃপা করি পাঠাইঞা দেয় হরি তাহে করে তোদের সম্মান ॥

শ্লেষ উক্তি

বিপক্ষ হইয়া নারী হেন শ্লেষ করে।
বাহ্যস্তব প্রায় নিন্দা আছয়ে ভিতরে ॥

যূথেশ্বরীর ভাব

যূথেশ্বরী নাহি করে সাক্ষাৎ বিল্লন।
বিপক্ষে দেখায় গাম্ভীর্য্যাদি গুণগণ ॥

যথা,—(পৌর্ণমাসী প্রতি বৃন্দা)—

বিপক্ষ রমণী যব আওল সদনে। কতহি গরব করু চঞ্চল বচনে ॥
মঙ্গলা ঐছন হেরল যবহি। তা সনে বিনয় বচনে কহে তবহি ॥
সো নিজ গরব লাজে অধোবদনে। লঘু লঘু যাওল আপকি সদনে ॥

যূথনাথার আগে বিপক্ষ লঘুগণ।
প্রখরা হইয়া নাহি কহে ঈর্ষ্যার বচন ॥
কেহ বলে গোপী সব হরিপ্রিয়া গণ।
উচিত না হয় তার দ্বেষাদি বর্ণন ॥

---

* ললিতা প্রতি পদ্মা-বাক্য। ইহাতে পদ্মার শ্রীকৃষ্ণসেবাজনিত গর্ব্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই রস-শাস্ত্র মাঝে ইহা যেই বলে।
অ-পূর্ব্ব রসিক তারে জান ক্ষিতি তলে॥
কোটী কাম জিনি কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য অপার।
মূর্ত্ত্য প্রিয়নর্ম্ম-সখা শৃঙ্গার যাহার॥
সেই ত শৃঙ্গার, ব্রজে 'উজ্জ্বল' নাম ধরে।
তার সঙ্গে আছে ঈর্ষ্যা আদি পরিবারে॥
গোপী হৃদয়ে সেই দ্বেষ আদি গণে।
আপনি শৃঙ্গার জেয়া করেন শ্রবণে॥
অতএব রাগ দ্বেষ আদি মিলনেতে হয়।
বিরহ হইলে রাগ দ্বেষ নাহি রয়॥

যথা,—

প্রিয় সখী চন্দ্রাবলী তোরে পুণ্যবতী বলি করেছিলে হরি আলিঙ্গন।
আমিত ব্যাকুলা হয়া তারে বেড়াই অন্বেষিয়া বহুদিনে পাইনু দরশন॥
অনাথিনী করি মোরে হরি রৈলা মধুপুরে না দেখে পরাণ ফেটে যায়।
কারে কব এই কথা কে জানে মনের ব্যথা তেই কিছু কহিব তোমায়
তোমার যে ভুজ-দ্বন্দ্ব আছে কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ সেই ভুজ মোর কণ্ঠে ধর।
সেই গন্ধ অঙ্গে দিয়া আমার হিয়া জুড়াইয়া খানিক জীবন দান কর॥*

'স্বপক্ষাদি'-ভেদের হেতু

এবে কহি স্বপক্ষাদি হেতুর নির্ণয়।
'স্বজাতীয়' ভাব হৈলে, 'স্বপক্ষতা' হয়॥
অল্প বিজাতীয় হৈলে, 'সুহৃদ্ পক্ষতা'।
অল্প স্বজাতীয় হৈলে হয় 'তটস্থা'॥

---

* 'ললিতমাধব গ্রন্থে'—শ্রীমতীর গোবর্দ্ধনশিলায় নিজ মূর্ত্তি প্রতিফলিত দেখিয়া নিজকে চন্দ্রাবলী জ্ঞানে উক্তি। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনকালে রাধা ও চন্দ্রাবলীর পরস্পর বিপক্ষতা ঘটে; কিন্তু বিশ্লেষদশা উপস্থিত হইলেই পরস্পরের

পরস্পর সর্ব্বথা যদি বিজাতীয় হয়।
'বিপক্ষ' বলিয়া তারে কবিগণ কয়॥
পরস্পর বিজাতীয় ভাব যদি হয়।
বিপক্ষের উৎকৃষ্টতা মনে নাহি সয়॥
পদ্মাবলী চন্দ্রাবলী কৃষ্ণের যোগ্যা হয়।
রাধিকার গণে কেহ ইহা নাহি সয়॥
হরিতে সমান প্রেম হয় প্রায় যাহাকার।
'স্বপক্ষ' 'বিপক্ষ' ভেদ জানিহ তাহার॥

রাধা-প্রেম

তাহাতে রাধার প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
কোন গোপীকাতে তার নাহি এক বিন্দু॥
তবে যেই বিপক্ষাদি করি এ গণন।
রসের পুষ্টতা লাগি কহে কবিগণ॥
অত্যন্ত হইলে ভাব সাজয়ে প্রকৃতি।
তুল্য প্রমাণতা তার হয়ত দুর্ঘট॥
ঘুণাক্ষর-ন্যায়ে যদি সুহৃদি মাত্র হয়।*
রসের স্বভাব হেতু বিপক্ষতা রয়॥
এই মত কহে কেহ কেহ কবিগণ।
এইত কহিল হরি-প্রিয়া প্রকরণ॥

---

* ঘুণ নামক কীটে কাষ্ঠ কর্ত্তন কালে দৈবাৎ তাহাতে যেমন অক্ষরাকার হয়, তদ্রূপ যূথেশ্বরীদ্বয়ের কথঞ্চিৎ সৌহৃদ্য সম্ভব হইতে পারে। কোন কোন রসজ্ঞের মতে—রসের স্বভাববশতই বিপক্ষতা ঘটে।

দশম অধ্যায়

উদ্দীপন বিভাব প্রকরণ

—:*:—

উদ্দীপন

উদ্দীপন* হয় হরির, আর গোপীকার।
'গুণ', 'নাম', 'চরিত', 'ভূষণ', 'গান' আর ॥
'সম্বন্ধী', 'তটস্থ' এই হয় উদ্দীপন।
তার মধ্যে প্রথমেই কহি 'গুণ' গণ ॥

(অ)—গুণ

গুণগণ [illegible]ত্র তার তিন প্রকার।
'মানস', 'বাচিক' গুণ, 'কায়িক' হয় আর ॥

(ক)—মানস

কৃতজ্ঞতা, ক্ষমা আর, আশয় করুণ।
ইত্যাদি করিঞা হয় 'মানসের' গুণ ॥

যথা,—(রাধা সখীদ্বয়ের পরস্পর উক্তি)—

অলপহি সেবনে হোয়ত বশ। বহুতর অপরাধে বচন সরস ॥
'পর দুঃখ লব দেখি হোয়ত কাতর। হরি গুণে মঝু মনে সুখ বহুতর ॥

---

* যে ভাবকে (অর্থাৎ রতি অবধি মহাভাব পর্যন্ত) প্রকাশ করে, তাহাকে 'উদ্দীপন' কহে। 'উদ্দীপনাস্তু তে প্রোক্তা ভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে'—ইতি ; 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর' দক্ষিণ বিভাগ—১মা লহরী—২৯১ শ্লোক। এই গ্রন্থে, শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, প্রসাধন, স্মিত, অঙ্গসৌরভ বংশ, শৃঙ্গ, নূপুর, শঙ্খ, পদাঙ্ক, ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত এবং বাসরাদি—'উদ্দীপন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

(খ)—বাচিক

কর্ণের আনন্দ হয় শ্রবণে যাহার।
'বচনের' গুণ হয় এই ত প্রকার॥

যথা—(বিশাখা প্রতি শ্রীরাধা)—

কানুর মধুর বাক্য মোর শ্রুতি হরে। রসাল বচন মোর লেগেছে অন্তরে।

(গ)—কায়িক

কায়-গুণ 'বয়ঃ', 'রূপ', 'লাবণ্য', 'সৌন্দর্য্য'।
'অভিরূপ', 'মৃদু' আদি আর ত 'মাধুর্য্য'॥

১—'বয়ঃ' চতুর্ব্বিধ

মধুরে বয়স হয় চারি প্রকার।
'বয়ঃসন্ধি', 'নব্য', 'ব্যক্ত', 'পূর্ণ' নাম আর॥
পূর্ব্ব গ্রন্থে গোবিন্দের বয়ঃ আদি গুণ।*
বিস্তার করিয়া কৈল অদভুত বর্ণন॥
অতএব কৃষ্ণপ্রিয়ার কহিব গুণগণ।
গোবিন্দের কিছু কিছু করিব বর্ণন॥

(অ)—বয়ঃসন্ধি

বাল্য যায়, যৌবনের প্রথম সন্ধান।
কবিগণ কহে তারে 'বয়ঃসন্ধি' নাম॥

শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃসন্ধি, যথা—

কৃষ্ণের যে রোমাবলী কপিশ বরণ ছাড়ি আচম্বিতে হইল শ্যামল।
যৌবন আরম্ভে দেখ কাম পাঠাইল লেখ তার আখর করে ঝল্‌মল্‌॥
পাইয়া তারুণ্য জল নেত্র দুই চঞ্চল সফরি হইয়া জলে ফিরে।

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য যথা—

কাম ব্যাধ তাহে আল্য অপাঙ্গ সন্ধান কৈল যুবতী মৃগীর প্রাণহরে॥

---

* 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু'—দক্ষিণ বিভাগ—প্রথমা লহরী দ্রষ্টব্য (২৯৬—৩১৬ শ্লোক)। এই অধ্যায়ে, অন্যান্য প্রসঙ্গ মধ্যে—'কৌমার', 'পৌগণ্ড', কৈশোর' (আদ্য, মধ্য ও শেষ) বিষয়ে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

কৃষ্ণপ্রিয়াগণের বয়ঃসন্ধি, যথা—

রাধা-দেহ রাজধানী যৌবন রাজ চূড়ামণি যেই মাত্র প্রবেশিলা তায়।
নিতম্ব সে কাল জানি আপে বহু গুণ মানি কাঞ্চি. বাদ্য সতত বাজায়॥
মধ্য দেখি নিজ ত্রাস চলিল বলীর পাশ তার সঙ্গে সখ্য কৈল সার।
তাহা দেখে বক্ষঃস্থল তুলি ধরে দুই ফল রাজারে দিবারে উপহার॥ *

কৃষ্ণপ্রিয়াগণের মাধুর্য্য, যথা—

কটাক্ষ ভ্রমর চয়ে তোর নেত্র-কুবলয়ে বসতি করিতে সদা মন।
তোমার চিত্ত মরাল লজ্জারূপ মৃণাল ক্ষণে ক্ষণে করে অন্বেষণ॥
তুয়া মুখ-পঙ্কজে পরিহাস মধু সাজে লুকাইতে নারিছ যতনে।
বুঝিলাম তোর দেহ করিঞা পরম মোহ জানাইল ব্রজেন্দ্র নন্দনে॥§

(আ)—নব্য বয়ঃ

অল্প স্তন দেখি, অল্প চঞ্চল নয়ন।
মন্দ মন্দ হাস্য মুখে, অল্প ভাবগণ॥

যথা—(শ্রীমতী প্রতি বৃন্দা)—

অল্প অল্প তোর স্তন বক্র বক্র ও বচন নেত্র দুই কিঞ্চিৎ চঞ্চল।
জঘন হইল ঘন ব্যক্ত হইল রোমগণ মধ্য ক্ষীণ করে টলমল॥
তোমার অপূর্ব্ব তনু অপূর্ব্ব নাগর কানু তুমি বট সেবাযোগ্য তার।

কৃষ্ণপ্রিয়াবর্গের বয়োমাধুর্য্য, যথা—

গোবিন্দ নিকুঞ্জ বনে কানুর বিশ্রাম স্থানে তুমি সেথা যাহ বার বার॥
কানু যবে বনে যায় তুমি তার পানে চায় দোহা দোহে করে দরশন।
তুমি কুলবতী নারী সে কোন প্রবন্ধ করি ভুলায়েছে তোমার নয়ন ?

---

* দূর হইতে শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া সুবল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্য।

§ শ্রীরাধার প্রতি বিশাখার পরিহাস বাক্য।

(গ)—ব্যক্ত বয়ঃ

দুই স্তন ব্যক্ত হয় মধ্য বলিত্রয়।
ব্যক্ত-যৌবনে অঙ্গ ঝল্‌মল্ হয় ॥

যথা—(ইন্দ্রাবলী প্রতি নান্দীমুখী বাক্য)—

চক্রবাক দুই স্তন সঙ্করিণী দুনয়ন বলিত্রয় হইল তরঙ্গ।
শুন ইন্দ্রাবলী সখী, তরুণিম জল দেখি ধরিয়াছ সরসের রঙ্গ ॥

ব্যক্ত বয়ঃ মাধুর্য্য, যথা—(শ্রীমতী প্রতি শ্যামলা বাক্য)—

যে হরির নখ-কণে বরদন্তীর মুক্তাগণে বিস্তার করেছে বনে বনে।
গহন নিকুঞ্জচারী হেন মহামত্ত হরি তুমি তারে বেন্ধেছ নয়নে ॥

(ঘ)—পূর্ণ বয়ঃ

নিতম্ব বিপুল হয় মধ্য বড় ক্ষীণ।
উরুযুগ্ম রম্ভা তুল্য স্তন বড় পীন ॥
অঙ্গের অত্যন্ত কান্তি পূর্ণ যৌবনে।
এই ত বয়স-সীমা কহে কবিগণে ॥

যথা—(লীলাবতী প্রতি বৃন্দা বাক্য)—

বক্র তোর দুনয়ন বিধু জিনি এ বদন কুচ দুই কুম্ভের আকার।

পূর্ণ বয়ঃ মাধুর্য্য, যথা—(শ্রীরাধা-দ্বেষকারিণী চন্দ্রাবলী প্রতি পদ্মা)—

তোমার এই সুখ দেখি বিপক্ষ হইল দুঃখী তোমার প্রেম উপরি সবার ॥
ব্রজের যতেক বালা তব স্থানে শিখে কলা তুমি বট সৌন্দর্য্যের রাশি।
এই ত নিকুঞ্জ রাজ্যে বসাঞা নিকুঞ্জ-রাজে তুমি হবে পাটের মহিষী ॥

(সম্পূর্ণ যৌবন)

নূতন তারুণ্য যার শোভা অতিশয়।
সম্পূর্ণ যৌবন বলি তাহাকে কহয় ॥

২—রূপ

অলঙ্কার বিনা অঙ্গ যাথে বিভূষিত।
'রূপ' বলি কহে তারে রসিক পণ্ডিত ॥

যথা—('বিদগ্ধমাধবে' শ্রীমতী প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্য)—

রাইক অলকা চিকুর বিলাসে। কস্তুরী পত্রক কয়ল বিলাসে ॥
রাইক চঞ্চল নয়ন তরঙ্গ। শ্রুতিযুগ কুবলয়দ্যুতী করু ভঙ্গ ॥
ও মুখ মৃদু মৃদু হাস বারবার। যাহে বিফল ভেল রতন কি হার ॥
সুন্দর রাইক অঙ্গকি মাঝ। আভরণগণ সব পাওল লাজ ॥

৩—লাবণ্য

মুক্তা জিনি অঙ্গকান্তি করে ঝল্‌মল্‌।
তাহারে 'লাবণ্য' কহে রসিক সকল ॥

যথা—(শ্রীমতি প্রতি বিশাখা বাক্য)—

শ্রুতি মূলে এক বচন কহি সুন্দরি তুহু তাহে কর অবধান।
কাহে অধোবদন হোই তুহু বৈঠলি অসময়ে বিরচিলি মান ॥
দেখ হরি হৃদয় উপরি ইহ বিলসই তু নহে আন কেহ নারী।
নিরমল দর্পণ সদৃশ হরি বক্ষসি ও প্রতিবিম্ব তোহারি ॥

৪—সৌন্দর্য্য

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির যেই সুষ্ঠু সন্নিবেশ।
কবিগণ কহে তাহে 'সৌন্দর্য্য' বিশেষ ॥

যথা—

মুখ জিনি পূর্ণচন্দ্র বিল্ব জিনি কুচদ্বন্দ্ব ভুজ দুই আনত কন্ধর
মধ্য মুষ্টি-পরিমিত শ্রোণী অতি বিস্তারিত উরু দুই অতি গুরুতর ॥
রাই, তোর রূপ ভুবনের সার।
কিবা এই তনুখানি কমল নবনী জিনি উপমা দিবারে নাহি আর ॥

৫—অভিরূপতা

যাহার নিকটে রহি আর বস্তুগণ।
[illegible] তাহারি বরণ ॥

যথা—(শ্রীরাধা প্রতি বিশাখা)—

কৃষ্ণের দশনে বসি স্ফটিক হইল বাঁশী হাতে হয় পদ্মরাগ মণি।
গণ্ডের নিকটে যেঞা ইন্দ্রনীলমণি হঞা বাঁশী হল রতনের খনি॥

৬—মাধুর্য্য

অনির্ব্বচনীয় রূপ জগতের ধৃর্য্য।
কবিগণ তাহারেই কহেন 'মাধুর্য্য' ॥

যথা—(শ্রীরাধা প্রতি বিশাখা)—

কিরূপ দেখিলাম আমি রবিসুতা কুলে। বরণী না হয় রূপ মন রৈল ভুলে।
আঁখি ঠারে কুলবতীর ব্রত কৈল নাশ। এমন মাধুর্য্য কৃষ্ণ অঙ্গে পরকাশ॥

৭—মার্দ্দব

কোমল বস্তুর স্পর্শ না পারে সহিতে।
'মার্দ্দব' কহি যে তারে রসশাস্ত্র মতে॥
সেই ত 'মার্দ্দব' হয় তিন প্রকার।
'উত্তম', 'মধ্যম', হয় 'কনিষ্ঠ' হয় আর॥

উত্তম মার্দ্দব, যথা—(রসমঞ্জরী প্রতি রূপমঞ্জরী বাক্য)—

অভিনব ফুল তুলি শেজ পাতাই। তাহে শোয়লু মৃদুতনু রাই।
এক কুসুম নাহি ভাঙ্গল তায়। কতহি আঁচর দেখ রাইক গায়॥

মধ্যম মার্দ্দব, যথা—(ধনিষ্ঠা প্রতি ললিতা বাক্য)—

আনি দিল অতিশয় সূক্ষ্ম বসন। সেই বস্ত্রে কৈলা চিত্রা অঙ্গ সম্বরণ॥
হেদেগো চিত্রার অঙ্গ এতই কোমল। বস্ত্রের আঁচড়ে রক্তবর্ণ বক্ষস্থল॥

কনিষ্ঠ মার্দ্দব, যথা—('রসসুধাকরে' পদ্মার সখীগণের পরস্পর উক্তি)—

এইত কমল দেখ পদ্মার বদন। প্রভাতের রৌদ্রে হলো তামার বরণ॥

(আ)—নাম

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বৃন্দার উক্তি)—

মধুর কালিন্দী তটে হরিণী রয় নিকটে বিহার করএ কৃষ্ণসার।
এই কৃষ্ণ নাম শুনি চমকি উঠিল ধনী ভূমিতে পড়য়ে কতবার॥

(ই)—চরিত

দ্বিবিধ—'অনুভাব' ও 'লীলা'

কৃষ্ণের চরিত হয় দুই ত প্রকার।
'অনুভাব' নাম এক, 'লীলা' নাম আর ॥
'অনুভাব'* অত্র গ্রন্থে করিব বর্ণন।
এবে কিছু বিরচিব কৃষ্ণ-লীলাগণ ॥

'লীলা'

'লীলা' হয়—'চারুক্রীড়া', কৃষ্ণের 'নর্ত্তন'।
'বেণুবাদ্য', 'গো-দোহন', 'পর্ব্বত ধারণ' ॥
দূর হতে নিজ শব্দে 'ডাকে' ধেণুগণে।
'সুন্দর গমন' করে সুদূর গহনে ॥

(১)—'চারুক্রীড়া'

রাস, গেড়ুখেলা আদি চারু-খেলা হয়।
তাথে আদৌ রাসক্রীড়া করয়ে নির্ণয় ॥

'রাস' যথা—(শ্রীরাধা প্রতি শ্যামলা বাক্য)—

রাস কয়ল হরি ব্রজনারী সঙ্গে। কোটী মদন জিনি নয়ন কি ভঙ্গে ॥
অম্বরে দেখি সব সুরচয় নারী। ঠোরি না পাওল ইহ রস ভারি ॥

'কন্দুক ক্রীড়া', যথা—

পেখত হরি অব খেলত গেড়ুয়া। পিঠই দোলই বেণী ঘন চারুয়া ॥
কত কত ভঙ্গী করই হরি নয়নে মঝু মন জারল ফুলশর দহনে।

(২)—তাণ্ডব

'তাণ্ডব', যথা—(সখীর প্রতি শ্রীরাধা)—

দেখ দেখ সখি নাগর নাচিছে কলিন্দনন্দিনী কুলে।
এমন নাচন দেখেছে যে জন সেই রহে এথা ভুলে ॥

---

* 'অনুভাব'—একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

শিখি পাখা শিরে　　পবনে উড়িছে　　সখাগণ তাল ধরে।
এমন দেখিয়া　　কোন কুলবতী　　রহিতে পারিবে ঘরে॥

(৩)—বেণুবাদন

যথা—(শ্রীরাধিকা প্রতি ললিতা বাক্য)—

কটি তটে ধড়া বান্ধি　　ও দুটি চরণ ছান্দি　　কাঁকালি পড়য়ে যেন হেলে।
বাঁকা নেত্র কন্ধরে　　বাঁশী লঞা অধরে　　তার ছিদ্র আচ্ছাদি অঙ্গুলে॥
চঞ্চল নয়ন বাণে　　আর মুরলীর গানে　　হানিলেক অবলার প্রাণে।
কিবা মন্ত্র জানে কানু　　অবশ করিল তনু　　সেই রূপ দেখিয়া নয়নে॥

(৪)—গো দোহন

যথা—(শ্রীরাধা প্রতি বিশাখা)—

চরণের আগে　　ধবলি ধরিঞা　　জানুতে ধরিয়া ভাণ্ড
ঐ দেখ সখী　　শ্যামলী ধবলি　　দুহিছে নাগর চন্দ॥

(৫)—পর্ব্বতোদ্ধার

যথা—(বিশাখা প্রতি শ্রীরাধিকা বাক্য)—

ঐ দেখ পর্ব্বত ধরেছে বাম করে।　　মধুর মধুর হাসি মোর প্রাণ হরে॥

(৬)—গো-আহ্বান *

(৭)—গমন

যথা—(ললিতা প্রতি শ্রীরাধা বাক্য)—

গজরাজ জিনি দেখ কানু চলে।　　মধুপাকুল ও নব মাল দোলে॥
শিখি চন্দক চঞ্চল বায়ে উড়ে।　　মৃদু হাসিহি মাণিক মতি পড়ে॥
ক্ষুর ধূলি বিভূষিত অঙ্গ বরে।　　পীতবাস কটীতটে বেণু করে॥
মঝু মানস নেওল আঁখি কোণে।　　শচীনন্দন তোটক ছন্দেভনে॥

---

* যথা – শ্রীরাধা কহিলেন ললিতে, দূরগত স্বীয় গাভীকুল আহ্বান করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম হইতে 'হে পিশঙ্গি, হে মণিকস্তনি হে প্রণতশৃঙ্গি, হে পিঙ্গেক্ষণে, হে মৃদঙ্গমুখি, হে ধূমলে, হে শবলি, হে বংশীপ্রিয়ে, ইত্যাদি নামোল্লেখ করাতে যে আশ্চর্য্যরূপে মুহুর্মুহুঃ হী-হী-রব উদ্গত হইতেছে, হে সখি, তাহাতেই হরি আমার মন হরণ করিলেন। (রাঃ নাঃ বিদ্যারত্ন কৃত অনুবাদ)

(ঈ)—ভূষণ বা মণ্ডন

চতুর্ব্বিধ 'মণ্ডন' বলি কহে কবিগণ।
'বস্ত্র', 'ভূষা', 'মাল্য' আর 'অঙ্গ-বিলেপন' ॥

১—'বস্ত্র'

যথা—(ললিতা প্রতি শ্রীমতী রাধিকা বাক্য)
কৃষ্ণের অঙ্গের অই পীত বসন। যাহা দেখি চঞ্চল হইল মোর মন ॥

২—'ভূষা'

যথা—(ঐ)—
নীপপুষ্প কৃষ্ণ কাণে রহেত কামের তূণে সেই মোরে দুঃখ দিতে পারে।
শিখি পাখা আছে শিরে কিবা দোষ দিব তারে সেই কেন দুঃখ দিল মোরে ॥

৩ ৪—'মাল্য' ও 'অনুলেপন'

যথা—('রসসুধাকরে'—সুবল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্য)—
কুন্তলের চারি পাশে ভ্রমর ফিরিয়া আসে বুঝি আছে বনমালাগণ।
অতি শোভা গণ্ড মাঝে বুঝিলাম তাম্বুল আছে অঙ্গ গন্ধে জানি যে চন্দন ॥

(উ)—সম্বন্ধী

দ্বিবিধ—'লগ্ন' ও 'সন্নিহিত'

ইহাতে 'সম্বন্ধী' হয় দুইত প্রকার।
'লগ্ন' এক নাম হয়, 'সন্নিহিত' আর ॥

(ক)—লগ্ন

অষ্টবিধ

'বংশীরব', 'শৃঙ্গীরব', 'গীত', 'সৌরভ'।
'ভূষাধ্বনি', 'পদাঙ্কাদি', 'বীণা আদি রব' ॥
'শিল্প কৌশলাদি' ধরে লগ্ন নাম।
প্রথমে বর্ণি যে তাথে মুরলীর গান ॥

(১) 'বংশীরব' বা মুরলীর গান

যথা—('দানকেলি কৌমুদী' গ্রন্থে শ্রীরাধা প্রতি ললিতা বাক্য)—

এই যে বেণুর নাদ তরুলতা উন্মাদ শুনি তরু বিকশিত হয়।
কোকিলের পাঠবাদ কাথে সন্ধ্যার মেঘনাদ তারা সব মৌন ধরি রয়॥
গোপীগণের স্মরানল, তাথে ঝঞ্ঝায় হানিল, সে আগুনে হিয়া জ্বলে যায়।
রাধা-ধৈর্য্য গিরিরাজ তাহা বিদারিতে বাজ, রাধিকা চঞ্চল হৈলা তায়॥
কৃষ্ণমুখ চন্দ্র যেই মুরলীর স্বণ।
উদ্দীপন শ্রেষ্ঠ তারে কহে কবিগণ॥

(২)—'শৃঙ্গীরব'

যথা—(শ্রীমতীর উক্তি)—

সদ্বংশে জন্মস্থান অকুটিল পঞ্চম গান এই গুণে বংশীর সম্মান।
কৃষ্ণমুখ সুধারাশি সদাপান করে বাঁশী তাহাতে নাহিক অভিমান॥
ওরে শৃঙ্গ, তোরে বলি তোর অঙ্গ যেন কালী অত্যন্ত কুটিল দেখি তোরে।
করিয়া মধুর গান মুখসুধা কর পান তাথে বড় দুঃখ লাগে মোরে॥

(৩)—'গীত'

যথা—(ললিতা প্রতি কলহান্তরিতা শ্রীরাধা বাক্য)—

নিভাইয়া মানানল বরিষয়ে গীতজল মেঘ হঞা আসিয়াছে হরি।
দক্ষিণ পবন হঞা মেঘ দেহ উড়াইয়া তবে মান রাখিবারে পারি॥

(৪)—'সৌরভ'

যথা—(ললিতা প্রতি শ্রীরাধা বাক্য)—

কার পরিমল আওল মঝু গেহে। তনুরূহ নর্ত্তন করতহি দেহে॥
জানলু মাধব আওল ধাম। যাকর ভুবনে সুরভি বলি নাম॥

(৫)—'ভূষাধ্বনি'

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বৃন্দা বাক্য)—

কালিন্দীতে কমলিনী শুনিয়া হংসীর ধ্বনি কৃষ্ণ নুপুর বলিয়া জানিল।
কাঁখে ছিল কলসী ভূমেতে পড়িল খাস তাহা কিছু জানিতে নারিল॥

(৬)—'পদাঙ্ক'

যথা—('দানকেলি কৌমুদী' গ্রন্থে ললিতা প্রতি শ্রীরাধা বাক্য)—

অঙ্কুশ সহ পঙ্কজ বজ্রের সহিত ধ্বজ এ চিহ্ন ও কৃষ্ণের চরণ।
সেই চিহ্ন ধরণীতে দেখিয়া আমার চিতে কভু প্রীত কভু বা কম্পন ॥

(৭)—'বিপঞ্চী নিক্কণ' বা বীণানাদ

যথা—('ললিত মাধব' গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)—

দেখ শ্যামলা-বীণা গাইছে সুতান। ঐছে হরিয়া লইছে মোর প্রাণ ॥

(৮)—'শিল্প কৌশলাদি'

যথা—(মাল্যবাহিকা কোন বনদেবীর প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি)—

কি মালা গেঁথেছে হরি নানা ফুল সারি সারি পট্টসূতে করিয়াছে গুণ।
দেখি মন কাঁপে শূন্য, যেন তীক্ষ্ণ বাণপূর্ণ কন্দর্পের অভিনব তূণ ॥

(খ)—'সন্নিহিতা'

নির্ম্মাল্যাদি', 'বর্হ' কৃষ্ণের সন্নিহিত হয়।
'গুঞ্জা', 'পর্ব্বত ধাতু', 'ধেনু সমুদয়' ॥
'লগুড়ি', 'বেণু', 'শৃঙ্গ', তার 'প্রিয় দরশন'।
'ধেনুধূলি', 'বৃন্দাবন', 'তদাশ্রিতগণ' ॥
'গোবর্দ্ধন', 'রবিসুতা', আর 'রাসস্থলী'।
এই সব গোবিন্দের 'সন্নিহিত' বলি ॥

(১)—'নির্ম্মাল্যাদি'

যথা—('বিদগ্ধ মাধব' গ্রন্থে বিশাখা প্রতি শ্রীমতী বাক্য)—

অঙ্গোত্তীর্ণ বিলেপন মন কৈল আকর্ষণ নামে পুনঃ বশ কৈল মন।
এই যে নির্ম্মাল্য মালা পুন মন সম্মোহিলা তিন বস্তু পরম মোহন ॥

(২-৩)—'বর্হ' ও 'গুঞ্জা'

যথা—(ঐ গ্রন্থে, পৌর্ণমাসীর উক্তি)—

শিখি-পুচ্ছ দরশনে রাই কাঁপে ঘনে ঘনে গুঞ্জা দেখি করএ রোদন।
রাধার হৃদয়ে আসি কোন গ্রহ রৈল পশি বিরচিয়া অপূর্ব্ব নটন ॥

(৪)—'পর্ব্বত ধাতু'

যথা—(গোবর্দ্ধন গিরির গৈরিক দর্শনান্তর শ্রীমতীর উক্তি)—

এইত পর্ব্বত ধাতু কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ হেতু হইয়াছে বড়ই উজ্জ্বল।
কিবা শোভা অনুপাম হৃদয়ে বেড়ায় কাম দেখি আমি হৈলাম চঞ্চল॥

(৫)—'নৈচিকী' বা ধেনুগণ

যথা—(মাথুর—পদ্মার উক্তি)—

সন্ধ্যাকালে ধেনু সব পথে করে হাম্বারব তোমা বিনা হইয়া কাতরে।
তাহা শুনি চন্দ্রাবলী দুঃখের অনলে জ্বলি ছট্‌ফটি করয়ে অন্তরে॥

(৬)—'লগুড়ী'

যথা—(মাথুর—কোন গোপীর বিলাপোক্তি)—

যেই যষ্ঠি আলম্বনে কানু এই বৃন্দাবনে দাঁড়াইত ত্রিভঙ্গ হইয়া।
সে যষ্ঠি নয়নে হেরি দ্বিগুণ দুঃখেতে মরি স্মরানল দিল বাড়াইয়া॥*

(১২)—তদাশ্রিতা

তদাশ্রিতা 'পক্ষী', ভ্রমর', আর 'মৃগীগণ'।
'কুঞ্জলতা', 'তুলস্যা'দি হয় উদ্দীপন॥
'কর্ণিকার', কদম্বা'দি কৃষ্ণউদ্দীপন।
পূর্ব্ববৎ জান উদাকৃতি বিবরণ॥§

(উ)—তটস্থা

তটস্থ চন্দ্রের 'জ্যোৎস্না', 'মেঘ', 'বিদ্যুৎ'।
'বসন্ত', 'শরৎ', 'চন্দ্র', 'সুগন্ধি' মারুত'॥
'পক্ষী'আদিগণ হয় তটস্থ উদ্দীপন।
পূর্ব্ব জান উদাকৃতি বিবরণ॥†

—— o ——

* ৭ 'বেণু', ৮ শৃঙ্গ, ৯ প্রিয়তমের সহিত সন্দর্শন, ১০ ধেনুধূলি ও ১১ বৃন্দাবন—এই সকলের উদাহরণ অনূদিত হয় নাই।

§ এই সকল 'তদাশ্রিত'গণের উদাহরণগুলি অনূদিত হয় নাই।

† এই সকল 'তটস্থ উদ্দীপনের' উদাহরণগুলি অনূদিত হয় নাই।

একাদশ অধ্যায়

——:*:——

অনুভাব প্রকরণ

'অনুভাব'—ত্রিবিধ

'অনুভাব' হয় তাথে তিন প্রকার।
'অলঙ্কার', 'উদ্ভাস্বর', 'বাচিক' নাম আর।

(১)—অলঙ্কার

বিংশতি প্রকার

যৌবন সত্ত্বেতে হয় বিংশতি অলঙ্কার।
সদা কান্তে অভিনিবেশ, এই হেতু তার॥

(ক)—অঙ্গজ ত্রিবিধ

'ভাব', 'হাব', 'হেলা' তিন অলঙ্কারে হয়।
'অঙ্গজ' বলিয়া তারে কবিগণ কয়॥

(খ) অযত্নজ—সপ্তবিধ

আদৌ 'শোভা', 'কান্তি', আর 'দীপ্তি', 'মাধুর্য্য'।
'প্রগল্ভতা', 'ঔদার্য্য', সপ্তম হয় 'ধৈর্য্য'॥
এই সপ্তবিধ পুনঃ অলঙ্কার হয়।
'অযত্নজ' বলি তারে কবিগণ কয়॥

(গ)—স্বভাবজ—দশবিধ

'লীলা', 'বিলাস' আর, 'বিচ্ছিত্তি' 'বিভ্রম'।
'কিলকিঞ্চিত', 'মোট্টায়িত', 'কুট্টমিত' নাম॥

'বিব্বোক', 'ললিত', 'বিকৃত' নাম হয়।
এই দশ অলঙ্কার 'স্বভাবজ' কয়॥

(ক)—অঙ্গজ ত্রিবিধ

(১)—'ভাব'

প্রথম রতিতে হয় 'ভাব' নাম তার।
নির্ব্বিকারাত্মক চিত্তে প্রথম বিকার॥ *

যথা—(যূথেশ্বরীর প্রতি কোন সখী)—

কখন তোমার নয়ন কমল চঞ্চল নাহিক দেখি।
কানু বন মাঝে বিহার করিছে দেখিছ পশারি আঁখি॥
আজি ত নয়ান চঞ্চল হইঞা শ্রবণ নিকটে গেল।
যাহার শোভাতে শ্রুতির কুমুদ ইন্দীবর সম হল॥

(২)—'হাব'

ঈষৎ প্রকাশ ভাব, 'হাব' নাম ধরে।
গ্রীবা বক্র, ভুরু নেত্র বিকশিত করে॥

যথা—(শ্রীরাধার প্রতি শ্যামা বাক্য)—

'তোমার যুগল নেত্র হইয়াছে অর্দ্ধমুদ্র ভুরুলতা করিছে নর্ত্তন।
মনেতে জানিলাম আমি মাধব দেখেছ তুমি সেই হয় এত ভাবোদগম॥

(৩—'হেলা'

সেই 'হাব' ব্যক্ত হঞা শৃঙ্গার সূচয়।
তবে 'হেলা' বলি তারে কবিগণ কয়॥

যথা—(শ্রীরাধা প্রতি বিশাখা বাক্য)—

বেণু শুনি দুই স্তন স্ফূর্ত্তি করে অনুক্ষণ চঞ্চল তোমার দুনয়ন।
পুলকিত সব অঙ্গ স্বেদ জলের তরঙ্গ আর্দ্র হইল জঘন বসন॥
সখি, সম্মুখে ফিরিছে গুরুজন।

---

* মতান্তরে—বিকারের কারণ সত্ত্বে চিত্তের যে অবিকৃতি তাহাকে 'সত্ত্ব' বলে। ঐ সত্ত্বের যে আদ্যা বিকৃতি, তাহারই নাম 'ভাব'—বীজের আদি বিকৃতি যেমন অঙ্কুর—ইহা তদ্রূপ।

সম্বরিতে বলি আমি ; প্রমাদ না কর তুমি অভিসারের এই নহে ক্ষণ ॥

(খ)—অযত্নজ সপ্তবিধ

১—'শোভা'

রূপ ও সম্ভোগে হয় অঙ্গ বিভূষণ।
রস-শাস্ত্রে 'শোভা' বলি কহে কবিগণ ॥

যথা—(সুবল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্য)—

রত্নতুল্য অঙ্গুলে ধরি কদম্বের ডালে কুঞ্জ ছাড়ি বিশাখা আইল।
দুই আঁখি ঢুলু ঢুল এলায়া পড়েছে চুল সেইরূপ মনেতে রহিল ॥

২—'কান্তি'

সেই 'শোভা' যদি মন্মথ বৃদ্ধি করে।
রসশাস্ত্রে পুনঃ 'কান্তি' বলি নাম ধরে ॥

যথা—(ঐ)—

সহজে মধুর ধনি তাহাতে তরুণীমণি মদন বিকার পুনঃ তায়।
যেই মোরে দেখা দিল হৃদয়ে প্রবেশ কৈল যতনেহ নাহি বাহিরায় ॥

৩—'দীপ্তি'

বয়ো, দেশ, কাল, গুণে 'কান্তির' বিস্তার।
অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হলে "দীপ্তি" নাম তার ॥

যথা—(সখী প্রতি রূপমঞ্জরী বাক্য)—

চান্দের কিরণ মালা বিপিন করেছে আলা সুগন্ধি পবন বহে মন্দ।
রাই অঙ্গ ঝলমল দূরে গেছে শ্রম জল অতিশয় শোভে মুখচন্দ্র ॥
দেখ রাই, নিকুঞ্জ ভিতরে।
অলস তরঙ্গ অঙ্গে বসি আছে শ্যাম অঙ্কে সৌন্দর্য্যে কানুর মন হরে ॥

৪—'মাধুর্য্য'

সর্ব্ব অবস্থাতে যে চেষ্টার চারুতা।
রস-শাস্ত্রে হয় ত 'মাধুর্য্য' বলি প্রথা ॥

যথা—(সখী প্রতি রতিমঞ্জরী)—

দক্ষিণ কর হরি কন্ধে আর ভুজ শ্রোণীবন্ধে দুই পদ ছন্দ প্রায় দেখি।
অল্প মুখ নত করি রাসারম্ভে ফিরি ফিরি কিবা শোভা করে শশীমুখী ॥

৫—'প্রগল্ভতা'

প্রয়োগে ছাড়িয়া শঙ্কা হয় যে উদ্ধতা।
বুধগণ তাহারেই কহে 'প্রগল্ভতা' ॥

যথা—('বিদগ্ধ মাধব' গ্রন্থে বৃন্দার উক্তি)—

প্রাতিকূল্য করি যেন রাধা করে নখার্পণ দন্তে দংশে কৃষ্ণের অধরে।
দেখিয়া রাধারে তথা রতি রণে প্রবীণতা দেখি কৃষ্ণ আনন্দ অন্তরে ॥

৬—'ঔদার্য্য'

সর্ব্ব অবস্থাতে যেই করএ বিনয়।
'ঔদার্য্য' বলিয়া তারে রসশাস্ত্রে কয় ॥

যথা—('বিদগ্ধ মাধব' গ্রন্থে মধুমঙ্গল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্য)—

সরল নয়ন গতি বদনে করয়ে স্তুতি দেখি করে সম্ভ্রম অপার।
তাথে করি অনুমান হৃদয়ে রাধার মান বিদগ্ধের এই ব্যবহার ॥

৭—'ধৈর্য্য'

চিত্তের উন্নতি যেই স্থিরতর হয়।
'ধৈর্য্য' বলিয়া তারে কবিগণ কয় ॥

যথা—('ললিতমাধব' গ্রন্থে নববৃন্দা প্রতি শ্রীরাধা বাক্য)—

কঠিন অন্তর করি আমারে ছাড়িল হরি আনন্দ করুন বহুতরে।
আমি তার সেই প্রেমে না ছাড়িব জন্মে জন্মে এই আশা মোর মন করে ॥

স্বভাবজ দশবিধ

১—লীলা

রম্য বেশাদি প্রিয়ের সদৃশ করণ।
রসশাস্ত্রে 'লীলা' বলি কহে কবিগণ ॥

যথা—(সখী প্রতি রতিমঞ্জরী)—

মৃগমদ লেপি অঙ্গে • পীত বস্ত্র পরি রঙ্গে কেশে করি চূড়ার নির্ম্মাণ।
রাধা কৃষ্ণরূপ ধরি করেতে মুরলী করি করে অতি সুমধুর গান॥

২—'বিলাস'

গমন, স্থিতি, আসন, বদন, নয়ন।
ইহাদের কর্ম্মের বৈশিষ্ট্য দরশন॥
• প্রিয় সঙ্গে তাৎকালিক যাথে ইহা হয়।
'বিলাস' বলিয়া রসশাস্ত্র মতে কয়॥

যথা—(শ্রীরাধা প্রতি বীরা)—

নাগরে দেখিয়া নাসার মুকুতা মাজিছ করিয়া ছল।
মুখে মৃদু হাসি ছাপায়া রেখেছ ইহাতে কি আছে ফল॥
সখি, দূরেতে চাতুরী রাখ।
তোর হাসিলবে ত্রিভুবন সবে ঝলমল করে দেখ॥

৩—'বিচ্ছিত্তি'

অল্প বিভূষণে যার বড় কান্তি হয়।
'বিচ্ছিত্তি' বলিয়া তারে রসশাস্ত্রে কয়॥

যথা —(নান্দীমুখী প্রতি বৃন্দা)—

একটি মাকন্দ পত্র পরিয়াছ কানে। তাহাতে পরম শোভা রাধার বদনে॥
রক্তবর্ণ সেই পত্র হৈল আভরণ। তাহাতেই বশ কৈল গোবিন্দের মন॥

যে নায়িকা প্রিয়ার অপরাধ দরশনে।
মান করি ঘুচায় অঙ্গের আভরণে॥
সখীর যতনে নাহি পরে পুনর্ব্বার।
কেহ কেহ কহে 'বিচ্ছিত্তি' নাম তার॥

যথা—(বিশাখা প্রতি শ্রীরাধা)—

কেন দুষ্ট টাড় লয়া তাথে দৃঢ় মুদ্রা দিয়া পুন পরাইলে মোর হাথে।
দৃঢ় গ্রন্থি দিয়া পুনঃ হার পরাইলে কেন দূর করি ফেলহ তুরিতে॥

কৃষ্ণ ভুজঙ্গের বিষে সব অলঙ্কার দোষে আমি তাহা কেমনে ধরিব।
আভরণ সঙ্গে আসি বিষ মোর অঙ্গে পশি অচিরাতে পরাণে মরিব ॥

৪—'বিভ্রম'

নায়িকা কান্তের কাছে তুরিতে যাইতে।
মদন প্রভাব হেতু ত্বয় হয় চিতে ॥
অঙ্গে বিপর্য্যয় করি পরে আভরণ।
'বিভ্রম' বলিয়া তারে কহে কবিগণ ॥*

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্রীরাধা)—

আমার কবরী বান্ধিতে তোমারে কে সেধেছে বার বার।
গলিত চিকুরে মোর বড় সুখ তুমি কেন বান্ধ আর ॥
কেন বা আমার বদন মাজিয়া দূর কর শ্রমজল।
ঘরম হইলে মোর বড় সুখ তনুতে বাড়য়ে বল ॥
কেশের উপরে মালতি না দেহ আমারে লাগয়ে ভার।
অঙ্গ আভরণ না পরাহ পুনঃ মানা করি বার বার ॥

৫—'কিলকিঞ্চিত'

হর্ষহেতু গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন।
স্মিত অসূয়া, ভয়, ক্রোধ একত্র মিলন ॥
'কিলকিঞ্চিত' নাম সেই অলঙ্কার।
অলঙ্কার মধ্যে ইহা বড় চমৎকার ॥ †

যথা—

কৃষ্ণ ঘাটে দানী হলা পথে রাধায় আগলিলা দেখি রাধা মৃদু মৃদু হাসে।
উজ্জ্বল নয়নে চায় বিন্দু বিন্দু জল তায় কিঞ্চিত রঞ্জিলা কোপাভাষে ॥

---

* কৌটিল্য বা বামতার আতিশয্য হেতু সেবাতৎপর কান্তের প্রতি যে অনভিনন্দন অর্থাৎ তাহার প্রতি আদর-বিমুখতা—কেহ কেহ তাহাকেই 'বিভ্রম' কহে। এই ভাবেরই উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

† অঙ্গ স্পর্শাদি ব্যতীত, বস্ত্র রোধনাদিতেও 'কিলকিঞ্চিত' সম্ভাবিত হয়। এই ভাবেই উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে—হাস্য, রোদন, ক্রোধ, রসিকতার উৎসিক্ত নিমিত্ত অভিলাষ, কুঙ্কন হেতু ভয়, কুটিল ও উত্তর নিমিত্ত গর্ব্ব ও অসূয়া—এই সপ্তভাব যুগপৎ প্রকটিত হইয়াছে।

রাধার যে রসিকতা	তাথে দৃষ্টি সুবাসিতা	অগ্র কিছু হইল কুঞ্চন।
কুটিল তারার গতি	তাহে দৃষ্টি শোভা অতি	দেখি কৃষ্ণ হরষিত মন॥

৬—'মোট্টায়িত'

কান্তের স্মরণ, বার্ত্তাতে প্রকট অভিলাষ।
'মোট্টায়িত' বলি রস-শাস্ত্রেতে প্রকাশ॥

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বৃন্দা ,—

সখীগণ বারে বারে	জিজ্ঞাসা করিল তারে,	কেন এত দুঃখ তোর মনে।
পালি উত্তর নাহি দিল	সখীগণ যুক্তি কৈল	তুয়া বার্ত্তা কহে সেই স্থানে॥
শুনিয়া পাইল সুখ,	প্রফুল্ল হইল মুখ	পুলকে পুরিল সব অঙ্গ।
সখীরা চতুর বড়	অনুমানে কৈল দৃঢ়	জানিতে তোমার এই রঙ্গ॥

৭—'কুট্টমিত'

পতি আসি করে স্তনাধরাদি গ্রহণ।
মনে প্রীত, বাহ্যে ক্রোধে করে নিবারণ॥

যথা—

কি কর, কি কর	দূরে নেহ কর	কবরী গলিত হল
কিবা উপহাস	ছাড় মোর বাস	নীবির বসন গেল॥
চঞ্চল না হয়া	ছাড়ি দেহ মোরে	তোমার চরণে পড়ি।
যাহ নিরদয়	নিবারণ হয়া	খানিক শয়ন করি॥

৮—'বিব্বোক'

ইচ্ছিত বস্তুতে যেই 'গর্ব্ব' 'মান' ভরে।
অনাদর করয়ে 'বিব্বোক' বলি তারে॥

গর্ব্ব-হেতু 'বিব্বোক', যথা—(বকুলমালাকে লক্ষ্য করিয়া পুষ্পচয়নরতা রূপমঞ্জরী বাক্য)—

অনেক বিনয় করি	বনমালা দিল হরি	নৈল শ্যামা হস্ত প্রসারিয়া
মনের প্রিয়তম মালা	তথাপি করিঞা হেলা	ফেলি দিল বিপক্ষ দেখাঞা॥

মান-হেতু বিব্বোক যথা—(কলহান্তরিতা গৌরীর প্রতি সখী-বাক্য)—

বিনয় করিল হরি, তারে তুমি মান করি আসিতে না দিলে এই স্থানে।
যে শুক পড়িতে পারে গোবিন্দের নাম করে তারে তুমি পড়াইছ কেনে ॥

৯—'ললিত'

ভঙ্গি রঙ্গি মনোহর ভুরুর বিলাস।
'ললিত' বলিয়া রস-শাস্ত্রে পরকাশ ॥

যথা— (দূরে শ্রীরাধাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাক্য)—

বৃন্দাবনে লতা যত ফুলে ফলে বিকশিত ভ্রূভঙ্গিতে তার পানে চায়।
ও পদ পঙ্কজ রাজে চলি যায় বনমাঝে অঙ্গ-গন্ধে মধুকর ধায়।
মুখপদ্মে অলি ধায় করপদ্মে বারে তায় এই মত বনে চলি যায়।
যেন বৃন্দাবন দ্যুতি হয়া স্বয়ং মূর্ত্তিমতী তরুলতা দেখিয়া বেড়ায় ॥

১০—'বিকৃত'

লজ্জা, মান, ঈর্ষ্যাদি না বলে মনের কথা।
চেষ্টায় ব্যক্ত হয় তার 'বিকৃত' হয় প্রথা ॥

(অ) 'লজ্জা' হেতু বিকৃতি

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি সুবল)—

তোমার যাচন বাণী মোর মুখে শুনি ধ্বনি বাক্য অভিনন্দন না কৈল
অঙ্গেতে পুলকসারি দেখা দিল থরি থরি অনুমতি তাহাতে জানিল ॥

(আ) 'মান' হেতু বিকৃতি

যথা—(উদ্ধব প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

কি কর কুটিল প্রেমা মান কৈল সত্যভামা হেনকালে চান্দের গ্রহণ।
আমি ত আসক্ত চিতে তারে গেলাম প্রসাদিতে চন্দ্রগ্রহ হৈয়া বিস্মরণ ॥
আমার বিনয় শুনি এক ইন্দ্র নীলমণি নিজ মুখ-চন্দ্রেতে ধরিল।
চন্দ্রগ্রহ নিরখিয়া স্নান দান কর গিয়া ইহা ছলে মনে পড়াইল ॥

(ই)—'ঈর্ষ্যা' হেতু বিকৃতি

যথা—(সুবল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

হেদে রাধে তস্করি মুরলী লয়াছ হরি সে মুরলী দেহত আমার।
ইহা শুনি ঈর্ষ্যা করি কুটিল নয়ানে ফিরি আমারে দেখিল বারে বার ॥

অঙ্গে চিত্তে অলঙ্কার বিংশ প্রকার।
যথাযোগ্য কৃষ্ণেতে আনিহ অলঙ্কার ॥
অন্য অলঙ্কার পুন কহে কবিগণ।
ভরতের অসম্মত, না কৈল বর্ণন ॥
তাহার মধ্যেতে দুই করিব বর্ণন।
'মৌগ্ধ্য', 'চকিত' কিছু মাধুর্য্য পোষণ॥

(ঈ)—'মৌগ্ধ্য'

জ্ঞাত বস্তু প্রিয় আগে করে জিজ্ঞাসন।
অজ্ঞাতের প্রায়, 'মৌগ্ধ্যের' এই ত লক্ষণ ॥

যথা—(কৃষ্ণ প্রতি সত্যভামা—'মুক্তাচরিত' গ্রন্থে)—

কেমন বা সেই লতা তার জন্ম হৈল কোথা কেবা তারে কৈল আরোপণ।
তুমি জান সে সকল যার এই মুক্তাফল তাথে মোর ঘটিত কঙ্কণ ॥

(উ)—'চকিত'

ভয়-হেতু না থাকিলে যেই হয় ভয়।
'চকিত' বলিয়া তারে রস-শাস্ত্রে কয় ॥

যথা—

ওহে কৃষ্ণ রক্ষা কর এই দুষ্ট মধুকর উড়ি বৈসে আমার বদনে।
এই বাক্য কহি রাধা জেন প্রকাশিল বাধা আলিঙ্গয়ে ব্রজেন্দ্র নন্দনে ॥

২—উদ্ভাস্বর

স্বস্থানে রহিয়া যেই করে উদ্ভাসন।
'উদ্ভাস্বর' বলি তারে কহে কবিগণ ॥ *

---

* "ভাববিশিষ্টজনের দেহে যাহা যাহা প্রকাশ পায়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই 'উদ্ভাস্বর' কহে।

উদ্ভাস্বরের ক্রিয়া

'নীবী' খসি পড়ে, খসে 'উত্তরী' বসন।
'কবরী এলায়ে' যায়, গাত্রের 'মোটন'॥
'হাই তুলে', নাসিকার 'প্রফুল্লতা' হয়।
'নিশ্বাসাদি'—'উদ্ভাস্বর', রসশাস্ত্রে কয়॥

(ক)—নীবী স্রংসন

যথা—(শ্রীরাধা প্রতি বৃন্দা—'বিদগ্ধমাধবে')—

তোমার যে দুনয়ন অশ্রুজলে নিরঞ্জন কুচ দুই নহে আর রাগী।
স্ফুরে তোমার বক্ষস্থল হবে তার মঙ্গল অচিরে হইবে কৃষ্ণ ভোগী॥
সব্বাকার ধর্ম্মে মন তাহা করি দরশন নীবী বলে আমি মোক্ষ হব।
সাক্ষাত কৃষ্ণের কাছে মোক্ষ হবে অনায়াসে তাহা আজি কেবা নিবারিব॥

(খ)—উত্তরীয় স্রংসন

যথা—(শ্রীমতী প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

তুয়া হৃদি যত রাগ বস্ত্রে তার একভাগ ইহা মোরে স্পষ্ট দেখাইতে।
তোমার হৃদয় বস্ত্র ভূমিতে পড়িল ব্যস্ত যতন না কর আচ্ছাদিতে॥

(গ)—ধম্মিল্ল স্রংসন

যথা—(শ্রীমতী প্রতি বৃন্দা)—

সম্মুখে দাঁড়াঞা হেথা দুরাত্মার মুক্তি দাতা স্বয়ং কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন
তাথে কি যে অদভুত তোর কেশ নিয়মিত দৃষ্টি মাত্র পাইল মোক্ষণ॥

(ঘ)—গাত্র মোটন

যথা—(বৃন্দা প্রতি নান্দীমুখী)—

কানুক নিকটে খঞ্জন-নয়নি। মোড়ই অঙ্গ বিকশিত বয়নি॥
ভাঙ্গই অঙ্গ বলিত বড় অলসে। অনঙ্গ তরঙ্গ বিস্তারিল রভসে॥

(ঙ)—জৃম্ভা

যথা—(চন্দ্রাবলী প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

তোরে ফুলশর বশ করই না পার। ফাঁফর হোয়ল মধুসূদন নার॥

জ্রূগুণ-বাণ ছোড়ল তুয়া দেহে। কয়ল আপন বশ তোহে অব তাহে॥
পুন পুন জ্রূতুই বদন তোমার। তাহে অনুমান কয়লু হাম সার॥

(চ)—ঘ্রাণের প্রফুল্লতা

যথা—(সুবল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

নাসার নিশ্বাসে বেশর দুলিল দুই পুট বিকশিত।
এমন নাসার বিলাস করিঞা হরি হরি নিল চিত॥

'মোট্টায়িত', 'বিলাসের' এ সব বিশেষ।
শোভার বিশেষ্ হেতু পৃথক্ নির্দেষ॥

(৩)—বাচিক

দ্বাদশবিধ

'আলাপ', 'বিলাপ', হয় আর ত 'সংলাপ'।
'প্রলাপ', আর 'অনুলাপ', আর 'অপলাপ'॥
'সন্দেশ', 'অতিদেশ' হয়, আর 'অপদেশ'।
'উপদেশ', 'নির্দেশ' হয়, আর 'ব্যপদেশ'॥
বাচিকের এইত দ্বাদশ ভেদ কয়।

(১)—আলাপ

চাটুপ্রিয় উক্তির 'আলাপ' নাম হয়॥

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ব্রজদেবীগণ)—

হেন কে রমণীমণি তোমার মুরলী শুনি নাহি ছাড়ে কুলধর্ম্ম ভয়।
তুয়া রূপ মনোরম ত্রিজগতে অনুপম ইহা দেখি কেবা ঘরে রয়॥
ওহে নাথ, তুমি না করিহ উপেক্ষণ।
তোমার এই রূপ দেখি বুঝে সবে পশুপাখী পুলকিত হয় তরুগণ॥

(২)—বিলাপ

দুঃখদ বাণীর নাম হয়ত 'বিলাপ'।

যথা—(উদ্ধবযানে গোপীগণের উক্তি)—

প্রত্যাশা পরম দুঃখ নৈরাশ্য পরম সুখ এই বাক্য কয়াছে পিঙ্গলা।
তথাপি কৃষ্ণের আশ কভু নাহি হয় নাশ এই মোর মনে বড় জ্বালা॥

(৩)—সংলাপ

উক্তি প্রত্যুক্তি বাক্যের আখ্যান 'সংলাপ'॥

যথা—

কো ইহ তোড়ই সঘন কবাট। এ ধনি জানবি মাধব নাট॥
অসময়ে আওব কাহে বসন্ত। নহি নহি কাল ফিরই তনুমন্ত॥
এ ধনি হাম মধুসূদন নাম। বাহিরে রহ শিব তোহে পরণাম॥
ছোড়হ চাতুরী চক্রী মঝু নাম। এ সখি, ভুজগ আওল মঝু ধাম॥

(৪)—প্রলাপ

ব্যর্থ আলাপের নাম হয়ত 'প্রলাপ'॥

যথা—(কৃষ্ণ প্রতি মধুপানে উন্মত্তা শ্রীরাধা)—

মুরলী রলী রলী শ্রবণে বনে বনে হৃদয় মথন মথন।
ললিতা লিতা লিতা কাতর তর তর দিয়াছে মন মন মন॥*

(৫)—অনুলাপ

বারবার উক্তির নাম হয় 'অনুলাপ'।

যথা—(ললিতা প্রতি শ্রীরাধা)—

নেত্রে নেত্রে নহি নহি পদ্মদ্বন্দ্ব গুঞ্জা গুঞ্জা নহি নহি বন্ধুকালী।
বেণু বেণু নহি নহি ভৃঙ্গঘোষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নহি নহি তপিঞ্ছা, আলি॥

(৬)—অপলাপ

পূর্ব্বোক্ত বাক্যের অন্য অর্থ আরোপণ।
'অপলাপ' বলি তারে কহে কবিগণ॥

---

* এই কবিতায়—'রলী' 'রলী', 'বনে বনে', 'লিতা লিতা', 'তর তর' ইত্যাদি ব্যর্থ শব্দ।

যথা—(বিশাখা প্রতি কলহান্তরিতা শ্রীরাধা)—

উজরোল বনমাল শোভা হইয়াছে। সো মাধবে অব মঝু মন যাছে।
সখী কহে তুরিতে মিলায়ব শ্যাম। রাই কহে ঋতুবর কাম ইহা নাম॥

(৭)—সন্দেশ

প্রবাসে কান্তেরে নিজ বাচিক পাঠায়।
'সন্দেশ' বলিয়া তারে রসশাস্ত্র কয়॥

যথা— (কোন পান্থ প্রতি পদ্মা)—

হেদে হে পথিক তুমি শুন একু মোর বাণী কৃষ্ণে বল আমার প্রহেলী।
দিনে দিনে ক্ষীণ হয়া কুহূতে অদৃষ্ট হয়া কাঁহা লয় হয় চন্দ্রাবলী॥

(৮)—অতিদেশ

তার কথা যেই, সেই মোর মুখে রয়।
এই প্রকার 'অতিদেশ' কবিগণ কয়॥

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ললিতা)—

যে কথা কহিলাম আমি সন্দেহ না কর তুমি এই বাক্য রাধিকার হয়।
আমি যন্ত্র তেতন্ত্রী রাধা তাথে হয় যন্ত্রী ইহাতে নাহিক বিপর্য্যয়॥

(৯)—অপদেশ

অন্য উপদেশ-বাক্য হয় 'অপদেশ'।

যথা—(পৌর্ণমাসী প্রতি নান্দীমুখী)—

দাড়িম তরু উজ্জ্বল ধরিয়াছে দুই ফল তাথে রেখা আছে বহুতর।
দুই পুষ্প বিকশিত তাহাতে করেছে ক্ষত বড়ই নিঠুর মধুকর॥
শ্যামা শুনি সখীর বচন।
চমকিত হয়া ধনী অধরে ধরিল পাণি বসনে আচ্ছাদে দুই স্তন॥

(১০)—উপদেশ

শিক্ষা রূপ বাক্য হলে হয় 'উপদেশ'॥

যথা—(মানিনী শ্রীরাধা প্রতি তুঙ্গবিদ্যা)—

যৌবন সে চঞ্চল সদা করে টলমল বড়ই দুষ্প্রাপ্য বনমালি।
তুরিতে চলহ বনে দেখা হবে হরি সনে মনের আনন্দে কর কেলি॥

(১১)—নির্দ্দেশ

সেই আমি—এই প্রকার হয়ত 'নির্দ্দেশ'।

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বিশাখা)—

সেই রাধা বিধুমুখী সেই এই ললিতা সখী সেই আমি বিশাখা সুন্দরী।
মোরা তিন সখী মিলি গহনে কুসুম তুলি এথা কেন এলে তুমি হরি॥

(১২)—ব্যপদেশ

ছলে অভিলাষ উক্তি হয় 'ব্যপদেশ'॥

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশ করিয়া মালতীর কোন সখীর উক্তি)—

নূতন পল্লবে হলো বিকশিত মালতি গহন বনে।
তুম্বীর চুম্বনে ভ্রমর রসিক ইহার কি সব জানে॥

'বাচিক'-অনুভাব যে সম্ভবে সর্ব্ব রসে।
কিন্তু শৃঙ্গারে বড় মাধুর্য্য প্রকাশে॥
অতএব অন্য রসে নাহি বিবরণ।
বিস্তার করিয়া এথা করিল বর্ণন॥

দ্বাদশ অধ্যায়

সাত্ত্বিকভাব প্রকরণ *

১—স্তম্ভ

(ক)– হর্ষ হেতু 'স্তম্ভ'

যথা—(মধুমঙ্গল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

পদক সেচন করি বহে তাথে শ্রমবারি দেহের স্পন্দন নাহি আর।
কুট্মলিত দুনয়ন চিত্রের পুতলী যেন রাধার স্তম্ভ হৈল সাক্ষাতকার॥

(খ)—ভয় হেতু 'স্তম্ভ'

যথা—(পৌর্ণমাসী প্রতি নান্দীমুখী)—

মেঘের গর্জ্জন শুনি চকিত হইঞা। কৃষ্ণে আলিঙ্গিল রাধা নিশ্চল হইলা॥

(গ)—আশ্চর্য্য হেতু 'স্তম্ভ'

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি মধুমঙ্গল)—

তোমার মাধুরী ধাম ত্রিগজতে অনুপাম তাহা আজি রাধিকা দেখিয়া।
মনে হৈল চমৎকার নিমেষ নাহিক আর স্তব্ধ হয়া আছে দাঁড়াইয়া॥

(ঘ)—বিষাদ হেতু 'স্তম্ভ'

যথা—(চিত্রার সখীর উক্তি)—

কৃষ্ণের বিলম্ব দেখি অন্তরে হইয়া সুখী বসি রহে সঙ্কেত সদনে।
মনে হৈল বিপ্রলম্ভ শরীরে হইল স্তম্ভ দেখিয়া ভাবয়ে সখীগণে॥

(ঙ)—অমর্ষ বা ক্রোধ হেতু 'স্তম্ভ'

যথা—(শ্রীমতীর প্রতি শ্যামলার সখী)—

কৃষ্ণের স্খলিত কথা শুনিয়া শ্যামলা। নিমেষ নাহিক আর, হলো অচঞ্চলা॥

---

* 'ভক্তি রসামৃত সিন্ধু' গ্রন্থের দক্ষিণ বিভাগের তৃতীয় লহরীতে সাত্ত্বিক ভাব বিবৃত হইয়াছে। সাক্ষাৎ কিম্বা পরম্পরায় কৃষ্ণ-সম্বন্ধে ভাব দ্বারা আক্রান্ত-চিত্তকে রসশাস্ত্রে 'সত্ত্ব' কহে এবং ইহা হইতে উৎপন্ন ভাবের নাম 'সাত্ত্বিক ভাব।'

২—স্বেদ

(ক)—হর্ষ হেতু 'স্বেদ'

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ললিতার উক্তি)—

রাধিকার দেহলতা চন্দ্রকান্ত বিরচিতা বুঝিলাম তাহার অন্তর।
চন্দ্রের উদয় হেরি তারা রহে নৃত্য করি স্বেদছলে গলে কলেবর॥

(খ)—ভয় হেতু 'স্বেদ'

যথা—(বিশাখা প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

ভয় ছাড় কলাবতী দূরেতে তোমার পতি এই বন নিবিড় গহন।
অনেক যতন করি দিলাম অলকা সারি ঘর্ম্ম জলে হয় বিনাশন॥

(গ)—ক্রোধ হেতু 'স্বেদ'

যথা—(পৌর্ণমাসী প্রতি নান্দীমুখী)—

কৃষ্ণের স্খলিত শুনি মনে ক্রোধ কৈল ধনি লজ্জা করি কিছু না কহিল।
স্বেদজল পড়ে গায় বসন ভিজিল তায় মনের ক্রোধ তাহাতে জানিল॥

(৩)—রোমাঞ্চ

(ক)—আশ্চর্য্য দর্শন হেতু 'রোমাঞ্চ'

যথা—(গার্গী প্রতি পৌর্ণমাসী)—

যত যত গোপনারী একত্র সবার হরি আসি করে বদন চুম্বন।
স্বর্গে যত দেব নারী হেন কৃষ্ণ লীলা হেরি নাচাইল নিজ রোমগণ॥

(খ)—হর্ষ হেতু 'রোমাঞ্চ'

যথা—(শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ৩২।৭)—

নেত্র পথে দেখি কৃষ্ণ হৃদয়ে করিল সর্ব্বাঙ্গ পুলক ব্যাপ্ত স্তম্ভিত হইল॥

(গ)—ভয় হেতু 'রোমাঞ্চ'

যথা—(পালী সখীর উক্তি)—

পাইয়া অঙ্গের গন্ধ আইলা ভ্রমর বৃন্দ দেখি পালী কম্পিত হইল।
অঙ্গ হইল পুলকিত মন হৈল চমকিত ব্যস্ত হঞা কৃষ্ণেরে ধরিল॥

(৪)—স্বর ভেদ

(ক)—বিষাদ হেতু 'স্বরভেদ'

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বাসকসজ্জা শ্রীমতীর সখী)—

তোমার বিরহে রাধার মদন বিকার। কণ্ঠেতে ব্যাকুল হয় বর্ণের উচ্চার॥

(খ)—বিস্ময় হেতু 'স্বরভেদ'

যথা—(ললিতা প্রতি শ্রীরাধা)—

মুরলীর ধ্বনি শুনি মোর নাহি হয় বাণী দেখাইলাম করের ইঙ্গিতে।
দেখ সেই ধ্বনি শুনি লতা সব পুলকিনী মধুস্বেদ পড়িছে তাহাতে॥

(গ-ঙ)—অমর্ষ, হর্ষ, ও ভয় হেতু স্বরভেদ

'অমর্ষ', 'হর্ষ', 'ভয়ে' স্বর ভেদ এই মত।
পদ্যমত উদাকৃতি কর অনুগত॥

(৫)—বেপথু

ত্রাসে, হর্ষে, অমর্ষে 'বেপথু' উৎপত্তি।
দিক্ দরশন দিএ এক উদাকৃতি॥

'ত্রাস' হেতু কম্প

যথা—(শ্রীরাধা প্রতি বিশাখা)—

নাগর হোয়ল যুবতী আকার। মূঢ়মতি তুয়া পতি কি করু আর॥
কাহে তুহু কম্পসি কদলী সমান। দূর কর ত্রাস ধৈরজ ধরু প্রাণ॥

(৬)—বৈবর্ণ্য

বিষাদ, রোষ, ভয়ে হয় 'বৈবর্ণ্য' উৎপত্তি।
পূর্ববৎ দিএ তাথে এক উদাকৃতি॥

বিষাদ হেতু বৈবর্ণ্য

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্রীরাধার সখী)—

মুখের মাধুরী দেখি কুঙ্কুম হইত দুঃখী সেই মুখ শুক্লবর্ণ হলো।

(৭)—অশ্রু

হর্ষ, রোষ, বিষাদে হয় 'অশ্রু' নয়ন।
পূর্ব্ববৎ করি তার দিক্ দরশন ॥

হর্ষ হেতু অশ্রু

যথা—(শ্রীগীতগোবিন্দে)—

রাধার নয়ান শ্রবণ নিকটে যাইতে প্রয়াস করে।
বহু দূর পথ চলিয়া যাইতে শ্রম হলো কলেবরে ॥
সেই শ্রমে বারি অশ্রু ছল করি পড়িছে ধরণী তলে।
নিকুঞ্জ ভবনে নাগরের সনে দেখা হল্য যেই কালে ॥

(৮)—প্রলয় বা নিশ্চেষ্টতা

সুখ দুঃখ 'প্রলয়ের' হয়ত উৎপত্তি।
পূর্ব্ববৎ দিএ তাথে এক উদাকৃতি ॥

সুখ নিমিত্ত প্রলয়

যথা—(বিশাখার প্রতি ললিতার উক্তি)—

জানু দুই স্থির দেখি স্পন্দন রহিত আঁখি শব্দ নাহি শুনি যে কণ্ঠেতে।
নাসায় নিশ্বাস শূন্য সমাধি ধরার মনঃ দেখি রাধা নিজ প্রাণনাথে ॥

(৯)—ধূমায়িতা*

যথা—(বিমানচারিণী দেবী প্রতি সিদ্ধ-বণিতা বাক্য)—

শুন ওগো সুরাঙ্গনে মথুরার অঙ্গনে দেখিয়াছ পুরাণপুরুষ।
তোমার নেত্রে অশ্রুজল পুলকিত গণ্ডস্থল হইয়াছে মদনের বশ ॥

---

* পূর্ব্বোল্লিখিত ভাবনিচয় এক বা দুইয়ের সহিত মিশ্রিত হইয়া ঈষৎভাবে প্রকাশিত হইলে, যদি তাহা গোপন করিবার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে ঐ ভাবকে 'ধূমায়িত' বলে। 'অদ্বিতীয়া অমীভাবা অথবা সদ্বিতীয়কাঃ। ঈষদ্ব্যক্তা

(১০)—জ্বলিতা*

যথা—(ধন্যার প্রতি সখী)—

জানু দুই অচঞ্চল নেত্রে বহে অশ্রুজল রোমগণ করিছে নর্ত্তন।
বুঝিলাম নীলবর্ণ অপূর্ব্ব পুরুষ রত্ন পাইছ তুমি যে দর্শন॥

(১১)—দীপ্তা†

যথা—(শ্রীরাধা প্রতি বিশাখা)—

তোমার যে অশ্রুজল ভিজাইল ক্ষিতিতল নিশ্বাসে নাচিছে অঙ্গবাস।
পুলকে দন্তুর অঙ্গ বুঝি কৃষ্ণ লীলারঙ্গ তোমার শ্রুতিপুটে কৈল বাস॥

(১২)—উদ্দীপ্তা§

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ললিতা দশাবর্ণনচ্ছলে উদ্ধব)—

নেত্রজলে কৈল স্নান স্বেদবিন্দু মুক্তাদাম রোমাঞ্চতে অঙ্গ ঢাকা গেল।
গণ্ড হলো পাণ্ডুবর্ণ কণ্ঠে গদ্‌গদ্ বর্ণ এতভাবে রাধিকা ভাসিল॥
দেখ দেখ, রাধার ভাবচয়।
উঠি সব ভাবগণ লজ্জা কৈল নিবারণ কৈল সজ্জা স্তম্ভের আশ্রয়॥

(১২)—সুদ্দীপ্তা

উদ্দীপ্তির বিশেষ 'সূদ্দীপ্তা' নাম হয়।
সাত্ত্বিকের উৎকৃষ্টতা বড় তাথে রয়॥

---

* দুই বা তিনভাব এককালীন প্রকট দশা প্রাপ্ত হইলে, তাহা যদি কষ্টে গোপ্য হয়, তাহা হইলে উহা 'জ্বলিতা' নামে অভিহিত নয়।

† তিন চারি বা পাঁচটি প্রৌঢ়ভাব যুগপৎ উদয় হইলে, যদি তাহা সম্বরণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'দীপ্তা' কহে।

§ পাঁচ, ছয় অথবা সমস্ত ভাব যদি এককালে যুগপৎ উদিত হইয়া প্রেমের পরমোৎকর্ষার আরূঢ় হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'উদ্দীপ্তা' কহে।

যথা—

পড়ে রাধার স্বেদবারী তাহা পিয়ে ধেনু সারি তাহাদের তৃষ্ণা দূরে গেল।
মুকুলিত লোম সারি দেখি কোকিলের নারী তাথে মন লুব্ধ হইল ॥
তোমার মুরলী শুনি স্তম্ভিত হইলা ধনি শুক্লবর্ণ সব অঙ্গ হল।
সরস্বতীর প্রতিকৃতি সেই ভ্রমে মূঢ়মতি বিদ্যার্থিরা নিকটে আইল ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্যভিচারী ভাব প্রকরণ

—:*:—

১। ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রকার ব্যভিচারী ভাব*

ব্যভিচারী নির্ব্বেদাদি তেত্রিশ প্রকার।
উগ্রতা আলস্য বিনা সবারি প্রচার ॥
ঔগ্র্যালস্য দুই ভাবের শৃঙ্গারে না হয়।
ইহা পুনঃ ব্যভিচারী সখীর প্রণয় ॥
মরণাদি ইহা পুনঃ সাক্ষাত অঙ্গ নয়।
কিন্তু গৌণরূপে তার পরচার হয় ॥

১—নির্ব্বেদ বা আত্মধিক্কার

মহার্ত্তি, বিয়োগ, ঈর্ষা'য় 'নির্ব্বেদ' উৎপত্তি।
দিগ্ দরশন দিএ এক উদাকৃতি ॥

সুমহৎ আর্ত্তি হেতু নির্ব্বেদ, যথা—(শ্রীরাধা বাক্য)—

যাহার সঙ্গম আশে লজ্জা ধর্ম্ম কৈনু নাশে দুঃখ দিলাম প্রিয়সখীগণে।
সে হরি ছাড়য়ে মোরে প্রাণ রাখি কার তরে ধিক্ রহু আমার জীবনে ॥†

---

* ব্যভিচারী ভাব—'বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি ॥ বাগঙ্গ সত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ ॥ ('ভক্তিরসামৃত সিন্ধু'—দক্ষিণ বিভাগ—৪র্থ লহরী)। অর্থাৎ বিশেষরূপে এবং অভিমুখতায় স্থায়ীভাবে বিচরণ করে বলিয়া ইহাদিগকে 'ব্যভিচারী' কহা যায়। ভাব, বাণী, অঙ্গ (ভ্রূনেত্রাদি) এবং সত্ত্ব (সত্ত্বোৎপন্ন অনুভাব) দ্বারা যাহা বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে, তাহাকে "ব্যভিচারী ভাব" বলা যায়।' ফলতঃ, 'অমৃত বারিধিতে তরঙ্গের ন্যায়, ব্যভিচারী ভাব স্থায়ীভাবে উন্মগ্ন হইয়া, ইহাকে বর্দ্ধিত করে এবং নিমগ্ন হইয়া তাহার স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।'

† বিপ্রিয় হেতু নির্ব্বেদ ও ঈর্ষা হেতু নির্ব্বেদের উদাহরণ অনূদিত হয় নাই।

২—বিষাদ বা পশ্চাত্তাপ

ইষ্টাপ্রাপ্তি হয় কিম্বা কার্য্যে সিদ্ধি নয়।
বিপত্তি অপরাধ হেতু 'বিষাদ' জন্ময়॥
এক উদাকৃতি দিএ দিক্‌দরশন।
এই মত সর্ব্বেতে জানিহ বুধগণ॥

'ইষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি হেতু,' যথা—(বিশাখা প্রতি শ্রীরাধা)—

কৃষ্ণের মধুর বাণী অতি স্বাদু সুধা জিনি না শুনিলাম শ্রবণ পুরিয়া।
কৃষ্ণ মুখের সৌন্দর্য্য সকল মাধুর্য্য ধুর্য্য না দেখিলাম নয়ন ভরিয়া॥
অনেক পুণ্যের ফলে আইলা কৃষ্ণ যেই কোলে বিধি মোরে বড় বিড়ম্বিল।
দেখ সখি বিধিবল জটিলায় করি ছল সেই সুখ মোর হরি নিল॥

৩—দৈন্য

দুঃখ, ত্রাস, অপরাধে 'দৈন্যের' উৎপত্তি।
পূর্ব্ববতাদিক্রমে এক উদাকৃতি॥

'দুঃখ নিমিত্ত দৈন্য', যথা—('বিল্বমঙ্গলে')—

শুন, কৃষ্ণের মুরলী তোরে ভাগ্যবতী বলি সদা থাক কৃষ্ণ মুখ চন্দে।
তোমার চরণ ধরি কহিছি বিনয় করি মোর দশা কহিও গোবিন্দে॥

৪—গ্লানি বা নির্ব্বলতা

শ্রম, মনঃপীড়া, রতি তিনে হয় 'গ্লানি'।
পূর্ব্ববৎ এক উদাহরণ বাখানি॥

'শ্রম হেতু গ্লানি', যথা—(পৌর্ণমাসী প্রতি বৃন্দা)—

কৃষ্ণ সঙ্গে জলকেলি কৈল রাধা সখী মেলি মণিবলয় পড়িছে খসিয়া।
সখীগণ হাসে তারে তুলিয়া লইতে নারে অঙ্গ সব পড়িছে ভাঙ্গিয়া॥

৫—শ্রম

পথশ্রম, নৃত্যশ্রম, আর রতিশ্রম।

'পথশ্রম', যথা—

দুই তিন পদ জেঞা কেলিপদ্ম ফেলাইয়া কেশমালা ফেলে কত দূরে।
কণ্ঠের মুক্তার মালা তারপর ফেলি দিলা শ্রমে অঙ্গ হইল জরজরে॥
কৃষ্ণ প্রেম অন্তরে দূরে অভিসার করে শ্রোণীভরে চলিতে না পারে।
বহু চিন্তা কৈল তায় তার উপায় নাহি পায় দুঃখী হইয়া নিন্দে নিতম্বেরে॥

৬—মদ

'মদ' এক, তার মধু পানেতে জনম॥

যথা—(নান্দীমুখী প্রতি কুন্দবল্লী)—

হরির নিক'ট রঞা মুখ মোড়ে লজ্জা পাঞা যে রাধিকা বাক্য নাহি কয়।
মধু পানে মত্ত হঞা লাজবিজ্ঞ পাসরিয়া শারী প্রায় নিঃশঙ্ক পড়য়॥

৭—গর্ব্ব

সৌভাগ্য, রূপ, গুণ, আর সর্ব্বোত্তমাশ্রয়।
এই সব হেতু হইলে 'গর্ব্বোৎপত্তি' হয়॥

সৌভাগ্য হেতু, যথা—(বিশাখা প্রতি শ্রীরাধা)—

সখীগণ সঙ্গ ছাড়ি ছাড়ি সব ব্রজনারী কৃষ্ণ তোমারি দুয়ারে দাঁড়াঞা।
কুন্তল রচিছ তুমি বার বার বলি আমি হরি পানে চাহগো ফিরিঞা॥

৮—শঙ্কা

চৌর্য্য, অপরাধ, আর পরের ক্রূরতা।
এই তিন হেতু 'শঙ্কা' হয় উৎপাদিতা॥

চৌর্য্য হেতু, যথা—

কৃষ্ণ নিদ্রা গেল দেখি বাঁশী লয়া বিধুমুখী লুকাইল লতার ভিতরে।
অঙ্গের যে ছটাগণ তমঃ করে বিনাশন তাথে রাধা সভয় অন্তরে॥
রাধা করে বিধির নিন্দন।
হেন অঙ্গ মোর কৈল অন্ধকার দূরে গেল বিধি নাহি বুঝে প্রিয় জন॥

বিদগ্ধ নারীর চিত্তে যেই শঙ্কা হয়।
ভীরু স্বভাব হেতু উৎপাদে যে ভয়॥

৯—ত্রাস

তড়িৎ দর্শনে, ঘোর জন্তু দরশনে ॥
আর ঘোর শব্দে 'ত্রাস' জনময়ে মনে ॥

তড়িন্নিমিত্ত, যথা— (কুন্দবল্লী প্রতি রূপমঞ্জরী)—

জলদেরি দ্যুতি দেখি ত্রাস পাঞা বিধুমুখী কৃষ্ণের কোলেতে লুকাইল।
দ্বিতীয় বিদ্যুৎ যেন মেঘে প্রবেশিল পুন সেই শোভা সখীরা দেখিল ॥

১০—আবেগ

প্রিয় দৃষ্টি, প্রিয় শ্রুতি, অপ্রিয় দরশনে।
'আবেগ' জন্ময়ে অপ্রিয় শ্রবণে ॥

প্রিয় দর্শন, যথা—(শ্রীরাধার উক্তি)—

জলধর সুন্দর যুবা কোন নাগর আমার নিকটে দেখা দিল।
চঞ্চল নয়ন কোনে চাহিয়া আমার পানে ধৈর্য্য ধন হরিয়া লইল ॥

১১—উন্মাদ

প্রৌঢ়ানন্দে, বিরহেতে 'উন্মাদ' জন্মায়।

প্রৌঢ়ানন্দ, যথা—(সখী প্রতি বৃন্দা)—

হেদে গো ভ্রমরী সখী কৃষ্ণ আলিলিয়া রাখি আমারে করহ আলিঙ্গনে
কৃষ্ণেরে দেখিয়া কাছে ভ্রমরীকে ইহা যাচে উন্মাদেতে কিছুই না জানে ॥

১২—অপস্মার

ধাতুর বৈষম্যে এক অপস্মার হয় ॥*

যথা—(ললিতা বাক্য)—

বচনে প্রলাপ সার উদ্গত বচন তার লালা কেন বদনে উদ্গার।
অন্তরে বিরহ বাধা ব্যাকুলা হয়েছে রাধা গুরুজনে কহে অপস্মার ॥

---

* দুঃখ নিমিত্ত ধাতুবৈষম্যজনিত চিত্তবিক্লবকে 'অপস্মার' কহে।

১৩—ব্যাধি †

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্রীমতীর সখী)—

সখীগণ সজল নলিনী দল বিতরল রাই শুতায়ই তাথে।
অঙ্গকি তাপে ধূলি সম হোয়ত সো সব নলিনীকি পাতে॥
শীতল সরসিজে এক সখী বীজই তবহু শুখাওত সোই।
লেপন চন্দন তবহি শুখাওত মলিন রেণু সম হোই।
মাধব, তুয়া বিরহানলে রাধা।
জর জর অঙ্গ হৃদয় বর কাতর ক্ষণে ক্ষণে মনসিজ বাধা॥

১৪—মোহ

হর্ষেতে জন্ময়ে 'মোহ', কৃষ্ণের বিরহে।
বিষাদে জন্ময়ে 'মোহ', কবিগণ কহে॥

হর্ষ হেতু 'মোহ', যথা—(ললিতা ও বিশাখা প্রতি শ্রীরাধা)—

নীলোৎপল জিনি বর্ণ সেই যে পুরুষ রত্ন যবে মোরে পরশ করিল।
কিবা করি, কোথা যাই কেবা আমি, কেবা হই সেই হতে সব পাশরিল॥

১৫—মৃতি বা প্রাণত্যাগ

মৃতির অধ্যবসায় করিব বর্ণন।
কবির বর্ণন নাহি সাক্ষাত মরণ॥*

যথা—(উদ্ধব সন্দেশে ললিতা প্রতি শ্রীরাধা)—

যাবত অক্রূর রথে না চড়ায় প্রাণনাথে তাবত শুনহ মোর বাণী।
আমি না বাঁচিব আর তোরে দিলাম কার্য্যভার মনে করি, করি করি আমি॥
এই যে মালতী লতা যার পুষ্প নব্য পাতা গোবিন্দ পরিত নিজ কানে।
তুমি তাথে করি প্রীতি জল দিহ নিতি নিতি যতন করি করিহ পালনে॥

---

† অর্থাৎ জ্বরাদি প্রতিরূপ বিকার।

* মরণের উদ্যম মাত্র বর্ণনীয়—সাক্ষাৎ মৃত্যু বর্ণয়িতব্য নহে। 'কারণ—সমর্থ, সমঞ্জস ও সাধারণ স্থায়িভাববতী কৃষ্ণপ্রিয়াগণের নিত্যসিদ্ধত্ব হেতু মৃত্যু অসম্ভব। কচিৎ সাধকপ্রায়া কোন কৃষ্ণপ্রিয়ার মৃত্যু সম্ভব হইলেও, অমঙ্গল হেতু

১৬—আলস্য

যদ্যপি সাক্ষাৎ অঙ্গ, 'আলস্য' না হয়।
তথাপি ভঙ্গিতে তার করিএ নির্ণয় ॥§

যথা—(শ্রীমতী মতি রূপমঞ্জরী)—

সদা দধি বিলোড়নে শ্রমে কিছু নাহি জানে শ্বাশুড়ী আছয়ে ভূমে পড়্যা।
শঙ্কা ছাড়ি দেহ তাথে আলস না হও চিতে হরির মাথাতে বান্ধ চূড়া ॥

১৭—জাড্য

ইষ্টানিষ্ট শ্রুতি, ইষ্টানিষ্ট দরশনে।
বিরহে 'জাড্যের' জন্ম, কবিগণ গুণে ॥

ইষ্ট শ্রবণ নিমিত্ত জাড্য, যথা—(নান্দীমুখী প্রতি কুন্দবল্লী)—

হরির নূপুর দুয়ারে বাজিছে তাহা শুনি শশীমুখী।
চলে যেতে চাহে চলিতে না পারে মনে হলো বড় দুঃখী ॥

১৮—ব্রীড়া

নবীন সঙ্গম দশা, অকার্য্য, আর স্তুতি।
আর অবজ্ঞাতে হয় 'ব্রীড়ার' উৎপত্তি ॥

নবসঙ্গম হেতু লজ্জা, যথা—(সুবল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

কুসুম শয়নে বসসিএগ্রা আসি দুয়ারে দাঁড়ায়ে কেন।
বিনয় করিয়া রাধিকারে আমি ডাকিলাম পুনঃ পুনঃ ॥
অধোমুখ হএগ্রা তবহি রহিলা কিছুই না কহে লাজে।
নিকুঞ্জ-দেবতা আপনি যেমন দাঁড়ায়ে দুয়ার মাঝে ॥

১৯—অবহিত্থা বা আকার গোপন

তাথে 'অবহিত্থা' হয় অনেক প্রকার।
কেবল কৌটিল্যে হয়ে জৈক্ষ্য, লজ্জায় আর ॥

---

§ কৃষ্ণপ্রিয়াগণের কৃষ্ণবিষয়ক বস্তুর প্রতি আলস্য সম্ভব হয় না—কিন্তু জরতী সম্ভব হইতে পারে। এইজন্য ভঙ্গি ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

দাক্ষিণ্যেতে হয় পুনঃ কেবল লজ্জাতে।
লজ্জা ভয়ে হয়ে আর কেবল ভয়েতে॥
গৌরব দাক্ষিণ্য অবহিথা হয় আর।
অবহিথায় সংগোপয়ে আপন আকার॥

জৈহ্ম্য বা কাপট্য হেতু, যথা—(জগন্নাথবল্লভ নাটকে শশীমুখী প্রতি মদনিকা)—

সেই ব্রজরাজ পুত্র কালিন্দী তীরের ধূর্ত্ত তার বার্ত্তা না কহ আমারে।
এ যে নাচে রোমচয় এ মোর পুলক নয় হীমের পবনে শীত করে॥

২০—স্মৃতি

সাদৃশ্যের দরশন, আর দৃঢ়াভ্যাস।
ইহাতেই হয় চিত্তে 'স্মৃতির' প্রকাশ॥

সাদৃশ্য দর্শনে, যথা—

পুলিন্দ নারীরগণ গোবিন্দের স্মরণ করিছে তমাল দরশনে।
কৃষ্ণভাব তরঙ্গে খেদ হইয়াছে অঙ্গে অতি দুঃখী হইয়াছে মনে॥
হংস, আমার বচন তুমি ধর।
যমুনার মাঝে যেঞা নিজ পাখা ডুবাইয়া তাহাদের অঙ্গে বায় কর॥

২১—বিতর্ক

পরম সংশয়েতে হয় 'বিতর্কন'।*

বিমর্শ হেতু, যথা—(শ্রীরাধার উক্তি)—

ভৃঙ্গ সব ঘুরেফিরে মধুপান নাহি করে জাড্যে শুক দাড়িম্ব না খায়।
বিবর্ণ হরিণীগণ চমকিত দুনয়ন তৃণপানে ফিরিয়া না চায়॥
সখি হে, বুঝিলাম ইহার কারণ।
গজেন্দ্র জিনিয়া গতি সেই হেন ব্রজপতি এই পথে করেছে গমন॥

২২—চিন্তা

ইষ্টাপ্রাপ্তি অনিষ্টপ্রাপ্তি 'চিন্তার' কারণ॥

---

* বিমর্শহেতু বা কারণান্বেষণ নিমিত্ত এবং সংশয়হেতু বা পক্ষদ্বয় উদ্ঘাটন পূর্ব্বক নির্ণয়ের অসমর্থ হেতু—এই দ্বিবিধ 'বিতর্ক'।

ইষ্টাপ্রাপ্তি, যথা—(পৌর্ণমাসীর উক্তি)—

গোবিন্দের দুই আঁখি অধিক চঞ্চল দেখি নিশ্বাস বহিছে খরতরি।
কেমন সে রমণী বস কৈল ব্রজমণি তাহাকেই চিন্তা করে হরি॥

২৩— মতি বা বিচারোত্থ অর্থ নির্দ্ধারণ*

যথা—(শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখপদ্ম-পরিপূত শ্লোক)§—

আলিঙ্গন করি মোরে চরণে ঠেলুন দূরে, কিম্বা মারুন মর্ম্মহত করি।
যা করু তা করু সেই মোর মনে আর নেই কেবল প্রাণনাথ মোর হরি॥

২৪—ধৃতি

দুঃখাভাব, উত্তমাপ্ত্যা এই দুই গুণে।
পূর্ণ মন অচাঞ্চল্য 'ধৃতির' লক্ষণে॥

দুঃখাভাব, যথা—(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩২।১২)—

শুনিয়া কৃষ্ণের নাম উল্লাস করয়ে প্রাণ খল্‌বল্‌ করয়ে অন্তর।
তথাপি না দুঃখ করে অচঞ্চল ধৈর্য্য ধরে সুগম্ভীর রাই কলেবর॥

উত্তম প্রাপ্তি হেতু, যথা—(পদ্মা প্রতি বিশাখা)—

মৃগীদশা গুণশ্রেণী নবীন যৌবন ধনি সৌদামিনী জিনিয়া কিরণ।
গম্য যেন সুগাম্ভীর্য্য অচঞ্চল স্থির ধৈর্য্য সদা কৃষ্ণগণ রাধামন॥

---

* শাস্ত্রাদির বিচারজনিত অর্থ-নির্দ্ধারণকে 'মতি' কহে। কর্ত্তব্যকরণ, সংশয় ও ভ্রমের খণ্ডন এবং শিষ্যদিগের উপদেশ, পূর্ব্বপক্ষ এবং সিদ্ধান্তাদি তাহার চেষ্টা।

§ 'বিরহ-বিশীর্ণাঙ্গী শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া পৌর্ণমাসী সস্নেহ বচনে বলিলেন—বৎসে, ভগবান নারায়ণের পূজা, পরিচর্য্যা, জপ ও স্তবনাদি তোমাকে উপদেশ দি—যাবৎ শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমন না হয়, তাবৎ তাহাতেই মনোনিবেশ পূর্ব্বক এই দুস্তর সময় ক্ষেপন কর। এই উপায়ই সমীচীন—ইহাতে ঐহিক পারত্রিক উভয়তঃ সুখলাভের সম্ভাবনা। অতএব তুমি নারায়ণের ভক্ত হও। ইহা শ্রবণান্তর শ্রীরাধা বলিলেন—হে ভগবতি, যদি ইহাই কর্ত্তব্য হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বজ্ঞ গর্গাচার্য্যের মতে নারায়ণ তুল্য শ্রীকৃষ্ণের পূজা জপ তপ করিতে উপদেশ দিতেছেন না কেন? আমি সেই প্রকারে কৃষ্ণের আরাধনা করি, যাহাতে আবির্ভূত হইয়া তিনি আমায় স্বয়ং দর্শন দান করিবেন। এই কথা শুনিয়া পৌর্ণমাসী কহিলেন—পুত্রি! জান না, তাঁহার স্বভাব দুর্নিবার—পুনর্ব্বার তোমায় বিরহবেদনা প্রদান করিবেন। এই শ্লোকটি, তদুত্তরে রচিত'।

যখন যাহাতে স্থির বুদ্ধি ধৈর্য্য হয়।
'ধৃতির' লক্ষণ এই কবিগণ কয়॥

২৫—হর্ষ

অভীষ্ট দর্শন, আর অভীষ্ট লাভেতে।
'হর্ষ' হয় চিত্তে এই রসশাস্ত্র মতে॥

অভীষ্ট লাভ হেতু, যথা—(শ্রীরাধা বিষয়ে নববৃন্দার উক্তি)—

রাই যব শ্যামরও মুখ হেরই। সুখ সায়র আসি অঙ্গহিঁ ভরই॥
আঁখি উপেখি কতহি কত কহই। নায়র পেখনে নিমেষ কি সহই॥
সহজে দুটি আঁখি সো বিহি করই। শ্যাম ত্রিভঙ্গ রূপহি নাহি ধরই॥
এতই কহই ধনি সুখে তনু ভরই। হরষ সরস রস মাধব রচই॥

২৬—ঔৎসুক

ইষ্ট দৃষ্টি স্পৃহা, ইষ্ট প্রাপ্তির স্পৃহাতে।
উৎসাহে কালযাপনা 'ঔৎসুক্যের' রীতি॥

যথা—

আজু আওব যব নাগর রসিয়া। মান করি হাম রব মুখ ফিরিয়া॥
সো যব আদরে হেরব নয়নে। তাহে নাহি হেরব, হেরব গহনে॥
জবহু কোরে মঝু লেওব শ্যাম। হোই সমুখ মুখ চুম্বব হাম॥
যো বোল বোলব বদনহি বদনে। মাধবে সাধব মাধব নিজনে॥

২৭—উগ্র

'উগ্রতা' সাক্ষাৎ অঙ্গ না হয় শোভন।
অতএব বৃদ্ধাদিতে করি গৌণ বর্ণন॥

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি মুখরা)—

নবীনা নাতিনী মোর ধর্ম্মভয় নাহি তোর মোর দৃষ্টি নাহি চলে দূরে।
যদি না যাও কানাই মোর কিছু দোষ নাই মোরে কত দূর মধুপুর॥

২৮—অমর্ষ

অধিক্ষেপ, অপমানে 'অমর্ষের' স্থিতি।

অধিক্ষেপ হেতু অমর্ষতা, যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি রুক্মিণী)—

যে বলিলে রাজগণ তাথে মোর নাহি মন, তাহাদের পতি হউক তারা।
যাহাদের কর্ণমূলে না প্রবেশে কোন কালে তোমার গুণের মধু ধারা॥

২৯— অসূয়া বা পরসৌভাগ্যে বিদ্বেষ

সৌভাগ্যেতে, গুণগণে 'অসূয়া' উৎপত্তি॥

সৌভাগ্যে, যথা —(রাসান্তর্ধানে চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মার উক্তি)—

এই পথে গেছে হরি এক নারী কান্ধে করি ইহা মোরা কৈনু অনুমান।
অতিভার বয়া গেছে পদচিহ্ন ডুবি আছে দেখি কাঁপে আমাদের প্রাণ॥

৩০—চাপল বা চিত্তের লঘুতা হেতু অগাম্ভীর্য্য

অনুরাগে দ্বেষে হয় 'চাপলের' স্থিতি।

রাগ হেতু, যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ললিতা)—

আর ব্রজের রমণী প্রফুল্লিত কমলিনী তাহা ক্রীড়া করে আশা পু'রে।
আমি কিছু নাহি জানি অপুষ্পিত কমলিনী কৃষ্ণ হস্তে না ছুঁইহ মোরে॥

৩১—নিদ্রা বা চিত্তের নিমীলন

ক্লম আদি হেতু হয় 'নিদ্রার' উৎপত্তি॥

যথা—(নান্দীমুখী প্রতি বৃন্দা)—

শ্বাস বহে নাসিকায় উদর শোভিত তায় অভিনব পুষ্পের আস্তরে।
রাধিকার স্তনগিরি তারে উপাধান করি হরি নিদ্রায় পর্ব্বত কুহরে॥

৩২—সুপ্তি (স্বপ্ন)*

যথা—(শ্রীরাধার স্বপ্নাবেশে উক্তি)—

পথ ছাড় চঞ্চল যাব যমুনার জল এই বাক্য কহিয়া স্বপনে।
গোবিন্দের ভুজ লঞা তাথে নিজ শির দিয়া রাধা নিদ্রা যায় কুঞ্জভবনে॥

---

* বিবিধ চিন্তান্বিত এবং নানা বস্তুর অনুভবময় নিদ্রাকে 'সুপ্তি' কহে। ইন্দ্রিয়গণের উপরতি, শ্বাস এবং চক্ষুর্মুদ্রণ প্রভৃতি তাহার অনুভাব।

৩৩—বোধ বা নিদ্রা নিবৃত্তি*

যথা—(পৌর্ণমাসী প্রতি বৃন্দা)—

সিংহ মহা শব্দ করে নিদ্রার প্রমোদ হরে সেই শব্দে হরি করে স্তুতি।
রাধার পীন পয়োধর লাগিয়াছে অঙ্গ' পর তাথে মনে বাড়ে বড় প্রীতি॥

সখীর প্রতি স্বীয় স্নেহ, যথা—(ললিতার সখী প্রতি রূপমঞ্জরী)—

শৈল পরি হরি সঙ্গে রাধিকা বিহরে রঙ্গে বোমগণ করয়ে নর্ত্তন।
ললিতার মুখশশী অলকা পড়িছে খসি তাহা রাধা করয়ে মার্জ্জন॥

২। দশা চতুষ্টয়

১—উৎপত্তি বা ভাব সম্ভব§

যথা—(শশীমুখী প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

রাধার মূর্চ্ছা বহু ইহা না কহিয় কেহু কুঞ্জে কৈল পুরুষের ভাব।
এই হরির কথা শুনি কুটিল নয়ানে ধনি দেখাইল বামতা স্বভাব॥

২—সন্ধি†

সমান রূপদ্বয়ের সন্ধি, যথা—(পৌর্ণমাসী প্রতি বৃন্দা)—

চিরকাল পরে রাধার ভবনে বিনোদ নাগর যায়।
তা দেখি রায়ান মনেতে রুষিয়া অরুণ নয়নে চায়॥
তাহারে দেখিয়া রাধার নয়ান নিমেষ ছাড়িয়া দিল।
চিত্রের পুতলি যেমন রহয়ে তেমনি রাধিকা হল্য॥ **

ভিন্ন ভাবদ্বয়ের সন্ধি, যথা—(পৌর্ণমাসীর উক্তি)—

পর্ব্বতের ভার জানি মনেতে বিষাদ মানি দুঃখিত সে সব গোপীগণ।
সদা কৃষ্ণ মুখ দেখি তাথে বড় হয় সুখী সদাই দ্বিবিধ গোপীর মন॥††

---

* অবিদ্যা, মোহ এবং নিদ্রাদির ধ্বংসজনিত প্রবুদ্ধতা বা জ্ঞানাবির্ভাবকে 'বোধ' কহে।

§ ভাবের সম্ভবকে 'উৎপত্তি' কহে।

† সমানরূপ বা ভিন্ন ভাবদ্বয়ের সংমিশ্রণকে 'সন্ধি' কহে।

** এই উদাহরণে ইষ্ট ও অনিষ্টের যুগপৎ দর্শন হেতু, জাড্যের সন্ধি সূচিত হইয়াছে।

†† এই উদাহরণে বিষাদ ও হর্ষের সন্ধি প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভিন্ন হেতু নিমিত্ত, যথা—(কুন্দলতা প্রতি বৃন্দা)—

রাধার সহিত নব অনুরাগ যবে বাঢ়াইল হরি।
পদ্মারে ললিতা ইঙ্গিত করএ কত অবহেলা করি॥
পদ্মা তাহা শুনি চরণে ধরণী লিখয়ে মৌন করি।
বদন বাহিয়া চর্ চর্ হঞা কত পড়ে স্বেদ বারি॥§

৩—শাবল্য বা উত্তরোত্তর সম্মর্দ*

যথা—(কলহান্তরিতা শ্রীরাধার উক্তি)—

পুণ্যবতী সেই নারী নন্দের নন্দন হরি যার সনে করএ বিহার।
মোর চপলতা দেখি রুষিবে ললিতা সখী কত নিন্দা করিবে আমার॥
গোবিন্দের আলিঙ্গনে উৎকণ্ঠা বাড়িছে মনে বিধি মোরে বড় দুঃখ দিল।
যদি পাঞাছিলাম হরি কপট প্রবন্ধ করি মোর মনে মান প্রকাশিল॥†

৪—শান্তি বা ভাবের লয়

যথা—(সখী প্রতি নান্দীমুখী)—

সখী বাক্য পরচার সেই মহা কুঠার তাথে যার না হৈল ছেদন।
দূতীবাক্যে বহুতর সেই নদী নিঝর তাথে যার না হৈল উন্মূলন
দেখ, কৃষ্ণ বাঁশীর মাধুরী।
সে কমলার মান-বৃক্ষ তাহা উপাড়িতে দক্ষ হেন বাঁশী-পবন-লহরী॥

---

§ এই উদাহরণে শ্রীকৃষ্ণ হেতু চিন্তা ও ললিতা হেতু অমর্ষের সন্ধি সূচিত হইয়াছে।

* ভাবনিচয়ের উত্তরোত্তর পরস্পর সম্মর্দনকে 'শাবল্য' কহে।

† এই উদাহরণে চপলতা, শঙ্কা, ঔৎসুক্য ও অমর্ষ প্রভৃতির শাবল্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

স্থায়িভাব প্রকরণ

স্থায়িভাব বা মধুরা রতি*

এই ত শৃঙ্গারে যেই স্থায়িভাব হয়।
তাহাকে 'মধুরা রতি' কবিগণ কয়॥

(ক)—রতি আবির্ভাবের হেতু বা রতিভেদ

'অভিযোগ', 'বিষয়েতে', আর 'সম্বন্ধেতে'।
'অভিমানে', 'তদীয় বিশেষে', 'উপমাতে', ॥
আর 'স্বভাবতঃ' রতি আবির্ভূত হয়।
যথোত্তর উত্তমত্ব কবিগণ কয়॥

১—অভিযোগ

নিজ হৈতে, পরেতে বা, ভাব প্রকাশন।
'অভিযোগ' বলি তারে কহে কবিগণ॥

---

* 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু'-গ্রন্থে, দক্ষিণ-বিভাগ পঞ্চম লহরীতে, 'স্থায়িভাব'-সম্বন্ধে নিম্নরূপ প্রণালীতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। যাহা হাস্যাদি অবিরুদ্ধ এবং ক্রোধাদি বিরুদ্ধভাবকে বশগত করিয়া সুরাজার ন্যায় বিরাজমান হয়, তাহাকেই 'স্থায়িভাব' বলে। শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিকেই, স্থায়িভাব বলিয়া ভক্তিরস-প্রকরণে কথিত হইয়াছে। এই রতি দ্বিবিধ—'মুখ্যা' ও 'গৌণী'। 'মুখ্যা'—'স্বার্থা' ও 'পরার্থা' ভেদে দ্বিবিধ। ইহারা প্রত্যেকেই আবার—শুদ্ধা, প্রীতি সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তা ভেদে পঞ্চবিধ। 'গৌণী'—হাস, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় ও জুগুপ্সা—এই সপ্তবিধ। এই সকল রতির আলম্বন শ্রীকৃষ্ণ, কেবলমাত্র শেষোক্তর আলম্বন দেহাদি। এই সকল রতির ভিন্ন ভিন্ন 'চেষ্টা' আছে। তাহা হইলে—মুখ্যারতি ১ ও গৌণী রতি ৭—এই অষ্টবিধ রতি, যাবৎ রসাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ ইহাদিগকে 'স্থায়িভাব' বলে।

স্বাভিযোগ যথা,—(বিশাখা প্রতি শ্রীরাধা)—

মোর অধর নিরখিয়া   নূতন পল্লব লৈয়া   হরি কৈল দশনে দংশন।
আমি তা নয়নে দেখি   ভুলিয়া রহিল আঁখি   প্রস্ফুটিত হয় মোর মন ॥

পরকর্ত্তৃক অভিযোগ, যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি পত্রহারী দূতী)—

তোমার সম্বাদ শুনি   চঞ্চল হইলা ধনি,   তার মন হইল ঘূর্ণ্যমান।
ভাবের তরঙ্গে ভাসে   অঙ্গের বসন খসে   তথাপি নাহিক তার জ্ঞান ॥

২—বিষয়

'শব্দ', 'স্পর্শ', আদি করি পঞ্চ 'বিষয়'।
রতির কারণ বলি বুধগণ কয় ॥

'শব্দ' হেতু, যথা,—(জিজ্ঞাসাকারিণী সখীর প্রতি শ্রীরাধা)—

একজনার কৃষ্ণনাম   ত্রিভুবনে অনুপাম   শুনি মতি হইল চঞ্চল।
উন্মাদের সাগরে   জম্বু ফেলাইল মোরে   আর জনার মুরলীর কল ॥
এই জলধর দ্যুতি   হরিল আমার মতি   পটে যার কৈনু দরশন।
একা আমি যুবতী   তিন জনে হলে রতি   বর আমার মঙ্গল মরণ ॥

'স্পর্শ', হেতু যথা,—(ঐ)—

একদিন ব্রজপুরে   অতি গাঢ় অন্ধকারে   এক যুবা মোরে পরশিল।
সে দিন অবধি করি   রোমগণ নিদ্রা ছাড়ি   অদ্যাবধি তেমতি রহিল ॥

'রূপ' হেতু, যথা—(হংসদূত মুখে শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ললিতা)—

তুয়া রূপ আকর্ষণ   রাধা কৈল দরশন   হিতাহিত কিছুই না জানে।
প্রেমানলে প্রকাশিল   আপে আত্মা খোয়াইল   কীট যেন পুড়য়ে দহনে ॥

'রস' হেতু, যথা, —(সখী বাক্য)—

অঙ্গ হৈল পুলকিত   তনু যেন বিগলিত   তরঙ্গিত হৃদয় হইল।
রাধার এমন দেখি   মনে অনুমানি সখী   ললিতারে কহিতে লাগিল ॥
আমি ইহার   বুঝিলাম কারণে।
কৃষ্ণের অধরামৃত   তাম্বুলের চর্ব্বিত   তুমি দিলে রাধার বদনে ॥

'গন্ধ' হেতু, যথা,—(ঐ)—

কেমন সে সুখী তরু যার পুষ্প এত চারু তাহাতে বৈজয়ন্তী রচিত।
সৌরভে ভ্রমরা ভুলে কেবা যাতযাম* বলে মোর মন কৈল উন্মাদিত ॥
লোকোত্তর বস্তুর এমন শক্তি হয়।
এক কালে স্ফূর্ত্তি করায় রতি তদ্বিষয় ॥

৩—সম্বন্ধ

'কুল', 'রূপ' আদি বস্তুর গৌরব† যে হয়।
'সম্বন্ধ' বলিয়া তারে কবিগণ কয় ॥

যথা,—(কোন সখীর প্রতি ব্রজসুন্দরীর উক্তি)—

কে বর্ণিবে বল তাথে গিরি ধরে বাম হাতে রূপ ত্রিভুবনের মোহন।
জন্ম ব্রজরাজ ঘরে গুণ লেখা কেবা করে লীলা চমৎকারের কারণ ॥
সখি, হেন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
তাহার মুরলী শুনি হেন কে রমণী মণি যে করয়ে ধৈর্য্য সম্বরণ ॥

৪—অভিমান

অনেক অপূর্ব্ব বস্তু আছয়ে ভুবনে।
কিন্তু মোর বড় ইচ্ছা হয় এই ধনে ॥
এই মত ভাবি যেই করিয়ে নির্ণয়।
'অভিমান' বলি তারে বুধগণ কয় ॥§

যথা,—(নান্দীমুখী প্রতি শ্রীরাধা)—

এই ত ধরণী মাঝে অনেক নাগর আছে তাহারা অনেক রস জানে।
তাহাদিকে কুলবতী স্বয়ম্বরে কৈল পতি তাহা মোর নাহি লাগে মনে ॥
চূড়া নাহি যার মাথে বেণু নাহি যার হাতে গিরি ধাতু নাহি যার দেহে।
হউক যেনে সুন্দর বিদগ্ধ নাগর বর তৃণসম নাহি গণি তাহে ॥

---

* যাতযাম = পরিভুক্ত। † গৌরব = আধিক্য।

§ মমতার আস্পদ বিষয়ে যে-কোন অনন্যতাময় সঙ্কল্প-বিশেষের নাম—'অভিমান'। এই 'অভিমান' রূপাদিকে অপেক্ষা না করিয়া রতি উৎপাদন করে।

৫—তদীয় বিশেষ

'পদচিহ্ন', 'বৃন্দাবন', আর 'প্রিয়জন'।
'তদীয় বিশেষ' কহে রসিকের গণ ॥

'পদচিহ্ন', যথা,—(দূরদেশ হইতে আগতা নবপরিণীতা গোপকুমারীর উক্তি)—

চক্রাম্বুজ দম্ভোলী চিহ্নিত পদাঙ্কগুলি কার বটে কহত আমারে।
যাহা দেখি মোর মন সদা করে ঘূর্ণন তনুরুহগণ নৃত্য করে ॥

'বৃন্দাবনাশ্রিত স্থান' বা 'গোষ্ঠ', যথা,—(ঐ)—

দেখি এই বৃন্দাবন চঞ্চল আমার মন দেখ ইহার অপূর্ব্ব মাধুরী।
বুঝি এই বন মাঝ কোন বা নাগররাজ সদা রহে ইহ ক্রীড়া করি ॥*

৫—'প্রিয়জন'

গোবিন্দের প্রৌঢ়ভাবে বিভাবিত মন।
রসশাস্ত্র মতে হয়ে কৃষ্ণ-'প্রিয় জন' ॥

যথা,—(শ্রীরাধা দর্শনে নববধূর উক্তি)—

রাধারে দেখিতে মোর সখিজন নিবারিল বারে বার।
তথাপি রাধারে দেখিলাম আমি সকল মাধুরী সার ॥
সেই দিন হতে তৃষিত নয়নে চারিদিক্ পানে চাই।
শ্যামল বরণ একটি পুতলি তাহাতে দেখিতে পাই ॥

৬—উপমা

যথা কিঞ্চিৎ সদৃশতা যাহাতে রহয়।
'উপমা' বলিয়া তারে কবিগণ কয় ॥

যথা,—(নটকে দেখিয়া সখীর প্রতি কোন গোপকুমারী)—

নব জলধরদ্যুতি বড়ই মধুর মূর্ত্তি এই নট করিয়াছে বেশ।
ধরিয়াছে যার রূপ সেই যুবা অপরূপ তোমরা দেখেছ কোন্ দেশে ॥

---

* কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বস্তু, রতি ও রতিবিষয়ক আলম্বন, এই উভয়ই শীঘ্র যুগপৎ প্রকটিত করে। এস্থলে, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় ব্রজপুর, নববধূর হৃদয়ে; শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ারতি ও তাহার আলম্বন স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে যুগপৎ প্রকট করিয়া দিল।

যথা বা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বৃন্দা)—

কৃষ্ণতুল্য মেঘ-লেখা ইন্দ্রধনু শিখিপাখা বিদ্যুৎ হয়াছে পীতাম্বর।
সে মেঘ দেখিয়া ধনি নয়নে বহিছে পানি ভাবে অঙ্গ হৈল স্থিরতর॥

৭ স্বভাব

বাহ্য হেতু বিনা যেই রতির উৎপত্তি।
তদুদ্বোধ হেতু অল্প গুণ রূপ শ্রুতি॥

নিসর্গ

দৃঢ়াভ্যাস সংস্কারে 'নিসর্গ' উৎপত্তি।
তদুদ্বোধ হেতু অল্প গুণরূপ শ্রুতি॥

'গুণ শ্রবণ নিমিত্ত স্বভাব', যথা,—(সখীর প্রতি রুক্মিণী দেবী)—

রুক্মি করু তর্জ্জন ছাড়ুক মোরে বন্ধুগণ পিতা মোর হউন লজ্জিত।
শুনি মোর চপলতা রোদন করুন মাতা মোর দশা হউক বিপরীত॥
শুনি কৃষ্ণের গুণগণ ভুলিয়াছে মোর মন শিশুপালে করে ঘৃণাকার।
যে বল, সে বল মোরে মোর মন যদুবরে কিছু না বলিহ মোরে আর॥

স্বরূপ ভাব

বিনা হেতু স্বতঃসিদ্ধ 'স্বরূপ' ভাব হয়।
তাহারে ত্রিবিধ করি কবিরা কহয়॥
'কৃষ্ণনিষ্ঠ' হয়ত, 'ললনা-নিষ্ঠ' আর।
'কৃষ্ণ-ললনা-নিষ্ঠ',—তিন ভেদ তার॥

অ—কৃষ্ণ-নিষ্ঠ স্বরূপ

'কৃষ্ণ-নিষ্ঠ' স্বরূপ পরম মোহন।
দৈত্য বিনা, সুখেতে জানয়ে ভক্তগণ॥

যথা,—(নারীবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে বিমানচারিণী দেবীগণোক্তি)—

এ নহে গোপনারী হরি বধূ-বেশ করি সুরনারীর মন কৈল চুরি।
রবি বিনে অন্ধকার বিনাশিতে শক্তি কার অতএব জানিল বটে হরি॥

আ—ললনা-নিষ্ঠ স্বরূপ

'ললনা-নিষ্ঠ' স্বরূপ হয় স্বয়ং উদ্বুদ্ধ।
অ-দৃষ্ট অশ্রুত হলেও রতির আরব্ধ ॥

যথা,—(দর্শনাদির পূর্ব্বেই, শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করিয়া সখী প্রতি শ্রীরাধা)—

নাহি দেখি নাহি শুনি হেন যে পুরুষ মণি মোর মন করে সম্ভাবন।
ঘনশ্যাম পীতাম্বরে সঙ্কল্প করিয়া তারে বৃথাই ঘুরয়ে মোর মন ॥

ই—কৃষ্ণ-ললনা বা উভয়-নিষ্ঠ স্বরূপ

কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রিয়ার যেই স্বরূপ হয়।
'উভয়-নিষ্ঠ' বলি তারে কবিগণ কয় ॥

যথা,—(ললিতা প্রতি শ্রীরাধা)—

দ্বিজ বেশ ধরি রবি পূজিবারে বুঝি সে নাগর এল।
নহে কেন মোর তনু পুলকিত অন্তর দ্রবিয়া গেল ॥
গগন মাঝারে শশধর যদি উদয় নাহিক করে।
চন্দ্রকান্ত মণি কেন বা গলিবে বঞ্চন না কর মোরে ॥

গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণে স্বভাবসিদ্ধা রতি

'অভিযোগ' আদি করি বিলাস প্রকার।
কৃষ্ণে স্বভাব-রতি হয় গোপীকার ॥

(খ)—রতির তারতম্য

ত্রিবিধ রতি

'সাধারণী', 'সমঞ্জসা', 'সমর্থা' রতি আর।
কুব্জাদি, মহিষী, ব্রজদেবীতে প্রচার ॥
'সাধারণী'—মণিবৎ অতি সুলভা নয়।
'সমঞ্জসা'—চিন্তামণি সুদুর্লভা হয়।
গোপীর 'সমর্থা' রতি, আর কোথাও নয়।
অনন্যলভ্যা বলি তারে কবিগণ কয় ॥

১—সাধারণী রতি

কৃষ্ণের সাক্ষাৎকারে 'সাধারণী' হয়।
সম্ভোগেচ্ছা হেতু তাহা অতি সান্দ্র নয়॥

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি কুব্জা বাক্য)—

কতদিন মোর সহ করহ রমণ। তোমার বিয়োগ মোর নাহি সহে মন॥

নিবিড় না হয় রতি, ভোগেচ্ছা-প্রধান
কুব্জাতে ইহার স্থিতি শাস্ত্র পরমাণ॥

২—সমঞ্জসা রতি

গুণাদি শ্রবণে কৃষ্ণ-পত্নীভাব ধরে।
সান্দ্র হয় কখন ভোগেচ্ছা ভেদ করে॥
সেই রতি রস-শাস্ত্রে 'সমঞ্জসা' নাম।
রুক্মিণ্যাদি মহিষীতে হয় তার স্থান॥

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি রুক্মিণী দেবীর সন্দেশ-পত্র)—

তোমার বিদ্যা, রূপ, শীল, বয়ঃ ধাম, ধন, কুল, হয় ত্রিজগতের মোহন।
কোন ধীর যুবতী হয়া মহানন্দবতী নাহি বাঞ্ছে তোমার চরণ॥

সমঞ্জসায় সম্ভোগ ইচ্ছায় হয় বিভিন্নতা।
তাহাতে দুষ্কর হয় কৃষ্ণের বশ্যতা॥

৩—সমর্থা রতি

পূর্ব্ব হতে অপূর্ব্ব বিশেষ রতি হয়
সম্ভোগের ইচ্ছা কেবল হয় রতিময়॥
'সমর্থা' বলিয়া তারে কবিগণ ভণে।
সেই সমর্থার স্থিতি ব্রজদেবী গণে॥
সেই রতি স্বস্বরূপে হয়ত উদয়।
কিবা তার হেতু যত কিঞ্চিৎ অন্বয়॥

'সমর্থা রতির' গন্ধে জগৎ বিস্মরে।
বড়ই নিবিড় সেই হয় সর্ব্বোপরে॥

যথা,—(বৃন্দার উক্তি)—

ত্রিভুবনে যত নারী রাধা হয় সর্ব্বোপরি দেখি সেই রূপের তরঙ্গ।
তোমার কথা মনোহারী গুরুজন শঙ্কা করি তার কাছে না করে প্রসঙ্গ॥
পথে চলে যাও তুমি হয় নূপুরের ধ্বনি সেই ধ্বনি শুনিয়া কিশোরী।
কখন যা না শুনিল তার কর্ণে না কহিল উঠে রাধা 'কৃষ্ণ—কৃষ্ণ' করি॥

অদত্ত বিলাস ইহা অতি চমৎকার।
সম্ভোগেচ্ছা বিশেষের ভেদ নাহি তার॥
ইহাতে কৃষ্ণের সুখ কেবল তাৎপর্য্য।
অতএব 'সমর্থা রতি' হয় মহা ধৈর্য্য॥
পূর্ব্বে যে দুই রতি করিনু বর্ণন।
কদাচিত স্বার্থেতে তাহার উদ্যম॥

মহাভাব

এই রতি প্রৌঢ় হলে 'মহাভাব' হয়।
ভক্ত বিমুক্তগণ ইহারে বাঞ্ছয়॥

প্রেম, স্নেহ প্রভৃতি

'সমর্থা রতি' দৃঢ় হলে, 'প্রেম' নাম হয়।
এই ক্রমে পুনঃ 'স্নেহ', 'মানের' উদয়॥
'মান', 'প্রণয়', 'রাগ', 'অনুরাগ', 'ভাব'।
এই সীমা পর্য্যন্ত রতির প্রভাব॥
বীজ অরোপিলে ইক্ষু রস হয় তাথে।
তাথে গুড়, তাথে খণ্ড, শর্করা এই মতে॥
তাথে সিতা হয় সিতোপলা এই মতে।*
রতি হতে প্রেমাদি জন্ম লয় তাথে॥

* সিতা—মিশ্রী; সিতোপলা—ওলা।

গুড় হৈতে গূঢ় বিকার তার গুড় নাম।
প্রেম-বিকার স্নেহ আদি 'প্রেম' ত আখ্যান॥
যাহার যাদৃশী ভাব কৃষ্ণেতে উদয়।
তাহাতে তাদৃশ ভাব গোবিন্দের হয়॥

৯—প্রেম

ধ্বংসের কারণে যার না হয় ধ্বংসন।
'প্রেম' হয় সেই দোঁহার ভাবের বন্ধন॥

যথা,—(নান্দীমুখী প্রতি শ্রীরাধা)—

তোমারি শপথ মোরে   আমি করি ধর্ম্মাচারে   তাথে মোর নাহি কিছু দোষ।
কত কুবচন বলি   আমি তারে দিই গালি   তুমি মোরে মিছা কর রোষ॥
সখি, বড়ই নিঠুর   পরাণ তার।
পথ আগলিয়া রহে   আমি কি করিব তাহে   গৃহপতি করু প্রতিকার॥

'প্রেম' ত্রিবিধ

সেই 'প্রেম' হয় তাথে ত্রিবিধ প্রকার।
'প্রৌঢ়', 'মধ্য', 'মন্দ'—এই ভেদ হয় তার॥

[১। শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী বিষয়ক প্রেম-ভেদ]

(অ)—'প্রৌঢ়' প্রেম

বিলম্বে নায়ক-চিত্ত প্রিয়া নাহি জানে।
নায়কের ক্লেশ হয় 'প্রৌঢ়' প্রেম গুণে॥

যথা,—(মধুমঙ্গল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

সুবল, নিকুঞ্জে যাহ   যাঞা রাধিকারে কহ   আমার মুখের এক বাণী।
আমার বিলম্ব দেখি   মনে না হইও দুঃখী   তিলেক বিলম্বে যাব আমি॥
এথা এক মহামত্ত   আসিয়াছে দুষ্ট দৈত্য   আমি তায় করি বিনাশন।
মিলিবগা প্রিয়া সঙ্গে   করিব অনেক রঙ্গে   উৎকণ্ঠিত আছে মোর মন॥

আ—'মধ্য' প্রেম

অন্য নায়িকার প্রেম অপেক্ষিত যাথে।
'মধ্য'-প্রেম বলি তারে রসশাস্ত্র মতে॥

যথা,—(চন্দ্রাবলীর সহিত মিলনান্তর শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)—

চন্দ্রাবলী বর নারী তার সঙ্গে রঙ্গ করি গোঞায়িলাম সকল যামিনী।
তথাপি আমার মনে রহি রহি ক্ষণে ক্ষণে প্রবেশয়ে রাধা গুণমণি॥

ই—'মন্দ' প্রেম

সদাই আত্যন্তিক হয় পরিচয় যাথে।
উপেক্ষা অপেক্ষা নাই 'মন্দ'-প্রেমাতে॥

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি পুরোহিত-পত্নী)—

মানিনী অশোক- লতারে আনগা বহু অনুনয় করে।
প্রেমবতী জনে আমি উপেখিলে লোকে দোষ দিবে মোরে॥

[২। প্রেয়সীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেম-ভেদ]

অ—'প্রৌঢ়'-প্রেম

অথবা, বিরহ যাথে না পারে সহিতে।
'প্রৌঢ়'-প্রেম বলি তারে রসশাস্ত্র মতে॥

যথা—(ললিতা প্রতি শ্রীরাধা)—

বারে বারে তুমি মান করিবারে আমারে কহিছ, সখি।
কানুর লিখন পটেতে লিখিয়া মোরে আনি দেহ দেখি॥
যাহারে দেখিয়া মনে সুখী হৈয়া ঢাকিয়া রহিব কান।
মুরলীর ধ্বনি তাথে ন্যাহি শুনি তবে সে করিব মান॥

আ—'মধ্য'-প্রেম

কষ্টেতে বিরহ যেই পারয়ে সহিতে।
তাহাই 'মধ্য'-প্রেম রসশাস্ত্র মতে॥

যথা—(সখীর প্রতি কোন যূথেশ্বরী)—

এই ত দীঘল দিন কখন হইবে ক্ষীণ সন্ধ্যাকাল হইবে কখন।
তাহাতে কৃষ্ণের মুখ দেখিয়া পাইব সুখ বনে হতে আসিবে যখন॥

ই—'মন্দ'-প্রেম

কদাচিৎ বিস্মরণ হয়ত যাহাতে।
'মন্দ' প্রেম বলি তারে রসশাস্ত্র মতে॥

যথা—(ঐ)—

এলে প্রতিপক্ষ নারী তার প্রতি ঈর্ষ্যা করি পাশরিলাম মালার গ্রন্থন।
কি করিব সহচরী ঐ পারা এলো হরি হাম্বারব করে ধেনুগণ॥

২—স্নেহ

প্রেমের পরম কাষ্ঠা জ্ঞানোদ্দীপন।
হৃদয় দ্রবায়, 'স্নেহ' কহে কবিগণ॥
এই স্নেহ উদয় করয়ে যার মনে।
তার আশা নাহি পুরে কৃষ্ণ দরশনে॥

যথা—(রাধা প্রতি বৃন্দা)—

কৃষ্ণের বদন-বিধু তাহার কিরণ শীধু তাঁহা রাধা নয়ন-চকোর।
পুনঃ পুনঃ পান করে তভু নাহি ছাড়ে তারে শীধু পানে হইয়াছে ভোর॥
অদভুত লাগিল দেখিয়া।
পেটভরি সুধা খায়ে অশ্রু ছলে উগারয়ে তভু পীয়ে উন্মত্ত হইয়া॥

'স্নেহ বা মনোদ্রব'—ত্রিবিধ

'অঙ্গ সঙ্গ' মনোদ্রব কনিষ্ঠ নাম হয়।
'বিলোকনে' মনোদ্রব মধ্য বলি তায়॥
'শ্রবণাদি' মনোদ্রব হয় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।
মনোদ্রবের এই তিন ভেদ হয় ইষ্ট॥

১—'অঙ্গ সঙ্গ' মনোদ্রব

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি পালীর সখী)—

ঘন রসরূপ তুয়া তনুখানি যাহার পরশ পাঞা।
লাবণিময় পালী মনেতে দ্রবিল বিলাসে কৌতুকী হয়া॥

২—'অবলোকনে' মনোদ্রব

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্যামার সখী বকুলমালা)—

তুয়া মুখপদ্ম-সুহৃৎ শ্যামার হৃদয় ঘৃত দ্রবীভূত হইবারে পারে।
দেখি শ্যামার মুখচন্দ্র তুয়া মন চন্দ্রকান্ত নাগ-লীলা চিত্র লাগে মোরে॥

৩—'শ্রবণে' মনোদ্রব

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বিশাখা)—

তোমার অর্দ্ধেক নাম কর্ণ মন অভিরাম যেই মাত্র কর্ণে প্রবেশিল।
তাহাই শুনিয়া রাধা হইল মুগ্ধামেধা কতক্ষণ স্তব্ধ হইল॥

৪—'স্মরণ' হেতু মনোদ্রব

যথা,—(শ্রীরাধা প্রতি নান্দীমুখী)—

কৃষ্ণচন্দ্র করি মনে বসিয়াছ স্ব-ভবনে তেই তনু কাঁপিছে সঘনে।
তোমার স্নেহ অতিশয় তাথে মন দ্রব হয় ইহা আমি বুঝিয়াছি মনে॥

'স্নেহ'—স্বরূপতঃ দ্বিবিধ

সেই স্নেহ হয় পুনঃ দুই ত প্রকার।
'ঘৃত' এক নাম হয়, 'মধু' নাম আর॥

১—'ঘৃত'-স্নেহ

অত্যন্ত আদর যাথে, সেই হয় 'ঘৃত'।
এই মত কহে রসশাস্ত্রের পণ্ডিত॥
ভাবান্তরান্বিত হয় অতি স্বাদু পুনঃ।
স্বভাব শীতল আদরেতে হয় ঘন॥
দোঁহার আদরে গাঢ় ঘৃতের সমান।
অতএব 'ঘৃত-স্নেহ' হৈল তার নাম॥

যথা,—(ললিতাদির প্রতি পদ্মা)—

দূরেতে যাহারে হেরি আপনি উঠিয়া হরি যাহারে করয়ে আলিঙ্গন।
যার স্নেহে বশ হয় সদাই নিকটে রয় ছাড়িয়া না যায় কোন ক্ষণ॥
কৃষ্ণলীলা-বৃষ্টি পাঞা মনেতে কৌতুকী হঞা দ্রব হয় শীতোপল যেন।*
হেন চন্দ্রাবলী সখী তার তুল্য নাহি দেখি তার সম কে হইবে পুনঃ॥

'গৌরব'

'গৌরব' হইতে হয় পরম আদর।
সেই গৌরব হয় দোঁহাকার পরস্পর॥
রত্যাদি স্থানে 'গৌরব' বরূপী আছয়।
কিন্তু এই স্থানে 'গৌরব' অতি ব্যক্ত হয়॥

২—'মধু'-স্নেহ

আমার কৃষ্ণ,—এই জ্ঞান অধিক যাহাতে।
'মধু'-স্নেহ বলি তারে রসশাস্ত্র মতে॥
সহজে মধুর, নানা রস সমাহার।
যদি উষ্মা ধরে, সেই মধু সাম্যে তার॥

যথা,—(সুবল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

স্নেহময় মাধুর্য্য সার তাহাতে নির্ম্মাণ যার হেন রাধা সুধার প্রতিমা।
গুণ-সংখ্যা নাহি তায় ভাব-উষ্মা সদা গায় কিনা দিব তাহার উপমা॥
সুবল, রাধা মোর মন হরি নিল।
যার নাম কর্ণ-পথে অর্দ্ধ মাত্র প্রবেশিতে সব মোর বিস্মৃতি হইল॥

৩—মান

স্নেহের উৎকর্ষে হয় মাধুর্য্য নূতন।
তাথে অদাক্ষিণ্যে 'মান' কহে বুধগণ॥†

---

* শীতোপল—ওলা

† অদাক্ষিণ্য = কৌটিল্য।

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্রীরাধা)—

তোমার সুরভি যায় পথে ধূলি উড়ে তায় সেই ধূলি নয়নে লাগিল।
তাথে মোর আঁখি ঝুরে মুখানিলে কিবা করে ইহা বলি ভুরূ বাঁকাইল॥

'মান'—দ্বিবিধ

সেই ত মানের হয় দ্বিবিধ আখ্যান।
'উদাত্ত', 'ললিত'—এই শাস্ত্র পরমাণ॥

১—'উদাত্ত'

ঘৃত-স্নেহ গম্ভীরতায় 'উদাত্তের' বন্দ।
দাক্ষিণ্যভাক্, অদাক্ষিণ্য, আর বাম্য গন্ধ॥§

'দাক্ষিণ্যোদাত্ত মান', যথা—(কুন্দবল্লী প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

আমার বদনে রাধিকার নাম তাহা শুনি চন্দ্রাবলী।
মুখের হসিতা দ্বিগুণ করিল হাতে দিয়া করতালি॥
বিনয় বচন শুনিয়া আমার বিনয় বচন কয়।
তাহা শুনি মোর সখাগণ যেন চিত্রের পুতলি রয়॥

'বাম্য গন্ধোদাত্ত মান' যথা—(কোন সখীর প্রতি চন্দ্রাবলী সখীর উক্তি)—

পাশক খেলিতে ধনিরে জিনিয়া হরি চাহে আলিঙ্গন।
কুটিল নয়নে মন চাহে ধনি হাতে করে নিবারণ॥

২—'ললিত'

মধুস্নেহ, কৌটিল্যের স্বভাব সুন্দর।
আর পরিহাস-বিশেষ, 'ললিত' সর্ব্বোপর॥

অ—'কৌটিল্য'-ললিত

যথা, —(রতিমঞ্জরী প্রতি রূপমঞ্জরী)—

স্তনে করি হস্তার্পণ হরির কৌতুকী মন চিরকাল রাই সুখ পেল।
পুলকে মঙ্গলা সখী তাহা চিরকাল দেখি বাম স্তনে হরিরে তাড়িল।

§ দাক্ষিণ্য=সরলতা। পরবর্ত্তী পঞ্চদশ অধ্যায়ে, 'সহেতুক' ও 'নির্হেতুক' এই দ্বিবিধ 'মান' বর্ণিত হইয়াছে। এই উদাহরণে—'সহেতুক'-মান বর্ণিত হইল।

আ—'নর্ম্ম'-ললিত

যথা,—('দানকেলি কৌমুদী' গ্রন্থে)—

মিছা না কহিবে তোমার রসনা সেত বড় পুণ্যবতী।
কুলবতী সতীর অধর পানেতে সদাই যাহার রতি॥
তোমার যে কর সে বড় সুন্দর কেন না করিব বল।
নীবীর বন্ধন দেখিয়া যে কর সদা করে টলমল॥

৪—প্রণয়

মানের বিশ্বাস* হলে হয়ত 'প্রণয়'।
এই মত রসশাস্ত্রে কবিগণ কয়॥

যথা,—(সখী প্রতি রূপমঞ্জরী)—

হরির কর কুচ 'পরি তার স্কন্ধে কণ্ঠ ধরি ভ্রূকুটিল কুটিল নয়ন।
প্রমোদ-অশ্রু নেত্রে বয় কৃষ্ণ অঙ্গে সিঞ্চয় লয়া করে তাহার মার্জ্জন॥

'প্রণয়'—দ্বিবিধ

এই 'প্রণয়ের' স্বরূপ হয়ত বিশ্বাস।
বিশ্বাস দ্বিবিধ—'মৈত্র', 'সখ্য' পরকাশ॥

অ—'মৈত্র'-বিশ্বাস

যাহার বিশ্বাসে রহে সহজ বিনয়।
'মৈত্র' বলিয়া ভাবজ্ঞেরগণ কয়॥

যথা,—(স্বাধীনভর্ত্তৃকা চন্দ্রাবলীর প্রতি তদীয়া কিঙ্করীর উক্তি)—

তোমার যে শ্রীচরণ নাহি কর সঙ্কোচন ইহাতে নূপুর পরাইব।
যাহার শব্দ শুনি লজ্জা পাবে মরালিনী বিপক্ষ-কামিনী লজ্জা পাব॥

---

* বিশ্বাস—এই 'বিশ্বাস' বা সম্ভ্রম-রাহিত্যে স্বীয় প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির সহিত কান্তের প্রাণ, মন বুদ্ধি ও দেহের ঐক্যভাবন লক্ষিত হইয়াছে।

আ—'সখ্য'-বিশ্বাস

সাধ্বস রহিত যাথে হয়ত বিশ্বাস।*
স্ববশতাময় হয় সখ্য পরকাশ॥

যথা,— শ্রীকৃষ্ণ প্রতি সত্যভামা)—

যদি তোমার সত্য বাণী পারিজাত তরুখানি মোর গৃহে কর আরোপণ।
তবে জানি মোর প্রতি তোমার অধিক প্রীতি এইবারে জানি তোমার মন॥

অথবা, (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩০।৩১)—

গোপী সঙ্গে রাস করি অন্তর্ধান হৈল হরি রাধা লয়া করিল গমন।
রাধা কহে অহে হরি আমি ত চলিতে নারি লেহ মোরে যথা তোমার মন॥†

'স্নেহ'—'প্রণয়'—'মান'

'স্নেহে', 'প্রণয়' হয়া কভু হয় 'মান'।
'স্নেহ' হৈতে 'মান' পুনঃ, 'প্রণয়' হয় নাম॥
অতএব কার্য্য-কারণ হয় পরস্পর।
তাহাদের উদাকৃতি হয় স্বতন্তর॥

'সু-সখ্য' ও 'সু-মৈত্র'

উদাত্ত স্নেহেতে যুক্ত 'মৈত্র', 'সখ্য' হয়।
'সুমৈত্র', 'সুসখ্য' তাথে যথাক্রমে রয়॥

'সুমৈত্র' যথা,—(কোন সখীর প্রতি চন্দ্রাবলীর সখীর উক্তি)—

সখীর নিকটে রজনীর কথা কহিছে বরজ নাথ
বসনে হরির বদন ঢাকিতে রাধিকা তুলিল হাত॥
এমনি রাধার প্রীত।
অমনি বদন নামিয়া রহিল করিল মুগুধার রীত॥

'সুসখ্য' যথা—(নান্দীমুখী প্রতি বৃন্দা)—

একবার হরি অধর চুম্বন খেলা পণ নিরমাণ।
জিনিয়া নাগর রাধার অধর দু'বার করিল পান॥

---

* সাধ্বস=ভয়। † এই উদাহরণে, দৃপ্তাহেতু 'মান' পরিলক্ষিত হইতেছে।

তাহা দেখি রাধা	কুটিল নয়নে	চাহয়ে নাগর পানে।
ভুজলতা দিয়া	অমনি বান্ধিল	রোষ করি যেন মনে॥

৫—রাগ

'প্রণয়' উৎকর্ষে দুঃখ, সুখ সম হয়।
'রাগ' বলি রসশাস্ত্রে কবিগণ কয়॥

যথা, (সখীগণ প্রতি ললিতা)—

সূর্য্যের কিরণে তপ্ত	সূর্য্যকান্ত মণি যত	তাথে অদ্রিতট ক্ষুরধার।
তাহাতে দাঁড়াঞা রাধা	না জানে মনের বাধা	দেখে কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য অপার॥
দেখ, রাধা-প্রেমের	মাধুরী।	
ইন্দীবর সূর্য্য'পরি	যেমন চরণ ধরি	অচঞ্চল রহিল সুন্দরী॥

'রাগ'—দ্বিবিধ

সেই 'রাগ' হয় ইহ দুই ত প্রকার।
'নীলিমা' বলিয়া এক, 'রক্তিমা' নাম আর॥

১—'নীলিমা' রাগ

সেই ত 'নীলিমা' রাগ দুই ত প্রকার।
'নীলি', 'শ্যামা'—এই দুই ভেদ হয় তার॥*

ক—'নীলী'-রাগ

ক্ষয় সম্ভাবনা নাহি, প্রকাশ নহে যেই।
স্বভাবের আবরণ 'নীলী'-রাগ সেই।
'নীলী'-রাগ কৃষ্ণ, চন্দ্রাবলীতে প্রচার।
দোঁহার অক্ষয় রাগ প্রকাশ নাহি তার॥

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ভদ্রা)—

বিশদ আশয়ে	তুয়া প্রতারণা	গুণ বলি পুনঃ জানে।
চন্দ্রাবলী সনে	তোমার পীরীতি	সখীরাও নাহি জানে॥

---

* নীলবৃক্ষ এবং শ্যামলতাজাত রাগ বা রঙ্গকে 'নীলিমা' কহে।

খ—‘শ্যামা’-রাগ

ভীরুতা-ঔষধিসেকে অল্প প্রকাশিত।
চিরকাল সাধ্য ‘শ্যামা’-রাগ শাস্ত্রমত॥

যথা—(কলহান্তরিতা ভদ্রার প্রতি তদীয়া সখী)—

পূর্ব্বে কুঞ্জের অন্তরে অল্প মাত্র অন্ধকারে না যাইত তোমার নিকটে।
সেই আজি কুঞ্জ ঘরে অতি ঘোর অন্ধকারে তোমায় খুঁজে পড়েছে শঙ্কটে॥

২—‘রক্তিমা’ রাগ

কুসুম্ভ-সম্ভব, আর মঞ্জিষ্ঠ-সম্ভব।
দুই প্রকার ‘রক্তিমা’, কহয়ে কবি সব॥

ক—‘কুসুম্ভ’ রাগ

‘কুসুম্ভ’-রাগ যেই, চিত্তে লাগয়ে ত্বরিত।
অন্য রাগ দ্যুতি ব্যঞ্জে, শোভে যথোচিত॥

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্যামলার কোন অমিতার্থা দূতী)—

তোমার শ্রবণাবধি ভুজগ দেখয়ে যদি তারে তুয়া ভুজ বলি মানে।
নানাভাব পরচার এমন স্বভাব তার চিত্ত ধৈর্য্য ছাড়ে উন্মাদনে॥
তোমারে সাক্ষাতে দেখি মুদিয়াছে দুই আঁখি যে দশা হইল সাক্ষাৎকার।
কিয়ে অনুরাগিণী কিম্বা হল বিরাগিণী বুঝিতে আমার হল্য ভার॥

সুন্দর আধারে পুনঃ এই রাগ হয়।
কৃষ্ণপ্রিয় জনে ইহার মলিনতা নয়॥*

খ—‘মাঞ্জিষ্ঠ’ রাগ

আপনে বাঢ়য়ে কান্তে, অন্যাপেক্ষ নয়।
‘মাঞ্জিষ্ঠ’ রাগ রাধা মাধবের হয়॥

---

* স্বভাবতঃ, কুসুম্ভ পুষ্পের রঙ্ চিরস্থায়ী নহে। কিন্তু অন্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া সিদ্ধ হইলে যেমন স্থায়ী হয়, তদ্রূপ মঞ্জিষ্ঠা রাগিণী শ্রীরাধার সঙ্গিনীগণের সহিত সঙ্গ বশতঃ, কৃষ্ণপ্রণয়িনী শ্যামলাদি যূথেশ্বরীতে, ঐ ‘কুসুম্ভ’ রাগ চিরস্থির দেখা যায়।

যথা,—(নান্দীমুখী প্রতি পৌর্ণমাসী)—

উপাধি-রহিত জন্ম কথন নাহিক ক্ষীণ অতিভয়েও রস বরিষণ।
ক্ষণে বাড়ে বহুতর অতি চমৎকৃতিকর রাধাকৃষ্ণের ভাব সর্ব্বোত্তম ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাব † চন্দ্রাবলী আদির হয়।
রুক্মিণ্যাদি মহিষী নিকরে পুনঃ রয় ॥
উত্তর উত্তর ভাব § রাধিকাস্থে হয়।
সত্যভামা লক্ষ্মণ প্রভৃতিতেও রয় ॥
এই প্রকার ভাব-ভেদ সর্ব্ব গোপনারী।
আত্মপক্ষ বিপক্ষাদি পূর্ব্ব ভেদ করি ॥
ভাবান্তর সম্বন্ধে বিবিধ ভেদ হবে।*
বুদ্ধি প্রভাবে বুধ তাহারে জানিবে ॥

৬—অনুরাগ

সদাদৃষ্ট কৃষ্ণে দেখে নূতন নূতন।
রাগ নব নব হএ 'অনুরাগ' পুনঃ ॥

যথা,—('দানকেলিকৌমুদী'তে)—

হরি দেখি বারে বার এমন মাধুর্য্য আর কথন না করি দরশন।
এক অঙ্গে যেই শোভা তাহাতে করিয়া লোভা তাই পীতে না পারে নয়ন ॥

† অর্থাৎ—ঘৃতস্নেহ, উদাত্ত, মৈত্র, সুমৈত্র ও নীলিমা রাগ। § অর্থাৎ—মধুস্নেহ, ললিত, সখ্য, সুমৈত্র ও নীলিম, সুসখ্য ও রক্তিমা প্রভৃতি।

* বিবিধ ভেদ—অর্থাৎ, মধুরাখ্য স্থায়িভাব—১ + ব্যভিচারী ভাব—৩৩, + হাসাদি ভাব—৭, মোট ৪১ প্রকার ভেদ। নবম অধ্যায়ে, ব্রজসুন্দরীগণের চারি প্রকার মাত্র ভেদ বিবৃত হইয়াছে—স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থ ও প্রতিপক্ষ (পৃঃ ৭৮)। কিন্তু অন্যান্য ভেদও লক্ষিত হয়। শুক্ল, নীল, রক্ত ও পীত—এই চারি মূল বর্ণের মিশ্রণভেদে বহুবিধ বর্ণের উৎপত্তির ন্যায়, ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহের পরস্পর একপাদ, অর্দ্ধপাদ ও সার্দ্ধপাদাদি মিশ্রণভেদে, এবং নীল প্রভৃতি

'অনুরাগের' ক্রিয়া বা অনুভাব

পরস্পর বশ হয়, প্রেম বৈচিত্ত্য।
অপ্রাণীতে জন্ম নিতে আশা করে চিত্ত ॥
বিপ্রলম্ভে সদাই গোবিন্দ স্ফূর্ত্তি হয়।
'অনুরাগের' ক্রিয়া এই কবিগণ কয় ॥

১—পরস্পর বশীভাব

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি কুন্দলতা)—

রাধাগোবিন্দের প্রেম যেন জম্বুনদ হেম পরস্পর বাড়িবারে চায়।
কৃষ্ণ মন কুঞ্জর রাইর প্রেম-নিগড় সদা বদ্ধ আছয়ে তাহায় ॥
কৃষ্ণ-প্রেমের অপূর্ব্ব মাধুরী।
যাহার প্রেমের গুণে রাধার মন-হরিণে বান্ধিয়াছে নিজ বশ করি ॥

২—প্রেম-বৈচিত্ত্য

প্রেম-বৈচিত্ত্য যেই করেছে গণন।
বিপ্রলম্ভ-প্রকরণে করিব বর্ণন ॥

৩—অপ্রাণীতে জন্ম-লালসা

যথা,—(ললিতা প্রতি শ্রীরাধা)—

সাগরে যাইয়া কামনা করিব বেণু হব এইবার।
ত্রিভুবন মাঝে যতেক জনম বেণু সে সকল সার ॥
যে তপ করিয়া মুরলী হয়েছে সদা রহে হরি-করে।
অধরের সুধা বড়ই মধুর মনোসুখে পান করে ॥

৩—বিপ্রলম্ভে বিশিষ্ট স্ফূর্ত্তি

যথা—(কোন পান্থ প্রতি ললিতা)—

মথুরা যাইছ তুমি এককথা বলি আমি কয়্য তুমি মথুরার নাথে।
ছাড়িয়াছ ব্রজনারী এসেছ মথুরাপুরী তাথে মোর দুঃখ নাহি চিতে ॥

৭—ভাব

অনুরাগ আপনি যদি হয় প্রকাশিত।
যাদবাশ্রয় বৃত্তি 'ভাব' হয়ত বিদিত ॥

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বৃন্দা)—

জো রাধাকৃষ্ণ মন স্বেদে করি বিলেপন ভেদ-ভ্রম দূর করি দিল।
ব্রহ্মাণ্ড হর্ম্ম্যের মাঝ শৃঙ্গার চিত্রক রাজ নবরাগ-হিঙ্গুল তাথে দিল ॥
বিরচিল বড় অদভুত।
তাথে চিত্র কৈল যেই পরম মোহন সেই তাহা নহে কাহার বিদিত ॥

মহাভাব

কৃষ্ণমহিষীগণের অত্যন্ত দুর্লভ।
ব্রজদেবীর মাত্র এই হয় 'মহাভাব' ॥
পরম অমৃত এই মহাভাব হয়।
মহাভাব রূপ তার হয়ত হৃদয় ॥

'ভাব'—দ্বিবিধ

সেই 'ভাব' হয় তাহে দুই ত প্রকার।
'রূঢ়', 'অধিরূঢ়'—এই দুই নাম তার ॥

১—'রূঢ়'-ভাব

উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক হলে 'রূঢ়' ভাব হয়।
রসশাস্ত্রে এই মত কবিগণ কয় ॥

'রূঢ়'-ভাবের অনুভাব

ইহাতে নিমেষ কাল না যায় সহন।
দেখি চিত্তে ক্ষোভ পায় নিকটস্থ জন ॥
অতি অল্পকাল কল্পকাল, বলি মানে।

নায়কের সুখেতেও দুঃখ শঙ্কা করে।
তাথে ক্ষীণ হয় সদা ধৈর্য্য নাহি ধরে॥
এক ক্ষণ কান্তে যদি না দেখে নয়নে।
অতি অল্পক্ষণ কল্পকাল করি মানে॥
ইত্যাদি অনুভাব, 'রূঢ়'-ভাবে হয়।
যোগ বিয়োগ উচিত করিঞ নির্ণয়॥

নিমেষের অসহিষ্ণুতা

যথা,—(কুরুক্ষেত্রে মিলিতা গোপী-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে)—

গোপীগণ কৃষ্ণচন্দ্র দেখি পাইল চিত্তানন্দ রুষি করে বিধির নিন্দন।
আরে বিধি, কি করিলি আঁখে কেন পাখা দিলি নিমেষ মেনে না যায় সহন॥

এক উদাকৃতি কৈল দিগ্‌দরশন।
আর সব যথাযোগ্য জানিহ বর্ণন॥

২—'অধিরূঢ়'-ভাব

রূঢ়ে উক্ত অনুভাবের বিশিষ্টতা হয়।
'অধিরূঢ়' বলি তারে কবিগণ কয়॥

যথা,—(পার্ব্বতী প্রতি মহেশ্বর)—

ত্রিভুবনের যত সুখ আর যত আছে দুঃখ সবে যদি একত্র মিলয়।
রাধার সুখ দুঃখ সিন্ধু তার যেই এক বিন্দু তাহার তুলনা নাহি হয়॥

'অধিরূঢ়'—দ্বিবিধ

সেই 'অধিরূঢ়' হয় দুই ত প্রকার।
'মোদন', 'মাদন' এই নাম হয় তার॥

ক—'মোদন'

সাত্ত্বিক উদ্দীপ্ত সৌষ্ঠব হয়ত যাহাতে।
'মোদন' বলিয়া কহি রসশাস্ত্র মতে॥

যথা,—('ললিতমাধব' গ্রন্থে)—

রাধাকৃষ্ণের উল্লাস কল্পতরু পরকাশ তাহে কলকণ্ঠ নাদ শুনি।
স্তম্ভশোভা অতিশয় শোভিত অঙ্কুর হয় স্বেদ-জল মুক্তাফল জিনি॥
অতি শোভে সেই তরুবর।
অশ্রুজল মধু পড়ে কাঁপয়ে বিভ্রম ভরে তার মূল বড় দৃঢ়তর॥

রাধাকৃষ্ণের ইহা বিক্ষোভ বাড়ায়।
প্রেম-সম্পদ রতি কান্ত অতিশয়॥
রাধিকার যুথে মাত্র হয়ত 'মোদন'।
হ্লাদিনী শক্তির এ বিলাসে উত্তম॥

প্রেমোরুসম্পদ্বতী বৃন্দাতিশয়িত্ব, যথা,—(রুক্মিণী দেবীর সখীর উক্তি)—

যে ভবানী শিব গায়ে অর্দ্ধ অঙ্গ হয়ে রয়ে লক্ষ্মী নারায়ণের বক্ষে রহে।
সত্যভামা বড় প্রিয়া চন্দ্রাবলী অতিশয়া তথাপি রাধার তুল্য নহে॥

(অ)—'মোহন'

"মোদন' বিরহ দশায় হয়ত 'মোহন'।
সুদ্দীপ্ত তাহাতে হয় সাত্ত্বিকের গণ॥

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি উদ্ধব)—

কে করে কম্পের অন্ত বাজন বাজায় দন্ত স্বরভঙ্গে কণ্ঠ ঘড়ঘড়।
অশ্রু কথা কেবা কহে যাহাতে যমুনা বহে পুলকে সকল অঙ্গ জড়॥
তোমার বিরহে হেন রাধা।
শ্বেতবর্ণ অঙ্গ তার দেখি লাগে চমৎকার সখীগণ মনে পায় বাধা॥

'মোহনের' অনুভাব

ইহাতে কহিযে পুনঃ অনুভাবগণ।
কান্তাশ্লিষ্ট গোবিন্দের হয়ত মূর্চ্ছন॥
কোন প্রকারে যদি তার সুখ হয়।
তাহাতে অসহ্য দুঃখ স্বীকার করয়॥
ব্রহ্মাণ্ড ক্ষোভ করে সেই ত 'মোহন'।

তাহা দেখি পুনঃ পাখী করয়ে রোদন ॥
আপন অঙ্গের করে বিলাস স্বীকার।
তাহাতেও পায় যদি অঙ্গ-সঙ্গ তার ॥
আর দিব্যোন্মাদাদি হয়ত বিস্তর।
এই মত অনুভাব হয় বহুতর ॥
প্রায় বৃন্দাবনেশ্বরীর হয়ত মোহন।
সঞ্চারি মোহেতে যার কার্য্য বিলক্ষণ ॥

কান্তালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা, যথা,—(মথুরা হইতে আগতা সন্ন্যাসিনীর উক্তি)—

দ্বারকায় রত্ন ঘরে বসিয়াছে যদুবরে রুক্মিণী করিয়া আলিঙ্গন।
রাধাকুণ্ডে রাধা সঙ্গে স্মরি সে সব রঙ্গে অমনি হইল মূরছন ॥

অসহ্য দুঃখ স্বীকারপূর্ব্বক কৃষ্ণসুখ কামনা, যথা—(উদ্ধব প্রতি শ্রীরাধা)—

হরি আসে ব্রজপুরে তবে সুখ হয় মোরে এলে ত কৃষ্ণের নাহি ক্ষতি।
যদি নাহি আসে হরি তবে ত বিয়োগে মরি তথাপি আমার এই মতি ॥
হরির যদি সুখ মধুপুরে।
তবে সে তথায় রহু মনে সুখ করু বহু ইহাই সদা আমার অন্তরে ॥

ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিত্ব যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি নান্দীমুখী)—

ত্রিভুবনের নরজন সভে করে ক্রন্দন ফণীকুল হইল ব্যাকুল।
খেদ পায় দেবগণ কান্দয়ে বৈকুণ্ঠজন দেখি রাধা বিরহের শূল ॥

তির্য্যক্ জাতির রোদন, যথা—(পৌর্ণমাসী প্রতি নান্দীমুখী)—

মধুপুর ছাড়ি হরি চলে দ্বারাবতী পুরী সে সম্বাদ রাধিকা শুনিল।
কৃষ্ণের উত্তরি বাস করিয়া গলার পাশ কুঞ্জ মধ্যে কান্দিতে লাগিল ॥
দেখ, রাধা-প্রেম সর্ব্বোত্তম।
যাহার বৈকুল্য দেখি কান্দে সব পশু পাখী জলে কান্দে জলচরগণ ॥

মৃত্যু স্বীকারপূর্ব্বক নিজ দেহস্থ ভূত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গতৃষ্ণা, যথা—(ললিতা প্রতি শ্রীরাধা)—

তনু হউক বিনাশন তার যেই ভূতগণ মহাভূতে করুক প্রবেশ।

বিধির চরণ ধরি বহুত বিনয় করি তাথে এই যাচিয়ে বিশেষ ॥
যাথে স্নান করে হরি আমার অঙ্গের বারি সেই সরোবরে রহু যায়া।
কৃষ্ণ মুখ দেখে যাথে হেন সেই মুকুরেতে মোর তেজ রহু লয় হয়া ॥
কৃষ্ণের যে অঙ্গন তাথে রহু শূন্যগণ ক্ষিতি রহু গোবিন্দের পথে।
কৃষ্ণের যে বীজন মোর অঙ্গ পবন চিরকাল লীন রহু তাথে ॥

আ—দিব্যোন্মাদ

মোহনে পরম গতি কথনীয় নয়।
তাথে চিত্তভ্রম-আভা 'দিব্যোন্মাদ' হয় ॥
'উদ্‌ঘূর্ণা', 'চিত্রজল্পাদি' তার ভেদ হয়।
অনেক আছয়ে ভেদ কবিগণ কয় ॥

১—উদ্‌ঘূর্ণা

অঙ্গের বিবশতা হয়ে নানা চেষ্টা হয়।
'উদ্‌ঘূর্ণা' বলিয়া তারে কবিগণ কয় ॥

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি উদ্ধব)—

কখন বা কুঞ্জগৃহে বাস-সজ্জা করি রহে বলে, পাব কৃষ্ণ দরশন।
দেখি নব জলধরে মানের আচার করে করে বহু তর্জ্জন গর্জ্জন ॥
দেখি রাতি অন্ধকার কভু করে অভিসার হয় বহু সম্ভ্রম অপার।
অন্তরে বিরহ জ্বর অঙ্গ সব জর জর রাধা করে কত ব্যবহার ॥

'ললিতমাধবে' কৃষ্ণের মথুরা গমন।
তৃতীয়াঙ্কে আছে রাধার 'উদ্‌ঘূর্ণা' বর্ণন ॥

২—চিত্রজল্প

কৃষ্ণের সুহৃদ্ দেখি গূঢ় রোষ করে।
বহু ভাবময় হয়া তীব্রোৎকণ্ঠা ধরে ॥
'চিত্রজল্পের' হয় দশ অঙ্গ বিরচিত।
'প্রজল্প' এক, আর 'পরি-পূর্ব্ব জল্পিত' ॥

'বিজল্প', 'উজ্জল্প', 'সংজল্প' নাম তার।
'অবজল্প', 'অভিজল্প', 'আজল্প' নাম আর॥
'প্রতিজল্প', 'সুজল্প'—এই চিত্রজল্পগণ।
দশমে 'ভ্রমরগীতায়' আছে বিবরণ॥*
অসংখ্য বিচিত্র ভাব অতি চমৎকার।
তবু 'চিত্রজল্প' কিছু করি যে প্রচার॥

(১)—প্রজল্প

অসূয়ের্ষ্যা মদযুক্ত প্রিয়ের ন্যক্কার।
'প্রজল্প' ধরয়ে নাম অকৌশলোদ্গার॥

যথা,—(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৪৭।১০—১৯—ভ্রমর ভ্রমে উদ্ধব প্রতি শ্রীরাধা)—

ভ্রমর! ভণ্ডের মিতা! চরণে না দিও মাথা সপত্নী কুচের যে মালা।
তাহার কুঙ্কুম লয়া নিজ শ্মশ্রু রাঙ্গাইয়া তুমি কেন ব্রজপুরে এলা॥
যার দূত তুমি হেন জন।
মানিনী মথুরা-নারী তার প্রসাদ কর হরি যদু-সভায় পাবে বিড়ম্বন॥

(২)—পরিজল্প

প্রভুর নির্দ্দয়তা, শাঠ্যাদির উৎপাদন।
'পরিজল্প'-ভঙ্গে নিজ সুধীত্ব কথন॥

যথা—(ঐ)—

অধরের সুধা যেই পরম মোহন সেই আমাদিকে করাইল পান।
ভৃঙ্গ যেন ছাড়ে ফুল করিতে মন ব্যাকুল হরি কৈল মথুরা পয়ান॥
এই বড় অদ্ভুত মোরে।
কিবা এই তার গুণ লক্ষ্মীর হরিল মন সেই আসি পদ সেবা করে॥

(৩)—বিজল্প

ব্যক্ত অসূয়া যাথে গূঢ় মান ধরে।
'বিজল্পেতে' কৃষ্ণচন্দ্রে কটাক্ষোক্তি করে॥

* শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে 'ভ্রমরগীত' বর্ণিত আছে।

যথা,—(ঐ)—

হেদে হে নির্ব্বুদ্ধি ভৃঙ্গ ছাড়হ গানের রঙ্গ আমরা কেবল বনবাসী।
ত্বরায় যদুসভা যাও কৃষ্ণপ্রিয়া গুণ গাও সেথা গেলে পাবে সুখরাশি॥

(৪)—উজ্জল্প

গর্ব্বগর্ভ ঈর্ষ্যাতে হরির কুহকতা।
সাসূয় আক্ষেপ কহে 'উজ্জল্পের' প্রথা॥

যথা—(ঐ)—

স্বর্গ, ভূমি, রসাতল তাথে নারী সকল কেহ তোমার সুদুর্ল্লভ নয়।
যে তোমার কপট হাস বাঁকা ভুরুর বিলাস যাথে পদ্মা পদদাসী হয়॥
হায় বিধি, বড় অগেয়ান।
এমন কপট জনে কপটীয়া নাহি ভনে 'উত্তমশ্লোক' কৈল নাম॥

(৫)—সংজল্প

সোল্লুণ্ঠ গম্ভীর ক্ষেপ বাক্য কহে বাম।
কৃষ্ণে অকৃতজ্ঞ উক্তি, 'সংজল্প' তার নাম॥

যথা—(ঐ)—

পদ ছাড় ভৃঙ্গ তুমি তোমারে জানি যে আমি তুমি বহু জান অনুনয়।
তোহে দেখি দূতবরে মুকুন্দ পাঠাল তোরে এ ত তোমার উপযুক্ত নয়॥
ওহে ভৃঙ্গ, দেখ আমাদের অপমান।
যার লাগি সব ছাড়ি ছাড়ি গেল হেন হরি তার সনে কিসের সন্ধান॥

(৬)—অবজল্প

হরির কাঠিন্য ধৌর্ত্তা, সের্ষ্যাভয়ে কয়।
আসক্তির অযোগ্যতা 'অবজল্প' হয়॥

যথা—(ঐ)—

পূর্ব্ব জন্মে রাম হঞা বালি কপি বিনাশিয়া যেহ কৈল ব্যাধের আচার।
সূর্পনখার নাসাকর্ণ তাহা কৈল ছিন্ন ভিন্ন বড়ই নির্দ্দয় মন তার॥

পুনশ্চ বামন হয়া	বলির সর্ব্বস্ব লয়া	পুনঃ তারে করিল বন্ধন।
হেন কৃষ্ণবর্ণ যে	তার সখ্য চাহে কে	তভু তারে নাহি ছাড়ে মন॥

(৭)—অভিজল্প

ভঙ্গি করি তার ত্যাগ উচিত কহয়।
পক্ষীগণে খেদ দেয় এই কৃপা হয়॥
সেই কৃপাবলে তার ত্যাগ উচিত।
'অভিজল্প' সেই রস শাস্ত্রের বিদিত॥

যথা—(ঐ)—

যার লীলা সুধাসম	করি তার চর্ব্বণ	পক্ষীগণ ছাড়ে দ্বন্দ্ব ধর্ম্ম।
এখন নিজ পরিবার	ছাড়ি ভিক্ষু আচার	করে দেখি কাটে মোর মর্ম্ম॥

(৮)—আজল্প

কৌটিল্যেতে কষ্টে হরি মোরে পীড়া দিব।
অন্য কথায় সুখ হয় তাহাই শুনিব॥
এই মত ভঙ্গি করি কহয়ে বচন।
'আজল্প' বলিয়া তারে কহে কবিগণ॥

যথা—(ঐ)—

আমরা মুগুধা নারী	তার কথায় শ্রদ্ধা করি	বান্ধা গেনু যেমন হরিণী।
তাহার পাইনু ফল	দুঃখে তনু টলমল	জর জর এ সব কামিনী॥
শুন, আমার	মন্ত্রণা-বচন।	
অন্য কথা কহ মুখে	শুনি মনে পাই সুখে	না করিহ কৃষ্ণের বর্ণন॥

(৯)—প্রতিজল্প

স্ত্রীসঙ্গ গোবিন্দ কভু না পারে ছাড়িতে।
আমাদের প্রাপ্তি তাথে হইবে কেমতে॥
দূতের সম্মান করি এই কথা কয়।
রস-শাস্ত্রে 'প্রতিজল্প' তার নাম হয়॥

যথা—(ঐ)—

তুমি ত আইলে পুনঃ কৃষ্ণ মোর প্রিয়জন কি দিয়াছেন আমাদের তরে।
তুমি কি চাহিছ ধন মাননীয় দূত জন তাহা অগ্রে কহত সত্বরে ॥
যতেক ব্রজের নারী লয়া যাবে মধুপুরী এ লাগি এসেছ ফিরিয়া।
মোরা সেথা না যাইব যেয়া সঙ্গ নাহি পাব লক্ষ্মী-হৃদে আছয়ে বসিয়া ॥

(১০)—সুজল্প

ঋজুতা, গাম্ভীর্য্য, দৈন্য, সোৎকণ্ঠা, চপল।
'সুজল্প' জিজ্ঞাসা করে সম্বাদ সকল ॥

যথা—(ঐ)—

শুধাই বিনয় করি মথুরাতে আছে হরি পিতৃগৃহ স্মরেণ কখন।
গোপগণে পড়ে মনে এই দিব্য বৃন্দাবনে মনে পড়ে যত কেলিগণ ॥
মোরা তার দাসীগণ কভু করেন স্মরণ কিছু কথা কহেন কখন।
তার যেই ভুজদ্বন্দ্ব যাহাতে অগুরু গন্ধ পুনঃ কিয়ে পাব দরশন ॥

খ—মাদন

সর্ব্বভাব উল্লসিত যেই পরাৎপর *
হ্লাদিনীর সার অংশ হয় সর্ব্বোপর †॥
তাহার 'মাদন' নাম রস-শাস্ত্র মতে।
সেই ভাব সর্ব্বদাই কেবল রাধাতে ॥

যথা—(নান্দীমুখী প্রতি পৌর্ণমাসী)

সর্ব্বদা অক্ষয় জানি দ্রবায় হৃদয়-মণি পূর্ণ হলেও সর্ব্বদা বক্রিমা।
রুচিতে সাধ্বস নাশে সুখ বাড়ায় প্রদোষে সদাই নবীন মধুরিমা ॥
দেখ, রাধাকৃষ্ণ প্রেম-শশী।
অদ্ভুত যাহার নাট কেবল মাধুর্য্য-হাট দোঁহে যেন পিরীতের রাশি ॥

---

* পরাৎপর—অর্থাৎ, মোহনাদি ভাব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

† হ্লাদিনীর সার—অর্থাৎ, প্রেম ; এই প্রেম যদি রতি আদি মহাভাব পর্য্যন্ত উদ্গমনে উল্লাসী হয়।

ঈর্ষ্যার অযোগ্যেতে* হয় ঈর্ষ্যা আরোপণ।
অতএব আশ্চর্য্যরূপ হয়ত 'মাদন'॥
সদা কৃষ্ণ সম্ভোগেতে সিঞ্চিত অন্তরে।
তবু তার গন্ধ বাতে তারে ব্যস্ত করে॥

অযোগ্যে ঈর্ষ্যা, যথা—('দানকেলি কৌমুদী' গ্রন্থে বনমালা দর্শনে শ্রীরাধা)—

শুদ্ধ ব্রজনারী বৃন্দ নাহি জানে ভাল মন্দ সুচরিত সরল অন্তর।
অহে কৃষ্ণের বনমালা, তাহাদিগে করি হেলা তুমি মিছা দ্বেষ কেন কর॥
এই শুদ্ধ ব্রজনারী তারে তৃণতুল্য করি সদা রহে গোবিন্দের অঙ্গে।
আপাদ মস্তক লয়া কৃষ্ণ অঙ্গ আলিঙ্গিয়া হৃদয়ে বিহার করে রঙ্গে॥

সতত সম্ভোগেও তদ্গন্ধ বা কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় গন্ধমাত্রের আধারকে স্তুতি, যথা—(শ্রীরাধা-বাক্য)—†

পুলিন্দী রমণীগণ রম্য তার জীবন যারা কৃষ্ণ চরণ কুঙ্কুম।
তৃণে লগ্ন তাহা পাঞা আপন হৃদয়ে লঞা সদাই কৌতুকী হয় মন॥

যোগেতে§ বিচিত্র হয় এই ত মাদন।
তাথে কোটী কোটী হয় নিত্যলীলাগণ॥
মাদনের যেই গতি মদন না জানে।
অন্যের কা কথা, মুনি‡ না জানে আপনে।

স্থায়িভাব—উপসংহার

'রাগের' 'অনুরাগতা' প্রথমেই হয়।
'স্নেহ' ত্বরা করি হয়, 'মান', 'প্রণয়'॥
অতএব প্রবন্ধেতে আছয়ে বর্ণন।
পূর্ব্বরাগ প্রসঙ্গেতে রাগের লক্ষণ॥

---

* ঈর্ষ্যার অযোগ্য—চেতনাশূন্য বস্তু।
† শ্রীমদ্ভাগবত—১০ম স্কন্ধ, ২১ অঃ, ১৭ শ্লোক।
§ যোগেতে = সম্ভোগকালে।
‡ মুনি—'নাট্যশাস্ত্র' নামক অলঙ্কার গ্রন্থ রচয়িতা প্রাচীন ঋষি (১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অথবা, শ্রীশুকদেব।

ব্রজদেবীর ভাবভেদ বহুতর হয়।
তর্কাগোচর হেতু বর্ণনীয় নয়॥

ভাবভেদ

'সাধারণী রতির' ভাব 'ধূমায়িত' হয়।
রতি প্রেমের ভাব 'জ্বলিত' নিশ্চয়॥*
স্নেহাদি পঞ্চেতে† 'দীপ্ত', রূঢ়েতে 'উদ্দীপ্ত'।
মোহনাদি স্থলে ভাব হয় 'সুদ্দীপ্ত'॥

রতির বিপর্য্যয়

এই প্রায়, কিন্তু শ্রেষ্ঠ মধ্যাদি নির্ণয়ে।
দেশ কাল জনাদ্যের বিপর্য্যয় হয়ে॥§

রতির সীমা

'সাধারণী রতি' প্রেম পর্য্যন্ত বাঢ়য়।
অনুরাগ অন্তঃসীমা 'সমঞ্জসার' হয়॥
'সমর্থা রতির' হয় মহাভাব সীমা।
ত্রিভুবনে যেই রতির নাহিক উপমা॥
নর্ম্মসখার রতি হয় 'অনুরাগ' অন্ত।
তার মধ্যে সুবল্যাদ্যের 'ভাব' পর্য্যন্ত॥
এই 'স্থায়িভাব' ইহা করিল বর্ণন।
যাহা শুনি সুখ পায় কৃষ্ণ-ভক্তগণ॥

---

* সমঞ্জসা ও সমর্থা রতিতে 'জ্বলিত' ভাব। † স্নেহাদি পঞ্চ —স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ।

§ 'ভাব-ভেদ' প্রসঙ্গে যে ব্যবস্থা উক্ত হইল, তাহা সর্ব্বত্র হয় না। দেশকালাদির শ্রেষ্ঠত্বহেতু কেবল 'রতিতে' 'দীপ্ত' ভাব হয়। কারণ—'দীপ্ত'-ভাব সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ। 'স্নেহাদিতে' 'জ্বলিতভাব' ইত্যাদি ক্রমে বুঝিতে হইবে। এই কবিতায় জনাদি শব্দে 'আদি' অর্থে—'সংসর্গ'ও ধর্তব্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিপ্রলম্ভ প্রকরণ

শৃঙ্গার ভেদ

শৃঙ্গারের নাম হয় দুই ত প্রকার।
'বিপ্রলম্ভ' এক, আর 'সম্ভোগ' শৃঙ্গার ॥

বিপ্রলম্ভ

মিলনে অমিলনে হয় 'বিপ্রলম্ভ' স্থিতি।
অভীষ্টালিঙ্গনাদ্যের বাধে নাহি প্রাপ্তি ॥
এই 'বিপ্রলম্ভ' বলি কবিগণ কয়।
'বিপ্রলম্ভ' হ'লে 'সম্ভোগ' অতিশয় হয় ॥*

'বিপ্রলম্ভ'—চতুর্ব্বিধ

'পূর্ব্বরাগ', 'মান', আর 'প্রেমবৈচিত্ত্য'।
'প্রবাস'—এই চারিভেদে বিপ্রলম্ভ স্থিত ॥

১—পূর্ব্বরাগ

'দর্শন', 'শ্রবণ' আদি সঙ্গমের পূর্ব্বে।
দোঁহার রতি 'পূর্ব্বরাগ' কহে কবি সর্ব্বে ॥

অ—দর্শন

সেই 'দরশন' হয় তিন প্রকার।
'সাক্ষাৎ', 'চিত্রপট', 'স্বপ্ন-দর্শন' আর ॥

---

* 'বিপ্রলম্ভ' সম্ভোগের উন্নতিকারক ; ইহা ব্যতিরেকে 'সম্ভোগে'র পুষ্টি হয় না। রঞ্জিত বস্ত্রের পুনর্ব্বার রঞ্জন হইলে যেরূপ পূর্ব্বরাগের অতিশয় বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ।

'সাক্ষাৎ' দর্শন, যথা,—('পদ্যাবলী'-গ্রন্থে বিশাখা প্রতি শ্রীরাধা)

বিকশিত ইন্দী- বর দল নিন্দিত তনুরুচি জগত মাতায়।
কাচা কাঞ্চন জিনি অতি সুন্দর পীতবাস পহিরল তায়॥
সখি হে, ফিরি দেখ এ হেন রঙ্গ।
বুকমাঝে হার কোন বরনাগর মঝু মনে দেওল অনঙ্গ॥

'চিত্রপট' দর্শন, যথা—('বিদগ্ধমাধব'-গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে শ্রীরাধা)—

পুনঃ পুনঃ পরিজন- গণ মঝু বোলন চিত্রক দরশন লাগি।
যব ধরি পথ মাঝে দেখনু নাগর মঝু মনে লাগল আগি॥
মুগধিনী নাগরী কাহে এত জানব দেখি হনু আনন্দে ভোর।
কো জানে অমৃত- জলধি মাঝে বাড়ব এ তনু দাহব মোর॥

'স্বপ্ন' দর্শন, যথা—(পদ্মা প্রতি চন্দ্রাবলী)

স্বপনে দেখাল্য বিধি কালজল এক নদী তার তীরে মাধবীর কুঞ্জ।
দেখিলাম তার মাঝে পীতবাস মধ্যে সাজে হেন মূর্ত্তি অন্ধকার পুঞ্জ।
হেদে সখি, সত্য বলি আমি বটি চন্দ্রাবলী এমন সে তমঃ পুঞ্জ মত।
মোর আগে ধেয়া যাঞা দুই হাত পশারিঞা হাসি হাসি আগলিল পথ।

আ— শ্রবণ

'বন্দী', দূতী', 'সখী'-মুখে 'গীতাদি' শ্রবণ।
ইত্যাদি 'শ্রবণ' কহে রসিকের গণ॥

'বন্দী'-বদন হইতে 'শ্রবণ', যথা,—(লক্ষ্মণার প্রতি তদীয়া সখী)*—

'দূতী'-মুখে শ্রবণ, যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বৃন্দা)—

তোমার দূতিকা হয়া তারার নিকটে যায়া তোমার রূপ কহিলাম আমি।
তারার কণ্ঠ হল রুদ্ধ অঙ্গ হল ভাবে বদ্ধ কহিতে নারিল কিছু বাণী॥

---

* এই উদাহরণটি অনুদিত হয় নাই। মূল গ্রন্থের শ্লোকানুবাদ এই—'লক্ষ্মণার সখী লক্ষ্মণাকে কহিলেন, হে সখি লক্ষ্মণে! বন্দিশ্রেষ্ঠ তোমার স্বয়ম্বর সভায় শ্রীকৃষ্ণ, মগধরাজ জরাসন্ধকে যুদ্ধে জয় করিয়াছেন, এই বিরুদাবলী বা

'সখী'-মুখ হইতে শ্রবণ, যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বিশাখা)—

মোর সহচরী তোমার এ রূপ শুনিয়া বচনে মোর।
সে দিন অবধি তনু অতি ক্ষীণ ভাবিয়া না পাই ওর ॥

'গীত' হইতে শ্রবণ, যথা—(সখী প্রতি বৃহৎসেন-তনয়া লক্ষ্মণা)—

রাজার সভাতে আসি নারদ তপোধন। বীণাযন্ত্রে গায় গোবিন্দের গুণগণ ॥
কতভাব উপনীত মুনির শরীরে। তাহা শুনি মোর নেত্র অনুখণ ঝরে ॥

পূর্ব্বরাগের হেতু

পূর্ব্বে রতি হেতু অভিযোগাদি বর্ণন।*
যথোচিত পূর্ব্বরাগে করিহ গঠন।

পূর্ব্বরাগের পারম্পর্য্য

যদ্যপি মাধব-রাগে প্রাথর্য্য সম্ভবয়।
আদৌ নায়িকা-রাগে মাধুর্য্য বাঢ়য় ॥†

সঞ্চারি ভাব

ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, সঞ্চারি হয় তার।
শ্রম, ক্লম, নির্ব্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য আর ॥

---

* চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ('স্থায়িভাব বিবৃতি')—'রতি আবির্ভাবের হেতু—বা রতিভেদ' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য (১৩০—৬০পৃঃ)

† এই প্রসঙ্গে, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের 'আনন্দচন্দ্রিকা'-টীকার মর্ম্মানুবাদ এই—"মাধব-রাগের প্রাথম্যে অর্থাৎ প্রথম উৎপন্ন হইলেও, মৃগাক্ষীদিগের অগ্রে চারুতার আধিক্য হয়। তাহার কারণ এই—'নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া'—'কৌস্তুভ অলঙ্কার'-গ্রন্থের বচনানুসারে, যদিচ বয়ঃসন্ধির আরম্ভে ভাবের প্রথম বিক্রিয়ানন্তরই স্ত্রী-পুরুষদ্বয়ের পরস্পরের অন্বেষণ সম্ভব হয়, তথাপি লজ্জা, ধৈর্য্য, কুলাচারাদি দ্বারা আবৃতা স্ত্রীর, পুরুষের প্রতি সহসা পূর্ব্বরাগ প্রকট হয় না। কিন্তু পুরুষের প্রতি ধৈর্য্য লজ্জাদি আবরক না হওয়াতে, সহসা প্রথম বিক্রিয়ার ক্ষণেই প্রায়, পুরুষ কর্ত্তৃক স্ত্রীলোকের অন্বেষণ উপস্থিত হয়। পরন্তু, এই প্রকার হইলে মৃগাক্ষীদিগের রাগ—'পূর্ব্বরাগে আদৌ' এই উক্তি হেতু চারুতার আধিক্য বর্ণিত হইয়াছে। কারণ, স্ত্রীগত প্রেমের আধিক্য আছে, প্রেম হইতে লজ্জাদি নিবারণ হয়—এ কারণ মৃগাক্ষীদিগের পূর্ব্বরাগ অগ্রেই বর্ণিত হয়। 'আদৌ রাগঃ স্ত্রিয়ো বাচ্যঃ পশ্চাৎ পুংসস্তদঙ্গিতৈরিতি'—('সাহিত্য দর্পণে')। আবার, কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে—ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তিকেই 'রস' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, কেননা, ঐ 'রস' ভক্তাশ্রয় অর্থাৎ ভক্তকে আশ্রয় করিয়া প্রকট হয়। ভগবানের 'রাগ', ভক্তরাগের পশ্চাৎ জন্মায়। ব্রজদেবী সকলের ভক্তের অবধি স্থান, এই নিমিত্ত তাঁহাদেরই প্রথমে পূর্ব্বরাগ হওয়া উচিত"

চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধন, করয়ে বিষাদ।
মোহ, মৃত্যু আদি করি, জড়তা, উন্মাদ॥

পূর্ব্বরাগ—ত্রিবিধ

সেই পূর্ব্বরাগ হয় তিন প্রকার।
'প্রৌঢ়', 'সমঞ্জসা', 'সাধারণ' ভেদ তার॥

(ক)—প্রৌঢ়

সমর্থ রতিরূপ 'প্রৌঢ়' পূর্ব্বরাগ কয়।
প্রৌঢ়ে দশা লালসাদি মরণান্ত হয়॥
সঞ্চারির উৎকণ্ঠত্বে বহু দশা হয়।
কবিগণ সংক্ষেপেতে দশ দশা কয়॥

দশ দশা

সম্প্রতি করিব দশ দশার লক্ষণ।
প্রথমেতে দশ দশা করিয়ে গণন॥
'লালসা', 'উদ্বেগ', আর সদা 'জাগরণ'।
'তানব', 'জড়িমা'. ব্যাগ্র', 'ব্যাধি', 'উন্মাদন'॥
'মোহ', 'মৃত্যু'—এই ইহার দশ দশা হয়।
প্রৌঢ়-পূর্ব্বরাগে প্রৌঢ় দশ দশা হয়॥

(১)—লালসা

অভীষ্ট লাভের লাগি গাঢ় লোভ হয়।
'লালসা' বলিয়া তারে রসশাস্ত্রে কয়॥
লালসাতে ঔৎসুক্যের চপলতা আর।
ঘূর্ণা, নিশ্বাস আদি সঞ্চারি বিকার॥

যথা, (শ্রীরাধা প্রতি ললিতা)—

পুনঃ পুনঃ কেন সদন ছাড়িয়া বাহির হইছ তুমি।
অমনি ত্বরিতে প্রবেশিলে ঘর বুঝিতে না পারি আমি॥

গুরুজনা ডরে নিশাসঁ ছাড়িয়া অমনি বসিছ কেনে।
চঞ্চল নয়নে কেন বা চাহিছ যমুনা নিকুঞ্জ পানে ॥

(২)—উদ্বেগ

রহি রহি মনে যেই বাড়য়ে কম্পন।
'উদ্বেগ' বলিয়া কহে রসিকেরগণ ॥
তাহে নিশ্বাস, চপলতা, অশ্রু, চিন্তন।
স্তম্ভ, বৈবর্ণ্য, স্বেদ হয় অনুক্ষণ ॥

যথা,—('বিদগ্ধমাধব'-গ্রন্থে শ্রীরাধা প্রতি বিশাখা)—

কিবা চিন্তা কর মনে মলিন বদন কেনে কেন অশ্রু দুটি আঁখি ভরি।
এত তোর নেত্র জল আদ্র হলো বস্ত্রাঞ্চল কেন বা কাঁপিছ থরহরি ॥
হৃদয়ে না কর ব্যথা কহ গো মনের কথা ইহা না করিহ সংগোপন।
আমার বচন ধর কারে বা সম্ভ্রম কর মোরা তোর প্রিয় সখীগণ ॥

(৩)—জাগর্য্য

নিদ্রানাশের নাম হয় 'জাগরণ'।
স্তম্ভ, শোষ, ব্যাধি আদি তাহার লক্ষণ ॥

যথা,—(বিশাখা প্রতি শ্রীরাধা)—

পীতাম্বর যেই ধরে হেন শ্যামবর্ণ চোরে নিদ্রা আনি দেখাইল মোরে।
সেই দিন হৈতে নিদ্রা রোষ করি কৈল যাত্রা পুনঃ নিদ্রা না আইল ফিরে ॥
বড় শঠ সেই চোর মন, ধন নিল মোর তারে পুনঃ দেখিতে না পাই।
নিদ্রা যদি এসে ফিরে তবে চোর দিব ধরে তেই সখি, তোমারে শুধাই ॥
ব্যাকুল হয়েছি আমি নিদ্রারে দেখেছ তুমি মোর কাছে আনহ তাহারে।
নিদ্রা যদি আসে মোরে তবে ধরি সেই চোরে আপনার মন নিব ফিরে ॥

(৪)—তানব

অঙ্গের কৃশতা হলে 'তানব' বলি কয়।
কৃশ হলে দুর্বলতা, ভ্রমণাদি কয় ॥

যথা,—(বিশাখা প্রতি তদীয়া সখী)—

হাতের বলয় চয় খসি হাত শূন্য হয় তাহা অমঙ্গল আশঙ্কিয়া।
বলয়েরে আবরিতে পুইছা* পরিল হাতে সেহ পড়ে বাহির হইয়া ॥
তোমার মুরলী শুনি বিশাখা বিষাদ গণি কেবল রহএ ঘরে বসি।
ছিল পূর্ণ চন্দ্র সম এখন হইল যেন কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দ্দশী শশী ॥

ইত্যঃমধ্যে কোন কোন রসিকের গণ।
'তানবে'র স্থলে করে 'বিলাপ' লিখন ॥

যথা,—(সখীগণ প্রতি শ্রীরাধা)—

এই ত কদম্বতলে হরি নানা মতে খেলে এইখানে নাচে সখাগণে।
আমি লতায় লুকাইয়া সেই লীলা নিরখিয়া খালি পুড়ি মদন দহনে ॥

(৫)—জড়িমা

ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান নাহি প্রশ্নের উত্তর।
দর্শন শ্রবণ নাহি 'জড়িমা' অন্তর ॥
অকস্মাৎ হুঙ্কার ছাড়ে, স্তম্ভ হয়া রয়।
নিশ্বাস, ভ্রম আদি জড়িমার গুণ হয় ॥

যথা,—(পালি প্রতি তদীয়া সখী)—

অকস্মাৎ হুঙ্কার কেন সখীর বাক্য নাহি শুন নিশ্বাসের দীঘল প্রমাণ।
আমি বুঝিলাম মনে তোমার দুই শ্রবণে প্রবেশিল মুরলীর গান ॥

(৬)—বৈয়গ্র্য

ভাবের গাম্ভীর্য্য ক্ষোভ না পারে সহিতে।
'ব্যগ্রতা' বলিয়া কহে রসশাস্ত্র মতে ॥
বিবেচনা শূন্য হয় হৃদয়ে নির্ব্বেদ।
অসূয়া করয়ে সদা বাড়ে বড় খেদ ॥

---

* পইছা—মণিবন্ধের অলঙ্কার বিশেষ

যথা,—(পৌর্ণমাসী প্রতি নান্দীমুখী)—

সকল বিষয় ছাড়ি ইন্দ্রিয় আনিয়া কাড়ি অনেক যতনে মুনিগণ।
বহুকাল কৃশ হয়া হৃদয়ে আনন্দ পায়া কৃষ্ণ অঙ্গে সমর্পয়ে মন॥
রাধার উল্টা রীত কৃষ্ণ হতে কাড়ি চিত বিষয়েতে সমর্পিতে চায়।
কৃষ্ণের মধুর গুণে বান্ধিয়া রেখেছে মনে যতনে ছাড়াতে নারে তায়॥
যার স্ফুর্ত্তি-লব লাগি কত যোগ করে যোগী তবু যেনে দেখিতে না পায়।
সে হরি রাধার মনে বিলসয়ে রাত্রিদিনে রাই তারে উকাসিতে চায়॥

(৭)—ব্যাধি

অভীষ্ট অলাভে হয় 'ব্যাধির' জনম।
পাণ্ডুতা, হৃদয়ে তাপ, তাহার লক্ষণ॥
শীত, স্পৃহা, মোহ, শ্বাস, ধরণী পতন।
এ সব বিকার ত'থে কহে কবিগণ॥

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ভদ্রার সখী)—

ভদ্রা হৃদি-দাবানলে সদাই অধিক জ্বলে নিশ্বাস পবনে বাড়ি গেল।
তুমি অগ্নি কর পান এই করি অনুমান হৃদি মাঝে তোমারে ধরিল॥
তুমি হৃদি প্রবেশিলে দ্বিগুণ অগ্নি জ্বেলে দিলে সে আগুন নাহিক নিভায়।
বড় তুমি সাধুজন হেন রীত কর কেন তার দেহ হৈল ভস্মপ্রায়॥

(৮)—উন্মাদ

সকল অবস্থাতে হয় কৃষ্ণগত মন।
শীতলাদি বস্তুতে হয় তীক্ষ্ণত্যাদি শ্রম॥
রসশাস্ত্রে 'উন্মাদ' বলিয়া তারে কয়।
ইষ্ট-দ্বেষ, নিশ্বাস, নিমেষ-বিরহ সম্ভবয়॥

যথা,—('বিদগ্ধমাধব'-গ্রন্থে সখীগণ প্রতি শ্রীরাধা)—

পটমাঝে মরকত সুন্দর নাগরে, যব ধরি দেখলু হাম।
কুটীল দৃগঞ্চল মঝু পর দেওল মনোমাঝে বিতরল কাম॥

তব ধরি আগনি শশী সম লাগই শশী ভেল আগুনি সমান।
কাতর অন্তর জর জর হোয়ল ছট্‌ফটি করই পরাণ॥

(৯)—মোহ

বিরুদ্ধচিত্ততা হৈলে 'মোহ' বলি কয়।
নিশ্চল, পতন আদি তার গুণ হয়॥

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বিশাখা)—

নাসায় নিশ্বাস নাই বিঘটিত আঁখি দুই বধূর ব্যাধি ঠাহরিতে নারি।
কৃষ্ণ তিল আনি দেহ সংস্কার করিব দেহ এই বাক্য কহিল শাশুড়ী॥
'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণে প্রবেশ করিল কর্ণে তেই অঙ্গে হইল কম্পন।
মোর বুদ্ধি বড় ধীর ভাবিয়া করিলাম থির তুমি বট তাহার কারণ॥

(১০)—মৃত্যু

বহু যত্নে নাহি হয় কৃষ্ণ সমাগম।
তবে গোপীকার হয় মরণ-উদ্যম॥
নিজ প্রিয়বস্তু সখীরে করে দান।
ভৃঙ্গ, মন্দানিল, জ্যোৎস্না, কদম্ব সন্ধান॥

যথা,—(পৌর্ণমাসী প্রতি বৃন্দা)—

কদম্ব কুঞ্জের বনে ভৃঙ্গের মধুর স্বনে তাথে রাধা প্রবেশ করিল।
কৃষ্ণের বিরহ স্বরে সদাই অন্তর পোড়ে তাথে জ্বালা দ্বিগুণ বাড়িল॥
ললিতারে হার দিয়া রাধা পড়ে মূর্চ্ছা হয়া ব্যাকুল হইল সখীগণ।
কর্ণে কৃষ্ণ-নাম করে জুড়াইল অন্তরে কতক্ষণে পাইল চেতন॥

(খ)—সমঞ্জস

সমঞ্জস রতিরূপ পূর্ব্বরাগ হয়।
'সমঞ্জস' বলি তারে কবিগণ কয়॥
'অভিলাষ', 'চিন্তা', 'স্মৃতি', 'গুণসঙ্কীর্ত্তন'।
'উদ্বেগ', 'বিলাপ' হয়, আর 'উন্মাদন'॥

'ব্যাধি', 'জড়তা', 'মৃতি' ক্রমে ক্রমে হয়।
প্রথমতঃ কহি 'অভিলাষের' নির্ণয়॥

(১)—অভিলাষ

প্রিয়ার সঙ্গম লাগি করে ব্যবসায়।
এই 'অভিলাষের' রাগ প্রকটনাদি হয়॥

যথা,—(সত্যভামা প্রতি সখী)—

সত্যভামা তোরে কই সুভদ্রার সঙ্গে সই ছলে যায় দেবকীর ঘর।
বসন ভূষণ গায় নিতিনিতি যায় তায় কিছু আছে মনের ভিতর॥

(২)—চিন্তা

অভীষ্ট প্রাপ্তির লাগি করে যেই ধ্যান।
'চিন্তা' বলি কবিগণ করয়ে আখ্যান॥
শয্যাতে শয়ন করে, নিশ্বাস ঘনে ঘন।
মিছা দৃষ্টিক্ষেপ আদি তার গুণগণ॥

যথা,—(রুক্মিণী প্রতি কোন প্রতিবেশিনী)—

হেদে গো রুক্মিণী তোর চিন্তা দেখি লাগে ডর নিশ্বাসেতে মলিন অধর।
মলিন বদন-শশী তাহে নাহি মৃদুহাসি শয্যার অধীন কলেবর॥
চমকিত দু'নয়নে চাহিছ কাহার পানে তাহে কেন ঘন বহে জল।
কালি তোমার পরিণয় এ পুরি আনন্দময় তোমায় কেন দেখি এ সকল॥

(৩)—স্মৃতি

'স্মৃতি', পূর্ব্ব-দৃষ্ট বস্তু পুনশ্চ চিন্তন।
কম্প, বৈবর্ণ্য, বাষ্প, নিশ্বাস তার গুণ॥

যথা,—(সত্যভামা প্রতি তদীয়া সখী)—

জলপূর্ণ নেত্র-পদ্ম কাঁপে কুচ রথপদ ভুজমৃণাল অতি কম্পবান।
তোর চিত্ত সরোবর তাথে কৃষ্ণ করিবর বুঝি করে ক্রীড়ার নির্ম্মাণ॥

(৪)—গুণকীর্ত্তন

সৌন্দর্য্যাদি গুণের এক করয়ে শ্লাঘন।
'গুণসঙ্কীর্ত্তন' বলি কহে কবিগণ॥
তাহাতে রোমাঞ্চ, কম্প, হয় অনুক্ষণ।
কণ্ঠ গদ্‌গদ আদি তার গুণগণ॥

যথা,—(সন্দেশপত্র লিখনান্তর কৃষ্ণ প্রতি রুক্মিণী)—

তোমার রূপ তৃষ্ণা করি ত্রিভুবনে যত নারী সবে ঘূর্ণাকুল হয় মন॥
তুমি নিজরূপ হেরি যা কহ বিস্ময় করি রোমগণ করয়ে নর্ত্তন॥
মোর মন মধুকর তোমার মাধুর্য্য ভর দূর হতে করিয়ে শ্রবণ।
ধৈরজ ধরিতে নারে চাহে উড়ি যাইবারে তুমি তারে কর আশ্বাসন॥

'উদ্বেগ' আদি পূর্ব্বে দিল 'প্রৌঢ়ে' উদাহরণ।
'সমঞ্জসে' যেনো তার যথোচিত বর্ণন॥*

(গ)—সাধারণ

সাধারণ রতিপ্রায় হয় 'সাধারণ'।
'বিলাপ' পর্য্যন্ত তার দশার বর্ণন॥†

'অভিলাষ', যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ দর্শনান্তর কুরুপুরস্ত্রীগণের উক্তি)—

কত তপ করি তারা হয়েছিল নারী। যাহাদের পতি এই সুন্দর মুরারী॥

'চিন্তা'দির উদাকৃতি নহে বিবরণ।
যথোচিত উদাকৃতি দিবে ধীরগণ॥

কামলেখ ও মাল্যার্পণ

পূর্ব্বরাগে 'কামলেখ', 'মালা' বহুতর।
বয়স্যাদি দ্বারা পাঠায় পরস্পর॥

---

* উদ্বেগ, বিলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃতি - এই ছয়টির পূর্ব্বে 'প্রৌঢ়'-স্থানে উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু 'সমঞ্জসা' রতির সামঞ্জস্য হেতু, এস্থলেও যথোচিতরূপে এই ছয়টি হইয়া থাকে।

† অর্থাৎ—অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্ত্তন, উদ্বেগ ও বিলাপ—এই ছয় দশা।

ক—কামলেখ

'কামলেখ' বলিয়া তাহার হয় প্রথা।
যাহাতে প্রকাশ হয় হৃদয়ের ব্যথা ॥
সেই 'কামলেখ' হয় দুই ত প্রকার।
'নিরক্ষর' একনাম, 'স্বাক্ষর' হয় আর ॥

(১)—'নিরক্ষর' কামলেখ

সুরক্ত পল্লবে অর্দ্ধচন্দ্রাদি আঁকিয়া।
আখর না লেখি লেখ দেয় পাঠাইয়া ॥

যথা,—(বিশাখার সখীপ্রদত্ত কামলেখ হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক সুবল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

নূতন পল্লব মাঝে অর্দ্ধচন্দ্র লেখা। সেই পত্র মোরে আজি পাঠাল বিশাখা ॥
সেই লেখ হ'ল কামের অর্দ্ধচন্দ্র বান। হৃদয়ে প্রবেশি ব্যাকুল কৈল প্রাণ ॥

(২)—'স্বাক্ষর' কামলেখ

নিজ কথা পত্রী মাঝে করয়ে লিখন।
'স্বাক্ষর'-লেখ বলি তারে কহে কবিগণ ॥

যথা,—(শশীমুখী দ্বারা প্রেরিত শ্রীরাধার কামলেখ—'জগন্নাথ বল্লভ' নাটকে ২।২৯)—

প্রবেশ আমার মন দুঃখ দেয় মদন অপযশ রাখিল ভুবনে।
যখন যেদিকে চাই তোমারে দেখিতে পাই মদনেরে না দেখি নয়নে ॥

পুষ্প দলে কস্তুরিকা কালির অক্ষর।
হৃদয়ের কুঙ্কুমে কুলুপ করে তার ॥

(খ)—মাল্যার্পণ

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বৃন্দা)—

এ বনমাল নিজ হাতে বনাওল তাহে দিল নাগররাজ।
ইহা শুনি রাইক স্বেদ ছলে বাহির হোয়ল ধৈরজ লাজ ॥

কামের দশ দশা

কেহ বলে, আদৌ হয় নয়নের প্রীত।
'চিন্তা' 'আসক্ত' হয় তারপরে 'সঙ্কল্পিত' ॥

'নিদ্রাচ্ছেদ', তনুতা', আর 'বিষয়-নিবৃত্তি'।
'লজ্জানাশ', 'উন্মাদ' হয়, আর 'মূর্চ্ছা', 'মৃতি'॥
এই ত কামের দশ দশা মাত্র হয়।
কোন কোন কবিগণ এই মত কয়॥
এই ক্রমে হয় হরির পূর্ব্বরাগ বর্ণন।
এক উদাকৃতি দিয়ে দিগ্ দরশন॥

যথা,—(শ্রীরাধা প্রতি বৃন্দা)—

বংশীক ছোড়ি চিত অতি আকুল নাগর ফিরই গহনে।
বনমালা গলে নাহি পহিরহি আকুল কুণ্ডল নাহি লয় শ্রবণে॥
তুয়া ভুরু ভুজঙ্গিনী তাহে অব দংশল জারল কালীয়দমনে।
সহচর ছোড়ি কুঞ্জ মাঝে রহতহি চাহই চঞ্চল নয়নে॥

২—মান

নায়ক নায়িকা দোঁহে রহে এক স্থানে।
আলিঙ্গন চুম্বনাদি নিবারয় মানে॥

সঞ্চারিভাব

নির্ব্বেদ, শঙ্কা, চাপল, ক্রোধ, গর্ব্ব, অসূয়া আর।
অবহিত্থা, * গ্লানি, চিন্তার ইহাতে 'সঞ্চার'॥

মান—দ্বিবিধ

প্রণয়েতে হয় ভাল মানের প্রচার †
'সহেতু', 'নির্হেতু'—এই দুই ভেদ তার॥

---

* অবহিত্থা—ভাব গোপন।

† 'প্রণয়ই' মানের উত্তম পদ বা যোগ্য স্থান। অর্থাৎ যে স্থলে 'প্রণয়', সেই স্থলেই 'মান' ঘটে। 'মানের উত্তম পদ প্রণয়' এই উক্তি হেতু পারম্পর্য্য হিসাবে, প্রণয় অপেক্ষা 'স্নেহ' ন্যূন হইতেছে (চতুর্দ্দশ অধ্যায়—'রতির তারতম্য' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)। 'জনিত্বা প্রণয়ঃ স্নেহাৎ কুত্রচিৎ মানতাং ব্রজেৎ। স্নেহান্মানঃ কচিদ্ভূত্বা প্রণয়ত্বমথাপ্নুতে॥ অর্থাৎ 'স্নেহ' হইতে 'প্রণয়' উৎপন্ন হইয়া কোন কোন স্থানে 'মানত্ব' প্রাপ্ত হয় এবং কখন কখন 'স্নেহ' হইতে 'মান' উৎপন্ন হইয়া

(ক)—সহেতু মান

নায়কের বিপক্ষে প্রেমাধিক্য দেখি নারী।
মান করয়ে কান্তে ঈর্ষ্যা হেতু করি॥
প্রণয়মুখ্য ভাব ইহা ঈর্ষ্যামান হয়।§
এই মত কবিগণ রসশাস্ত্রে কয়॥

(১)—বিপক্ষ্য-বৈশিষ্ট্য

তাথে সুসখ্যাদি যার হৃদয়ে আছয়।
'বিপক্ষ-বৈশিষ্ট্য' দেখি তার মান হয়॥
রুক্মিণীরে এক পারিজাত দিল হরি।
তাহা শুনি সত্যভামা রহে মান করি॥
সত্যাগৃহে করে হরি পারিজাত রোপন।
তাহা শুনি কোন নারীর না হইল মান॥

বিপক্ষ বৈশিষ্ট্য—ত্রিবিধ

'বিপক্ষ-বৈশিষ্ট্য' হয় ত্রিবিধ প্রকার।
'শ্রুত', 'অনুমিত', 'দৃষ্ট'—এই ভেদ তার॥

অ—শ্রবণ

প্রিয়সখী, শুকান্তের মুখে তাহা শুনি।
কান্তেরে করয়ে মান প্রেয়সী রমণী॥

---

§ মানের প্রতি-কারণ ঈর্ষ্যা, অর্থাৎ ঈর্ষ্যা হইলে মানের উৎপত্তি হয়। প্রিয়ব্যক্তির মুখে বিপক্ষদের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন হইলে প্রণয়মুখ্য যে ভাব, তাহাই 'ঈর্ষ্যামান'। কান্ত কর্ত্তৃক বিপক্ষনায়িকার উৎকর্ষ কীর্ত্তন হইলে, ঈর্ষ্যারূপ ভাব 'প্রণয়', প্রধান হইয়া 'ঈর্ষ্যামানত্ব' প্রাপ্ত হয়।

কোন কোন প্রাচীন পণ্ডিতের মতে—'স্নেহ' ব্যতিরেকে 'ভয়' হয় না এবং 'প্রণয়' ব্যতীত 'ঈর্ষ্যা' হয় না। এই হেতু, এই প্রকার 'মান' এই দুয়েরই প্রেম প্রকাশ করে। কৃতাপরাধ নায়কের নায়িকার প্রতি ভয় হয়। নায়ককৃত অপরাধে নায়িকার ঈর্ষ্যা উৎপন্ন হয়। এই উভয় কারণ বশতঃ নায়ক নায়িকার 'মান' নামক রস উৎপন্ন হয়। ইহাতে

সখীমুখ হইতে শ্রবণ, যথা—(মনোরমা প্রতি বৃন্দা)—

মিছা মিছি কেন কঠিন সখীর বচনে করেছ মান।
আমি ভাল জানি আন যুবতীর নিকটে না যায় শ্যাম ॥

শুক মুখ হইতে শ্রবণ, যথা—(শ্যামলার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

কলহ-নিপুণা কোন সহচরী পঢ়ালা এহেন শুকে।
চন্দ্রাবলী সনে আমার বিহার পড়িছে আপন মুখে ॥
রাই, তুমি না করিহ মান।
শুকের বচন সকলি বিফল তুমি সে আমার প্রাণ ॥

আ—অনুমিত

রতি-চিহ্ন, প্রলাপন, স্বপ্ন দরশন।
তিন প্রকার 'অনুমান' কহে কবিগণ ॥

ক—রতিচিহ্ন বা ভোগাঙ্ক

রতিচিহ্ন কখন বিপক্ষ অঙ্গে দেখে।
কখন বা রতিচিহ্ন পতি-অঙ্গে লখে ॥

বিপক্ষ গাত্রে রতিচিহ্ন, যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি পদ্মা)—

হেদে ধূর্ত্তের শ্রেষ্ঠ তুমি ত বড়ই ধৃষ্ট আপনার ঘরে যাহ চলি।
ঘরেতে আছয়ে বৃদ্ধা তারে না করিহ ক্রুদ্ধা সুখে নিদ্রা যাক্ চন্দ্রাবলী ॥
ছাড়হ চাতুরী-কথা তোমার যত সাধুতা দেখিয়াছি ললিতা-ললাটে।
তোমার হাতের বিরচিত অলকা তিলক জত দেখি চন্দ্রাবলীর মন ফাটে ॥

প্রিয়গাত্রে ভোগচিহ্ন দর্শন, যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্রীরাধা—'বিদগ্ধমাধব'-গ্রন্থে)—

স্থির করি দুই নেত্রে চাহি ছিলে মোর পথে তাথে পুষ্প-পরাগ পড়িল।
কেন মনে কর ব্যথা তোমার নাহি দোষ কোথা তাথে তোমার আঁখি রাঙ্গা হল ॥
এই ত শিশির-রাতে ব্রণ হল অধরেতে কেহ কহে দন্তের আঘাত।

খ—প্রলাপ বা গোত্রস্খলন

যথা,—('বিল্বমঙ্গলে' শ্রীকৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলীর উক্তি-প্রত্যুক্তি)—

রাধার মন্দির ছাড়ি যায়া সোমাভার বাড়ী কহে—'রাধা তোমার কুশল'।
শুনি চন্দ্রাবলী কহে— 'এস কংসরাজ ওহে তোমার দরশনেই মঙ্গল'॥
শুনিয়া নাগর কহে— 'কংশরাজ কৈ গৃহে'? চন্দ্রাবলী কহে—'রাধা কোথা'?
নাগর সে কথা শুনে বিস্ময় হইল মনে লাজ পাঞা নোয়াইল মাথা॥

গ—স্বপ্ন-দর্শন

হরি, কিম্বা বিদূষকের স্বপ্ন দরশন।
'স্বপ্নায়িত' বলি তারে কহে কবিগণ॥

হরির স্বপ্ন, যথা—(কুন্দবল্লী প্রতি বৃন্দা)—

রাই মোর অন্তরে রাই মোর বাহিরে রাই মোর অগ্রে পৃষ্ঠে রয়।
চন্দ্রাবলীর কাছে হরি আছয়ে শয়ন করি তাথে স্বপ্নে এই কথা কয়॥
চন্দ্রাবলী তাহা শুনি আপন লঘুতা মানি কৃষ্ণ প্রতি বিরচিলা মান।
সখীকে না কহে কথা হৃদয়ে বাড়িল ব্যথা ক্রোধে জ্বলে আগুন সমান॥

বিদূষকের স্বপ্ন, যথা—(স্বীয়াসখী প্রতি শৈব্যা)—

স্বপ্নে চন্দ্রাবলী গৃহে শ্রীমধু মঙ্গল কহে শুনে সবে যেন চিত্র-ছবি।
অনেক চাতুরী করি পদ্মায় বঞ্চিল হরি রাধা-স্মৃতি করাহ, মাধবি॥
তাহা শুনি চন্দ্রাবলী মানেতে রহিল জ্বলি কৃষ্ণ প্রতি করিল ভর্ৎসন।
শ্রীরূপের পাদপদ্ম তাথে মত্ত ষট্‌পদ ভণে ইহা শ্রীশচীনন্দন॥

ই—দর্শন

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি পদ্মা)—

জানিহে তোমারে হরি না করিহ চাতুরী তুমি মোর সখীরে ছাড়িয়া।
রসনার ধ্বনি শুনি মনে কিছু অনুমানি দ্রুত গেলে কৈতব করিয়া॥
চন্দ্রাবলী বেড়াইয়া দেখিল তোমারে যায়া কালিন্দীর তটে রাধা সনে।
সেই হৈতে চন্দ্রাবলী মানেতে আছয়ে জ্বলি তুমি সেথা যাইছ কেমনে॥

(খ)—নির্হেতু মান

কভু অকারণে, কভু কারণ-আভাসে।
'নির্হেতু' জন্ময়ে মান প্রণয়-বিশেষে॥

প্রণয়-মান বা নির্হেতুমান

সকারণ মান প্রণয়ের পরিণাম।
দ্বিতীয় প্রণয়-বিলাস-বৈভব ধরে নাম॥
রসিকেরগণ তারে কহে 'প্রণয় মান'।
অকারণে মানরস শাস্ত্রের প্রমাণ॥
অকারণে দোঁহার মান কবিগণ কয়।
অবহিত্থা আদি করি ব্যভিচারী হয়॥

শ্রীকৃষ্ণের কারণাভাস * জনিত মান, যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি কোন ব্রজসুন্দরী)—

মোরে কৃপাদৃষ্টি কর অপরাধ নাহি মোর তুমি বট কৃপাময় হরি।
প্রতারিতে দুষ্ট পতি বয়ে গেল আধরাতি কি করিব পরবশ নারী॥
জ্যোৎস্না রাত্রে অভিসরি শুক্ল অলঙ্কার ধরি অর্দ্ধ পথে এলাম যখন।
চন্দ্র গেল অস্তগিরি পুনঃ ঘরে গেলাম ফিরি পুনঃ কৈনু নূতন সাজন॥

যথা বা,—(শ্যামলার প্রতি শ্রীরাধা)—

বনফুল চয়নে বিলম্ব করি পন্থহি শ্যাম নিকটে হাম গেল।
মুখে হেরি নাগর বাত নাহি বোলল কেবল অধোমুখ ভেল॥
হাম ফুল-অঞ্জলি পদতলে দেখলু তাহে ভুরু কুটিল বিলাস।
পুরুষ কি মান সুচির নাহি হোয়ই বদনে প্রকাশল হাস॥

কৃষ্ণ-প্রিয়ার কারণাভাস জনিত মান, যথা,—(শ্রীরাধা প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

তোমার বচনে কুসুম চয়ন করিতে গেলাম আমি।
কিছু দোষ নাই কেন কেন রাই মানিনী হয়াছে তুমি॥
অনেক যতনে গহন কাননে আনিলাম মল্লিকা ফুলে।
ভূষণ করিয়া তোমারে পরাব কিবা সাজে শ্রুতিমূলে॥

নায়ক নায়িকার একবালীন মান, যথা—(যুগপৎ মানগ্রস্ত শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বৃন্দা)

কেন হে নাগর মুখ নামাইয়া বসিয়া রয়েছ তুমি।
কেন কেন রাই তোমার বদনে বচন নাহিক শুনি॥
বুঝিলাম মনে তোমরা দুজনে প্রেমেতে করেছ মান।
পুনঃ রতি রসে এখনি ভুলবে দুহুঁ সে দোঁহার প্রাণ॥

মানের উপশম

নির্হেতু মানের আপনি হয় নাশ।
আপনি আলিঙ্গন দেয় করে মৃদুহাস॥
সকারণ মান যায় উচিত কল্পনে।
'সাম', 'ভেদ ক্রিয়া', 'দান', 'নতি', 'উপেক্ষণে'॥
রসান্তর হৈলে হয় মানের বিনাশ।
মান নাশে অশ্রু নেত্রে, মুখে মৃদু হাস॥

(১)—সাম

প্রিয়া আগে প্রিয় কহে বিনয় বচন।
রসশাস্ত্রে 'সাম' বলি কহে কবিগণ॥

যথা,—(শ্রীরাধা প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

মঝু অপরাধ বহুত অব সুন্দরী তোওল ও দুই চরণে।
তুয়া বিনে ক্ষিতিতলে কো অব রাখব কো ইহ হোয়ব শরণে॥
ঐছন শ্যামকি বচন শুনি সুন্দরী রোয়ত খঞ্জন-নয়নী।
নয়ন কি লোরে ধোয়ি কুচকুঙ্কুম পদনখে লেখই ধরণী॥

(২)—ভেদ ক্রিয়া

'ভেদ' দুই বিধ—ভঙ্গ স্বমাহাত্ম্য কয়।
আর সখীদ্বারা নিজ প্রিয়ারে ভর্ৎসয়॥

ভঙ্গি দ্বারা স্বমাহাত্ম্য প্রকাশ, যথা—(মানিনী শ্রীরাধা প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

নাহি গণি গুণগণ একহি দোষে পুনঃ তুহু সে কয়লি মুঝে রোষ।
হাম মুগুধবর উচিত না জানলু আগে করনু হাম দোষ॥
সুর তরুণীগণ মুঝে কত যাচল ব্রজনারী কত চারি পাশে।
সো সব ছোড়ি তোহে হাম সেবনু তুয়া সঙ্গম-রস আশে॥

সখীদ্বারা উপালম্ভ প্রয়োগ, যথা—(ভদ্রা প্রতি কৃষ্ণপক্ষপাতিনী সখীগণ)—

শুন সখি শঙ্খচূড় রণ দমনে। মান উচিত নহে পঙ্কজ নয়নে॥
অসুর বিনাশি রাখই ব্রজভুবনে। তার সনে কেলি তোর ধিক্ রহু জীবনে॥
ভদ্রার ঐছন নিজ সখী বচনে। ঘন ঘন জল বহে ও দুটি নয়নে॥

(৩)—দান

ছলেতে কান্তারে দেয় বসন ভূষণ।
'দান' বলি তার নাম কহে কবিগণ॥

যথা—(পদ্মা প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

নামহি মদন এক মোর সহচর অতিশয় পিরীতি তাহার।
তুহু মঝু প্রেয়সী ঐছন শুনি তুজে দেওল মাল্য উপহার॥
এ বরমাল্য হৃদয়ে করু সুন্দরী তা সনে নাহি তোর মান।
শুনি ধনি হাসি বদন-বিধু বিকশল কানু সুধা করু পান॥

(৪)—নতি

কেবল দৈন্যেতে প্রিয়ার পায়ে পড়ি রয়।
'নতি' বলি রস-শাস্ত্রে কবিগণ কয়॥

যথা,—(কুন্দবল্লী প্রতি বৃন্দা)—

রাইক হৃদয় মান জানি মাধব পড়ল চরণতল পাশে।
নয়ন জলদজল বরিখনে ধনি করু মান-হুতাশ বিনাশে॥

(৫)—উপেক্ষা

সামান্যে না হয় যদি মানের ভঞ্জন।

কেহ কেহ মৌন ধরে, পতি যদি রয়।
'উপেক্ষা' বলিয়া তারে কবিগণ কয়॥

যথা,—(বিশাখার সখীগণ প্রতি শ্রীকৃষ্ণ উক্তিছলে বৃন্দা)—

আমি অতি সাধুজন ব্রজরাজের নন্দন তাথে পুনঃ হই মহাবীর।
নারীগণের মন হরে কেনা বাঞ্ছা করে মোরে কাম জিনি সুন্দর শরীর॥
তারে তুমি দিলে ব্যথা ভাল না হইল কথা পরিণামে হইবে কেমন।
মনে রহু কুট করি এই আমি যাই ছাড়ি কিবা যুক্তি করিবে এখন॥

যথা বা,—(সুবল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

মানভঞ্জন লাগি প্রণমিনু চরণে। পদ্মা তভু মুখে না চাহিল নয়নে॥
হাম মৌন ধরি বৈঠল যবহি। তাকর দিঠিজল বরিখল তবহি॥
সখিরে কহল কিছু মৃদুমৃদু বচনে। কুসুম কি ধূলি পড়ল মঝু নয়নে॥
বুঝনু টুটল মান-বিষ দহনে। যাই হাম চুম্বলু সো বিধু বদনে॥

[অথবা—]

সাধ্য সাধন ছাড়ি অন্যার্থ বচনে।
প্রিয়ারে প্রসন্ন করে, 'উপেক্ষা' তারে ভনে॥

যথা,—(চন্দ্রাবলী প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

কুন্তলের মাঝে মালতি আছয়ে তাহা ত চিনিতে পারি।
বাম শ্রুতিমূলে মল্লিকা আছয়ে চিনিলাম নয়নে হেরি॥
দক্ষিণ শ্রবণে কি ফুল আছয়ে তাহাও চিনিতে হল।
একথা কহিয়া চতুর নাগর মানিনীর কাছে গেল॥
গণ্ডের নিকটে বদন লইল আঘ্রাণ লইবার তরে।
অমনি চন্দ্রাবলী হাসিয়া উঠিল— নাগর চুম্বন করে॥

রসান্তর

আকস্মিক ভয়াদিতে 'রসান্তর' হয়।

(১)—যাদৃচ্ছিক

অকস্মাৎ উপস্থিত হয় যেই ভয়।
'যাদৃচ্ছিক্' বলি তারে কবিগণ কয়॥

যথা—

পদ্মার মান দেখি হরি অনেক বিনয় করি বহু যত্নে নারিল খণ্ডিতে।
সখীর বিনয় বাতে উত্তর না দিল তাথে মৌন করি রহিল মানেতে॥
হেনকালে দৈবদোষে অরিষ্ট অসুর এসে বজ্রতুল্য শব্দ করিল।
তাথে মান ছাড়িয়া ভয়েতে কম্পিত হয়া আলিঙ্গিয়া কৃষ্ণেরে ধরিল॥

(২)—বুদ্ধিপূর্ব্বক

উৎপন্নবুদ্ধি কান্ত করে ভয় দরশন।
'বুদ্ধিপূর্ব্বক' তারে কহে কবিগণ॥

যথা,—(পৌর্ণমাসী প্রতি বৃন্দা)—

পঞ্চমুখ কীট আসি আমার পাণিতে বসি আহা মরি করিল দংশন।
এ হেন কোমল হাতে কত না বাজিল তাথে ইহা কহে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
শুনি রাধা চমকিত ছাড়িয়া মানের রীত ব্যাগ্র কহে কি হল কি হল।
হেন কালে যাই হরি বদনে বদন ধরি মনের সুখে চুম্বন করিল॥

মানোপশমন

দেশ কাল বল, কভু মুরলী শ্রবণে।
বিনোপায় কভু মান হয়ত খণ্ডনে॥

দেশ-বল দ্বারা মানোপশমন, যথা—(ভদ্রা প্রতি বৃন্দা)—

কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমরগণ গুঞ্জরু বৃন্দাবন বন মাঝ।
মৃদু মৃদু হাসি নীপতরু মূলহি বৈঠল নাগর রাজ॥
চন্দ্রাবলী তব ছোড়ল মান।

কাল-বলে মানোপশমন, যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বৃন্দা)—

এ হেন শরৎকালে চন্দ্র-ছটা ঝল্ মলে যমুনার তীর শোভা করে।
শুনিয়া সখীর বাণী মান ছাড়ি দিল ধনি অভিসার করিল সত্বরে॥

মুরলী-শব্দ দ্বারা মানোপশমন, যথা—(ললিতা প্রতি শ্রীরাধা)—

মান নাহি জানি আমি মানের উপাধ্যায় তুমি তোমার বচনে কৈনু মান।
ঐ দেখ বনমাঝে কানুর মুরলী বাজে সত্বরে আচ্ছাদ মোর কান॥

নির্হেতু মান—ত্রিবিধ

মানের তারতম্য হয়, হেতুর তর-তমে।
'লঘু', 'মধ্য', 'মহিষ্ঠ' এই তিন নামে॥
সুসাধ্যের 'লঘু' নাম, 'মধ্যম' যতনে।
সুসাধ্য 'মহিষ্ঠ' * এই কহে কবিগণে॥

মানিনীগণের শ্রীকৃষ্ণ প্রতি সম্বোধন

মানিনী রুষিয়া সম্বোধন করে মন্দ।
বাম, দুর্লীলশেখর, কিতবেন্দ্র॥
মহাধূর্ত্ত, নির্লজ্জ, দুর্ল লিত, কঠোর।
কামী, গোপী ভুজঙ্গম, আর রতিচোর॥
গোপী-ধর্ম্মধ্বংসী, সাধ্বীব্রত-বিড়ম্বন।
বৃন্দাবনের বাটপাড়, কালিয়াদিগণ॥

৩—প্রেমবৈচিত্ত্য

প্রিয়ের নিকটে রহে, প্রেমের স্বভাবে।
'প্রেমবৈচিত্ত্য' হেতু বিরহ করি ভাবে॥

যথা—(পৌর্ণমাসী প্রতি বৃন্দা)—

কানুক কোরে বৈঠি ধনি কহতহি কাঁহা গেও নাগর রাজ।
কি মঝু দোষে ছোড়ল বর নাগর ইত বলি পড়ু ক্ষিতি মাঝ॥

এ সখি, কানু দেহ মুঝে আনি।
ঐছন রাইক বচনে হরি বিস্মিত বদনে লাগাওল পানি॥

অনুরাগের পরমোৎকর্ষ যেই পায়।
নিজ কোলে পতি,তিলে তিলেকে হারায়॥
ভাল উদাকৃতি আছে মহিষীর গীতে।
বোপদেব নিজ গ্রন্থে বর্ণিল ভাল মতে॥*

৪—প্রবাস

ব্যভিচারী ভাব

পূর্ব্ব-মিলিত দোঁহার দেশ ব্যবধান।
কবিগণ কহয়ে 'প্রবাস' তার নাম॥
হর্ষ, গর্ব্ব, মদ, ব্রীড়া ছাড়ি এই চারি।
শৃঙ্গারের সংযোগ্য সব হয় ব্যভিচারী॥

প্রবাস—দ্বিবিধ

সেই 'প্রবাস' হয় দুই ত প্রকার।
'বুদ্ধিপূর্ব্ব' এক হয়, 'অবুদ্ধিপূর্ব্ব' আর॥

(ক)—বুদ্ধিপূর্ব্ব

কার্য্য অনুরোধে যেই দূরেতে গমন।
কৃষ্ণের কার্য্য হয় কেবল ভক্তের প্রীণন॥
সেই 'বুদ্ধিপূর্ব্ব' হয় দুই ত প্রকার।
'কিঞ্চিদ্দূর', 'বহুদূর' এই ভেদ তার॥

'কিঞ্চিদ্দূর' প্রবাস, যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি)—

সুরভীকুল-পথি বিনিহিত-নয়না। তব নিজ নাম বশীকৃত রসনা॥
মাধব তব বিরহে বিধুবদনা। রাধা খিদ্যতি মনসিজ-বদনা॥

মুরলী নিনাদ শ্রুতি পটু বিষয়া। তব মুখ কমলে বিনিহিত হৃদয়া ॥
শ্রীল শচীনন্দন কবি গদিতং হরিমিহ জনয়তু বহুতর মুদিতং ॥

'সুদূর' প্রবাস

'দূর প্রবাস' হয় তিন প্রকার।
'ভাবী', 'ভবন্', 'ভূত' এই ভেদ তার ॥

'ভাবী', যথা,—(স্বীয় সখী প্রতি কোন ব্রজদেবী)—

নন্দ ঘোষের আজ্ঞাকারী এক দূত সবাকারি ঘরে ঘরে করিছে ঘোষণ।
আসিয়াছে অক্রূর হরি যাবে মধুপুর কালি প্রাতে করিবে গমন ॥
বড় অমঙ্গল দেখি নাচিছে দক্ষিণ আঁখি কাঁপিছে দক্ষিণ পয়োধর।
চঞ্চল হইল মন স্থির নহে এক ক্ষণ না জানিয়ে কি হইবে মোর ॥

'ভবন্' যথা,—(শ্যামলার উক্তি)—

দিবাকর মণ্ডলে প্রকাশ গগণ তলে অক্রূর সাজায়া রথখানি।
এস বলি কৃষ্ণে ডাকে শেল মারে মোর বুকে এখনি চলিল ব্রজমণি ॥
হেদেরে কঠিন মন আর দেহে থাক কেন আমার হৃদয় ফাটি যায়।
বিনয় করিয়ে আমি ত্বরা করি যাও তুমি ঐ দেখ ঘোটক চালায় ॥

'ভূত', যথা—(বিশাখা প্রতি শ্রীরাধা)—

সে হরি ছাড়িয়া মোরে রৈল যায়া মধুপুরে বিরহ দহনে আমি মরি।
অন্তরে আশার নদী বহে মোর নিরবধি তেই প্রাণ ছাড়িতে না পারি ॥

সন্দেশ

ইহা * কৃষ্ণ-প্রিয়ার প্রতি সন্দেশ পাঠায়।
প্রিয়াগণ সন্দেশ পাঠায় পুনঃ তায় ॥

কৃষ্ণের উদ্ধব দ্বারা শৈব্যার নিকট সন্দেশ, যথা—

বিরহের দাহন চক্ষু করি নিমীলন কথোদিন সহিয়া রহিবে।
বন্ধুগণের সুখ করি যাব আমি ব্রজ পুরি তবে মোর সঙ্গম পাইবে ॥

---

* ... শ্রীকৃষ্ণ ও প্রেয়সীগণ কর্তৃক প্রেমবশতঃ পরস্পর সন্দেশ প্রেরণ করা হয়।

(খ)—অবুদ্ধিপূর্ব্ব

পরবস প্রবাসের নাম পারতন্ত্র্য কয়।
দিব্যাদিব্যাদি পারতন্ত্র্য বহুবিধ হয়॥

যথা—(ললিতা প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

পূর্ণিমার চন্দ্র দেখি মনে হয়ে বড় সুখী বহু যত্নে তোমারে আনিল।
তাথে শঙ্খচূড় আসি দিল মোরে দুঃখ রাশি তাহে দোঁহার বিরহ হইল॥

দশ দশা

দশ দশা হয় তাথে চিন্তা, জাগরণ।
উদ্বেগ, তানব, মলিনাঙ্গ, প্রলাপন॥
ব্যাধি, উন্মাদ হয়, মোহ অনুক্ষণ।
মৃত্যু—এই দশ দশা কহে কবিগণ॥

'চিন্তা', যথা—('হংসদূত'-গ্রন্থে কোন রসিকের উক্তি)—(১)

যখন গোকুল ছাড়ি হরি গেলা মধুপুরি অক্রূর লইয়া গেল তারে।
সেই দিন হৈতে রাধা মনেতে বিরহ বাধা ডুবি রৈল চিন্তার সাগরে॥

'জাগরণ', যথা—(বিশাখা প্রতি শ্রীরাধা)—(২)

সেই পুণ্যবতী নারী স্বপনে যে দেখে হরি আমরা বড়ই অভাগিনী।
যবে কৃষ্ণ ছাড়ি গেল পরম বিয়োগ হৈল নিদ্রা হৈল পরম বৈরিণী॥

'উদ্বেগ', যথা—(ললিতা প্রতি শ্রীরাধা)—(৩)

পর দুঃখ সিন্ধু জলে সদাই হৃদয় জ্বলে এই দুঃখের না হৈল পার।
তোমার চরণ ধরি যুক্তি বল সহচরী ডুবে মরি না জানি সাঁতার॥

'তানব', যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি উদ্ধব)—(৪)

স্মরি বিরহ দুঃখ মলিন হয়াছে মুখ কুচের উপরে নাহি হার।
হৃদয়ে সদাই বাধা অতি কৃশ তনু রাধা নিদাঘের কন্দর আকার॥

'মলিনাঙ্গতা', যথা—(ঐ)—(৫)

শিশিরের পদ্ম জিনি রাধার বদন খানি চক্ষু যেন শারদ উৎপল।
বন্ধুক* মলিনতর তার তুল্য দু'অধর তনু নাহি করে ঝল্‌মল্ ॥

'প্রলাপ', যথা—('ললিতমাধব'-গ্রন্থে শ্রীরাধার বিলাপ)—(৬):

ব্রজেন্দ্র কুল দুগ্ধ-সিন্ধু কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু জন্মি কৈল জগত উজোর।
যার কান্ত্যামৃত পেয়ে নিরন্তর পীয়ে জীয়ে ব্রজজন নয়ন-চকোর ॥
সখি হে, কোথা কৃষ্ণ করাহ দর্শন।
ক্ষণেক যাহার মুখ না দেখিলে ফাটে বুক শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন ॥
এই ব্রজের রমণী কামার্ক তপ্ত কুমুদিনী নিজ করামৃত দিয়া দান।
প্রফুল্লতা করে যেই কাঁহা মোর চন্দ্র সেই দেখাও সখি, রাখ মোর প্রাণ ॥
কাঁহা সে চূড়ার টান শিখিপিঞ্ছ উড়ান নব মেঘে যৈছে ইন্দুধনু।
পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি মুক্ষ তাহার বকপাঁতি নবাম্বুদ জিনি শ্যাম তনু ॥
মোর সেই কলানিধি প্রাণ রক্ষা মহৌষধি সখী তোর সেই সুহৃত্তম।
যেই জীয়ে তাহা বিনে ধিক্ তার জীবনে ধিক্ ধিক্ যে রাখে জীবন।

(শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত অনুবাদ)

'ব্যাধি', যথা—(ঐ গ্রন্থে, ললিতা প্রতি শ্রীরাধা)—(৭)

তুষানল জিনি তাপ বিষ জিনি দেয় কাঁপ বজ্র জিনি বড়ই কঠোর।
হৃদয়ের শেল মোর সূচী জিনি খরতর দহে কৃষ্ণ বিরহের জ্বর ॥

'উন্মাদ', যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি উদ্ধব)—(৮)

যাইয়া মন্দির মাঝে চেতনাচেতনে পুছে দেখিয়াছ মোর প্রাণনাথে।
ধরণী পড়িয়া কান্দে কাঁপি স্থির নাহি বান্ধে কত না নির্বেদ করে চিতে ॥

'মোহ' বা 'মূর্চ্ছা', যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ললিতার পত্র)—(৯)

স্তব্ধ করে দৈন্যার্ণব দূর করে চিন্তা সব উন্মাদেরে করয়ে স্থগিত।
মূর্চ্ছা হয়া সহচরি রোধয়ে নয়ন বারি ক্ষেণে ক্ষেণে করয়ে সম্বিত ॥

'মৃত্যু', যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি হংসদূত দ্বারা ললিতা)—(১০)

ছাড়ি পতি নিজ জন লইল তোমার শরণ সার কৈল তোমার চরণ।
তুমি প্রেম ভঙ্গ করে ছাড়িয়া আইলে তারে বড়ই চঞ্চল তুয়া মন॥
রাধায় ধিক্ রহু তাথে অদ্যাবধি নাসিকাতে তুলা ধরি করি পরীক্ষণ।
ঘড়্ ঘড়্ করে গলা ঈষৎ চলয়ে তুলা সেই দশা না যায় বর্ণন॥

প্রবাসে হরিরও হয় এই দশাগণ।
এক উদাকৃতি করি দিগ্ দরশন॥

যথা—(ললিতা প্রতি উদ্ধব)—

শয্যা পয়ঃফেন জিনি তাথে বসি যদুমণি রাজকন্যার সঙ্গেতে বিহরে।
বনে রাধার ক্রীড়াগণ যেই হয় স্মরণ তেই মূর্চ্ছা হয়ে ভূমে পড়ে॥

[বহুদশা]

বিবিধ প্রেমার ভেদ বহুদশা তার।
সে-সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয়ত বিস্তার॥
এই ত প্রেমার অনুভাব দশা হয়।
সাধারণ দশাগণ সব সম্ভবয়॥
কিন্তু 'অধিরূঢ় ভাব' পরম মোহন।
তাহার বিশেষ যত করেছি বর্ণন॥*
অন্য বিপ্রলম্ভে কেহ বলয়ে করুণ।
প্রবাসের মধ্যে তাহা করিয়ে গণন॥
কালীয় হ্রদ প্রবেশাদি জন্য তার নাম।
এই ত কহিল বিপ্রলম্ভের আখ্যান॥

ষোড়শ অধ্যায়

সম্ভোগ প্রকরণ

সংযোগ-বিয়োগ-স্থিতি

হরিলীলা বিশেষের প্রকট অনুসার।
এই ত বিরহ দশা বর্ণিল গোপীকার॥
হরির সদা বৃন্দাবনে রাসাদি করণ।
গোপীসহ হরির বিয়োগ নাহিক কখন॥

পদ্মপুরাণে যথা,—

কংসহা নিত্য ক্রীড়া করে বৃন্দাবনে। অতএব জানিল নাহি ছাড়ে গোপীগণে॥

সম্ভোগ

দর্শনালিঙ্গনাদির যাহা আনুকূল্যে হয়।
ভাবের উল্লাস হলে 'সম্ভোগ' নাম কয়॥
'সম্ভোগে' ভাবের উল্লাসে আরোহণ।

সম্ভোগ—দ্বিবিধ

'গৌণ', 'মুখ্য'—দুই ভেদ কহে কবিগণ॥

১—মুখ্য সম্ভোগ

জাগ্রদবস্থাতে যেই দর্শন আলিঙ্গন।

মুখ্য-সম্ভোগ চতুর্ব্বিধ

'সংক্ষিপ্ত', 'সঙ্কীর্ণ', 'সম্পন্ন', 'সমৃদ্ধিমান'।
এই চারিভেদের কহি উৎপত্তির স্থান ॥
পূর্ব্বরাগে 'সংক্ষিপ্ত' হয়, মানেতে 'সঙ্কীর্ণ'।
আদ্য-প্রবাসের পরে সম্ভোগ 'সম্পূর্ণ' ॥
দ্বিতীয় প্রবাস পরে সম্ভোগ 'সমৃদ্ধিমান'।
চারিভেদ সম্ভোগের প্রায় চারিস্থান ॥

(ক)—সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ

সাধ্বস লজ্জাতে সংক্ষিপ্ত উপচার।
রতির সংক্ষেপে 'সংক্ষিপ্ত' নাম তার ॥

নায়কের 'সংক্ষিপ্ত'-সম্ভোগ, যথা—(শ্রীরাধিকার সখীগণ প্রতি নান্দীমুখী)—

লীলাতে তুলিল হরি গিরি গোবর্দ্ধনে। ডরাইল রাধার স্তন-পর্ব্বত দর্শনে ॥

প্রথম সঙ্গমের এই মত হয় রীত।
লজ্জায় আক্রান্ত হয় ভয়ভীত চিত্ত ॥

নায়িকার 'সংক্ষিপ্ত'-সম্ভোগ, যথা—

চুম্বন করিতে মুখ শশধর বসনে ঢাকিয়া রহে।
ঘন আলিঙ্গনে কুটিল হইয়া 'নহি নহি' বলি কহে ॥
রসের পদবী নাগর কহয়ে রাই না উত্তর করে।
নূতন সঙ্গমে রসের সাগরে ভাসাল নাগর বরে ॥

(খ)—সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ

ব্যলীক* স্মরণে হয় 'সঙ্কীর্ণ' উপচার।
তপ্ত ইক্ষু প্রায় হয় 'সঙ্কীর্ণ' শৃঙ্গার ॥†

* ব্যলীক = অপ্রিয় অর্থাৎ বিপক্ষের গুণকীর্ত্তন।

† তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ কালীন যেমন এককালে স্বাদুতা ও উষ্ণতা অনুভব হয়, তদ্রূপ নায়কের ব্যলীক ও স্মরণাদি-

যথা,—

মুখ-বিধু চুম্বনে রাই কহই পুনঃ জাহ চন্দ্রাবলী গেহ।
নিবিড় আলিঙ্গনে মান ভরমে তহি ধীরে ধীরে কুঞ্চই দেহ॥

(গ)—সম্পন্ন বা সম্পূর্ণ-সম্ভোগ

প্রবাস হইতে কান্ত নিকটে আইলে।
সম্ভোগ যে হয়, তারে 'সম্পন্নমান' বলে॥
প্রবাস গমন হয় দুই ত প্রকার।
'আগতি' এক নাম, 'প্রাদুর্ভাব' আর॥

(১)—আগতি

লৌকিক ব্যবহারে প্রিয়ের গৃহে আগমন।
তাহারে 'আগতি' বলি কহে কবিগণ॥

যথা—(শ্রীরাধা প্রতি বিশাখা)—

ছাড়ি গুরুজন লাজ এস গো অঙ্গন মাঝ বিরহেতে হয়াছ দুঃখিনী।
বনে হৈতে শ্যামরায় আসিয়া মিলিল তায় বাঞ্ছাপূর্ণ হইবে এখনি॥

(২)—প্রাদুর্ভাব

বিরহেতে বিহ্বল হইয়া রহে নারী।
অকস্মাৎ নিকটে আসিয়া মিলে হরি॥
তারে 'প্রাদুর্ভাব' বলি কবিগণ কয়।
সম্পূর্ণ-সম্ভোগ তাথে অভিমত হয়॥

যথা,—(শ্রীদশমে)—*

রূঢ়ভাবে বিপ্রলম্ভের পরে যে শৃঙ্গার।
নির্ভর পরম সুখ 'সম্পূর্ণ' নাম তার॥

---

* এই উদাহরণটি অনূদিত হয় নাই। মূল গ্রন্থে উদ্ধৃত শ্লোকের মর্ম্ম এই—'রাস বিপ্রলম্ভানন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাব শ্রীশুকদেব কহিতেছেন—গোপীগণের রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শূরনন্দন শ্রীকৃষ্ণ পীতাম্বরধারী ও মাল্যালঙ্কৃত হইয়া

ইহাতে বিরহে চিত্তে হয় মহা দুখ।
প্রাদুর্ভাবে সর্ব্বাভীষ্ট হয় মহা সুখ ॥

(ঘ)–সমৃদ্ধিমান

অতিরেক উপভোগ যাহাতেই হয়।
'সমৃদ্ধিমান' বলি তারে কবিগণ কয় ॥

যথা—('ললিতমাধব'-গ্রন্থে নববৃন্দা প্রতি শ্রীরাধা)—

এই কৃষ্ণের বিরহে ভস্ম হয়েছিল দেহে কত দুঃখ সহিনু অন্তরে।
আজ প্রাণনাথ পেনু তনু মনে জুড়াইনু আর নাহি পাঠাইব দূরে ॥

'ছন্ন', 'প্রকাশ' ভেদে কেহ দুই মত কয়।
তাহা না কহিল, বড় রসোল্লাস নয় ॥*

২–গৌণ-সম্ভোগ

স্বপ্নে প্রাপ্তি হয় যেই কৃষ্ণের মিলন।
'গৌণ-সম্ভোগ' তারে কহে কবিগণ ॥

স্বপ্ন-সম্ভোগ—দ্বিবিধ

'স্বপ্ন-সম্ভোগ' হয় 'সামান্য', 'বিশেষ'।
সামান্যের হয় ব্যভিচারেতে প্রবেশ ॥
জাগরণ সম হয় স্বপ্নের মিলন।
'বিশেষ-স্বপ্ন' বলি তারে কহে কবিগণ ॥
বড়ই অদ্ভুত বড় ভাবের প্রচার।
পূর্ব্ববৎ সংক্ষিপ্তাদি চারি ভেদ তার ॥

সস্মিত-বদনে তাঁহাদের মধ্যে এরূপে আবির্ভূত হইলেন যে, দেখিবামাত্র বোধ হইল যেন, ইনি জগমোহন কামদেবেরও মনোমধ্যে উদ্গত কামেরও সাক্ষাৎ মোহজনক।

* পূর্ব্বোল্লিখিত চতুর্ব্বিধ সম্ভোগ—'প্রচ্ছন্ন' ও 'প্রকাশ' ভেদে দ্বিবিধ। এই দ্বিরূপতা উক্ত হইলেও, বর্ণিত হইল না। যেহেতু তাহা উল্লাসকরী নহে।

স্বপ্নে সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ, যথা—(বিশাখা প্রতি শ্রীরাধা)—

সুন্দর কালিন্দী তীরে গোবিন্দ বিহার করে নবাম্ভোদ জিনি তনুখানি।
মাথায় বিনোদ চূড়া তাহে গুঞ্জ ছড় ছড়া সে বড় রসিক শিরোমণি ॥
নিকটে আসিয়া মোরে বদন চুম্বন করে সভয় নয়নে পুনঃ চায়।
আমি থাকি শয়নে এই দেখি স্বপনে এ বড আমার হল দায় ॥

স্বপ্নে সংকীর্ণ-সম্ভোগ, যথা—(কোন মুগ্ধা সখীর উক্তি)—

শুন সখি আজুক স্বপন কি বাত। হাসি হাসি আওল গোকুলনাথ ॥
হাসে কহল পুনঃ নাহি মঝু দোষ। উঠহ সুন্দরি, ছোড়হ রোষ ॥
যব মুখে দেওল চুম্বন দান। হাম নাহি জানলু টুটল মান ॥

স্বপ্নে সম্পূর্ণ-সম্ভোগ, যথা—(ললিতা প্রতি শ্রীরাধা)—

আমারে ছাড়িয়া হরি যদি গেল মধুপুরি কিবা ক্ষতি আছয়ে আমার।
যাহ তুমি কোন পুরি সুখেতে রহিও হরি আমার মরণ মাত্র সার ॥
তুমি গেলে মধুপুরি আমি আছি দুখে মরি তুমি পুনঃ আসিয়া স্বপনে।
মোরে বলাৎকার করি পুনঃ রহ মধুপুরি এত জ্বালা সহিব কেমনে ॥

স্বপ্নে সমৃদ্ধিমান-সম্ভোগ, যথা—(নববৃন্দা প্রতি শ্রীরাধা)—

আজিকার স্বপন শুনলো সুন্দরী নাগর আসিয়াছিল।
আদর করিয়া আমার নিকটে কত রঙ্গ বিরচিল ॥
স্বপনে দারুণ অক্রূর না ছাড়ে রথ লয়া এলো তায়।
দেখিয়া পরাণে কাঁপিয়া মরিয়ে কত করি হায় হায় ॥

তুল্য স্বরূপ রতি হয় দোঁহাকার।
ঊষা অনিরুদ্ধের হৈল যেমত প্রকার ॥
অতএব সিদ্ধ নারীর স্বপ্ন-রমণে।
প্রাপ্ত ভূষণ আদি দেখি জাগরণে ॥

সামান্য নিদ্রা সম্ভোগ

সামান্য নিদ্রার দশা চারি প্রকার।
'বিশ্ব' 'তৈজস', 'প্রাজ্ঞ' 'সমাধি' নাম তার ॥

গোপীর স্বপ্নদশা পঞ্চম—'প্রেমময়ী' নাম।
তামস স্বপ্নের নাহি সিদ্ধেতে বিশ্রাম॥
কৃষ্ণ-প্রেমের অপরূপ বিলাস হয় তায়।
স্বপ্নপ্রায় সাক্ষাৎ কৃষ্ণ সঙ্গম করায়॥

সম্ভোগ-বিশেষ নিরূপণ

ইহার 'বিশেষ' আর কবিগণ কয়।
এহো রতির অনুভাব দশা প্রাপ্ত হয়॥
দর্শন, জল্প, স্পর্শ, পথের রোধন।
রাস, বৃন্দাবন-ক্রীড়া, জলের ক্রীড়ন॥
নৌকা-খেলা, লীলা চৌর্য্য, ঘট্ট সংড়ন।
কুঞ্জ লীলা, মধুপান, স্ত্রীবেশ ধারণ॥
কপট শয়ন, আর পাশক ক্রীড়ন।
বস্ত্র আকর্ষণ, চুম্ব, আর আলিঙ্গন॥
নখার্পণ, আর বিম্বাধর সুধাপান।
সংপ্রয়োগ আদি 'বিশেষ' কহে কবিগণ॥

দর্শন, যথা—(কুন্দলতা প্রতি শ্রীরাধা)—

তাবত গুরুর ভয় তাবত কুলে মনে রয় তাবত হয় ধর্ম্মের আচার।
যাবত কুণ্ডলধারী পরম মোহন হরি নাহি হয় নয়ন গোচর॥

জল্প

জল্পের নাম হয় দুই ত প্রকার।
পরস্পর গোষ্ঠী এক, বিতথোক্তি * আর॥

বিতথোক্তি-জল্প, যথা—(শ্রীরাধাদি প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

এই গিরি গোবর্দ্ধনে কতদিন নারীগণে হরে নিলাম বসন ভূষণ।
নারী সব নগ্ন হল বৃক্ষ পত্র পহিরল উপকার কৈল লতাগণ॥

স্পর্শ, যথা—(সখী প্রতি কোন যূথেশ্বরী)—

নাকরু শপথ, বুঝলু সখী তোহে। শ্যাম ভুজগবর পরশন দেহে॥
নহে যদি কাহে কাঁপই তুয়া অঙ্গ। তনুরুহগণে করে নূতন রঙ্গ॥

বর্ত্ম-রোধ, যথা—('বিদগ্ধমাধব'-গ্রন্থে শ্রীরাধা প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

এই শৃঙ্গ দেখ মোর বক্ষঃ শিলা কঠোর বেত্র বংশ আছে মোর স্থানে।
আমি ত ধরণীধর বড়ই সাহস তোর তারে লঙ্ঘি যাইবে কেমনে॥

রাস, যথা—(কোন বিমানচারিণী দেবীর অপর দেবীর প্রতি উক্তি)—

কৃষ্ণ জিনি নবঘন তড়িত যেন গোপীগণ তড়িতের মাঝে জলধর।
তড়িত মেঘের মাঝে সম সখ্য হয়া সাজে রাসলীলা বড় মনোহর॥

বৃন্দাবন-ক্রীড়া, যথা—(শ্রীরাধা প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

স্থলপদ্ম বিকশিত তাথে ভ্রমরের গীত স্তুতি করে তোমার চরণে।
কুন্দফুল রাশি রাশি তোমার চরণে আসি দণ্ডবৎ করে দন্তগণে॥
তোমার অধর দেখি বিম্বফল হল দুঃখী চেয়ে দেখ রম্য বৃন্দাবনে।
রাধিকারে সঙ্গে লয়া হরি বেড়ায় দেখাইয়া বিহরয়ে বঁড় সুখী মনে॥

যমুনা জলকেলি, যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বিশাখা)—

জলকেলি রণরঙ্গে তোমার না হল ভঙ্গে তিলকের নাহি দরশন।
রাধা মুখচন্দ্র মাঝ তোমার কণ্ঠ মণিরাজ বিম্বছলে লইল শরণ॥
তুমি ভয় কর কার জল না মারিব আর হারিয়াছ জানিলাম নিশ্চয়।
তুমি বড় অল্পবল আর না মারিব জল বল তুমি রাধিকার জয়॥

নৌকা-খেলা, যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি রাধা)—

এই ত যমুনা বহে উৎকট তরঙ্গ তাহে ভাল নৌকা তাও মোরা জানি॥
চড়িবারে ভয় করি আমরা যুবতী নারী খেয়ারি চঞ্চল শিরোমণি॥

লীলা-চৌর্য্য

লীলা চুরি কহি যেই বংশীর হরণ।

বংশী-চৌর্য্য, যথা—(শ্রীরাধার সখীগণের পরস্পরোক্তি)—

চরণে নূপুর ছাড়ি গেলা রাধা ধীরি ধীরি না করিয়া কঙ্কনের স্বন।
নিদ্রায় আছিল হরি বাঁশী লয়া চুরি করি হাসি হাসি করিল গমন॥

বস্ত্র-চৌর্য্য, যথা—(শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে গোপীগণের উক্তি)—

তরুপত্র বস্ত্র করি যাই এক সহচরী আনহ ব্রজের বৃন্দাগণ।
এই বস্ত্র-বাটপাড়ে আসি যেন গালি পাড়ে সুখে মোরা করিব দর্শন॥

পুষ্প-চৌর্য্য, যথা—(শ্রীরাধা প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

নিতি নিতি আসি আমার কুসুম চুরি করি লও তুমি।
অনেক যতনে গহন কাননে তোমারে ধরেছি আমি॥
আজি ত উচিত দমন করিব ছিঁড়িয়া লইব হার।
বসন ভূষণ লইব হরিয়া কোথায় পলাবে আর॥

ঘট্ট, যথা—('দানকেলি কৌমুদী'-গ্রন্থে ললিতাদি প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

আমি ত ঘাটের রাজা না করি তাহার পূজা বিবাদে চঞ্চল কৈলে মন।
বুঝি গিরি কুঞ্জবনে ঘাটের রাজার সনে তোমরা করিবে মহারণ॥

কুঞ্জাদিলীনতা, যথা—('বিদগ্ধমাধব'-গ্রন্থে শ্রীরাধা অন্বেষণকারী শ্রীকৃষ্ণ)—

আমি এই বুঝি মনে রাধা এই কুঞ্জবনে লুকায়েছে কৌতুক করিয়া।
নৈলে কেন অলিগণ সৌরভ লুবুধ মন স্তব করে চৌদিক বেড়িয়া॥

মধুপান, যথা—(পৌর্ণমাসী প্রতি বৃন্দা)—

কৃষ্ণের বদন-চন্দ্র মধুপাত্রে প্রতিবিম্ব দেখে রাধা সুস্থির নয়নে।
যাচয়ে নাগর রায় তবু মধু নাহি খায় চেয়ে রৈল প্রতিবিম্ব পানে॥

বধূবেশ ধারণ, যথা—(বধূবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে রাধা ও বিশাখার উক্তি প্রত্যুক্তি)—

কো ইহ শ্যাম বরনারী। এ সখি, নাগর কি গোপকুমারী॥
কি ফল আওল এ মঝু পাশ। তুয়া সুখী হোয়ব ইহ করি আশ॥
মঝু সখী হোয়ল প্রাণ সমান। তুরিতহি করহ আলিঙ্গন দান॥

কপট শয়ন, যথা—('কর্ণামৃত'-গ্রন্থে লীলাশুক উক্তি)—

দেখসিয়া হরি কপট করিয়া শয়ন করিয়া রয়।
মুখে মৃদু হাসি ছাপিয়া রাখয়ে তভু প্রকাশিত হয় ॥

পাশক-ক্রীড়া, যথা—(কুন্দলতা প্রতি বৃন্দা)—

রাই কানু পাশা খেলে সখীগণ গুটি চালে পণ কৈল অধর চুম্বন।
কখন জিতয়ে হরি কভু জিতে সুন্দরী হাততালি দেয় সখীগণ ॥

বস্ত্রাকর্ষণ, যথা—('ললিত মাধব'-গ্রন্থে মধুমঙ্গল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

আজি ত নিকুঞ্জ ঘরে রাধা বস্ত্র নিলাম হ'রে তাথে লুকাইল অন্ধকারে।
কৌস্তুভমণির সার তাথে কৈল উপকার আমা দেখি রাধা লজ্জা করে ॥

চুম্বন, যথা—(সখী প্রতি রূপমঞ্জরী)—

রাইক বদন কমল বর সুন্দর চুম্বই নাগর রায়।
কমল বিপিনে যেন অলিবর বিহরই পুনঃ পুনঃ মধু পিয়ে তায় ॥

আলিঙ্গন, যথা—(শ্রীরাধা-সখীর উক্তি)—

নাগর ভুজবলয়ায়িত রাধা। রাহু গরাসল শশধর আধা ॥

নখ-রেখা, যথা—(শ্রীরাধা প্রতি শ্যামলা)—

গতিতে কুঞ্জর জিনি তার কুম্ভ হ'রে আনি রাখিয়াছ আপন হৃদয়ে।
শ্রীনাগ দমন কৃত নখাঙ্কুশ চিহ্ন যত প্রকাশিত হইয়া আছয়ে ॥

অধর-সুধা পান, যথা—(শ্রীরাধা প্রতি দূতী বা শ্রীকৃষ্ণ)—

সুধাকর সুধা ব্যর্থকারী মুখ আচ্ছাদ না কর করে।
নাগর ভ্রমর পান করু তাহা আপনার আশা পুরে ॥

সংপ্রয়োগ, যথা—(কুন্দলতা প্রতি বৃন্দা)—

রাধিকার কন্ধ বেড়ি হস্ত প্রসারিল হরি অধর সুধা করে পান।
রাধার হয় ভাবোদ্গম দোহে অতি মনোরম ক্রীড়াগণের করয়ে নির্ম্মাণ ॥

বিদগ্ধের বিলাসাদ্যে যত সুখ হয়।
সংপ্রয়োগে তাহা নয়, কবিগণ কয়॥*

যথা—(গোপনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের 'লীলাবিলাস' আস্বাদনকারিণী সখীগণোক্তি)—

হরি আলিঙ্গয়ে তাথে রাই করে নখাঘাতে কৃষ্ণ যেই করয়ে চুম্বন।
বসন ফেলাঞা মারে হরি পুনঃ বস্ত্র ধরে রাধা করে উৎপল তাড়ন॥
গোবিন্দ উৎপল ধরে শুষ্ক (?) রোদন করে কপটে করয়ে কোপাভাষ॥
সঙ্গমের শতগুণ তাথে আনন্দিত মন রাধা সঙ্গে সদাই বিলাস॥

অতএব 'শ্রীগীতগোবিন্দে'†—

প্রত্যুহঃ পুলকাঙ্কুরেণ ইত্যাদি।

গ্রন্থশেষে মঙ্গলাচরণ

কৃষ্ণে সম্বোধয়ে—গোকুলানন্দ গোবিন্দ।
প্রাণেশ, সুন্দরোত্তংশ, নন্দকুল-চন্দ্র॥
নাগর-শিরোমণি, আর বৃন্দাবন বিধু।
গোষ্ঠ-যুবরাজ, মনোহর, প্রাণবঁধু॥
এই মত কৃষ্ণেরে করে প্রিয় সম্বোধন।
কিঞ্চিৎ দেখাল তার, দিগ্ দরশন॥
অতুল্য অপার সেই মধুর রস সিন্ধু।
তটস্থ হইয়া তার পাইনু একবিন্দু॥

---

* নির্জ্জন স্ত্রীসম্ভোগ দ্বিবিধ -'সংপ্রয়োগ' ও 'লীলাবিলাস'। বিদগ্ধ বা রসিকগণের এই 'লীলাবিলাস' আস্বাদনে যেরূপ সুখোৎপত্তি হয়, 'সংপ্রয়োগ' বা স্ত্রীসম্ভোগে তদ্রূপ হয় না।

† গ্রন্থ-সমাপ্তি কালে, রসিকমহানুভাবাগ্রগণ্য শ্রীল জয়দেব রচিত পদ্য দ্বারা স্বীয় মত দৃঢ়ীকরণ জন্য, গ্রন্থকার এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই শ্লোকের, পদ্যানুবাদ প্রদত্ত হয় নাই। ভাবানুবাদ এই—'শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর সুরতারম্ভ যাহা রসিকজনের অনুভববেদ্য হইয়া উদ্ভুত হয়, তাহারই নিবিড় আলিঙ্গন-জনিত পুলকাঙ্কুর দ্বারা, ক্রীড়া জন্য সতৃষ্ণ বিলোকনে নিমেষ দ্বারা, অধর সুধা পান নিবন্ধন কথার নম্রতা দ্বারা, এবং মন্মথ কলাযুদ্ধে আনন্দানুভব দ্বারা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল।

তাহা কিছু স্পষ্ট করি করিনু বিস্তার।
নিঃশেষ বর্ণন করে হেন শক্তি কার ॥*

অনুবাদক

শ্রীরূপ গূঢ় অর্থ করি লোকে জানাইল।
তার কিছু অর্থ মুঞি প্রকটন কৈল ॥
এই রসে যেই জন রসিক হইবে।
পরম আদর করি ইহারে জানিবে ॥
নির্ব্বুদ্ধির হাতে না করিহ সমর্পণ।
একে আর লেখি করে অর্থ বিনাশন ॥

সম্পূর্ণ

---

* শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী স্বীয় 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থের সফলতার জন্য, স্বসেব্য চরণারবিন্দ শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রবণ-বিষয়ীভাব প্রাপ্তি কামনা করিয়া বলিতেছেন—'হে দেব, দুর্গম মহাঘোষ (গোকুল) সাগরোৎপন্ন এই 'উজ্জ্বল নীলমণি' আপনার মকরকুণ্ডল পরিসরে সেবা-উচিত ভজনা করুক'।

পরিশিষ্ট

প্রেমোল্লাস বিধায়িনী সুরসিনী মৎকণ্ঠ সঞ্চারিণী
শৃঙ্গারোৎসব ভারতী গুণবতী গোবিন্দ লীলাবতী।
সংস্পৃষ্টা কবিতা ময়া শুভধিয়া সন্মার্গ প্রত্যাশয়া
শ্রীমদ্ভক্ত সভাসদাবলি পরাশংমোদ হেতুঃ সদা ॥ ১ ॥

সুহৃত্তিলকতেজশ্চন্দ্র ভূপাল সভ্যপ্রবর নবকিশোরাখ্যস্যানন্দদত্তোত্তমস্য।
গুণজলধি কনিষ্ঠ ভ্রাতুরাদেশতোঽহং ব্যরচয়মমিতার্থং গ্রন্থমেতং প্রমোদাৎ ॥২ ॥

সংগোপ্যযত্নাৎ সুধিয়া নিধেয়ঃ গ্রন্থোঽয়ং মুখ্যস্য করেষু দেয়ঃ।
মূর্খোহি জানাতি নচাস্য ভাবং বিমর্শয়েৎ কেবলমক্ষরাণি ॥ ৩ ॥

স্পষ্টীকৃতোঽয়ং শৃঙ্গারো নিজ জ্ঞানানুসারতঃ।
ময়া রূপপদাম্ভোজ কৃপাসীধুমদাত্মনা ॥ ৪ ॥

মুনি খ মুনি শশাঙ্কে সংজ্ঞিতে শাকেবর্ষে
তুহিণ কিরণবারে পৌষ মাসে দশম্যাং
দ্বিজবর কুলজাত শ্চানক গ্রাম বাসী
রচিত সরল ব্যাখ্যা শ্রীশচীনন্দনাখ্যঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীরূপগোস্বামি বিরচিতোজ্জ্বলনীলমণিস্পষ্টব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

॥ ইত্যুজ্জ্বলচন্দ্রিকা নামগ্রন্থঃ সমাপ্তঃ ॥

রস-বৃক্ষ

দুই শাখা—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ

ক—বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ

(১) পূর্ব্বরাগ—৮

শ্রবণ—

দূতী মুখে শ্রবণ ১
সখী মুখে শ্রবণ ১
গুণীজনের গান ১
ভাট মুখে শ্রবণ ১
বংশীধ্বনি " ১
———
৫

দর্শন—

স্বপ্ন দর্শন ১
সাক্ষাৎ " ১
চিত্রপট " ১
———
৩
———
মোট—৮

নায়ক—ধীরোদাত্ত
নায়িকা—খণ্ডিতা
করুণ—রস
শোক ভাব
———
৪

(২) মান—৮

সহেতু—৬

(ক) শ্রুত
সখী মুখে ১
শুক মুখে ১
মুরলী প্রস্তাবে ১
———
৩

(খ) অনুমিতি
ভোগাঙ্ক চিহ্ন দর্শনে ১
(প্রিয় গাত্রে)
ঐ—বিপক্ষগাত্রে ১
বাক্যস্খলন ১
———
৩
———
৬

নির্হেতু—২
কারণ আভাস ১
অতিকারণ (অকালে প্রেমোদ্গম) ১
———
২
———
মোট—৮

নায়ক—ধীরশান্ত
নায়িকা—বিপ্রলব্ধা
অদ্ভুত—রস
উৎসাহ—ভাব
———৪

(৩) প্রেম-বৈচিত্ত্য—৮

আক্ষেপানুরাগ ১
উল্লাসানুরাগ ১
———
২

রূপানুরাগ—
কৃষ্ণপ্রতি আক্ষেপ ১
নিজপ্রতি " ১
মুরলী " ১
সখী " ১
দূতী " ১
———
৫
রসোদ্গার ১
———
মোট—৮

নায়ক—ধীরশান্ত
নায়িকা—বিপ্রলব্ধা
করুণ—রস
উৎসাহ ভাব
———
৪

(৪) প্রবাস—৮

নিকট প্রবাস—
গোচারণ ১
নন্দমোক্ষণ ১
কালীয় দমন ১
কার্য্যানুরোধে ১
রাসে অন্তর্ধান ১
———
৫

ভাবী ১
ভবন ১
ভূত ১
———
৩
———
মোট—৮

নায়ক—শঠ
নায়িকা—প্রোষিতভর্ত্তৃকা
বীভৎস—রস
জুগুপ্সা—ভাব
———
৪

কিঞ্চিদ্দূর প্রবাস

নিকট প্রবাস

খ—সম্ভোগ চতুর্ব্বিধ

(১)—সংক্ষিপ্ত	(২)—সঙ্কীর্ণ	(৩)—সম্পূর্ণ	(৪)—সমৃদ্ধিমান
(পূর্ব্বরাগানন্তর)	(মানানন্তর)	(কিঞ্চিদ্দূর প্রবাসানন্তর)	(সুদূর প্রবাসানন্তর)
বাল্যে ১	মহারাস ১	সুদূর দর্শন ১	স্বপ্নে মিলন ১
গোষ্ঠে ১	কুঞ্জলীলা ১	দোল লীলা ১	কুরুক্ষেত্রে " ১
গাভী দোহে ১	দানলীলা ১	হোলীলীলা ১	বাক্ বিলাপে ১
চুম্বনে ১	নৌকাবিলাস ১	প্রহেলী ১	ব্রজাগতে ১
স্পর্শনে ১	বংশী চৌর্য্য ১	দ্যূত ক্রীড়া ১	ভোজন কৌতুকে ১
বস্ত্রাকর্ষণে ১	মধুপান ১	নর্ত্তক রাস ১	একত্র নিদ্রায় ১
পথ রোধে ১	সূর্য্য পূজা ১	রসালস ১	বিপরীত সম্ভোগ ১
রতি ভোগে ১	স্বয়ং দূতী ১	কপট নিদ্রা ১	স্বাধীন ভর্ত্তৃকা ১
মোট—৮	মোট—৮	মোট—৮	মোট—৮
নায়ক—ধৃষ্ট	নায়ক—ধীরললিত	নায়ক—দক্ষিণ	নায়ক—অনুকূল
নায়িকা—খণ্ডিতা	নায়িকা—বাসকসজ্জিকা	নায়িকা—অভিসারিকা	নায়িকা—স্বাধীনভর্ত্তৃকা
ভয়ানক—রস	রৌদ্র—রস	হাস্য—রস	মধুর—রস
ক্রোধ—ভাব	বিস্ময়—ভাব	হাস্য—ভাব	রতি—ভাব
৪	৪	৪	৪

সম্ভোগ চতুর্ব্বিধ—প্রত্যেকে অষ্ট প্রকারে—৩২ প্রকার

বিপ্রলম্ভ " " —৩২ "

সর্ব্বসমেত— ৬৪ চতুঃষষ্ঠি রস

[এই রস-বৃক্ষটী একটী প্রাচীন পুঁথি হইতে সঙ্কলিত হইল]